৩
বিমল কর
কিকিরা
সমগ্র

কিকিরা সমগ্র ৩

বিমল কর

আ ন ন্দ

ভূমিকা

কিকিরা সমগ্র-এর দুটি খণ্ড আগেই প্রকাশিত হয়েছে। এটি তৃতীয় খণ্ড। কিকিরা চরিত্র নিয়ে লেখা আর কোনও কাহিনী আমি খুঁজে পাচ্ছি না। ধরে নিতে হবে এটিই শেষ খণ্ড। আগে যা বলেছি, আবার বলি, গোয়েন্দা গল্প বলতে ঠিক যা বোঝায় কিকিরার গল্প তা নয়। অপরাধমূলক কাহিনী বলা যায়। খুনোখুনি বন্দুক পিস্তল রক্তপাত—এইসব ভয়ংকর ব্যাপার কিকিরার গল্পে নেই; যেটুকু আছে তা আড়ালে, এবং অতি সামান্য। এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। কিকিরাসারকে যাদের ভাল লাগে, এই লেখাগুলি তাদের তৃপ্ত করলে খুশি হব।

বিমল কর

সূচি

কৃষ্ণধাম কথা
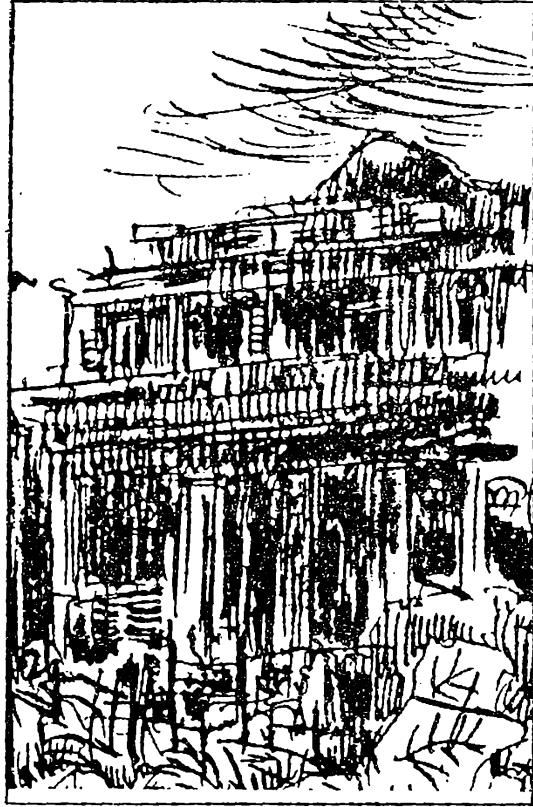
কৃষ্ণধাম কথা

বাসটা ঠিক জায়গাতেই নামিয়ে দিল। রাস্তা ঘেঁষে বটগাছ। একটার গায়ে গায়ে আরেকটা। বাসস্টপের নাম 'জোড়া বটতলা'। বৃষ্টি পড়ছে তখনও। তবে ঝিরঝিরে বৃষ্টি। আকাশে মেঘ। চেহারা দেখে মনে হয় সারাদিনেও এই বাদলা ঘুচবে না। আশপাশে গাছগাছালি, ঝোপ, জংলা লতাপাতা। একপাশে একটা ভাঙা মন্দির। অন্যপাশে, সামান্য তফাতে, কোন এক মিশনারিদের অনাথালয়। চারদিকে পাঁচিল তোলা। ফটকটাও দেখা যায়।

বটগাছের তলায় ছাতা হাতে যশোদাজীবন দাঁড়িয়ে ছিলেন। পরনে ধুতি, মালকোঁচা মেরে পরেছেন যেন। গায়ে একরঙা শার্ট। পায়ে বর্ষা-জুতো, আজকাল বাজারে যা দেখা যায়।

কিকিরা দেখতে পেয়েছিলেন যশোদাকে।

"আমি আধঘণ্টাখানেক দাঁড়িয়ে আছি," যশোদা কয়েক পা এগিয়ে এলেন। "বাসটা তাহলে পেয়েছেন! দিনটা বড় খারাপ আজ।"

কিকিরা বললেন, "কেন, সময়েই তো পৌঁছে গেলাম। ক'টা বাজে এখন? দশটার বেশি নাকি?"

"না, না, ওইরকমই হবে।...এদিককার বাস কম। গোটা তিন-চার। খারাপ হয়ে গেলে তাও কমে যায়। তার ওপর দিন বুঝে বাস চালায়। আজ দিনটা একেবারে পুরো বর্ষার মতন। আসুন—।"

কিকিরা তারাপদকে ইশারা করলেন এগিয়ে যেতে। যশোদাকে বললেন, "কত দূর যেতে হবে?"

"বেশি নয়। মিনিটবিশেক হাঁটতে হবে। রাস্তা ভাল নয়, কাঁচা। কাদায় পা ডুবে যায়..."

"ঠিক আছে চলুন। তা যশোদাবাবু, বাসটা থেকে আমরা দু'জন মাত্র নামলাম এখানে। আর তো কেউ নামল না।"

"ওইরকমই। এক-আধজনই নামে এখানে। হাটের দিনে অবশ্য ভিড় হয়। ওই

ওপাশে মঙ্গলঘাটা বলে একটা জায়গায় হাট বসে রবিবার। পাইকাররা আসে। অন্যদিন ভোঁ-ভা।”

“অনাথালয়টা কাদের?”

“মিশনারি সাহেব বাবুদের পয়সায় তৈরি। শুনেছি কোন এক নামকরা বিদেশি মেমসাহেব এদিকে একবার বেড়াতে এসে টাকা-পয়সার ব্যবস্থা করে দিয়ে গিয়েছিলেন। অন্যরাও টাকা দেয়। ওদের নিজেদের একটা পুরনো জিপগাড়ি আছে। কাজেকর্মে বাইরে যায়।”

কিকিরারা হাঁটতে শুরু করেছিলেন। কাঁচা রাস্তা। হাত-কয়েক চওড়া মাত্র। জল কাদায় পা রাখা দায়। মাঝে মাঝে ইটের টুকরো, ভাঙা পাথরের চাঁই ফেলা রয়েছে। দু'পাশে নিচু জমি। কোথাও কোথাও আধখাপচাভাবে চাষ হয়েছে, কোথাও সবজি বাগান, ছোট একটা নার্সারিও চোখে পড়ল।

তারাপদ তেমন খুশি হচ্ছিল না। কিকিরা দিন-দিন যেন ছেলেমানুষ হয়ে যাচ্ছেন। কোথাকার কে হীরালাল বলে এক ভদ্রলোক দিন চার-পাঁচ হল তাঁর বাগান থেকে উধাও। ভদ্রলোক নাকি বড়সড় কারবারি, কলকাতা শহরে তিনটে আর হাওড়ায় একটা কাপড়ের দোকান। ছোটখাটো দোকান নয়। মস্ত দোকান। বেশ নামডাক আছে দোকানগুলোর, হাজার হাজার টাকার কারবার করেন। তা করুন কারবার, ভাল কথা। তা ওই ভদ্রলোক—হীরালালবাবু,—বছর তিন-চার আগে এদিকে অনেকটা জমি কিনে তাঁর শখের ‘কৃষ্ণধাম’ বলে একটা বাগানবাড়ি তৈরি করিয়েছিলেন। বাগানবাড়ি বলতে ঠিক যা বোঝায়—তেমন বাড়ি অবশ্য নয়। একটা ছোট বাড়ি, আর আশপাশে বাগান—ফলফুলুরির। লোকজন রেখেছিলেন নিজের পছন্দ মতন। প্রত্যেক হপ্তায় শুক্রবারে হীরালাল তাঁর কৃষ্ণধামে চলে আসতেন। থাকতেন সোমবার পর্যন্ত। ওঁর স্ত্রী বিগত। সংসারে ছেলেমেয়েরা আছে। তাদের বয়েসও কম হল না। বাবার ব্যবসা ছেলেরাই দেখে। হীরালালবাবু নিজে ব্যবসাপত্র থেকে ধীরে ধীরে সরে এসেছেন। তবু তিনি থাকা মানে মাথার ওপর ছাতা থাকা। ইদানীং ভদ্রলোক কেমন যেন হয়ে যাচ্ছিলেন। উদাস, নিস্পৃহ। তিনি কোনও ব্যাপারেই মন বা নজর দিতে চাইতেন না। একেই বোধ হয় বলে বৃদ্ধ বয়সের সংসার বৈরাগ্য।

গত শুক্রবার হীরালাল যথারীতি তাঁর কৃষ্ণধামে চলে আসেন। সঙ্গে যশোদা। যশোদা হীরালালের নিত্যসঙ্গী। বন্ধু নয়, কর্মচারী। হীরালালের যৌবনকাল থেকে পাশে পাশে আছেন। দুঃখের দিনের সঙ্গীকে সুখের দিনেও ছাড়েননি হীরালাল। সম্পর্কটা প্রায় বন্ধুর মতন হয়ে উঠেছিল। লোকে জানে, যশোদা হলেন হীরালালের ম্যানেজার এবং বিশ্বস্ত বান্ধব।

গত শনিবার বিকেল থেকে হীরালালকে কৃষ্ণধামে পাওয়া যাচ্ছে না। পাওয়া যাচ্ছে না—সে অন্য কথা। কিন্তু হীরালালের হাতে লেখা যে তিনটি চিরকুট পাওয়া গিয়েছে—সেটাই মারাত্মক।

চিরকুটগুলো পড়লে ধাঁধা লেগে যায়। মনে হয়: (১) হীরালাল আত্মহত্যা করার কথা ভাবছিলেন, (২) আত্মহত্যা করার সিদ্ধান্ত তিনি নিয়ে নেন সম্প্রতি, (৩) সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর হীরালাল আত্মহত্যা করতে যাচ্ছেন বলে একটা চিরকুট লিখে রেখে উধাও হয়ে গিয়েছেন।

শনিবার বেলার দিকে হীরালাল যশোদাকে একটা কাজে পাঠিয়েছিলেন। কাজটা মোটেই জরুরি নয়। মাইল চারেক দূরে 'বৈকুণ্ঠ নার্সারি'-তে গিয়ে খোঁজ করতে হবে তারা সত্যি সত্যি নার্সারি বিক্রি করার কথা ভাবছে কিনা! যদি বিক্রি করাই ঠিক করে থাকে—তবে জমিজায়গা নার্সারি সমেত দরদাম কী পড়তে পারে!

যশোদা যেতে চাননি। কী হবে নার্সারিতে, বা জমিজায়গায়! ঈশ্বরের কৃপায় বড়বাবু—মানে হীরালালের তো কম সম্পদ নেই; তা হলে অযথা আর সম্পত্তি বাড়ানো কেন? তা ছাড়া একটা পড়তি নার্সারি সম্পত্তি হিসেবেও কেনার কোনও মানে হয় না। আপত্তি সত্ত্বেও যেতে হল যশোদাকে; হাজার হোক বড়বাবুর হুকুম।

মেঠো রাস্তায় সাইকেল চালিয়ে যশোদা বৈকুণ্ঠ নার্সারিতে গিয়েছিলেন। ফিরতে ফিরতে বিকেল। ফিরে এসে আর বড়বাবুকে দেখেননি।

আশপাশে কোথাও আছেন ভেবে যশোদাও আর হীরালালের খোঁজ করেননি তখন। যশোদারও বয়েস হয়েছে; যাওয়া-আসায় আট মাইল। তাও মেঠো পথে। সাইকেল চালাবার ধকল সামলে যশোদা যখন খানিকটা সামলে নিয়েছেন নিজেকে, তখন বড়বাবুর খোঁজ করলেন। ভাদ্রমাসের বিকেল ততক্ষণে মরে গিয়ে অন্ধকার নেমে এসেছে। এখানে ইলেকট্রিক নেই! কেরোসিনের বাতিতেই কাজ চালাতে হয়। মাঝে মাঝে বড়বাবুর খেয়ালে কৃষ্ণধামের বারান্দায় একটা ছোট পেট্রম্যাক্স বাতি জ্বালানো হয়। চতুর্দিক ফাঁকা, যেদিকে তাকাও মাঠ আর গাছপালা আর অন্ধকার। ওর মধ্যে পেট্রম্যাক্স বাতিটা যেন আকাশের তারার মতন দেখায়। অবশ্য জ্যোৎস্নার দিনে বাতি জ্বালানো হয় না বাইরে। তখন অঢেল জ্যোৎস্না আর জোনাকির নৃত্যই যেন কৃষ্ণধামকে ঘিরে থাকে।

সন্ধের মুখেও হীরালালকে দেখতে না পেয়ে যশোদা দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলেন। কাজের লোক তিনজন। একজন রান্নাবান্না নিয়ে থাকে, অন্যজন ঘরদোর সাফসুফ রাখে। তৃতীয়জনের কাজ হল জল তোলা আর চৌকিদারি। বাড়তি দু'জন মালি আসে হপ্তায় তিনদিন। তারা বিকেল-বিকেল চলে যায়।

কাজের লোকরা বলতে পারল না বড়বাবু কোথায় গিয়েছেন। তাঁকে বিকেলের পরে তারা দেখেছে। তারপর আর দেখেনি।

যশোদা তখন হীরালালের শোয়ার ঘরে খোঁজ করতে আসেন। এসে দেখেন বিছানার ওপর তিনটুকরো কাগজ রাখা। প্রত্যেকটি কাগজের ওপর ভারী কিছু চাপা দেওয়া—যেন না বাতাসে উড়ে যায় কাগজগুলো।

কাগজের লেখাগুলো পড়েই যশোদার মাথা ঘুরে যায়। তিনি বিশ্বাস করতেও

পারেননি। তারপর খোঁজ খোঁজ পড়ে যায় আবার। এবার যশোদা নিজে বাড়ির কাজের তিনটে লোককে নিয়ে মাঠেঘাটেও খুঁজে বেড়াতে শুরু করেন বড়বাবুকে। আত্মহত্যা করুন আর না করুন, কোথাও হয়তো পড়ে আছেন মাথা ঘুরে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে, সাপেখোপেও কামড়াতে পারে।

লণ্ঠন আর টর্চ নিয়ে ঘণ্টাখানেকের বেশি খোঁজ চলল। রাত্রে আর কত খোঁজ করা যায়! এদিকে কলকাতা যাওয়ার শেষ বাস চলে গিয়েছে সোওয়া সাতটা নাগাদ। কলকাতায় যাওয়ারও উপায় নেই।

রাতটা উদ্বেগে আর দুর্ভাবনায় কাটিয়ে পরের দিন যশোদা ছুটলেন কলকাতায়। বড়বাবুর বাড়ি বাগবাজারে। তেতলা বাড়ি। ছেলেরা সকলেই একসঙ্গে থাকে। বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবার।

বড়বাবুর বড় ছেলে বড়দা—মানে কানাইলাল। মেজো ছেলে শ্যামলাল। তিনি হলেন মেজদা। ছোটর নাম কুমারলাল। বড়দা এখন বেনারসে, পুজোর মরশুমে কাশীর চকপট্টি আর তাঁত-মহল্লায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন ব্যবসার কাজে। এখন থেকে না ব্যবস্থা করে রাখলে বিয়ের মরশুমে মনের মতন বেনারসি পাবেন না। তা ছাড়া আজকাল সুতি কাপড়েও বেনারসি ধরনের কাজ হয় কাশীতে। মালের অর্ডার দিয়ে দু'-একদিনের মধ্যেই ফিরবেন। তাঁকে হুট করে এ-সময় একটা দুঃসংবাদ দেওয়া যায় না। আর না-জেনে না-দেখে—কেমন করে বড়দাকে খবর দেওয়া যায় যে, বাবা আত্মহত্যা করেছেন, তুমি পত্রপাঠ ফিরে এসো।

মেজো শ্যামলাল স্বভাবে ভিতু আর সাবধানী। তার মোটেই ইচ্ছে নয়, ব্যাপারটা নিয়ে হুট করে থানাপুলিশ করা। বাবা যদি আত্মহত্যা না করে থাকেন—আর থানা-পুলিশ করতে ছোটে বাড়ির লোকে—তবে ভবিষ্যতে বিরাট একটা গোলমাল হবে। আত্মহত্যা করতে চলেছি—এই ব্যাপারটা পুলিশকে জানালেও সেটা বিশ্রী অপরাধ বলে গণ্য হবে। আইনের কত না ফ্যাকড়া!

কুমারলাল এখন ছুটেছে বর্ধমান, আসানসোল, কালনা—যেখানে যেখানে জ্ঞাতি, গোষ্ঠী আছে তাদের সকলের কাছে গিয়ে বাবার খোঁজ নিতে। মানুষ বুড়ো হলে ভীমরতি ধরে। বাবারও যে ধরেনি কে বলবে!

শ্যামলালের সঙ্গে পরামর্শ করে যশোদা এসে ধরেছিলেন কিকিরাকে। রায়বাবুর সঙ্গে মোটামুটি একটা পরিচয় ছিল যশোদার। অনেককাল আগে একই পাড়ায় থাকতেন দু'জনে।

কিকিরা মন দিয়ে সব শুনেছিলেন ঘটনাটা। কৌতুক এবং কৌতূহল—দুই-ই বোধ করেছিলেন। শেষমেশ রাজিও হয়ে গেলেন।

মাথায় ছাতা। গায়ে রেনকোট। মাঠঘাট, জলকাদা ভেঙে, মাঝে মাঝে বুনো ঝোপ সরিয়ে কিকিরারা শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণধামে পৌঁছে গেলেন।

দূর থেকে ভাল করে বোঝা যায় না, আন্দাজ করা চলে। তার ওপর বৃষ্টির

বিরাম নেই। কাছে এসে বোঝা গেল, কৃষ্ণধামের কম্পাউন্ড-ওয়াল তেমন উঁচু নয়, হাত তিনেক হবে। তার ওপর অবশ্য ছোট ছোট লোহার খুঁটি জড়িয়ে তারকাঁটা লাগানো। গাছপালাই নজরে পড়ে বেশি, সামনের দিকে। বড় বড় গাছও রয়েছে অনেক: আম, জাম, পেয়ারারা। পেছন দিকে কৃষ্ণধাম। বাড়িটা বড় নয়। ছোট। দেড়তলার মতন লাগে তফাত থেকে দেখলে। বাড়ির ছাঁদ অনেকটা মন্দিরের মতন। মানে নকশাটা মন্দির ধরনের। আশপাশে ফুলগাছ, সরু সরু পথ, মোরাম আর নুড়ি পাথর বিছানো পথ।

ভালই লাগে দেখতে।

তারাপদ বলল, "কিকিরা সার, আপনি বললেন বর্ষায় একটু 'ফিশিং' করতে যাবেন! এই আপনার ফিশিং?"

কিকিরা বললেন, "দ্যাখো তারাবাবু, আমি অনেক কিছু জানি; তার চেয়েও বেশি হল যা জানি না। পৃথিবীর একভাগ স্থল, তিনভাগ জল। আমার ব্রেনেরও সেই অবস্থা, সার বস্তু ওয়ান পার্ট ওনলি! ফিশিংটা আমার শেখা হয়নি বাপু। ছিপ আমি দেখেছি; মাছ ধরতেও দেখেছি বাবুদের। কিন্তু জীবনে কখনও ছিপ ধরিনি।...তা সে যাই হোক, তোমাকে আমি ফিশিংয়ের ব্যাপারটা বলেছি আগেই।"

"তা অবশ্য বলেছেন।"

"তবে?"

"ব্যাপারটা আমার কাছে বাজে বলে মনে হচ্ছে। এই বৃষ্টিবাদলায় কেউ এমন অজগাঁয়ে আসে! চাঁদু বেঁচে গিয়েছে।"

"বেঁচে গেল, কিন্তু মজাটা জানতে পারল না। চাঁদু কথায় কথায় বাড়ি ছোটে কেন বলতে পারো?"

"ও বোধ হয় হাসপাতালের চাকরি ছেড়ে দেবে। বাড়ি গিয়ে প্রাইভেট প্র্যাকটিস নিয়ে বসবে।"

"পারবে?"

"পারবে। মন বসাতে পারলে। চাঁদু দারুণ ছেলে। তবে কিকিরা, চাঁদু কলকাতা ছেড়ে চলে গেলে আমি মরে যাব। ও আমার বন্ধু, ভাই, গার্জেন..."

কিকিরা হেসে বললেন, "তুমি এক কাজ করো।"

তারাপদ তাকিয়ে থাকল।

কিকিরা মজার গলায় বললেন, "কম্পাউন্ডারিটা শিখে নাও। চাঁদুর 'কম্প' হয়ে পাশে পাশে থাকতে পারবে।"

তারাপদ হেসে ফেলল। বলল, "তা ঠিক।...তবে আমি একটা চিরকুট রেখে এসেছি চাঁদুর কোয়ার্টারে। কাল পরশু ফিরলেই জানতে পারবে।"

॥ ২ ॥

হাত-পা ধুয়ে ভিজে পোশাক পালটে কিকিরারা চা খেতে বসলেন। বেলা প্রায় এগারোটা। বৃষ্টি ধরে রয়েছে, তবে আবার নামবে।

চা খেতে খেতে কিকিরা যশোদাকে বললেন, "কই, সেই কাগজগুলো দিন, দেখি।"

যশোদা আগেই নিয়ে এসেছেন কাগজের চিরকুটগুলো। জামার পকেটেই ছিল। এগিয়ে দিলেন।

কিকিরা হাত বাড়িয়ে নিলেন কাগজগুলো। দেখলেন একবার। একই ধরনের কাগজ। এক্সারসাইজ খাতার সাদা পাতা। লেখার কালি কলমও এক। হীরালালের হাতের লেখা চলনসই।

যশোদা বললেন, "পর পর গুছোনো আছে। ওপরেরটা প্রথম...।"

কিকিরা লেখাটা পড়লেন মনে মনে। "আমার বয়েস আটষট্টি হইয়া গিয়াছে। দেশ ছাড়া হইয়া যখন আসি, উনিশ-কুড়ি বয়েস ছিল। লেখাপড়া ঠিকঠাক শেখা হইয়া উঠে নাই। পাঁচ ঘাটের জল খাইয়া কাটা কাপড়ের ব্যবসা শুরু করি। তাহার পর কাপড়ের গাঁঠরি পিঠে করিয়া বাড়ি বাড়ি তাঁতের শাড়ি বিক্রি করিতাম। পরিশ্রম অনেক করিয়াছি। অবশেষে শ্যামবাজারে একটি কাপড়ের দোকান দিতে পারি। ঈশ্বরের কৃপায় ইহা সম্ভব হইয়াছিল। সৎভাবে ব্যবসা করিয়াছি। ভাগ্যও সহায় হইয়াছে। ক্রমে ক্রমে আমাদের ব্যবসা বাড়িল। তিন-তিনটি দোকান দিলাম। এখন তো অভাব অনটন কিছুই আর নাই। ছেলেরাও দাঁড়াইয়া গিয়াছে। আমার মনে কিন্তু সুখ নাই। অনর্থক আর বাঁচিতে ইচ্ছা করে না। শ্রীকৃষ্ণচরণে শরণ লইতে ইচ্ছা করে।"

লেখাটা বার দুই-তিন পড়ে কাগজটা তারাপদকে পড়তে দিলেন কিকিরা।

দ্বিতীয় চিঠিটা ছোট। তাতে লেখা: "অনেক ভাবিয়া দেখিলাম, এবার সংসার হইতে বিদায় লওয়াই আমার উচিত। বাঁচিয়া থাকিলে না জানি কত অধর্ম অন্যায় দেখিতে হইবে। মহাভারতে পড়িয়াছি, স্বয়ং মহাজ্ঞানী ভীষ্মও নিজের ইচ্ছামৃত্যুর জন্য অনুতাপ করিতেন। ভাবিতেন, উহা যেন অভিশাপ। আমি সামান্য মানুষ। আমার আর কতটুকু ক্ষমতা। আমি মনস্থির করিয়া ফেলিয়াছি। আমার যাওয়া আর কে আটকায়।"

চিঠিটা তারাপদকে পড়তে দিলেন কিকিরা। শেষ টুকরোটা হাতে নিয়ে যশোদাকে বললেন, "এইটেই শেষ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

চিঠিটা খুবই ছোট। কয়েকটি মাত্র কথা। "আমি শেষ যাত্রায় চলিলাম। স্বেচ্ছায়। আমার পরিণতির জন্য কাহাকেও আমি দায়ী করি না। ঈশ্বর উহাদের মঙ্গল করুন।"

বার দুই-তিন শেষ চিঠিটা পড়ে কিকিরা কাগজের টুকরোটা তারাপদকে এগিয়ে দিলেন।

সামান্য চুপচাপ। পকেট থেকে কিকিরা চুরুট বার করলেন। সরু আঙুলের মতন চুরুট। দেশলাইটা স্যাঁতসেঁতে হয়ে গিয়েছে। চুরুট ধরাতে দশ-বারোটা কাঠি নষ্ট হল।

"যশোদাবাবু?"

"বলুন?"

"চিঠি তিনটের হাতের লেখা তো একই লোকের মনে হচ্ছে। হীরালালবাবুর। চিঠির শেষে নামও লিখেছেন, হীরালাল দাশ। আপনি কী বলেন?"

"হাতের লেখা বড়বাবুরই।"

"নকল নয় তো?"

"আজ্ঞে না।"

"কালির রং, কলমও একই বলে মনে হচ্ছে।"

"ঠিকই বলেছেন। আমিও কোনও তফাত দেখিনি।"

কিকিরা এবার তারাপদর দিকে তাকালেন। বললেন, "তারা, তুমি একটা জিনিস নজর করে দেখেছ? চিঠিতে কাটাকুটি বোধ হয় মাত্র দু'-তিন জায়গায়। হাতের লেখা স্পষ্ট। কোথাও হাত কাঁপেনি, এলোমেলো হয়নি লেখা। দেখেছ?"

তারাপদ দেখল। মাথা হেলিয়ে বলল, "হ্যাঁ—কথাটা ঠিকই।"

কিকিরা বললেন, "একজন লোক যখন সুইসাইড নোটের মতন চিঠি লেখে—তখন তার মাথা কতটা ঠাণ্ডা হতে পারে? তার কোথাও একটু আবেগ থাকবে না, দুঃখ থাকবে না? তোমার কী মনে হয়?"

"থাকা বোধ হয় উচিত।"

"বেশ, উচিত বাদ দিলাম। হয়তো হীরালালবাবুর মাথা বেজায় ঠাণ্ডা ছিল। স্ট্রং নার্ভ। তিনি বেশ গুছিয়ে নিজের কথাগুলো লিখেছেন। মনে মনে মক্‌শও করে থাকতে পারেন। কিন্তু আমার যে ধোঁকা লাগছে হে!" বলে কিকিরা যশোদার দিকে তাকালেন। "যশোদাবাবু, আপনাকে খোলাখুলি ক'টা কথা জিজ্ঞেস করি। যা জানেন বলবেন, কথা লুকোবেন না।"

"লুকোব কেন! বলুন।"

"হীরালালবাবুর সঙ্গে আপনি অনেকদিন ধরে আছেন, আমি জানি। তবু ঠিক কত বছর রয়েছেন জানা নেই।"

"আঠাশ-তিরিশ বছর। বড়বাবু যখন শ্যামবাজারে তাঁর প্রথম দোকান করেন—তখন থেকেই আমি তাঁর কর্মচারী। বাবু আমি আর বিনোদ বলে একটা ছেলে দোকান দেখতাম।"

"দ্বিতীয় দোকানটা কবে হয়?"

"পাক্কা দশ বছর পরে। কলেজ স্ট্রিট মার্কেটে।"

"তৃতীয়টা?"
"ভবানীপুরে। সেটা হয়েছিল মেজদার বিয়ের আগে।"
"আর হাওড়ার দোকান?"
"ওটা তেমন পুরনো নয়। বছর পাঁচ-সাত আগে হয়েছে।"
"দোকানগুলোর মালিকানা?"
"আগে সবই বড়বাবুর ছিল। পরে তিনি ভাগ করে দেন। আদি দোকান পায় বড়দা, কলেজ স্ট্রিটের দোকান দেওয়া হয় মেজদাকে। ভবানীপুরের দোকানের মালিকানা ছোড়দার।"
"আর হাওড়ার দোকান?"
"ওটা বড়বাবু অন্যরকম ব্যবস্থা করেন। তাঁর শ্যালক ও শ্যালকের ছেলেদের লিখে দেন। অবশ্য ওই দোকানটায় শালাবাবুদেরও টাকা খাটত।"
"আপনার মনিবই বলুন আর বড়বাবুই বলুন—মানুষ কেমন ছিলেন?"
"বাবু বড় ভাল লোক ছিলেন। সাদামাঠা, সরল। সৎ মানুষ। ব্যবসাদার হলেও তিনি শুধু লাভের দিকে চোখ রাখতেন না। বরং দশ পয়সার জায়গায় আট পয়সা লাভেই সন্তুষ্ট থাকতেন। ঠাকুর দেবতায় অগাধ ভক্তি ছিল। বউ ঠাকুরণ গত হওয়ার পর পুরোপুরি নিরামিষ আহার করতেন। আর গত তিন-চার বছর দোকানের ব্যাপারে মাথা ঘামাতেন না বিশেষ। বাড়ির কাছে বলে শ্যামবাজারের আদি দোকানটায় সন্ধের মুখে এক-আধ ঘণ্টা বসতেন। পুরনো লোকজন এলে কথাবার্তা বলতেন সুখদুঃখের।"
কিকিরা চুরুট টানতে টানতে মাথা নেড়ে যাচ্ছিলেন।
তারাপদ হঠাৎ কিকিরাকে বললেন, "সার, ছেলেদের সঙ্গে মন কষাকষি হয়নি তো? বুড়োমানুষ, কোনও ব্যাপারে মান-অভিমান হতে পারে।"
যশোদাই জবাব দিলেন। বললেন, "না, তেমন কিছু নয়। তবে বড়দা শ্যামবাজারের দোকানটা বাড়িয়ে নিয়েছিল। পাশের একটা ছোট হোসিয়ারি দোকান কিনে নেয়। আর আজকাল যা ফ্যাশান, দোকানটা হাল কায়দায় সাজিয়ে—ঠাণ্ডা-মেশিন চালু করে দোকানে। বড়বাবুর এটা পছন্দ হয়নি। তিনি সাবেকি মানুষ, নিজের হাতে গড়া দোকান, অত ঝকমকি তিনি মেনে নিতে পারেননি।"
"ও! তা এ নিয়ে ছেলের সঙ্গে মন কষাকষি হয়েছিল?"
"না। বড়বাবু চুপ করেই থাকতেন। মুখে কিছুই বলেননি। মনে লেগেছিল।"
"দোকান সাজানোর পর বিক্রিবাটা কমেছিল, না, বেড়েছিল?"
"বেড়েছিল।"
"তবে আর কী! অন্য দোকানগুলোর বেলায় কী হয়েছিল?"
"না, সেগুলো আগের মতনই ছিল।"
"কেমন চলত?"

“খারাপ নয়। মেজদার কলেজ স্ট্রিটের দোকানে তিন-চার মাস খুব বেচাকেনা হত—এই পুজোর টাইমে। ভবানীপুরের দোকানও ভাল চলত। ছোড়দা তার দোকানে রেডিমেড পোশাক রাখত। বাচ্চাদেরই বেশি।”

“আর হাওড়ার দোকান?”

“আজ্ঞে, ওটা আজকাল ভাল চলত না। তবে দোকানটা তো বড়বাবু শালাবাবুকে দান করেছিলেন। কাজেই ওটা হীরালাল দাশ অ্যান্ড সন্সের মধ্যে পড়ে না।”

বেলা হয়ে আসছিল। আবার বৃষ্টি নামল।

কিকিরা বললেন, “যশোদাবাবু, এখন থাক। এবার স্নান-খাওয়া সেরে নিই। দুপুরে একটু জিরিয়ে, বিকেলে কৃষ্ণধামের ঘরদোর দেখা যাবে। চোখে সব দেখে নেওয়া ভাল। আজ আমরা কিন্তু রাত্তিরেও আছি এখানে। মনে আছে তো?”

যশোদা বললেন, “ও-কথা কেন বলছেন! আপনাদের জন্যে সবরকম ব্যবস্থা করা আছে। যতদিন খুশি থাকতে পারেন!”

চুরুট নিভে গিয়েছিল কিকিরার। সেঁতিয়ে গিয়েছে। তারাপদর কাছে একটা সিগারেট চাইলেন কিকিরা।

সিগারেট ধরাতে ধরাতে হঠাৎ যশোদাকে বললেন, “আপনার বড়বাবু পান-তামাক খেতেন না?”

“আজ্ঞে না। ওঁর কোনও নেশা ছিল না। দু’বেলা দু’ পেয়ালা চা খেতেন মাত্র। আর গলা খুসখুস করে কাশি আসত বলে লবঙ্গ মুখে রাখতেন বেশিরভাগ সময়। বড়বাজার থেকে বাবুর জন্যে বাছাই করা ভাল লবঙ্গ আসত। আমিই আনতাম।”

“চলুন ওঠা যাক।” কিকিরা উঠে পড়লেন।

॥ ৩ ॥

বিকেলে কৃষ্ণধামের ঘরগুলো দেখলেন কিকিরারা। নীচের তলায় চার-পাঁচটি ঘর। মাঝারি মাপের। রান্না খাওয়ার ব্যবস্থা সামান্য তফাতে, একপাশে। বারান্দা প্রায় চারপাশেই। বারান্দার তলায় লতাপাতা আর ফুলগাছের ঝোপ। হাসনুহানা, টগর, বেল—আরও কত। ঘরগুলো পাকাপোক্তভাবে তৈরি। তবে বাহুল্য নেই, বিলাসিতা নেই। একটা ঘরে দু’ আলমারি ধর্মগ্রন্থ। দেওয়ালে দুর্গা, কালী, শ্রীকৃষ্ণ আর শ্রীগৌরাঙ্গর পট। সরল সাদাসিধে ঘরদোর। কিন্তু বেশ লাগে।

শেষে হীরালালের শোয়ার ঘরে এলেন কিকিরারা। অবাকই হলেন ঘরটি দেখে। আসবাব যৎসামান্য। একটি পুরনো পালঙ্ক, ড্রয়ার একটি, কাঠের আলমারি, আলনা। দুটি মাত্র চেয়ার। টেবিল নেই। ঘরে চারটি জানলা। কাঠের পাল্লা, গ্রিলও রয়েছে।

যশোদা পালঙ্কটি দেখিয়ে বললেন, “চিঠির টুকরো তিনটি এই বিছানার

ওপরেই ছিল।”

কিকিরা আর তারাপদ নজর করে ঘর দেখছিলেন।

কিকিরা বললেন, “যশোদাবাবু, অনেককাল আগে আপনার সঙ্গে দোকানে বেড়াতে গিয়ে একবার হীরালালবাবুকে দেখেছিলাম। চেহারাটি ঠিক মনে নেই। বেঁটে রোগা মতন ভদ্রলোক না?”

“আজ্ঞে বেঁটে ঠিক নয়, তবে মাথায় খাটো। গায়ের রং ছিল ধবধবে। মাথায় চুল অল্প। ইদানীং সবই পেকে সাদা হয়ে গিয়েছিল।”

“সাজপোশাকও সাধারণ ছিল না?”

“ধুতি-পাঞ্জাবি। গায়ে ফতুয়া পরতেন। গেঞ্জি কখনও পরেননি। চামড়ার জুতোও পায়ে দিতে পারতেন না।”

“কেন?”

“পায়ে অনেক কড়া ছিল। ওষুধবিষুধ করেছেন। কাটিয়েছেন। আবার গজিয়ে যেত। ক্যাম্বিসের পা-ঢাকা জুতো পরতেন।”

“একটা হারমোনিয়াম দেখছি যে মশাই?”

যশোদা বললেন, “এখানে থাকলে নিজের মনে একটু গান গাইতেন। রামপ্রসাদী গানই বেশি।”

তারাপদ বলল, “ধার্মিক মানুষ।”

“তা ঠিকই। অমন মানুষ কেন যে...”

কথা থামিয়ে কিকিরা বললেন, “চলুন, এবার ওপরে যাওয়া যাক।”

সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠলে দক্ষিণ দিকে দুটি ঘর। উত্তরে ঘর নেই, ফাঁকা ছাদ। বাড়িটাকে তাই দোতলা না বলে দেড়তলা বলাই ভাল। আকাশে মেঘ রয়েছে। তবে ছেঁড়া ছেঁড়া। বৃষ্টি আপাতত বন্ধ। আলো মরে এসেছে। টুকরো মেঘগুলো জমে গেলেই আবার অন্ধকার হয়ে যাবে।

যশোদা বললেন, “আসুন, ঘরদুটো দেখুন।”

কিকিরারা এগিয়ে গেলেন। পাশাপাশি দুটি ঘর। একটি একেবারে ফাঁকা। মাটিতে একপাশে একটি কার্পেট পাতা। দেওয়ালে মস্ত বড় এক শ্রীগৌরাঙ্গর পট।

যশোদা বললেন, “এটিতে বড়বাবু কখনও কখনও কীর্তনগানের আসর বসাতেন। বরানগর থেকে বাণীবাবু আসতেন কীর্তন গাইতে। তাঁর দলবল থাকত। আর আমরা থাকতাম। আশপাশের দু’-পাঁচজন।”

কিকিরা দেখলেন ঘরটা। পরিচ্ছন্ন। হীরালাল নেই, তবু ঘরটি যে ঝাঁট পড়েছে, মোছা হয়েছে—বুঝতে কষ্ট হয় না।

পাশের ঘরটি হীরালালের ঠাকুরঘর। একপাশে উঁচু বেদি। বেদির ওপর সাদা মার্বেল পাথরের স্ল্যাব। মাঝখানে রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ। কালো পাথরের। আন্দাজে মনে হয়, হাত দুই উঁচু বিগ্রহ। দেখতে সুন্দর। চিৎপুরের পাথর বাজারে যা বিক্রি

হয়—সেরকম মামুলি জিনিস নয়। বিগ্রহের দু'পাশে দুটি লম্বা বাতিদান। পেতলের। ঝকঝক করছে। ঘরের ঘোলাটে আলোতেও সেটা চোখে পড়ে। বেদির তিন পাশে গ্লাস ফাইবার, ধোঁয়া রঙের; সামনের দিকটা খোলা। বেদির তলায় দু' ধাপ সিঁড়ি। সিঁড়ির ধারগুলো আলপনার নকশায় রং করা। দেওয়ালের একটি পাশে দেওয়াল-তাক, কাচের পাল্লা, ভেতরে কয়েকটা রুপোর বাসন, বাটি, চন্দন কাঠ, আরতির পঞ্চপ্রদীপ—এইরকম কত কী! আর গোল গোল কাচের শিশি। শিশির মধ্যে বাতাসা, কিশমিশ, শুকনো খেজুর, মিছরি। একটা শিশিতে লবঙ্গও রয়েছে। শিশিটা কাত হয়ে গিয়েছে একপাশে।

যশোদা বললেন, "এসব ঠাকুরের।"

"বোঝাই যায়।...আচ্ছা যশোদাবাবু, ওই ফাইবার গ্লাসগুলো লাগানো হয়েছিল কেন?"

"ঠাকুরের গায়ে ধুলোময়লা যাতে না পড়ে!"

"ও!" বলে কিকিরা মাথার ওপর তাকালেন, তারপর তারাপদকে বললেন, "দেখেছ?"

তারাপদ আগেই দেখেছে। এই ঘরের ছাদের ধাঁচটা যেন মন্দিরের চুড়োর মতন।

"চলুন বাইরে যাই," কিকিরা বললেন।

বাইরে, ঠাকুরঘরের পেছনের আর পাশের খানিকটা লোহার রেলিং দিয়ে ঘেরা। গ্রিলের রেলিং। হাতকয়েক চওড়া ফাঁকা বারান্দা। ব্যালকনি মতন। ঠাকুরঘরের পেছন দিকের ব্যালকনি থেকে একটা ঘোরানো লোহার সিঁড়ি নীচে নেমে গিয়েছে। সিঁড়িটা শেষ হয়েছে যেখানে তার চারপাশে কলাঝোপ আর পাতকুয়ো। কলাঝোপ যথেষ্ট ঘন তার ওপর বর্ষায় পাতাগুলো যেন বিস্তর বেড়ে উঠেছে। ঝোপ ছাড়ালেই একটা জামগাছ। জামগাছের ওপাশে ঢালু জমি। বাঁশঝোপ। তারপর কৃষ্ণধামের পেছন দিকের পাঁচিল।

কিকিরা মন দিয়ে দেখছিলেন।

তারাপদও নজর করে দেখছিল আশপাশ।

কিকিরা বললেন, "যশোদাবাবু, এই সিঁড়িটা দিয়ে নেমে গেলেই কলাঝোপ?"

"আজ্ঞে।"

"কুয়োর জল কেমন?"

"ভাল।"

"একটাই কুয়ো নাকি?"

"না, আরও একটা আছে। গোয়ালঘরের দিকে।"

তারাপদ কী বলতে যাচ্ছিল তার আগেই কিকিরা পায়ের তলা থেকে কী যেন কুড়িয়ে নেওয়ার জন্যে ঝুঁকে পড়লেন। কাচের টুকরো। পায়ে লাগতে পারত। টুকরোটা তুলে নিতে গিয়ে কিকিরার চোখে পড়ল, কয়েকটা লবঙ্গ ছড়িয়ে আছে।

বৃষ্টিতে ভিজে একেবারে অন্যরকম দেখায়।

লবঙ্গগুলো তুলে নিলেন কিকিরা। তারপর চোখের ইশারায় তারাপদকে কিছু বললেন।

তারাপদ বুঝতে পারল।

কিকিরা যশোদাকে নিয়ে অন্যপাশে সরে গেলেন। তারাপদ লোহার সিঁড়ি বরাবর কী যেন খুঁজতে লাগল হেঁট হয়ে।

অন্যপাশে সরে গিয়ে কিকিরা যশোদাকে বললেন, "আপনি হীরালালবাবুর সবচেয়ে বিশ্বস্ত লোক। উনি যে এরকম একটা কাজ করতে পারেন—আপনাকে আভাসমাত্র দেননি!"

"না।"

"আপনিও বুঝতে পারেননি?"

"না। শুধু বুঝতে পেরেছিলাম উনি মনে মনে কেমন যেন ভেঙে পড়েছেন। কথায়বার্তায় আফসোস। দুঃখ করতেন।"

"কীসের আফসোস?"

যশোদাজীবন ইতস্তত করেছিলেন; শেষে বললেন, "সেভাবে সরাসরি আমায় কিছু বলেননি। বোধ হয় বলতে চাইতেন, পারতেন না। তবে বুঝতে পারতাম, তিনি যা চান না, ভাবতেও পারেন না—এমন একটা ব্যাপার বাড়ির মধ্যে কোথাও হচ্ছে।"

কিকিরা নজর করে দেখলেন যশোদাকে। মনে হল, হীরালালের এই বিশ্বস্ত বন্ধু এবং কর্মচারীটি সঠিক জবাব দিলেন না। কথা লুকোলেন।

কথা পালটে নিলেন কিকিরা। সহজভাবে বললেন, "বাড়িতে তিন ছেলের মধ্যে সদ্ভাব কেমন?"

"আজ্ঞে, হাতের পাঁচ আঙুল যেমন সমান হয় না, সংসারে ভাইবোনরাও সকলে সমান হয় কি! ফারাক থাকবেই।"

"যেমন?"

"যেমন ধরুন, বুদ্ধি-বিবেচনা, সাহস, জেদ, এইরকম আর কী! কেউ ধূর্ত হয় বেশি, লোভী; কেউ যেমন আছে তেমনই থাকতে চায়। কেউ ভিতু, সাবধানী। কেউ বা হালকা স্বভাবের। নিজেরটি নিয়ে থাকে।"

"কথাটা ঠিকই যশোদাবাবু, পাঁচ আঙুল সমান হয় না।...তা ছেলেদের মধ্যে সবচেয়ে বুদ্ধিমান কে?"

"বড়দা কানাইলাল। অতিশয় বুদ্ধিমান বলতে পারেন। সাহসী।"

"মেজো ছেলে?"

"শ্যামলাল—মানে মেজদার কথা আগেই বলেছি। ভিতু ধরনের। শখশৌখিনতাও নেই। সাদামাটা।"

"আর ছোট ছেলে?"

"কুমারলাল এখনও ঝোঁকের মাথায় চলে। হালকা স্বভাবের, বয়েসও কম। তবে হাল কায়দায় চলতে চায়। তা সে যাই করুক, ভবানীপুরের দোকানের ব্যবসাটা মন্দ চালায় না।"

তারাপদ ততক্ষণে ফিরে এসেছে।

কিকিরা আর কথা বাড়ালেন না। "চলুন, নীচে যাই।...ভাল কথা, হীরালালবাবু চলে যাওয়ার পর ওপরতলার ঠাকুরঘর, বাইরের এই জায়গাগুলো ঝাঁট পড়েনি? মোছামুছি করেছে তো?"

"মনে হয় করেনি। সকলেই বড়বাবুকে খোঁজাখুঁজিতে ব্যস্ত। আমি না হয় জিজ্ঞেস করব ওদের?"

"করবেন?...আপনিও তো ব্যস্ত। চলুন যাই, চা-টা খেতে হবে।"

কিকিরারা নীচে নেমে গেলেন।

॥ ৪ ॥

কিকিরা আর তারাপদ মুখোমুখি বসে কথা বলছিল। ঘরে লণ্ঠন জ্বলছে। সন্ধে পেরিয়ে গিয়েছে, তবে রাত নয়। তবুও, এই ফাঁকা জায়গায় সন্ধে-রাতই যেন অনেক। বাইরে বৃষ্টি নেই, ঝিঁঝি ডাকছে। বাঁশবাগান আর কলাঝোপের দিক থেকে ক্রমাগত ব্যাঙ ডেকে যাচ্ছিল।

কিকিরা বললেন, "তারা, চিঠিগুলো—মানে, হীরালালবাবুর লেখাগুলো আমি বারবার পড়েছি। আমার কী মনে হয় জানো?"

"কী?"

"ভদ্রলোক ব্যবসাদার হলেও সৎ সরল মানুষ। তিনি শুধু ধর্মকর্ম করতেন না, মনে মনেও অধর্ম করার কথা ভাবতেন না। তাঁর কাছে ধর্ম ভেক ছিল না। অথচ নিজের সংসারের মধ্যেই এমন কোনও অন্যায় অধর্ম হচ্ছিল যা তিনি সহ্য করতে পারছিলেন না। আবার মুখ ফুটে বলতেও পারছিলেন না।"

"কেন?"

"এরকম হয়। বুড়োমানুষ, সংসারের সাতপাঁচে থাকতেন না। বলতে গিয়ে যদি বিপত্তি হয়। তা ছাড়া আমার ধারণা, বলার মতন জোর প্রমাণও তাঁর হাতে ছিল না। হয়তো সন্দেহ করেছিলেন। কানাঘুষো শুনেছিলেন..."

"হতে পারে। তবে কীসের সন্দেহ?"

"সেটাই ভাবছি। যশোদাবাবুর পেটে এখনও কথা আছে। বলতে পারছেন না।"

"তা হলে মামলা ছেড়ে দিন, সার। আমার মনে হয়, আত্মহত্যা করার কথাটা বাজে। এখানে কেউ আত্মহত্যা করলে আজ ক'দিনে তার কোনও হদিস মিলবে না?"

"তোমার কথাটা ঠিকই। আমারও মনে হয় না, হীরালালবাবু সত্যি সত্যি আত্মহত্যা করেছেন। ...আরে, একটা মানুষ যখন আত্মহত্যা করতে যায় তখন কি সে ঠাকুরঘরের লবঙ্গর শিশি থেকে এক মুঠো লবঙ্গ তুলে নিয়ে চলে যায়! অসম্ভব! তখন তার মনের সে-অবস্থা থাকে না।"

তারাপদ বলল, "আপনি ওপরে লোহার ঘোরানো সিঁড়ির সামনে লবঙ্গ পেয়েছেন সার, আমি সিঁড়ির নীচের ধাপেও গোটা দুয়েক পেয়েছি।"

"ভদ্রলোক যাওয়ার আগে ঠাকুরঘরে ঢুকেছিলেন। হয়তো ঠাকুর প্রণাম করতে। তারপর কাচের আলমারি থেকে এক মুঠো লবঙ্গ তুলে নিয়ে সিঁড়ির পথ ধরে কলাঝোপ আর বাঁশঝাড়ের আড়াল দিয়ে পালিয়ে গিয়েছেন কোথাও।"

তারাপদ মাথা নাড়ল। বলল, "বেশ বুদ্ধি করেই পালিয়েছেন। যশোদাবাবুকে কোন এক নার্সারি দেখে আসতে বলে, কাজের লোকদের চোখে ধুলো দিয়ে দিব্যি গা-ঢাকা দিলেন! কিন্তু সার, ওই বুড়োমানুষ কোথায় যেতে পারেন! এখানে কাছাকাছি লুকিয়ে থাকার জায়গা কোথায় পাবেন? সবই তো ফাঁকা।"

কিকিরা মাথা দোলাতে লাগলেন। ভাবছিলেন। পরে বললেন, "শোনো বাপু, আমাকে একটু ভাবতে দাও। হীরালাল আত্মহত্যা করেননি বলেই আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু তিনি কোথায় লুকিয়ে আছেন বুঝতে পারছি না। আরও বুঝতে পারছি না, ভদ্রলোক কেন, কীসের জন্যে এই নাটক করছেন! বাড়ির গণ্ডগোল একটা কারণ হতে পারে। সেই গণ্ডগোল কেমন? কে বা কারা করেছে? কেনই বা?...তা আপাতত আমরাও আর এখানে থাকছি না। কালই ফিরে যাব কলকাতায়। আবার আসব আসছে হপ্তায়। শুক্র বা শনিবার। চাঁদুও ততদিনে ফিরে আসছে। তখন একবার চেষ্টা করা যাবে।"

তারাপদ বলল, "এই ক'দিন কী করবেন?"

"দাশবাবুর পারিবারিক খোঁজখবর নেওয়ার চেষ্টা করব। দোকানগুলো দেখব। আর ফন্দিফিকির খুঁজব।"

"দেখুন চেষ্টা করে।"

"তুমি একবার যশোদাবাবুকে ডেকে আনো। কথা বলব।"

তারাপদ বাইরে গেল যশোদাজীবনকে ডাকতে।

ক'মুহূর্ত পরেই যশোদা এলেন।

কিকিরা বললেন, "যশোদাবাবু, আপনাকে একটা কাজ করতে হবে।"

"বলুন।"

"আমরা কাল ফিরে যাব।...না, না, আসব আবার, আসছে হপ্তায়—শুক্র বা শনিবার। এর মধ্যে আপনি যেভাবে খবরটা চেপেচুপে আছেন সেইভাবে থাকবেন। থানা-পুলিশ করবেন না। মেজোবাবু ছোটবাবুকে সামলে রাখবেন।"

"বড়দা?"

"তাঁকে আলাদা করে খবর না দিলেই ভাল। তবে তিনি যদি নিজেই ফিরে

আসেন কাশী থেকে অন্য কথা।...ক'টা দিন সবুর করে থাকুন, হইচই করবেন না। একটা কথা জানবেন, আপনার বড়বাবু সত্যি সত্যি আত্মহত্যা করেননি। আর যদি করেও থাকেন তবে এখানে কোথাও নয়। বুঝলেন!"

মাথা নাড়লেন যশোদাজীবন।

॥ ৫ ॥

পরের শুক্রবারই এলেন কিকিরা। একা।

বর্ষাবাদলা নেই। ভাদ্রমাসের চড়া রোদ থাকছে দিনভর। গাছপালার সেঁতানি ভাব শুকিয়ে এসেছে অনেকটা। রাত্রে হালকা জ্যোৎস্না। শুক্লপক্ষ চলছে।

এসেই বললেন, "আপনাদের বড়দা ফিরেছেন নাকি?"

"না। দু'-চারদিনের মধ্যেই আসছেন।"

"বাড়িতে হইচই হচ্ছে?"

"আজ্ঞে তা তো হবেই। মেজদাকে আমি সামলে রেখেছি। কিন্তু ছোড়দা আর শুনতে চাইছে না। বলছে, বাবার আত্মহত্যা করার কথাটা না হয় চেপে গেলুম। হারিয়ে যাওয়ার কথাটা তো পুলিশকে জানাতে পারি।"

কিকিরা একটু হাসলেন। বললেন, "মিসিং! তা অবশ্য জানাতে পারেন; তবে মিসিংয়ের সঙ্গে অনেক ফ্যাকড়া জড়িয়ে আছে। সুতোর জট খুলতে গেলে ব্যাপারটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে আপনাদের ছোড়দার জানা নেই।"

যশোদা মাথা হেলালেন। মানে, তিনি বোঝেন সবই।

সামান্য চুপচাপ থাকার পর কিকিরা হঠাৎ বললেন, "আপনাদের এখানে শুকনো খড় পাওয়া যাবে। খড়ের আঁটি?"

যশোদা অবাক! হকচকিয়ে যাওয়ার মতন অবস্থা। "আজ্ঞে খড়?"

"খড়ের আঁটি! গোরু গোয়ালঘর যখন রয়েছে এখানে—আপনাদের কৃষ্ণধামে তখন খড় পাওয়া সহজ! না কি!"

"পাওয়া যাবে।"

"ধরুন একটু বেশিই লাগবে।"

"দেখি। খড়ের গাড়ি এ হপ্তায় আসেনি। জোগাড় হয়ে যাবে!"

"আপনাদের এখানে কেরোসিন তেল দিয়েই লণ্ঠন জ্বলে। চার-পাঁচ বোতল বা ধরুন দু'-চার লিটার তেল পাব নিশ্চয়।"

যশোদা কিছুই বুঝলেন না। তাকিয়ে থাকেন হাঁ করে।

কিকিরা মুচকি হাসলেন। ঠাট্টার গলায় বললেন, "ঘাবড়ে যাবেন না। ভয়ের কিছু নেই।...শুনুন, কাল আমার জনা দুই লোক লাগবে। মালি আসবে না?"

"আসতে পারে।"

"ঠিক আছে।...না এলে আপনাদের এখানে কাজের লোক আছে। দুটো ঠিকে

মজুর ধরে দিতে পারবেন না?”

যশোদা কিছু না বুঝলেও মাথা নাড়লেন। পরে বললেন, “তারাপদবাবু এলেন না?”

“কাল আসবে। অফিস সেরে। আমি আগে আগে এলুম কাজ খানিকটা গুছিয়ে রাখতে। একটাই শুধু আমার ভয় মশাই, হঠাৎ করে যদি বৃষ্টি নেমে যায় কাল-পরশু—তবেই বিপদ।”

“আর এখন নামবে বলে মনে হয় না। ক'টা দিন একটু মাঠঘাট শুকুক। তবে ভাদ্রমাস, বলা যায় না কিছুই।”

পরের দিন তারাপদ এল। বিকেল বিকেল। কাঁধে কিটব্যাগ, হাতেও একটা নাইলনের ছোট হাত-ঝোলা।

কিকিরা বাগানে দাঁড়িয়ে ছিলেন। বোধ হয় অপেক্ষা করছিলেন তারাপদর। বললেন, “সংবাদ কী?”

“ভাল।”

“চাঁদু?”

“সারের অ্যাডভাইস জানিয়ে এসেছি। হাজির থাকবে সময়মতন। আপনার কাজ কতটা এগুল?”

কিকিরা আঙুল দিয়ে কৃষ্ণধামের কম্পাউন্ড-ওয়ালের দিকটা দেখালেন। বললেন, “দুটো পাশ হয়ে গিয়েছে। বাকি দু'পাশ কাল দুপুরের মধ্যেই হয়ে যাবে। যাও না, একবার দেখে এসো।”

তারাপদ এগিয়ে গিয়ে দেখে এল। বলল, “সার, গর্তগুলো আগুপিছু কেন?”

কিকিরা মুচকি হাসলেন। “একে বলে জিগজাগ ট্রেঞ্চ। অবশ্য এটা ট্রেঞ্চ নয়। মানে, মাটি কাটা নালা নয় হে, ফুট তিনেক অন্তর একটা করে গর্ত। তা গর্তগুলো ফুট দুই-আড়াই হবে, তলার দিকে, ডিপ আর কী! আর গোললাইয়ের মাপও মোটামুটি ওইরকম।...আগুপিছু—জিগজাগ করার মানে হল, তফাত থেকে দেখলে চোখের ভুল হবে। বোঝা যাবে না, একটা গর্ত থেকে আর-একটা গর্তের মধ্যে হাত কয়েক তফাত। আগুন যখন জ্বলবে, দূর থেকে দেখলে মনে হবে, একটানা দাউদাউ করে জ্বলছে।”

তারাপদ হেসে বলল, “এটা কি আপনার ম্যাজিশিয়ানের টেকনিক?”

“খানিকটা তো বটেই,” বলে আবার হাত তুলে একটা জায়গা দেখালেন, “ওই যে দেখছ জায়গাটা, ওখানে যত রাজ্যের গাছের শুকনো পাতা ঝেঁটিয়ে এনে জমানো হয়েছে। আরও দু'-চার ঝুড়ি কাল জমানো যাবে। খড় রেডি। কেরোসিন তেল মজুত। আর তুমি তো অন্য মালমশলাও এনেছ!” অন্য মালমশলা বলতে খানিকটা গন্ধক।

বাগান থেকে বাড়ির দিকে হাঁটতে হাঁটতে তারাপদ বলল, “সবই না হয় হল।

আপনি লঙ্কাদহন পর্বটা সারলেন, কিন্তু যার জন্য এত—সেই ভদ্রলোক যদি ধরা না দেন!”

“না দিলে করার কিছু নেই। আমরা যশোদাবাবুকে বলব, আপনারা থানা-পুলিশ করুন, আমাদের দিয়ে হল না।”

তারাপদ যশোদাজীবনকে দেখতে পেল, বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন । বলল কিকিরাকে।

কিকিরা গলা নামিয়ে বললেন, “তারাপদ, কাল তুমি যশোদাবাবুর ওপর নজর রাখবে। উনি যেন এই বাড়ির চৌহদ্দির বাইরে যেতে না পারেন। এমনিতেই ভদ্রলোক ভ্যাবাচাকা খেয়ে গিয়েছেন। মগজে কিছুই ঢুকছে না ওঁর। তার ওপর কাল সন্ধের ঝোঁকে যখন বাড়ির চারপাশে দাউদাউ করে আগুন জ্বলে উঠবে, উনি বোধ হয় পাগলামি শুরু করবেন।”

তারাপদ সে-কথার কোনও জবাব দিল না। শুধু বলল, “হীরালালবাবু এখানেই কাছাকাছি কোথাও আছেন বলে আপনার ধারণা। যদি না থাকেন—?”

“না থাকেন? দ্যাখো তারাবাবু, আমি ফিশিং এক্সপার্ট নই, তবে শুনেছি এক-একরকম মাছের জন্যে এক-একরকম চার কাজে লাগে। বঁড়শিরও হেরফের হয়। হীরালালবাবুর এই কৃষ্ণধামই আমার টোপ। এই টোপে হয় তিনি ধরা দেবেন, না হয় আমরা হার মেনে নিয়ে ফিরে যাব।...যাক গে, চাঁদুকে সব ভাল করে বুঝিয়ে দিয়েছ তো?”

“দিয়েছি। ও জায়গাটা আন্দাজ করতে পেরেছে। এদিকে একবার ওদের ক্যাম্প বসেছিল। ডাক্তারদের ক্যাম্প।...ও ঠিক সময়ে হাজির হয়ে নিজের পজিশন নেবে।” তারাপদ হাসল।

“ভাল কথা। দেখা যাক কী হয়?”

বারান্দায় উঠে এলেন কিকিরা। যশোদাজীবন দাঁড়িয়ে আছেন। দেখলেন তারাপদকে। কিকিরা হেসে বললেন, “যশোদাবাবু, আমার চেলা এসে গিয়েছে। বলেছিলুম না, সময় মতন চলে আসবে।”

যশোদা বললেন, “দেখেছি ওঁকে। আসুন, চা তৈরি, ডাকতেই এসেছিলাম আপনাকে।”

“চলুন।”

॥ ৬ ॥

দূর থেকে দেখলে মনে হবে, সত্যি সত্যি কৃষ্ণধামে আগুন লেগে গিয়েছে। কম্পাউন্ড-ওয়ালের কাছাকাছি মাটি খুঁড়ে করা গর্তগুলোর মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া শুকনো খড়, গাছের পাতা জ্বলে উঠেছে দাউদাউ করে। ভাদ্রমাসের বাতাসে দমকা নেই, তবু যেটুকু হাওয়া দিচ্ছিল ফাঁকা মাঠে তাতেই শিখা উঠেছে আগুনের,

ধোঁয়ায় ভরে যাচ্ছে আশপাশ। বোঝা যাচ্ছে না, একটা গর্তের সঙ্গে অন্য গর্তের হাত কয়েক ফাঁক আছে। এই মাঠে, দু'-পাঁচটা ঝোপঝাড় গাছপালার মধ্যে সামান্য আগুনেই কম হলকা ছড়ায় না। আর এই সন্ধেবেলার মুখেই ঝাপসা জ্যোৎস্নার মধ্যে কৃষ্ণধামের আগুন কার না নজরে পড়বে! কাছাকাছি গাঁ-গ্রাম নেই, তবু সামান্য তফাতে দু'-চার ঘরের বসতি তো আছেই, আছে এক-আধটা ছোট নার্সারি-বাগান। লোকজন সাকুল্যে হয়তো দশ-পনেরোজন। প্রথমটায় হয়তো এরা হকচকিয়ে গিয়েছিল। তারপর মাঠ ভেঙে ছুটে আসতে লাগল।

যশোদাজীবন হতবাক! কী যে হচ্ছে তিনি বুঝতেই পারছিলেন না। ভয়ে আতঙ্কে দিশেহারা অবস্থা তাঁর। কৃষ্ণধামের কাজের লোক তো তিনটি—তারাও বোকার মতন এই অগ্নিকাণ্ড দেখছিল।

ঠিক যে কতক্ষণ সময় কাটল, বোঝা গেল না। হঠাৎ চন্দনের গলা পাওয়া গেল, চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলছে, "তারা, ধরে ফেলেছি, শিগগির আয়, ধরা পড়ে গিয়েছেন।"

তারাপদ ফটকের দিকে দৌড়ে গেল। খোলাই ছিল ফটক। চন্দনকে দেখতে পেল তারাপদ, বুড়োমতন এক ভদ্রলোককে জাপটে ধরে রেখেছে চন্দন।

হীরালাল।

বারান্দায় একটা চেয়ার বসানো হল হীরালালকে। ভদ্রলোকের যেন হুঁশ নেই। কী দেখছেন, কাদের দেখছেন—বোঝাই যায় না। কাঁপছেন তখনও। কপালে ঘাম। চন্দন একবার নাড়ি দেখল ভদ্রলোকের। বলল, "আগে জল দিন ওঁকে, একটা পাখা এনে বাতাস করুন কেউ।"

যশোদা প্রায় কেঁদে ফেললেন, "বড়বাবু!"

জল এল, পাখাও এল।

হীরালাল জল খেলেন, চোখেমুখে দিলেন। একজন পাখার বাতাস করতে লাগল।

আগুন ধরেছে দেখে যারা ছুটে এসেছিল তারা দাঁড়িয়ে থাকল কিছুক্ষণ, তারপর যশোদার কথায় চলে গেল একে একে। কৃষ্ণধামের গায়ে কোথাও আগুনের চিহ্ন নেই, বাগান ছাড়িয়ে পাঁচিলের গায়ে গায়ে যা আগুন জ্বলছে তখন, তাও নিভে এসেছে বারোআনা।

হীরালাল কাশছিলেন। যশোদা বড়বাবুর জন্যে লবঙ্গ আনতে বললেন।

প্রায় মিনিট পনেরো পরে হীরালাল খানিকটা সুস্থ হলেন। যশোদাকে বললেন, "এসব কী? এঁরা কারা?"

কিকিরাই কথা বললেন, "আমরা আপনার খোঁজেই এসেছিলাম। আমি কিঙ্করকিশোর রায়, লোকে বলে কিকিরা। এরা দু'জন আমার চেলা, তারাপদ আর চন্দন।...আমরা নিজের গরজে আসিনি মশাই, যশোদাবাবু আমার চেনা লোক,

উনিই আমায় ধরে এনেছিলেন।”

“আপনারা পুলিশ...?”

“না। আপনি যা করেছিলেন—তাতে থানা-পুলিশ করা যেত। করা হয়নি। আপনি বুড়োমানুষ, আপনার মতন মানুষের কাণ্ডজ্ঞান থাকার কথা। তবু এমন ভীমরতি ধরল কেন? আপনি কি জানেন না, আত্মহত্যা করার শাসানিও পুলিশ ভাল নজরে দেখে না। কেন আপনি এসব থিয়েটার করতে গিয়েছিলেন! কেন?”

হীরালাল কথা বলতে পারছিলেন না। অসহায়ের মতন মুখ করে যশোদার দিকে তাকালেন। তাঁর চোখ জলে ভরে আসতে লাগল। বিপন্ন, হতবুদ্ধি মানুষ।

কিকিরা বললেন, “কী হয়েছিল?...আমি আপনার লেখা কাগজের টুকরোগুলো পড়েই বুঝেছিলাম—আত্মহত্যা করার মানুষ আপনি নন। এখানেই কোথাও লুকিয়ে আছেন।”

হীরালাল আধ-বোজা গলায় বললেন, “আপনারা আমায় ধরে আনলেন!”

“আমরা নিমিত্ত; আপনাকে ধরে এনেছে—আপনার কৃষ্ণধাম। আপনার এত সাধের, এমন ভক্তি-ভালবাসার বাড়ি, বিগ্রহ পুড়ে যাবে—সে কি আপনি জীবন থাকতে সইতে পারেন! দেখুন মশাই—মানুষ যা ভালবাসে অন্তর দিয়ে, ভক্তি করে, বিশ্বাস করে—তার ক্ষতি সইতে পারে না। আপনি ধার্মিক মানুষ, বিশ্বাসী মানুষ, ন্যায়-অন্যায় বোধ রয়েছে। কিন্তু কোন আঘাতে অভিমানে আপনি চিঠিগুলো লিখেছিলেন বলুন তো?”

হীরালাল প্রথমটায় কথা বলতে পারছিলেন না। ঠোঁট কাঁপছিল।

“বলুন! সত্যি কথাই বলুন।”

“আমার বড় ছেলে—” হীরালাল বললেন। “আমার বড় ছেলে কানাই যা করতে যাচ্ছিল তার চেয়ে বড় অন্যায় অধর্ম কী হতে পারে!”

“কী করতে যাচ্ছিল?”

“আমাদের শ্যামবাজারের আদি দোকানে আগুন লাগাবার ফন্দি করেছিল। দোকানের গায়ে একটা ছোট দরজির দোকানও আছে। ভাল চলে না আজকাল। আমাদের দোকান অনেক আগেই ইনসিওর করিয়ে নিয়েছিল ছেলে। পরে আরও মোটা টাকায় ইনসিওর করায়। দোকান বেড়েছে, মালপত্র বেড়েছে, কাজেই অসুবিধে হয়নি।”

কিকিরা তারপদদের দিকে তাকালেন।

হীরালাল বললেন, “হঠাৎ একদিন আমার কানে গেল, কানাই দোকান থেকে তলায় তলায় দামি শাড়ি কাপড়চোপড় সরাচ্ছে। এর পর ভাড়াটে লোক দিয়ে আগুন ধরাবে। তারপর ইনসিওরেন্স থেকে টাকা নেবে। বখরার ব্যবস্থাও করে রেখেছিল বোধ হয়। দোকান পুড়িয়ে সে নতুন করে সাজিয়ে পশার বসাবে। এয়ারকন্ডিশন করবে। দরজির দোকানটাকে কিছু টাকা দিয়ে তুলে দেবে।...বলুন, এ অধর্ম নয়, পাপ নয়, জুয়াচুরি নয়। আমি আমার কাঁধে, মাথায় শাড়ির বোঝা

বয়ে জীবন শুরু করেছিলাম। অনেক রক্ত জল করে আমার ওই দোকান। প্রায় চল্লিশ বছরের...! সেই দোকানে আজ ও আগুন লাগাবে!" হীরালাল কপাল চাপড়ে ছেলেমানুষের মতন কেঁদে ফেললেন।

তারাপদ বলল, "আপনি ছেলেকে বলতে পারেননি কিছু?"

"না বাবা, পারিনি। যদি অস্বীকার করত! তা ছাড়া কী জানো? সন্তানস্নেহ মানুষকে শুধু অন্ধ করে না, তার বিবেককেও বোবা করে রাখে। ধৃতরাষ্ট্রের কথাই মনে করো।"

কিকিরা বললেন, "আপনার বড় ছেলে দেখছি অতি ধূর্ত, সে নিজে গিয়ে কাশীতে বসে থাকল কাজের ছুতোয়, আর এখানে দোকান পোড়াবার জন্যে লোক লাগিয়ে গেল! যেন তাকে কেউ সন্দেহ না করে।"

"ঠিকই বলেছেন আপনি।...আমি ভেবেছিলাম চিঠিগুলো ছেলেদের হাতে পড়লে হয়তো..."

"আপনার মেজো ছেলে, ছোট ছেলে—এসব কিছু জানে না?"

"না।"

"আপনি কোত্থেকে জানলেন?"

হীরালাল মুখে বললেন না কিছুই। শুধু ঘাড় তুলে একবার যশোদার দিকে তাকালেন।

"তা কোথায় লুকিয়ে ছিলেন এতদিন?"

"মিশনারিদের বাড়িতে। ওখানকার সরকারবাবু আমার জানাশোনা। বন্ধুর মতন। ওঁর আশ্রয়েই ছিলাম।"

কিকিরা তারাপদদের দিকে তাকিয়ে হাসলেন।

ঝিলের ধারে একদিন

ঝিলের ধারে একদিন

"চাঁদু, শিগ্‌গির ওঠ। চাঁদু—" তারাপদ জোরে ধাক্কা মেরে চন্দনকে জাগিয়ে তোলবার চেষ্টা করল।

চন্দন যে ঘুমকাতুরে স্বভাবের তা নয়। ডাক্তার মানুষ, এক সময় হাসপাতালে দিনের পর দিন রাত জেগে কাজ করেছে। এখন অবশ্য তা করতে হয় না। তবে রাতবিরাতে তাকে ঠেলাঠেলি সহ্য করতেই হয়। পেশাদারি প্রাইভেট প্র্যাকটিস করা ডাক্তার না হলেও কখনও কখনও কিছু সামাজিক কর্তব্য তো থাকেই।

গায়ের হালকা কম্বলটা মুখের ওপর টেনে নিয়ে চন্দন পাশ ফিরল। মানে, বোঝাতে চাইল, যা ঝামেলা করিস না, ঘুমোতে দে।

চন্দনের গায়ের কম্বল টান মেরে উঠিয়ে নিল তারাপদ। "ওঠ, শিগ্‌গির ওঠ। সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড হয়ে গিয়েছে, তুই পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছিস ! উঠে পড়। হারি আপ।"

চন্দন চোখ চাইল। সকাল হয়ে গিয়েছে বুঝতে তার কয়েক মুহূর্ত সময় লাগল। মাথার দিকের জানলা বন্ধ থাকলেও পায়ের দিকের জানলা খোলা। পাশের একটা আধ-ভেজানো জানলা দিয়েও সকালের ফরসাটে ভাব বোঝা যায়।

চন্দন হাই তুলতে তুলতে উঠে বসল। "তোর মর্নিং ওয়াকে আমি নেই। কেন ডিস্টার্ব করছিস ফর নাথিং। ঘুমোতে দে।"

"ঘুমোতে হবে না। শিগ্‌গির চল। একটা লোক ঝিলের কাছে পড়ে আছে। হয়তো মারা গিয়েছে।"

মারা গিয়েছে—শোনামাত্রই চন্দন যেন চমকে উঠল। চোখের পাতায় ঘুমের রেশ থাকলেও চেতনায় আর না-ঘুম না-আলস্য। অবাক হয়ে বলল, "কী বলছিস !"

"দেখবি চল।"

চন্দন লাফ মেরে উঠে পড়ল। পরনে পাজামা, গায়ে পাতলা কট্‌স উলের

এক খাটো ঢলঢলে পাঞ্জাবি। কোনও রকমে গায়ের গরম চাদর টেনে নিয়ে চটিতে পা গলিয়ে দিল চন্দন। "চল। কিকিরাকে ডেকেছিস ?"

"না। কাল ওঁর কাঁচা সর্দিতে জ্বর-জ্বর ভাব হয়েছিল। এত সকালে ডেকে কাজ নেই।"

দু'জনেই বেরিয়ে পড়ল।

বাড়িটা ছোট। দু'কামরার মতন। রান্নাবান্না স্নানের ব্যবস্থা অবশ্য আছে। হাত কয়েকের বুনো বাগান। ছোট কাঠের ফটক। কাঁটাতার আর কাঠকুটোর একটা মামুলি ফেন্সিং।

এখন যে শীতকাল তাও নয়। হেমন্তের শেষ প্রায়। অগ্রহায়ণ মাস। তবু এখানে শীত এসে গিয়েছে। এ তো কলকাতা শহর নয়, শ' তিন মাইল দূরের বিহারের আধা মফস্বলি পাহাড়ি জায়গা। না, ঠিক পাহাড়িও বলা যাবে না, পাহাড়তলির ছোট্ট জায়গা বলা যেতে পারে। পাহাড় অনেকটাই দূরে। তবে এখানকার মাটি শক্ত, মাঠঘাট উঁচুনিচু, সমতল ভূমি বড় একটা চোখেই পড়ে না, চারপাশে কত যে বুনো ঝোপ আর পাথরের টুকরো ছড়ানো রুক্ষ মাঠ, তার হিসেব পাওয়া ভার। গাছের মধ্যে নিম জাম কাঁঠাল আর হরীতকী বেশি। পলাশ মহুয়াও আছে।

অনেককাল আগে রেল কোম্পানি লাইন পাতার কাজ চলার সময় এখানে কুলি-লাইন বসিয়েছিল বলে শোনা যায়। তারপর গত বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ সাহেবরা এখানেই চুপিচুপি বিশাল কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ছোট একটা পি. ও. ডবলু. মানে প্রিজনার্স অব ওয়ার-এর ক্যাম্প বসিয়েছিল। সেসব কথা পুরনো। তারও পরে আশেপাশের রেল-কলোনির কিছু অ্যাংলো ইন্ডিয়ান সাহেবরা ছোট ছোট বাংলো বাড়ি বা কটেজ করে বসবাসের চেষ্টা করে। মন হয়তো বসেনি শেষপর্যন্ত ; কেউ কেউ মারা গেল, কেউ-বা দেখল ছেলেমেয়েরা অন্যত্র চলে যাচ্ছে একে একে, তারা নিঃসঙ্গ, একা। এই পর্বও ঘুচে গেল একদিন। এখন হাবিলগঞ্জ নিতান্তই এক স্বাস্থ্যকর ছোট মফস্বলি শহর।

কিকিরা তাঁর দুই চেলা নিয়ে এখানে দিন কয়েকের জন্য বেড়াতে এসেছেন। তাও চামেলিবাবুর জন্য। চন্দন আর তারাপদ অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে ছুটি নিয়েছে। দিন পনেরো না হলেও দিন দশেক থাকার ইচ্ছে তাদের।

চামেলিবাবুর কথা পরে, আগে আজ সাত সকালে যে-ঘটনাটি ঘটে গিয়েছে তার কথা বলা যাক।

চন্দন আর তারাপদ প্রায় ছুটতে ছুটতে ঝিলের দিকে যাচ্ছিল।

চন্দন বলল, "ব্যাপারটা কী ?"

তারাপদ বলল, "ভোর ভোর উঠে আমি খানিকটা বেড়াতে বেরিয়েছিলাম।

হাঁটতে হাঁটতে ওই ঝিলের দিকে গিয়েছি, ঝিলের গায়ে বড় আল দেওয়া যে পথ— সেখান দিয়ে যাচ্ছি, দেখি একটা লোক ঝিলের পাশে পড়ে আছে। তার মাথাটা বড়সড় এক পাথরের ওপর, কোমরের দিকটা জলের তলায়। আমি ভাবলাম, লোকটা হয়তো পা পিছলে বেকায়দায় পড়ে গিয়ে চোট পেয়েছে মাথায়। তাকে ডাকলাম, জল ছিটিয়ে দিলাম চোখে মুখে। কোনও সাড়া নেই। ভেবে দেখ, এখন ঝিলের জল কত ঠাণ্ডা ! সারারাতের হিমে জল তো বরফ।"

চন্দন অবাক হয়েই বলল, "চল, দেখি !"

বাড়ি থেকে ঝিল অন্তত সাত আট শ' গজ। হাজারও হতে পারে। ওটাকে ঠিক ঝিল বলাও যাবে না। বড় পুকুর বা দিঘি হতে পারে। ঝিলের গা ধরেই এদিককার বড় রাস্তা। উত্তর দিকে। রাস্তাটা কাঁচা, নুড়ি পাথর আর কাদাটে মাটি ছড়ানো। ঝিলের উত্তর দিকের রাস্তাটাই এদিককার বড় রাস্তা। রাস্তাটা চলে গিয়েছে বরাবর ; আধ মাইলটাক দূরে বাজার, রেলস্টেশন। লোকে সাধারণত এই পথ ধরেই আসা-যাওয়া করে স্টেশন বা বাজারে। তবে চামেলিবাবুর বাগান আর তাঁর এলাকার মধ্যে যেসব ছোটখাটো ঘরবাড়ি আছে, এমনকী সামান্য তফাতে এক দেহাতি ছোট গাঁ —সেখানকার লোকজন—কাজেকর্মে এ দিকে আসতে হলে ঝিলের দক্ষিণ দিকের রাস্তা ধরেই আসে। অবশ্য ওটা রাস্তা নয়, মাটির উঁচু পাড় বা আলপথ। চওড়া মন্দ নয়। আলপথের এ-পারে ঝিল, অন্য পারে খেত-খামারি। গরমের দিন দু'চার হাত আল কেটে মাটি সরিয়ে জল দেওয়া হয় খেতিতে। এপাশে কোনও নদীনালা নেই। ঝিলটা নেহাতই প্রকৃতির দয়ায় কোনওকালে দেখা দিয়েছিল কি না কে জানে ! তবে বেশ বড় ঝিল বা দিঘি। জল তেমন পরিষ্কার নয় ; শ্যাওলা শালুক জলজ লতাপাতাও যথেষ্ট। আলের পাশে হেলে-পড়া দু'-একটা বড় গাছগাছালিও আছে। চোখে দেখতে ভালই লাগে।

ততক্ষণে রোদ উঠে গিয়েছে। একেবারে কাঁচা রোদ নয়, আকাশ পরিষ্কার, সূর্য ঝকঝক করছে। পাখি উড়ে যাচ্ছিল, বাতাসে হালকা শীত।

তারাপদরা প্রায় ছুটতে ছুটতে ঝিলের কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

দু'-তিনজন দেহাতি জুটে গিয়েছে ইতিমধ্যে। হয়তো তারা কাজেকর্মে যাচ্ছিল আলপথ ধরে, একজন বাবু-লোক ওইভাবে পড়ে আছে দেখে দাঁড়িয়ে পড়েছে জায়গাটায়।

তারাপদ বলল, "ওই যে— !"

চন্দন আগেই দেখতে পেয়েছিল। একবার দেহাতি মানুষগুলোর দিকে তাকাল চন্দন, তারপর জলের কাছে নেমে গেল।

দেখল লোকটিকে। বাঙালি বলেই মনে হয়। দিন দুই হল চন্দনরা এখানে এসেছে। ঘোরাঘুরি সামান্য যা করেছে এ পর্যন্ত—তাতে এই লোকটিকে নজরে

পড়েনি কোথাও।

চন্দন জলের ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে লোকটির মুখ দেখল। ডাক্তারি চোখে নজর করল যেন। তারপর একটি হাত তুলে নিল তার। নাড়ি দেখল। মুখ গম্ভীর হয়ে গেল কখন। হাত নামিয়ে দিল লোকটির। বোজা চোখের পাতা টেনে টেনে চোখ দেখল। গলার কাছে হাত দিল একবার, চোয়ালের তলায়। লোকটির মাথা একপাশে কাত হয়ে আছে শুকনো পাথরের ওপর। খানিকটা রক্ত। জমাট, কালচে।

উঠে এল চন্দন।

"কী রে ?" তারাপদ বলল উদ্বিগ্ন গলায়।

"ডেড !"

"মারা গিয়েছে," আঁতকে উঠল তারাপদ। "কীভাবে ? কখন ?"

চন্দন চারপাশে তাকাল। সকালটি নিশ্চয় সুন্দর ; একঝাঁক বক উড়ে যাচ্ছে, দূরে ট্রেনের হুইসিল, মাঠ এখন খাঁখাঁ, প্রথম শীতের বাতাস, রোদের রং আরও গাঢ় হয়ে এল। এমন এক সকালে এ কী বিশ্রী কাণ্ড !

চন্দন বলল, "কখন মারা গিয়েছে বলতে পারব না। তবে দু'-এক ঘণ্টার মধ্যে নয়। আমার মনে হয় মাঝরাতের দিকে। আন্দাজে বলছি।"

দেহাতি লোকগুলো চন্দনকে দেখছিল। তারা জানে না, চন্দন ডাক্তার। কিন্তু ওর জলে নামা, নাড়ি দেখা, চোখ দেখা থেকে অনুমান করে নিল ওই বাঙালিবাবু নিশ্চয় ডাক্তার-বদ্যি হবে। তারা তাকিয়ে থাকল, শুনতে চাইল বাবু কী বলে !

"তোমরা একে চেনো ?" চন্দন বলল, "জান-পয়ছান ?"

"না।" মাথা নাড়ল ওরা।

"বাবু জিন্দা নেই। মারা গিয়েছে।"

না-জানুক বাবুকে ওরা, হয়তো ওরাও এই রকম খারাপ কিছু অনুমান করছিল, চন্দনের কথায় একটা গুঞ্জন উঠল। সকলেই যেন হতবাক, বিষণ্ণ।

তারাপদ বলল, "চাঁদু এখন কী হবে ?"

"এরা কাউকে খবর দিক। কাছাকাছি বাড়িতে গিয়ে বলুক—যদি তাদের চেনা লোক হয় ভদ্রলোক। তারপর থানা...।"

"থানা ?"

"থানায় তো বলতেই হবে। তাদের লোক এসে দেখুক। ডেডবডি তুলে নিয়ে যাক। যা করার তাদেরই করতে হবে। দায়িত্ব তাদের।"

আরও দু'-একজন এসে পড়েছে ততক্ষণে। আলপথে আসা-যাওয়া করে অনেকেই। হাঁকডাকও শুনেছে অন্যদের। ঝিলের পুব দিকে মেঠো রাস্তা। তার গায়ে-গায়ে চামেলিবাবুর বাগান। আসলে পাঁচিল-ঘেরা সাত-আট বিঘে জমি, গাছপালার শেষ নেই, নিম কাঁঠাল শিরীষ থেকে আম জাম পর্যন্ত।

কলকে করবীর ঝোপও আছে। আছে বেলফুলের কুঞ্জ, গাঁদার ঝোপ। ওরই মধ্যে চামেলিবাবুর বসতবাড়ি। বাড়িটা এমন কিছু বড় নয়, সুদৃশ্যও নয়, একতলা বেছাঁদ বাড়ি। পুরনো দিনের ধরন-ধারণে জানলা দরজা।

চামেলিবাবুর এই বাড়িটাকেই লোকে বলে চামেলিবাবুর বাগান। বাগানের গা ঘেঁষে তাঁর কিছু জমি আছে। সেখানে মামুলি ছাঁদের আরও কয়েকটা বাড়ি। বাড়িগুলোর তিনটি চামেলিবাবুর। তিনি ভাড়া দেন। 'সিজ্‌ন টাইমে' দু'-তিনমাস ভাড়াটে থাকে। বাকি দুটি বাড়ি তাঁর নয়। সেখানে স্থায়ীভাবে অন্য দুই পরিবার থাকে।

চন্দন বলল, "চল আমরা যাই। মুখ ধোওয়া চা খাওয়া পর্যন্ত হয়নি। কিকিরাও বোধ হয় উঠে পড়েছেন। পরে আবার আসা যাবে।"

তারাপদ ইতস্তত করে বলল, "যাব ?"

"দাঁড়িয়ে থেকে আর আমরা কী করব !" বলেই চন্দনের কী মনে হল, দেহাতি লোকগুলোকে বলল, "আরে, কোই যাকে কুছ খবর দে দেও চামেলিবাবুকো। জলদি।"

সামান্য অপেক্ষা করে কে যেন বলল, "বাত তো ঠিক হায়—" বলে ছোকরা মতন লোকটা আলপথ দিয়ে ছুটতে লাগল। চামেলিবাবুকে খবরটা দিতে হবে।

চন্দনরা আর দাঁড়াল না, ফিরতে লাগল।

তারাপদ বলল, "ব্যাপারটা কী বল তো ?"

"কীসের ?"

"লোকটা কি জলে নেমেছিল ? কেন নামবে ?"

"বুঝতে পারছি না।"

"অত বড় পাথরটাই বা কেন থাকবে ওখানে ?"

"পাথর আরও দু'-একটা আছে এদিক-ওদিক। কাল আমরা যখন বেলায় ফিরছিলাম বাজার থেকে রাস্তা ধরে, আমি দেখেছি দুটো ধোপা ওখানে ভাটির কাপড় আছড়াচ্ছিল।"

"ধোপারা ওখানে কাপড় কাচে ?"

"তাই তো দেখলাম।"

ব্যাপারটা ঠিক লক্ষ করেনি তারাপদ। এতে আর অবাক হওয়ার কী আছে ! মাত্র তো দু'দিন হল এসেছে তারা। গত পরশু বিকেলের দিকে। স্টেশন থেকে ওদের বাড়িটা মাইল খানেকের কম নয়। শর্টকাট করে মাঠ ভেঙে এলে সামান্য কম হয়। প্রথম দিন কে আর মাঠ ভেঙে আসে। তার ওপর সকালের দিকে বাজারে চক্কর মেরে বেড়িয়ে ফেরার সময় তারাপদ গাছপালা, দু'-একটা ঘরবাড়িই লক্ষ করছিল। বিকেল বলতে এখন এক ফোঁটা। আলো মরছে কি সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার। স্টেশন, ডাকবাংলো, বাজারের জায়গাটুকু ছাড়া আলো

নেই। তাও ইলেকট্রিকের আলো শুধু স্টেশন, বুকিং অফিস আর মুসাফিরখানায়, বাকি সব কেরোসিন ল্যাম্প। দোকানে পেট্রম্যাক্স।

তারাপদদের বাড়িটা চামেলিবাবুর জুটিয়ে দেওয়া। ছাদ পাকা, তবে মেঝে যেন খরখরে। সিমেন্ট আছে ঠিকই, কিন্তু কতটুকু কে জানে! বাড়িতে সরাসরি জলের ব্যবস্থা নেই; পাশের কুয়া থেকে একটা ছোকরা সকাল দুপুর জল তুলে দিয়ে যায়। রান্নার লোক খেপা যদু। পুরো নাম যাদব রায়। আদি বাড়ি বর্ধমান জেলার কোনও গ্রামে। যাদব অনেককাল থেকেই এখানে। অভয়বাবুর ভাত ডালের সস্তা হোটেল থেকে নিমচাঁদের মিঠাইয়ের দোকানে কাজ করেছে। একবার পানের দোকান দিয়েছিল, ফেল মেরে গেল। তারপর কী খেয়াল হল দরজির দোকান বসাল বাজারে। সেটাও উঠে গেল। এখন সে যমুনাবাবুর কুঠিতে থাকে। নজরদারি করে। বাকি সময়টায় চামেলিবাবুর বাড়িতে ফাই ফরমায়েশ খাটে।

চামেলিবাবুই খেপা যদুকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। লোকটা দেখতে কাঠি, কিন্তু গলায় যেন মাইক ফিট করা। জোরালো গলা। ভাঙা ভাঙা স্বর। বকবক করে ভীষণ। তারাপদর ধারণা, খেপা যদু গাঁজা ভাঙ খায়।

তারাপদ অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। চন্দনের কথায় ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল।

"কিছু বললি?"

চন্দন বলল, "লোকটা—মানে ভদ্রলোকের বয়েস কত বলে তোর ধারণা?"

"কার! যে মারা গিয়েছে?"

"হ্যাঁ।"

"ক-ত! চল্লিশের কম নয়, পঞ্চাশের বেশিও না। মাঝামাঝি।"

"স্বাস্থ্য তো ভালই মনে হল।"

"সলিড। ফাঁপা নয়। গায়ে ক্ষমতা আছে বলে মনে হয়।"

"দেখতেও মোটামুটি ভাল। তবে মাথার চুল কম। মনে হল, সবেই চুল ছেঁটেছে।"

"কী জানি! গায়ের রং একরকম ফরসা! তাই না! পরনে পাজামা, গায়ে পাঞ্জাবি। বাঙালি বলেই মনে হল। হাতের আঙুলে একটা তামার তারের আংটি। কেন কে জানে!"

"আমারও তাই মনে হয়। বাঙালি।"

"বেচারা!"

কথা বলতে বলতে বাড়ির কাছে এসে পড়ল দু' জনে।

কিকিরা বাইরে একচিলতে বারান্দায় বসে আছেন। কাঠের মামুলি চেয়ারটা প্রায় বারান্দার শেষ প্রান্তে। রোদ এসেছে বারান্দায়। কিকিরার হাতে চায়ের পেয়ালা। পেয়ালা না বলে মগ বলাই ভাল। বসে বসে চা খাচ্ছিলেন। গায়ে হালকা গরম চাদর, গলায় মাফলার জড়ানো।

কিকিরা বললেন, "এই যে চন্দ্র-তারা ! গুড মর্নিং। কোথায় গিয়েছিলে তোমরা ? মর্নিং ওয়াক ! চা যে জুড়িয়ে জল হয়ে গেল ! যাও চা-টা ঢেলে নিয়ে খেয়ে নাও। আমিই করেছি। যদুবাবু এখনও আসেননি।"

খেপা যদু একটু বেলা করেই আসে। আসার সময় বাজার ঘুরে এটা-ওটা কিনে নিয়ে আসে। বলাই আছে তাকে। সকালের দিকে আনাজগুলো—তা সে যাই হোক ভাল পাওয়া যায়। খেপা যদু দরাদরিতেও ওস্তাদ। এখানকার লোক বলে তাকে সিজন-বাবু ভেবে দু' পয়সা বেশি কামাবার উপায় নেই।

তারাপদ বলল, "গুড মর্নিং নয় সার, ভেরি ব্যাড মর্নিং !"

"ব্যাড মর্নিং ! কেন ?"

"সাত সকালে একটা খারাপ জিনিস দেখলাম ! মৃত্যুদৃশ্য !"

"মৃত্যুদৃশ্য ! বলো কী !" কিকিরা অবাক।

চন্দন বলল, "আমি এখনও মুখে জল দিইনি। মুখ ধুয়ে চা নিয়ে আসছি, তারা। তুই কিকিরাকে ব্যাপারটা বল।" চন্দন চলে গেল।

কিকিরা কিছুই জানেন না। অনুমান করারও উপায় নেই। তাকিয়ে থাকলেন তারাপদর দিকে।

তারাপদ সকালের ঘটনা সবিস্তারে বর্ণনা করতে লাগল। কিকিরা মন দিয়ে শুনছিলেন।

তারাপদ শেষ পর্যন্ত থামল।

কিকিরা অল্পক্ষণ চুপচাপ। তারপর বললেন, "বাঙালি ?"

"হ্যাঁ। আমাদের তো তাই মনে হল। বাঙালি ছাপ আছে।"

"কত বয়েস বললে, চল্লিশ-পঞ্চাশের মাঝামাঝি ?"

"ওইরকম !"

"স্ট্রোক হয়েছিল নাকি ? ভদ্রলোক জলেই বা নামতে যাবে কেন ! আশ্চর্য ! আর চাঁদুর কথা যদি ঠিক হয় তবে তো ভদ্রলোক শেষরাত বা মাঝরাতে মারা গিয়েছে। অত রাতে সে ঝিলের পাড়ে যাবে কেন ! আশ্চর্য ব্যাপার !" বলে মাথা নাড়তে লাগলেন কিকিরা।

॥ ২ ॥

খানিকটা বেলায় কিকিরা চন্দনদের নিয়ে যখন ঝিলের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন, তখন সেখানে বেশ ভিড় জমে গিয়েছে।

এখানকার থানা ছোট। নামেই পুলিশ স্টেশন। কাজকর্ম বিশেষ থাকে না। ছোটখাটো চুরি, গাঁ-গ্রামে দু'পক্ষের ঝগড়া লাঠালাঠি, কখনও বা বাজারের দিকে হইহল্লা থামিয়েই পুলিশের কাজ মিটে যায়। অবশ্য কদাচিৎ গাঁয়ের দিক থেকে খুনখারাপি, বিষ-খাওয়ার ঘটনাও এসে পড়ে। তখন দারোগাবাবুকে

খানিকটা নড়েচড়ে বসতে হয়।

কিকিরারা গিয়ে দেখলেন, থানা থেকে দারোগাবাবু এসে গিয়েছেন, সঙ্গে জনা দুয়েক গোঁফওয়ালা সেপাই। ওদিকে চামেলিবাবুও এসেছেন, তাঁর এলাকার দু-চারজন বাবু আর বাড়ির কাজের লোক। কৌতূহলী মানুষও রয়েছে।

কিকিরাদের দেখে চামেলিবাবু এগিয়ে এলেন।

কিকিরা বললেন, "কী হল চামেলিবাবু ? হুট করে একটা লোক এভাবে মারা গেল !"

চামেলিবাবু বললেন, "এখানে কেউ এভাবে মরেনি রায়সাহাব ! আমি বিশ্বাস করতে পারছি না।" বলে দারোগার দিকে তাকালেন। "আমাদের থানার অফিসার। আসুন পরিচয় করিয়ে দি।" কিকিরাকে চামেলিবাবু কখনও বলেন 'রায়সাহাব', কখনও 'রায়বাবু'।

দারোগাবাবুর নাম কৈলাসনাথ শর্মা। লোকে সাধারণত শর্মাজি বলে ডাকে। বয়েসে ছোকরাই ; বছর পঁয়ত্রিশ হয়তো। মজবুত স্বাস্থ্য। চোখেমুখে পুলিশ অফিসারের রূঢ়তা ও কাঠিন্য নেই। বরং মোলায়েম ভাব। মুখে সামান্য দাড়ি। গোঁফটি ছোট করে ছাঁটা।

পরিচয় করিয়ে দেওয়ার পর শর্মাজি তারাপদ আর চন্দনকেও দেখলেন। কে যেন কিছু বলল ভিড়ের মধ্যে থেকে। চন্দনকে দেখিয়ে। গোড়া থেকেই ছিল বোধ হয় সে।

শর্মাজি চন্দনকে বললেন, "আপ ডক্টর ? আপনি ডাক্তার ?" হিন্দি-বাংলা মিশিয়েই বললেন। "এরা বলছে, আপনি ওই লোকটির হাত তুলে পাল্‌স দেখেছেন ?"

চন্দন মাথা হেলিয়ে বলল, "হ্যাঁ। আমি ডাক্তার। আমি ওকে দেখেছি। দেখেছি যখন তখন ও আর বেঁচে নেই। ডেড।"

"আপনিই প্রথম দেখেছেন ?"

তারাপদ বলল, "না দারোগাজি, আমিই প্রথম দেখেছি।" বলে যা যা ঘটেছিল তারাপদ বলল পর পর।

দারোগা শর্মা কিছু বলার আগেই এক সেপাই এগিয়ে এসে বলল, "খাটিয়া আর হরিয়া ডোম আসছে, সঙ্গী নিয়ে।"

একটা ভাঙাচোরা দড়ির খাটিয়া নিয়ে দু'জন লোক আসছিল। পুব দিকের মেঠো রাস্তা দিয়ে।

শর্মাজি মানুষটি ভাল। কিন্তু পুলিশ তো ! আইন তাঁকে মানতেই হয়। চন্দনদের বললেন, "আপনাদের একবার থানায় যেতে হবে। ডর পাবেন না। রুটিন স্টেটমেন্ট নিতে হবে আমাকে।... আধা ঘণ্টা এক ঘণ্টা পরে আসবেন আপনারা, আগে এই বডিটা তুলে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করি।"

কিকিরা চামেলিবাবু আর তারাপদরা একপাশে সরে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল, অন্যপাশে ভিড়ের মানুষ।

গাঁয়ের লোক বোধ হয় এ-ধরনের মরা মানুষ ছোঁয় না। জাত-পাত তো আছেই। তার ওপর বেমক্কা এক মরা লোক টানাটানি করে কে আর কোতোয়ালির নানান ফাঁদে জড়িয়ে পড়তে চায়।

হরিয়া ডোমরা মাত্র দু'জন। জল আর পাথরের জায়গাটা তারা একটু পরিষ্কার করে নিল জল সরিয়ে—তারপর লোকটাকে টেনে তুলল। অর্ধেক শরীর ভেজা, কয়েকটা জলো লতা জড়ানো পায়ের দিকে। ভিজে সপসপে পাজামা। পায়ে স্ট্র্যাপ বাঁধা চটি, কোমরের তলায় একটা চামড়ার বেল্ট। পাজামার ওপর বেল্ট—বেশ অদ্ভুত ব্যাপার। তার চেয়েও অদ্ভুত বেল্টের বাঁ দিকে একটা খাপ। দেখলেই বোঝা যায়, পিস্তল নয়, ছোরা বা ড্যাগার রাখার খাপ। খাপটায় অবশ্য কিছু নেই। বাঁট বা মুখ দেখা যাচ্ছিল না ড্যাগারের।

লোকটাকে খাটিয়ায় শোয়ানো হল। প্রায় ধপ করে ফেলে দিল ডোমরা। নোংরা মারকিন বড় কাপড় সঙ্গেই ছিল তাদের। লোকটিকে দেখে গায়ে ফেলে দিল, মুখও ঢেকে দিল। এক সেপাই একটা কালো চাদর রেখে দিল খাটিয়ার পাশে। গরম চাদর।

চামেলিবাবু শর্মাকে জিজ্ঞেস করলেন, "চাদর কোথায় পেলেন ?"

"মাঠে পড়ে ছিল—" বলে জায়গাটা দেখালেন। "একটা টর্চও পাওয়া গিয়েছে। এ টর্চ উইদাউট ব্যাটারি।"

"আচ্ছা ! আজব ব্যাপার। টর্চ আছে ব্যাটারি নেই।"

"ওহি তো বাত।"

শর্মাজির হুকুমমতন তাঁর সেপাইরা হরিয়া ডোমদের দিয়ে খাটিয়া তুলিয়ে নিল। তারপর চলে গেল। থানাতেই যাবে।

ভিড়টা একবার নজর করে দেখে নিলেন শর্মাজি। চেনা মুখ সব। দরকারে ওদের থানায় হাজির করাতে অসুবিধে হবে না।

ভিড় সরে গেল। সেপাই আর হরিয়া ডোমরা আলপথ ছেড়ে মেঠো রাস্তায় নামল।

কিকিরা কী মনে করে পাথরটার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। জল খানিকটা ঘোলাটে, কিছু জলজ লতাপাতা অবশ্য আছে, শ্যাওলাও। তবু ততটা নোংরা নয়। ধোপারা এখানে কাপড় কাচার সময় জল সরিয়ে যতটা পারে পরিষ্কার করে নেয়। লক্ষ করলে ভাটির বড় গামলা অবশ্য এখন চোখে পড়বে না। তবে রাখার জায়গা আন্দাজ করা যায়, নীল আর মাড়ের জায়গাও। ঝিলের ওপাশে মাঠে তারা কাপড় শুকোতে দেয়। গতকাল কিকিরার চোখে পড়েছিল বড় রাস্তা দিয়ে ফেরার সময়।

রোদ বাড়ছিল।

শর্মাজি চলে যাবেন।

চামেলিবাবু হঠাৎ বললেন শর্মাজিকে, "বহুত মেহনত হল শর্মাজি। চলুন, একটু চা-পানি খেয়ে যাবেন।"

চামেলিবাবুর বাগান বা বাড়ি কাছেই। শ' দুয়েক গজ। সামান্য বেশিও হতে পারে।

শর্মাজি কী ভেবে বললেন, "চলুন।"

চামেলিবাবু কিকিরাদেরও ডাকলেন। "আসুন রায়সাহাব।"

কিকিরা আপত্তি করলেন না।

তারাপদ হঠাৎ শর্মাজিকে বলল, "আপনি এমন বাংলা কোত্থেকে শিখলেন শর্মাজি ?"

শর্মাজি দাঁড়িয়ে পড়ে হেসে ফেললেন প্রথমে ; পরে জোরেই হাসলেন। বললেন, "আমি দাদা সেভেন্টি পার্সেন্ট বাঙালি। বর্ধমানে আমার মামার বাড়িতে থেকে স্কুলে লেখাপড়া করেছি। গ্রাজুয়েশান করেছি কলকাতায়। সেন্ট পলসে পড়তাম। পুলিশ লাইনে আসার মতলব আমার ছিল না। আমার বাবা নেই। আমি যখন বালবাচ্চা তখনই মারা গিয়েছেন। মামারা গার্জেন ছিলেন। আমার বড়মামা পুলিশের লোক। ধানবাদে ছিলেন, মামা আমায়..."

বাকিটা আর বলতে হল না, তারাপদরা বুঝে নিল।

সামান্য পথ চুপচাপ। তারপর কিকিরাই চামেলিবাবুকে বললেন, "চামেলিবাবু ভদ্রলোক কে ? আপনি চেনেন না ?"

"না।" মাথা নাড়লেন চামেলিবাবু।

"আপনি এখানকার বরাবরের বাসিন্দে। ঘোরাফেরাও করেন। ভদ্রলোককে দেখেননি ?"

"না, রায়সাহাব। দেখিনি। লোকটা নতুন। একদম নয়া এসেছে।" বলে একটু থেমে আবার বললেন, "আমি থাকি একদিকে, এই শহরটার তিনদিকে চারটে মহল্লা। কে কোথায় আসছে জানব কেমন করে ! একটু পুরনো হয়ে গেলে হয়তো স্টেশনে বাজারে পোস্টঅফিসে মুখটা দেখা যায়। এ লোক নতুন।"

তারাপদ নিশ্বাস ফেলে, বিষণ্ণ গলায় বলল হঠাৎ, "ভদ্রলোক এখানে মরতে এসেছিল। কী কপাল !"

প্রথমে চুপচাপ, পরে শর্মা বললেন, "কমপ্লিকেটেড কেস। যে মরতে আসে তার কোমরে ড্যাগারের বেল্ট থাকে ? ফাঁকা বেল্ট পরেই বা সে আসবে কেন !" কী যেন ভাবছিলেন শর্মা। টর্চটা দেখছিলেন ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে। "অ্যান্ড এ টর্চ উইদাউট ব্যাটারি ! স্ট্রেঞ্জ !"

আর কোনও কথা বলল না কেউ।

চামেলিবাবুর বাগানে বসে চা খাওয়া শেষ হতেই শর্মাজি উঠে পড়লেন। তাঁর অনেক কাজ। যাওয়ার সময় চামেলিবাবুকে বললেন, "লোকটার পাত্তা আমি নিয়ে নেব। ডেডবডি থানায় পড়ে থাকবে এখন। বিকেলে চালান করে দেব সদরে। বাদে যা হয় বড়সাহেবরা করবেন। চলি..." বলে চন্দনদের দিকে তাকালেন, "থানায় আপনারা একবার আসবেন। প্লিজ। সাড়ে দশ বাজে আসুন। ও. কে।"

শর্মা চলে যাওয়ার পর কিকিরারা চুপচাপ। সাত সকালে এমন একটা ঘটনা ঘটবে কে জানত! মন খারাপ না হয়ে উপায় কী!

চামেলিবাবু যেন হঠাৎ অনুতাপ বোধ করে বললেন, "রায়সাহাব, আমার বড় খারাপ লাগছে। আপনাদের বলেকয়ে বেড়াতে নিয়ে এলাম এখানে। দু' দিন যেতে না যেতে ঝঞ্ঝাট! মাফি চাইছি।"

কিকিরা মাথা নাড়লেন। "না না, এতে আর আপনার দোষ কোথায়! জগতে কত কী তো হঠাৎ হয়ে যায়। ট্রেনে আসার সময় যদি একটা অ্যাকসিডেন্ট হত, ডাকাতের হাতে পড়তাম—আপনার কি তাতে দোষ থাকত!"

"আপনারা যখন থানায় যাবেন আমি সঙ্গে থাকব।"

"কোনও দরকার নেই। থানা চিনতে আমাদের অসুবিধে হবে না।"

তারাপদ বলল, "ডেডবডি সদরে পাঠাবার মানে কী, চামেলিবাবু?"

"সদরে হেড কোয়ার্টার। বড় পুলিশ অফিসাররা আছেন। সরকারি হাসপাতাল আছে। মর্গ আছে। বডির পোস্টমর্টেম হবে ওখানে।"

চন্দন মাথা হেলিয়ে বলল, "সাধারণ প্রসেসটা তাই। পোস্টমর্টেমটা জরুরি। অ্যাবনরমাল যে-কোনও মৃত্যুরই পোস্ট মর্টেম হওয়া উচিত। ওটা আইন। তবে আমাদের এখানে সব কাজ আইন মেনে হয় না।"

চামেলিবাবু মাথা নেড়ে বললেন, "এইসব ছোট গাঁ-গঞ্জে আইন বলতে পুলিশ। যা খুশি করতে পারে।... তবে শর্মা ভাল লোক। ভেরি গুড অফিসার। ওর বড়মামা ধানবাদ শহরে টেরার ছিলেন। মাফিয়াদের ঠাণ্ডা করে রাখার চেষ্টা করতেন ভদ্রলোক। অনেকবার ওঁকে মারার চেষ্টা হয়েছে...।"

কিকিরা যেন শুনছিলেন না কথাগুলো। অন্যমনস্ক। বললেন, "চামেলিবাবু আপনার এই বাগানের বাইরে গোটা পাঁচেক বাড়ি আছে, না?"

"হ্যাঁ, পাঁচ...।"

"বাড়িগুলো সব আপনার নয়?"

"তিনটে আমার। বাকি দুটো অন্যের। আমার কাছ থেকেই খানিকটা জমি কিনে বাড়ি করেছে।"

"কোন দুটো?"

"পশ্চিম দিকের। একটা বাড়ি শীতলবাবুর। ঘোলাটে দেখতে। হলুদ।

ছোট বাড়ি। ভাঙাচোরা চেহারা। শীতলবাবু এখানেই কাজ করতেন একসময়। পোস্টমাস্টারবাবু। চাকরির পর এখানেই বাড়ি করে থাকতে শুরু করেন। প্রায় বুড়োমানুষ। ওঁর স্ত্রী আছেন। ছেলে ছিল। জোয়ান। বাপের সঙ্গে ঝগড়া করে রাঁচির দিকে চলে যায়। সেখানে কাজকারবার করে। বাপের সঙ্গে সম্পর্ক নেই বলতে পারেন। বিয়ে-থা করে নিজের মতন থাকে তফাতে।"

"শীতলবাবুর চলে কেমন করে ?"

"সামান্য জমানো আছে। বাকিটা চলে বদ্যিগিরি করে। উনি একদিকে কবিরাজ অন্যদিকে হোমিওপ্যাথ। গাঁ গ্রামের গরিব মানুষ শীতলবাবুর কাছে আসে। সকালে ভিড় হয়।"

"ও ! অন্য বাড়িটা কার ?"

"কচি—মানে কাঞ্চনের। কচির দোকান আছে বাজারে। স্টেশনারি। পুরনো দোকান। কচি তার মাকে নিয়ে থাকে। ছোকরা বেশ তেজি।"

"মানে ?"

"মানে কাউকে রেয়াত করে না। কথা বলে কটকট করে। এমনিতে ভাল।"

"ওকে কি সকালে দেখেছি ভিড়ের মধ্যে ?

"না। ওকে কেমন করে দেখবেন ! আজ বৃহস্পতিবার। ওর দোকান বন্ধ। ও বুধবার সন্ধের গাড়িতে মালপত্র কিনতে ধানবাদ আসানসোল চলে যায়। আজ বিকেলে ফিরবে। আপনি শীতলবাবুকে দেখেছেন।"

"রোগা বুড়োমতন দেখতে। গায়ে মেরুন রঙের চাদর ছিল।"

"ঠিক ধরেছেন। চুপচাপ মানুষ।"

"বাকি তিনটে বাড়ি আপনার ?"

"করেছিলাম এক সময়ে। এখন ভাড়া দিই। সিজন টাইমে ভাড়া হয়ে যায়—অন্য সময় ফাঁকা।"

কিকিরা কথা বলতে বলতে কাশলেন বার কয়েক। "এখন তিনটে বাড়িতেই ভাড়াটে আছে ?"

"তা বলতে পারেন।" চামেলিবাবু পকেট থেকে সিগারেট বার করলেন। "খাবেন নাকি ?" কিকিরা মাথা নাড়লেন, কাঁচা সর্দিতে গলা জ্বালা করছে। চন্দনরা সিগারেট নিল।

চামেলিবাবুর বাড়িটি মাঝারি। একতলা। পুরনো ধাঁচের বাড়ি। বারান্দায় বসে চা খাওয়া হচ্ছিল। সামনে আশেপাশে বাগান। বড় বড় গাছ। ফুলবাগান মামুলি। অনেকটা তফাতে গোয়ালঘর। একপাশে বড় ইঁদারা।

কিকিরা বললেন, "ভাড়াটে কারা ? কোত্থেকে এসেছে ?"

চামেলিবাবু বললেন, "কলকাতা থেকে এসেছেন গণপতি পাঁজা। বলেন,

আলসারের রোগী। জল হাওয়া বদলাতে এসেছেন। মোটেই মিশুকে নন। ঘোরাফেরাও বড় করতে দেখি না। কথাবার্তা বলেন কম। চোখমুখ দেখলে মনে হয় স্বভাবে খিটখিটে।"

"কী করেন কলকাতায় ?"

"চিৎপুরে পাঁজাবাবুর দু' পুরুষের দোকান। ডিজাইনার অ্যান্ড ড্রেস মেকার। বলেন তো তাই। থিয়েটার যাত্রার সাজ তৈরি করান। নকল চুল দাড়িও। বলেন, ড্রেস মেকার পাঁজা বললেই—এক ডাকে সবাই চিনতে পারে, থিয়েটার যাত্রা মহলে !"

"ও ! একাই এসেছেন ?"

"স্ত্রী মারা গিয়েছেন বছর কয়েক আগে। এখন ভৈরব বলে একটা লোকই পাঁজাবাবুর দেখাশোনা করে। অনেক কাল ধরেই ওঁর কাছে।"

"ভৈরব !"

"চেহারা দেখলে মনে হয় ডাকাত। যেমন তাগড়া তেমনই কালো। মাথার চুল একেবারে সেই হাবসি টাইপ। বেটার গলায় আবার কণ্ঠি।" চামেলিবাবু হাসলেন যেন।

"অন্য ভাড়াটে কারা ?"

"গোল বারান্দাওয়ালা বাড়িটায় এসেছেন, মাখনলাল দত্ত, ভদ্র সজ্জন মানুষ, কলকাতায় এক ছাপাখানার ম্যানেজার। সঙ্গে স্ত্রী আর একটি বাচ্চা ছেলে। স্ত্রী বোধ হয় গানটান জানেন। আসা যাওয়ার পথে শুনেছি এক-আধবার।"

"একেও কি আজ সকালে দেখেছি ?"

"না। অত সকালে এঁদের কাউকে বাইরে দেখা যায় না। বিকেলবেলায় বেড়াতে বেরোন।"

"তিন নম্বর ভাড়াটে কারা মশাই ?"

চামেলিবাবু এবার যেন সামান্য বিরক্ত হলেন। বললেন, "আর বলবেন না, আগে তো কিছু জানতাম না। না জেনেই ভাড়া দিয়ে দিয়েছি। দুটো ষণ্ডা এসে জুটেছে। জামশেদপুর থেকে মোটরবাইক হাঁকিয়ে এসে হাজির। দুই বন্ধু। একজন বলে, সে বড় এক ওষুধ কোম্পানির রিপ্রেজেনটেটিভ, অন্য বন্ধুটি নাকি কপার কর্পোরেশানে। সে ছোকরা আবার খেলোয়াড়, হকি প্লেয়ার। দুই যেন মানিকজোড়। বয়েস কম। হুল্লোড় করে বেড়ায়। আবার কানে যন্তর লাগিয়ে নাচে। ওরা বোধ হয় বেশি দিন থাকবে না। ভাড়া অবশ্য পুরো মাসের দিয়েছে।"

"নাম কী ?" চন্দন বলল।

"নামের বাহার আছে। একটার নাম, পল্লব ; পল্লব মুখার্জি ! আরেকটার নাম, লাডলি হালদার।"

"হকি খেলোয়াড় ?"

"তাই হবে। বলে তো হকি খেলত! ওই দুটো যাঁড় আমাকে জ্বালিয়ে মারছে।"

"কেন, কেন?"

"আরে মশাই, যখন তখন এসে নানান বায়নাক্কা করে।"

"কীরকম?"

"রকম আবার কী! মজা, খেয়াল, অন্যকে বিরক্ত করা। একবার হঠাৎ এসে বলল, মুরগির কী এক রান্না করবে, বাসন দাও!...আর একদিন এসে বলল, নাচ দেখবেন, ভাঙড়া নাচ?... দাদা চলুন না—একটু ফিশ খেলব। দু' পয়সা পকেটে আসতে পারে...। আপনার বাগানে ভূত আছে নাকি—কে যেন মাঝরাতে নাক ডেকে ঘুমোয়! রসিকতা করে মশাই! সেদিন এসে বলল, ঘুমের বড়ি আছে? দিন না দুটো। সাউন্ড স্লিপ হচ্ছে না ক'দিন।"

তারাপদ হেসে ফেলল।

"হাসির কথা নয়। আমি ওদের বাপের বয়েসি। আমায় নিয়ে ঠাট্টা তামাশা!...তা সেদিন রেগে গিয়ে বলেছি, ওহে আমার বাড়িতে দোনলা বন্দুক আছে। দেখবে? তোমরা পুরনো বন্দুক দেখেছ! উইলসন রেঞ্জ! জানো না! একবার দেখবে! দেখে নাও—! বলে জংলীকে ডাকলাম। জংলী আমার বাড়িতেই থাকে। জংলী বন্দুক এনে দিল। বন্দুক হাতে পেলে তার অবস্থাটা হয়ে দাঁড়ায় ভয়ঙ্কর। ওই দুটো ফাজিল ছেলেকে চোখের পলকে শেষ করে দিতে পারে।"

তারাপদ কৌতূহল বোধ করে বলল, "সর্বনাশ! ওরা জংলীকে বন্দুক হাতে দেখল!"

চামেলিবাবু মুখ টিপে হাসলেন। "দেখল বইকী! তারপর আর মুখে কথা নেই। পালিয়ে গেল। সেদিন থেকে আর জ্বালাতে আসে না।"

চন্দন চিনতে পারল ছোকরা দু'জনকে। কাল বিকেলেই বাজারের কাছে দেখেছে। মোটরবাইকে স্টার্ট দিচ্ছিল। জিন্‌সের প্যান্ট আর গায়ে জ্যাকেট। বোম্বাই সিনেমার লড়াকু হিরোদের মতন দাঁড়িয়ে ছিল। তারাপদও দেখেছে। তবে কলকাতায় এসব আজকাল এত দেখা যায় যে, আলাদা করে চিনে রাখার দরকার করে না।

কিকিরা চামেলিবাবুকে বললেন ঠাট্টা করেই, "আপনি তাহলে বেঁচে গিয়েছেন বলুন!"

"বাঁচা আর কী! স্বস্তি পেয়েছি।...তবে ছোকরা দুটো এখানে আর বোধ হয় থাকবে না।"

"কেন? এক মাসের ভাড়া নিয়েছে..."

"মাস-ভাড়া ছাড়া বাড়ি তো আমি দিই না। কেউ দেয় না। ওরা ভাড়া নেওয়ার সময়েই বলে দিয়েছিল—হপ্তা দেড়েক থাকবে বড় জোর!"

"হপ্তা দেড়েক হয়ে গিয়েছে ?"

"তা হল !"

কিকিরা এবার উঠে পড়লেন। খানিকটা আচমকাই। বললেন, "এখন চলি চামেলিবাবু ! অনেকক্ষণ হয়ে গেল ! বেলা হয়ে যাচ্ছে ! একবার থানায় যেতে হবে।"

ঘড়ি দেখল চন্দন। দশটা বেজে গিয়েছে।

চামেলিবাবু বললেন, "আমি আপনাদের সঙ্গে যাই। থানায় যাবেন— !"

"আরে না না, আপনি বসুন ! আমরা তো এ-সময় একবার টহল মারতে বেরোই। থানাটাও ঘুরে যাব।"

তারাপদরা উঠে পড়ল।

আসবার সময় তারাপদ হালকাভাবে বলল, "আপনার জংলীকে কিন্তু আমরাও দেখিনি।"

"আছে বাড়িতেই। ইঁদারার ওপরের ঢাকা জালটা ভেঙে গিয়েছিল একপাশে। সারানোর কাজ করছিল সকাল থেকেই। পরে দেখতে পাবেন, ওকে দেখা কঠিন কিছু নয়। কাজ নিয়ে থাকে।"

কিকিরারা আর দাঁড়ালেন না।

বাইরে এসে মাঠের রাস্তা ধরে যেতে যেতে কিকিরা প্রথমে ছড়ানো ছিটোনো বাড়িগুলো দেখছিলেন। আগেও দেখেছেন তবে নজর করে নয়। এখানে আসা তো মাত্র দিন দুই। গতকালই যা একবার এসেছিলেন চামেলিবাবুর বাগানে। আর আজ।

তারাপদ আর চন্দন থানায় গিয়ে কতক্ষণ আটকে যাবে সেটাই ভাবছিল। বেলা তো বেড়েই যাচ্ছে। বাজারে সামান্য কাজও ছিল। এ-বেলা হয়তো হবে না। খেপা যদু বাড়িতে কী করছে কে জানে !

কিকিরা হঠাৎ বললেন, "চাঁদু, ট্র্যাঙ্গল মানে ত্রিভুজ জানো তো !"

চন্দন তাকাল। তারাপদও।

কিকিরা হাত দিয়ে ঝিলের দিকটা দেখালেন। তারপর এপাশ ওপাশ। বললেন, "এটা একটু নজর করো। আমরা যে মাঠের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি—চামেলিবাগানের গা ঘেঁষে, এটা ঝিলের দক্ষিণ দিক। এই রাস্তাটা গিয়ে ওই বড় রাস্তা—মানে এখানকার মেন রাস্তায় পড়েছে। ওটা উত্তর দিক। আর ঝিল তো দেখতেই পাচ্ছ। আমরা থাকি উত্তর দিকে। প্রায় উত্তর। বিশ ত্রিশ পা হাঁটলেই কাঁচা মেন রোড।"

"আপনি সার আমাদের দিক শেখাচ্ছেন ?"

"না। আমি বলছি, ঝিলের কথা। দু' দিকে দুই রাস্তা। উত্তর আর পুবে। এ দিকে দক্ষিণে আলপথ ঝিলের। এই আলপথ দুই রাস্তাকে জয়েন করেছে।

মানে ইট ইজ লাইক এ ট্র্যাঙ্গল। অর্থাৎ তিন দিকে তিন পথ, মাঝখানে ঝিল। ত্রিভুজ বলা যায় কি না!"

চন্দন দেখল। মাথা নাড়ল। "তা বলতে পারেন।"

"আমার প্রশ্ন হচ্ছে, মাঝরাতেই হোক কি শেষরাতে, একটা লোক বড় রাস্তা ছেড়ে আলপথ দিয়ে যাবে কেন ? হোয়াই ?"

তারাপদর মনে হল, প্রশ্নটা যথার্থ।

কিকিরা বললেন, "লোকটা হয় চামেলিবাগানের দিক দিয়ে এসেছিল—মানে আসছিল ; না হয় উত্তর দিক দিয়ে। শর্টকাট পথে। তাই না ?"

চন্দন ভাবল কয়েক মুহূর্ত, তারপর বলল, "তাই তো মনে হয়।"

কিকিরা হাসলেন। "লোকটা কে ? কেন এভাবে যাচ্ছিল ?"

॥ ৩ ॥

থানা ছোট। ইট রঙের বাড়ি। মাথায় টালির ছাদ। কম্পাউন্ডওয়াল বলে কিছু নেই। তফাতে দারোগাবাবুদের কোয়ার্টারস, অন্য পাশে সেপাই জমাদারদের। অন্তত তাই মনে হয়। গাছগাছালি কম নয় চারপাশে, মাঠও আছে। খানিকটা তফাতে বিশাল এক ঘোড়ানিম আর কাঁঠালগাছের তলায় একটা খাটিয়া পড়ে আছে। স্পষ্টই বোঝা যায়, সকালের সেই অজ্ঞাত মানুষটির মৃতদেহ।

কৈলাসনাথ শর্মা নিজের ঘরে বসে ছিলেন।

কিকিরারা ঘরে আসতেই শর্মাজি বললেন, "বসুন। আপনাদের কথাই ভাবছিলাম।"

"দেরি হয়ে গেল ?"

"না না, ঠিক আছে।" বলে শর্মা তাঁর টেবিলের ওপর রাখা কাগজপত্র খাতা নাড়াচাড়া করলেন অন্যমনস্কভাবে। তারপর সাদামাটা গলায় যা বললেন—তার অর্থ হল তিনি সাধারণ একটা স্টেটমেন্ট লিখিয়েই চন্দনদের ছেড়ে দেবেন। এটা কোনও ডায়েরি নয়। মোটামুটিভাবে সকালে যা যা দেখেছে তারাপদরা, তা বললেই কাজটা মিটে যাবে। "ঘাবড়াবেন না, আমাকে আমার কাজটা করতে দিন, আপনাদের আমি এই মামলার সঙ্গে জড়াচ্ছি না।"

তারাপদ আর চন্দন যা বলার বলল। শর্মা নিজেই লিখে নিলেন খাতায়। তারপর খাতাটা এগিয়ে দিলেন। অর্থাৎ, আপনারা পড়ে দেখে নিন ভুলভাল লিখেছি কি না! তারপর একটা করে সই করুন প্লিজ।

তারাপদরা পড়ল। সই করে দিল।

কিকিরা বললেন, "আমাকে সই করতে হবে ?"

"বেকার। আপনি সই করে কী করবেন! আপনি অনেক পরে এসেছেন।

আমি তখন স্পটে প্রেজেন্ট ছিলাম। আরও বহুত লোক ছিল।”

সেপাই-জমাদার গোছের একটা লোক চার গ্লাস চা এনে টেবিলে রাখল। গ্লাসগুলো ছোট, কিন্তু পরিষ্কার।

“নিন বাবু, থোড়া চা পানি খান ! পান সিগারেট খাবেন ?”

“না না।” বলে চন্দন নিজেই পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বার করে এগিয়ে দিল।

শর্মা হাসলেন। বললেন, “সিগারেট আমি খাই না। প্যাকেটের খইনি খাই। খাবেন ?” বলে টেবিলের ড্রয়ার টেনে খইনির প্যাকেট বার করলেন।

চন্দনরা মাথা নাড়ল। হেসে বলল, “বমি করে ফেলব দারোগাসাহেব, অভ্যেস নেই।”

চা খেতে খেতে কিকিরা বললেন, “ডেডবডিটা গাছতলায় ফেলে রেখেছেন ? এবার তো পচতে শুরু করবে।”

শর্মা বললেন, “বিকেলে পাচার হয়ে যাবে।...রায়সাহেব, কী আজব বাত ! আমি বিশ বাইশ জন লোককে থানায় হাজির করলাম : রেলস্টেশনের টিকিট কালেক্টর দু’-তিনজন, এ এস এম পালবাবু, বাজারের হালুইঅলা লোচন, পানঅলা ভুলুয়া, ট্রেকারের ড্রাইভার মোহন—আরও ক’জন দোকানদার। ওরা বডি দেখল—আইডেন্টিফাই করতে পারল না। বলল, এই লোকটাকে তারা দেখেনি !”

“তাহলে লোকটা এল কোথা থেকে ?”

“ওহি তো বাত।”

“আরও তো লোক থাকে এখানে শর্মাজি...”

“থানা থেকে আমার লোক পাঠিয়ে ঘরে ঘরে খোঁজ নিচ্ছি, সব খবর পাইনি এখনও।”

“নো ওয়ান ইজ মিসিং ?”

শর্মা মাথা নাড়লেন। “নো। নান।” বলে চন্দনের দিকে তাকালেন শর্মা, “হোয়াট ইউ থিঙ্ক ডাগতারসাহেব ? টাইম অব ডেথ ?”

চন্দন কেমন বিভ্রমে পড়ে গেল। বলল, “শর্মাজি, আমার পক্ষে ঠিক বলা সম্ভব নয়। আন্দাজে বলতে পারি, মাঝরাত বা শেষরাত।”

“আপনি পারেন না ?”

“না। ডাক্তারদের ওপিনিয়ান সব সময় ডিফার করে। এ-ব্যাপারে বেস্ট জাজ পোস্টমর্টেম যিনি করবেন তিনি। যদিও দেখেছি এঁদের মতও পুরোপুরি মেলে না। আপনি অন্য কাউকে...”

শর্মা মাথা হেলালেন। মানে, তিনি এদিককার কোনও ডাক্তারকেও দেখিয়েছেন মৃতদেহ। তিনিও সময় বলতে পারেননি ঠিকমতন।

কিকিরা বললেন, “আপনি কী মনে করেন শর্মাজি ? ন্যাচারাল ডেথ ?”

"না।" মাথা নাড়লেন শর্মা, "ন্যাচারাল মনে হয় না।"

"মার্ডার ? এ কেস অব কিলিং ?" তারাপদ বলল।

"আই থিঙ্ক সো ! মাগর লোকটা কে ? কে মার্ডার করল ? হোয়াই ? হু ইজ দিস ম্যান ?"

কিকিরাও এই দুটি কথা জানতে চান। সামান্য সময় চুপ করে বসে থেকে হঠাৎ হাত বাড়ালেন, "দিন সার, আপনার প্যাকেটের খইনি দিন। আমি চুরুট খাই। খইনি হজম করতে পারব।"

চন্দন যেন আঁতকে উঠল। কিকিরার সর্দিজ্বর, সামান্যই জ্বর অবশ্য, গলা বসে আছে। কাশছেন মাঝে মাঝে। এর ওপর খইনি। নির্ঘাত কাশির দমকে একটা বিপদ বাধাবেন।

খইনির প্যাকেট নিয়ে কয়েক মুহূর্ত দেখলেন কিকিরা। তারপর হেসে বললেন, "এই খইনি কারা খায় শর্মাজি ! গোলাপ মার্কা খইনি ! নরম বোধ হয়।" বলে প্যাকেট থেকে একটু জরদা বাঁ হাতের তালুতে ঢেলে নিলেন। প্যাকেটটা এগিয়ে দিলেন শর্মাকে।

"স্টেশনের বাবুরা লোকটিকে জানতে পারেন নাকি ?" কিকিরা বললেন, খইনি তখনও মুখে দেননি।

শর্মা বললেন, "চান্স আছে। বাত কী জানেন রায়সাহাব, এখন প্রপার সিজ়ন টাইম নয় ; দেওয়ালি শেষ। পূজায় যারা এসেছিল তারা ফিরে গিয়েছে। নভেম্বরের এন্ডে কম লোক আসে এখানে বেড়াতে। ডিসেম্বরের মিড উইক থেকে আবার লোক আসবে। জানুয়ারিতে রাশ থাকে ...। ব্যস—সিজন খতম।"

কিকিরা শুনলেন, ভাল বুঝলেন না। তাকিয়ে থাকলেন।

শর্মা বুঝতে পারলেন, কথাটা ধরতে পারেননি রায়সাহাব। তারপর ব্যাখ্যা করে বোঝালেন, এ-সময় এত কম লোক আসে—মানে বেড়াতে আসে বাঙালিবাবুরা যে রেলস্টেশন থেকে বেরুবার সময় টিকিট কালেক্টররা মোটামুটি মুখগুলো নজর করতে পারেন। স্টেশনের মাল-বওয়া পোর্টাররাও চিনে নিতে পারে। শর্মাজি সেই আন্দাজে ডেকে আনিয়েছিলেন জনা কয়েক স্টেশনের বাবুকে। কেউ কিছু বলতে পারল না। বাজারের লোকরাও নয়। তা ছাড়া একেবারে নয়া লোক না হলে হাটেবাজারেও তার মুখ দেখা যায়। এই লোকটি একেবারে নয়া হতে পারে।

খইনি মুখে দিলেন কিকিরা, ঠোঁটের তলায়। মুখ সামান্য বিকৃত করলেন। কাশলেন না।

শর্মা হাসছিলেন।

চন্দন বলল, "শর্মাজি, আমরা এবার উঠতে পারি ?"

"জরুর পারেন। ... আমার দরকার পড়লে আপনাদের সঙ্গে মিট করব।"

কিকিরা উঠলেন না। বললেন, "শর্মাজি, চামেলিবাবুর বাগানের বাইরে যে ঝাড়িগুলো আছে ; তাদের খোঁজখবর রাখেন ?"

শর্মা অবাক। বললেন, "শীতলবাবু ! ওল্ড ম্যান। আমি চাচাজি বলি। গুড হোমিওপ্যাথ। পুরনো লোক। ভাল লোক !"

"কাঞ্চন। ছোকরা।"

"আরে, কচিবাবু আমার ইয়ার দোস্ত।"

"বাকিরা ? চামেলিবাবুর ভাড়াটেরা ?"

"শুনেছি। দেখিনি।"

"মোটরবাইক নিয়ে যে ছোকরা দুটো ঘুরে বেড়ায়।"

"দেখেছি। এনিথিং রং উইথ দেম ?"

"না। ওই ছোকরা দুটো যাতে এখান থেকে হুট করে পালাতে না পারে, সার। দু'-চারদিন আটকে রাখুন। পারবেন না ?"

শর্মা অবাক হয়ে বললেন, "কেন ?"

"দেখুন না ক'দিন।"

কিকিরা এবার উঠলেন। খইনি হজম করে ফেলেছেন নাকি !

শর্মা কিছু বলতে যাচ্ছিলেন—তার আগেই কিকিরা নিজের জিভ বার করে দেখালেন। জিভের ডগায় একটা কাশির দমক থামার বড়ি।"

অবাক হয়ে শর্মা বললেন, "আ-রে !"

"পেপ্‌স !... কাল এখানের দোকানে কিনেছি।"

"আমায় বুদ্ধু বানালেন রায়সাহাব।" শর্মা হাসতে লাগলেন।

কিকিরা হাসতে হাসতে বললেন, "আমি ম্যাজিশিয়ান শর্মাজি। এক সময় খেলা দেখাতাম। এখন সিটিং আয়ডিল।"

শর্মাজি হো হো করে হাসতে লাগলেন।

চলে আসার সময় কিকিরা কী মনে করে ঝিলের কাছে পাওয়া টর্চটা দেখতে চাইলেন। দেখালেন শর্মা। দেখলেন কিকিরা।

বাড়ি ফেরার পথে তারাপদ বলল, "কিকিরা সার, বেড়াতে এসে আচ্ছা এক প্যাঁচে পড়ে গেলুম।"

"কেন ?"

"কেসটা যদি মার্ডার কেস হয়, আমরা দু'জন—চাঁদু আর আমি তো ঝামেলায় পড়ে যাব। উইটনেস হওয়ার জন্যে ডাক পড়বে না ?"

"আরে দাঁড়াও। কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় দেখো আগে। আর উইটনেস হলে ফাঁসি যেতে হয় না।"

"আমার বাজে লাগছে।"

চন্দন বলল, "কিকিরা, এই চামেলিবাবু লোকটি কেমন ?"

"কেমন করে জানব ! পরিচয় সামান্য।"

"বাঃ !"

"বা কেন ?"

"চামেলিবাবুর কথায় আপনি এখানে বেড়াতে এলেন, সঙ্গে লেজুড় করে নিয়ে এলেন আমাদের, এখন বলছেন—কেমন করে জানব !"

কিকিরা মজার গলায় বললেন, "সংস্কৃতে একটা কথা আছে, পত্রম্ ন পরিচয়তে গুণম্ ... ! ঠিক সংস্কৃতটা ভুলে গিয়েছি—মনে নেই। আদত কথাটা বলি, তোমরা তো আবার সংস্কৃত বোঝো না। নিমপাতা যে তেতো এটা অভিজ্ঞতা থেকে জানা গিয়েছে, মুখে না দিলে জানা যেত না। একটা বাচ্চাকে এক আধ চামচে নিমপাতার রস খাওয়ানো যায়—যতক্ষণ সে না বুঝছে জিনিসটা খেতে কেমন ! একবার মুখে গেলে আর কি খেতে চায় ! এটাও সেইরকম হে ! চামেলিবাবুর সঙ্গে আলাপ হয়ে মন্দ লাগেনি। কত বাবুর সঙ্গেই তো পরিচয় হয়, আগে থেকে বুঝব কেমন করে সে কেমন—ভাল, না, মন্দ !"

কথাটা কিকিরা মিথ্যে বলেননি। রজনী সরকারের বাড়িতে আলাপ হয়েছিল চামেলিবাবুর সঙ্গে। রজনীবাবুরা অ্যাটর্নির বংশ। তিন পুরুষ হয়ে গেল একরকম। রজনীবাবু অবশ্য আইনের চেয়ে ধর্মকর্মের বই লেখা নিয়ে বেশি ব্যস্ত থাকেন। পেটের চিন্তা নেই, পরমার্থ চিন্তাতেই আনন্দ পান। মানুষটি ভাল, সুরসিক। কিকিরার সঙ্গে পরিচয় অনেকদিনের।

রজনীবাবুর বাড়িতে চামেলিবাবুকে দেখেছিলেন কিকিরা, আলাপও হয়েছিল। নিজের বিষয়গত একটা কাজে কলকাতায় এসেছিলেন চামেলিবাবু। বছরে এক-আধবার তাঁকে আসতে হয় কলকাতায়, বৈষয়িক কাজে। অবশ্য বৈষয়িক কাজগুলোর বৃত্তান্ত কিকিরা জানেন না, জানার আগ্রহও বোধ করেননি।

চামেলিবাবুই বেড়াতে আসার কথা তুলে উসকে দিলেন কিকিরাকে। "চলে আসুন, মশাই। আমাদের হাবিলগঞ্জ নামকরা জায়গা নয়। ছোট জায়গা। লোকজন কম। কিন্তু ভাল জায়গা। ক্লাইমেট ভাল এখন। জল হাওয়ার গুণ রজনীবাবুই জানেন।"

রজনীবাবু বার দুই এসেছেন এখানে। তাঁর এক মক্কেলের বাড়িও আছে। বললেন, "যাও কিঙ্কর, ঘুরে এসো কিছুদিন। তোমার শরীরটাও তো ভাল যাচ্ছে না বলছিলে। দিস ইজ প্রপার টাইম—বেশি শীত পাবে না, ভিড়ও পাবে না, জলটাও এমন স্বাস্থ্যকর ! চলে যাও।'

কিকিরার শরীর হালে ভাল যাচ্ছিল না। গ্যাসট্রিকের ব্যথা, খানিকটা দুর্বলতা, ঘুমের গোলমাল। কী যেন মনে করে রাজি হয়ে গেলেন।

চামেলিবাবুই ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন সব। বাড়ি, খেপা যদু থেকে ঘরদোর ঝাড়মোছ করার একটা লোকও। সামান্য বিছানাপত্র ছাড়া কিকিরাদের কিছুই

আনতে হয়নি। তক্তপোশ, অল্পস্বল্প আসবাব থেকে রান্নার বাসনপত্র—সবই ছিল এই বাড়িতে।

এখানে মাত্র দিন দুই এসেছেন কিকিরা। চামেলিবাবুর সঙ্গে অন্তরঙ্গতা তেমন হয়নি। তবে এটুকু বুঝেছেন, ভদ্রলোকের মানমর্যাদা এখানে যথেষ্ট। পুরনো মানুষ তো অবশ্যই। তার ওপর মোটামুটি ধনী। কলকাতার ধনী বলতে যেমন বোঝায় লোকটি তেমন নয়। মানে ধনীর আড়ম্বর চাকচিক্য নেই। অহঙ্কারও নয়। সেদিক থেকে গেঁয়ো হয়তো। চামেলিবাবুর জমিজায়গা আছে এখানে, ধানের জমি আছে, বাজারে কয়লা কেরোসিনের ডিপো আছে, লোক আছে দোকানে। আরও টুকটাক আছে কিছু।

চামেলিবাবু কিন্তু অবিবাহিত। তাঁর নিজের কেউ নেই। একটি মাত্র ছেলে থাকে—সম্পর্কে ভাইপো। এখানে থাকে না। চামেলিবাবুর নিজের ভাই একজন মাত্র। সে বরাবরই ঘরছাড়া। কবে কোন কালে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গিয়ে জাহাজের আর্টিজান হয়েছিল। এখন পদমর্যাদা বেড়েছে অনেক। কিন্তু ঘরে ফেরা আর হয়ে ওঠেনি। মাঝে মাঝে চিঠি লেখে ; শেষ দেখা একবারই হয়েছিল, বছর দুয়েক আগে। দাদাকে দেখা দিতে এসেছিল।

চামেলিবাবু সম্পর্কে এর বেশি কিছু জানেন না কিকিরা।

"কই, কিছু বলছেন না যে !" চন্দন বলল।

"কী বলব ?"

"চামেলিবাবু কেমন লোক ?"

"খারাপ বলে তো মনে হয় না এখনও।"

"মানে আপনি ..."

"ক্রিমিন্যাল বলে মনে করি কি না জানতে চাইছ ? ... তা যদি বলো তাহলে আমি বলব, ক্রিমিন্যালদের ভ্যারাইটি বা ক্লাস আছে। খুনখারাবি যারা করে বা করায় তারা যে-জাতের ক্রিমিন্যাল, আর জমিজায়গা নিয়ে মামলায় অন্যকে যারা ফাঁসায় তারা অন্য ধরনের ক্রিমিন্যাল। চামেলিবাবু ব্যবসাদার লোক। চালাক হতেই পারেন। তবে এই কেসের সঙ্গে তাঁর কোনও সম্পর্ক আছে বলে আমি এখনও মনে করি না।"

"কার আছে, সার ?"

"কেমন করে বলব। লোকটা যে কে এখনও জানা গেল না।"

"সত্যি, এটাই কেমন অবাক কাণ্ড।"

"শর্মাজি কি পাত্তা করতে পারবে ?"

"কী জানি ! তেমন ভাবে লেগে থাকলে পারতেও পারে।"

তারাপদ বলল, "ডেডবডিটা তো বিকেলে চালান হয়ে যাবে সদরে। সময় কম।"

কিকিরা কিছুই বললেন না।

পরের দিন চামেলিবাবু নিজেই এলেন সকালের দিকে।

ভদ্রলোকের পোশাক সাধারণ। ধুতি, গরম পাঞ্জাবি, পায়ে মোজা আর চামড়ার জুতো। পাট-করা মোটা চাদর গলার কাছে জড়ানো। হাতে বেতের মোটা ছড়ি। চামেলিবাবুর বয়েস্ বুঝতে কষ্ট হয় না। ষাট পেরিয়েছেন। মাথায় পাতলা চুল। রগ ঘেঁষা চুলগুলো সব পাকা। দূরের জিনিস দেখতে অসুবিধে হয় না। কাছের জিনিস ঝাপসা দেখেন। চশমা আছে। তবে বেশিরভাগ সময় সেটা খাপ-সমেত পকেটে থাকে। চামেলিবাবুর গায়ের রং কালো, খয়েরি-কালো। গড়ন ছিপছিপে। মাথায় লম্বা।

হাঁটতে হাঁটতেই এসেছেন চামেলিবাবু। তাঁর বাড়ি থেকে বেরিয়ে আলপথ ধরে এ-বাড়িতে আসতে মিনিট কুড়ি-পঁচিশ সময় যায়। সাধারণ জোরে হাঁটলে। নয়তো সামান্য বেশি।

কিকিরা বাইরেই ছিলেন। রোদ লাগাচ্ছিলেন গায়ে পিঠে। বললেন, "আসুন, বেড়াতে বেড়াতে নাকি ?"

চন্দন আর তারাপদ গিয়েছে বাজারে। খেপা যদুকে বাজারেই পাবে, পেলে একটু মাছের খোঁজ করবে। এখানে মাছ এ-সময় রোজই বড় একটা পাওয়া যায় না। সিজন টাইমে দু'-এক ঝুড়ি আসে। খরিদ্দার থাকে তখন। এখন মাছ বলতে মৃগেল। ছোট ছোট। বাজারে মুরগি অবশ্য পাওয়া যায়।

তারাপদরা খেতে পারে না। বাঙালির পেট, মাংস আর কত খাওয়া যায়। যদুপতি—মানে খেপা যদুর হাতে মাংস আবার তেলঝালে ভয়াবহ হয়ে ওঠে।

চামেলিবাবু বললেন, "বেড়াতে বেড়াতেই এলাম। ওই আল দিয়ে। ভাল করে সব দেখতে দেখতে। খবরটা ছড়িয়ে গিয়েছে রায়বাবু।" এবার আর রায়সাহেব বললেন না।

"কীরকম ?"

"এ তো ছোট জায়গা। গাঁ গ্রামের দেহাতিরা অনবরত আসছে যাচ্ছে ওই রাস্তা দিয়ে। তার ওপর ডেডবডিটা সারাদিন পড়ে ছিল থানার সামনে। শর্মার হুকুমে লোকজনও কম ধরে আনা হয়নি লোকটাকে আইডেন্টিফাই করতে।..."

"হ্যাঁ ! কিছু পাওয়া গেল ! মানে কোনও খোঁজ ?"

"না।"

"এখানে আসার ব্যবস্থা বলতে তো শুধু ট্রেন ?"

"ট্রেন। আর অন্য ব্যবস্থা হল ট্রেকার। ট্রেকার মাত্র একটা। তাও সেটা ঝুমুরিয়ার মোড় থেকে আসে। হাটের দিন ছাড়া ট্রেকারে লোক পাওয়া যায় না।"

"ট্রেকারে লোকটি আসেনি। শর্মা খোঁজ নিয়েছে।"

"ট্রেনেই এসেছে," চামেলিবাবু বললেন। "ট্রেকারে নয়।"

"আসুন বসা যাক," কিকিরা বারান্দার দিকে এগুলেন। "ট্রেনে এসেছে তা না মেনে উপায় নেই আপাতত! কিন্তু কেমন ভাবে এল! শর্মা বলছে, টিকিট কালেক্টার স্টেশনের খালাসি—কেউ ওকে দেখেনি নামতে।"

"না পারতে পারে। এখানে ট্রেন কমই আসে। দুটো প্যাসেঞ্জার, একটা বেলা দশটা নাগাদ, একটা বিকেলে। এক্সপ্রেস গাড়ি একটা। বাকি সব মালগাড়ি। ... অ্যাঁ, কোনও প্যাসেঞ্জার নামলে—দেহাতি যদি না হয়, বিশেষ করে কোনও নতুন বাঙালি ভদ্রলোক—স্টেশনের লোকের নজরে পড়ে। সেটা আমি মানছি। কিন্তু ভুল তো হয়। তা ছাড়া ধরুন কামরার উলটোদিক থেকে নেমে রেললাইন ধরে এগিয়ে তেঁতুলতলার আড়ালে চলে গেল। কে দেখবে! এখানে দেহাতিদের সে-অভ্যেসও আছে। টিকিট কাটে না। পেছন দিয়ে পালায়।"

কিকিরা কথাটা শুনলেন। আগে শোনেননি। তবে কামরার পেছন-দরজা দিয়ে নেমে পালানোর কথা নতুন কী! এ তো সর্বত্রই হয়।

"বসুন।"

চামেলিবাবু বসলেন কাঠের চেয়ারে।

"একটু চা করি?" কিকিরা বললেন।

"না না, আপনি কেন? ওরা কোথায়?"

"স্টেশনে বাজারের কাছে গিয়েছে। যদি মাছ পায় ..."

"মা-ছ! আরে ওদের বলুন খেপাকে পুটলির কাছে যেতে। পুটলি ব্যবস্থা করে দেবে। আমি আবার মাছ-মাংস খাই না। ভাল কথা, কাল রাত্রে আমার ওখানে আসুন আপনারা। দুটো মুখে দেবেন।"

"পরশুদিনই তো খেলাম ..."

"খেলেন কোথায়! নতুন এলেন, দু'-চারটে শাকসবজি পাঠিয়েছিলাম।"

প্রসঙ্গটা পালটে নিলেন কিকিরা। বললেন, "আপনি বলছেন লোকটি ট্রেনে এসেছিল। এসে লুকিয়ে গা-ঢাকা দিয়ে স্টেশন ছেড়ে পালিয়েছিল!"

"তা নয়তো আর কী হবে, আপনি বলুন?"

"বেশ, আপনার কথাই মানলাম। কিন্তু একজন ভদ্রলোক এমন কাজ করবে কেন? উদ্দেশ্য কী? মোটিভ?"

"তা বলতে পারব না," চামেলিবাবু মাথা নাড়লেন। "আপনি তো দেখেছেন লোকটির কোমরে বেল্ট ছিল। ভোজালির খাপ...। লোকটিকে কি খুব নিরীহ মনে হয়! আমার তো হয় না।"

কিকিরা বললেন, "তা বলতে পারেন। ... তবে এটাও ভাবতে হবে, ওটা ছিল কেন? আত্মরক্ষার জন্যে, না, কাউকে ঘায়েল করার জন্যে? যে-কোনও অস্ত্র দু'কারণেই ব্যবহার করা যায়? নয় কী?"

চামেলিবাবু মাথা নাড়লেন। তারপর বললেন, "আপনাকে একটা জিনিস দেখাই। আজ এখানে আসার সময় আমি ঝিলপারের পথটা ভাল করে দেখতে দেখতে এসেছি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছি চারপাশ। একটা জিনিসও পেয়েছি।"

কিকিরা তাকিয়ে থাকলেন। কৌতূহল বোধ করছিলেন।

চামেলিবাবু বললেন, "আপনি তো দেখেছেন ওই পথটার এখানে ওখানে ছোট ছোট ঝোপঝাড়, বুনো লতা—কত কী! আজ আমি কেমন ইচ্ছে করেই সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিলাম! ভাবছিলাম, লোকটাকে যদি আড়াল থেকে লুকিয়ে কেউ মেরেই থাকে তবে একটুও ধস্তাধস্তি হবে না? যাই বলুন লোকটা দুবলাপাতলা নয়। ওকে দেখলে বোঝা যায় গায়ে ক্ষমতাও আছে খানিকটা। একেবারে বেটপ্পা—মানে আচমকা মার খেলাম আর ধড়াস করে পড়ে মরে গেলাম, তেমন মানুষ ও নয়। ঠিক কী না, বলুন?"

কিকিরা বললেন, "তা ঠিক। ... আপনি একটু বসুন। আমি দু' কাপ চায়ের জল চড়িয়ে আসি। শুধু মুখে কথা হয় না।" বলে একটু হেসে কিকিরা রান্নাঘরের দিকে চলে গেলেন।

সামান্য পরে ফিরে এসে কিকিরা বললেন, "জিনিসটা কী বললেন না?"

"আমি একটা তাবিজ লকেট পেয়েছি।" বলে জামার পকেট থেকে এক তাবিজের লকেট বার করে দেখালেন। হাতে বাঁধা থাকে এই ধরনের তাবিজ।

দেখলেন কিকিরা। সাধারণ জিনিস। রুপোর চেনে আটকানো রুপোর লকেট বা তাবিজতক্তি। পরে অনেকেই। ওর মধ্যে কী আর থাকতে পারে? কোনও ঠাকুর দেবতার পুজো দেওয়া শুকনো ফুলপাতা, কিংবা শেকড়-বাকড়, দৈব কিছুও হতে পারে।

"দেখি," হাত বাড়ালেন কিকিরা।

চামেলিবাবু জিনিসটা এগিয়ে দিলেন।

রুপোর লকেটটা বাহারি। গোল বা চৌকো নয়, গাছের পাতার ধরন—মানে পাতলা চ্যাপটা, ওপর-নীচে মানানসই করে ছড়ানো। লকেটের চেন ছিঁড়ে গিয়েছে। একটা আংটা ভাঙা। অন্যটার গায়ে একরত্তি চেন ঝুলে আছে।

না, রুপোর লকেটের ওপর কোনও নাম লেখা নেই। থাকে অনেক সময়, যেমন 'অমূল্য' 'সলিল' বা বেশ নকশা করে একটা অক্ষর 'র' 'ফ' অথবা 'ইংরিজিতে 'পি' 'এন'। সেসব কিছুই নেই লকেটটায়, শুধু একটা অস্পষ্ট চিহ্ন। বোঝা যায় না, ওটা কী! হরফ কিছুতেই নয়।

"কোথায় পেলেন?" কিকিরা জিজ্ঞেস করলেন।

"আলের গায়ে, একটা ছোট তেঁতুল ঝোপের পাতার আড়ালে।"

"শর্মাজির নজরে পড়েনি? তার সেপাইদের?"

"পাতার আড়ালে ছিল। সেখানে আগাছাও জন্মেছে।"

"নজর এড়িয়ে গিয়েছে তবে ! তা চামেলিবাবু জায়গাটা ..." বলতে বলতে উঠে পড়লেন কিকিরা। "একটু দাঁড়ান। চায়ের জল ফুটে গিয়েছে। আসছি...।"

কিকিরা চলে গেলেন।

চামেলিবাবু হাতের লাঠিটা কোলের পাশ থেকে সরিয়ে মাটিতে রাখলেন। এই বাড়িটা তাঁর নয়। দাসবাবুর। দাসবাবু মারা গিয়েছেন। তাঁর স্ত্রী থাকেন আদরায়, আশ্রমে। গুরুমায়ের কাছে। বিধবার সম্পত্তির জিম্মাদার এখন চামেলিবাবু। বাড়িটা ভাড়া খাটিয়ে বছরে যা পান, আদরায় পাঠিয়ে দেন চামেলিবাবু।

সকালটা চমৎকার গাঢ় হয়ে আসছিল। রোদে তাত ফুটছে। কোথায় যেন একটা রোড রোলার চলতে শুরু করল। কাছেই একটা রোলার পড়ে আছে বছর কয়েক ধরে, মাঝে মাঝে তার বুঝি ঘুম ভাঙে।

কিকিরা এলেন। হাতে চায়ের মগ।

"নিন। দুধ কম। যাদবচন্দ্র না এলে দুধ আসে না।"

"ও ঠিক আছে। অকারণ আপনি ব্যস্ত হলেন।"

"আমি অকম্মা নই, চামেলিবাবু ! চা তো কিছুই নয়, কুকিংয়ে আমি আপনার খেপা যদুর কান কেটে দিতে পারি। ভেরি গুড কুক, সার। একদিন আপনাকে খাইয়ে সার্টিফিকেট নেব।" হাসতে লাগলেন কিকিরা। "হোটেলে চাকরি পেয়ে যেতে পারি।"

চামেলিবাবু চায়ে চুমুক দিলেন। হেসে বললেন, "বাঃ।"

"যা বলছিলাম সার। আপনি এই হাতে-পরা লকেটটা ঠিক কোথায় পেয়েছেন ? মানে, যে-পাথরের কাছে লোকটি মরে পড়ে ছিল সেখান থেকে কতটা দূরে ?"

"ক-ত-টা !...তা ধরুন, কতটা হবে, আন্দাজে বলতে হলে বলতে হয়, বিশ-পঁচিশ গজ দূরে।"

"বেশি দূরে নয় তবে !"

"না না। যদি আপনি ভাল করে নজর করেন, ওখানে মাটিতে টানাহেঁচড়ানির দাগও দেখতে পাবেন।"

"দেখেছি। তবে স্পষ্ট নয়।" কিকিরা বললেন, "ওখানকার মাটি শক্ত। ভিজে হলে দাগ ধরা যেত। কিন্তু... ! আচ্ছা চামেলিবাবু, আপনার কি মনে হয় লোকটিকে আচমকা কেউ বা কারা অ্যাটাক করেছিল ?"

"আমার তাই ধারণা। ... আর এটাও মনে হয় আমার, লোকটার সঙ্গে হাতাহাতিও হয়েছিল। ও যা লোক, কোমরে ড্যাগারের খাপ, সে যে একেবারে ন্যাড়া হয়ে হাত-পা এলিয়ে দেবে তা আমার মনে হয় না। ফাইট একটা

হয়েছিল।”

কিকিরা কিছু বললেন না, চা খেতে খেতে মাথা নাড়লেন।

চামেলিবাবু চায়ের মগ নামিয়ে রেখে পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট দেশলাই বার করলেন। “কাল কী তিথি ছিল জানেন ?”

“অন্ধকার ছিল।”

“কৃষ্ণপক্ষ চতুর্দশী। আজ অমাবস্যা। ঘোর অন্ধকার ছিল কাল।”

“ওই অবস্থায় একটা লোক কেমন করে ঝিলের গায়ের আলপথ ধরে আসে, মশাই ?”

“টর্চ নিয়ে এসেছিল। দেখেছেন তো আপনি। শর্মা টর্চটা পেয়েছে কাছেই।”

“দেখেছি। বড় টর্চ। তিন সেলের।”

“তবে ?”

“কিন্তু টর্চটা ফাঁকা কেন ? সেলগুলো কোথায় গেল ! অবাক ব্যাপার নয় ?”

চামেলিবাবু মাথা নাড়লেন। তিনি কোনও জবাব দিতে পারলেন না। শেষে বললেন, “ব্যাটারিগুলো বার করে নিয়েছে।”

“কেন ? কে নিয়েছে ? কারা ?” কিকিরার চোখ হঠাৎ ঝকঝকে হয়ে উঠল। এই একটা কথা তিনি প্রথম থেকে ভাবছেন। তাঁর কাছে এটাই যেন সবচেয়ে অদ্ভুত মনে হচ্ছিল। গতকাল রাত্রে তারাপদ আর চন্দনের সঙ্গে অনেক গবেষণা করেছেন বিচিত্র এই কাণ্ডটা নিয়ে। এ টর্চ উইদাউট ব্যাটারি কেন ? চন্দনরা কোনও জবাব দিতে পারেনি। টর্চটা সত্যিই রহস্যের বস্তু। তা ছাড়া থানায় শর্মার কাছ থেকে টর্চটা চেয়ে নিয়েও দেখেছেন কিকিরা। মামুলি বাজারি টর্চ বলেই মনে হয়েছে। ভেতরে ফাঁকা।

দু’জনেই তখন চুপচাপ। হঠাৎ চোখে পড়ল, তারাপদরা আসছে। তারাপদ চন্দন খেপা যদু। যদুর হাতে বাজারের ব্যাগ।

“ওরা আসছে,” কিকিরা বললেন।

চামেলিবাবু বললেন, “তাবিজ লকেটটার কী হবে ?”

“শর্মার হাতে তুলে দেওয়াই উচিত।”

চামেলিবাবু ঘাড় নাড়লেন। “আমিও তাই ভাবছিলাম। যার যা কাজ ... !”

তারাপদরা কাছে চলে এসেছে।

খেপা যদুর হাতে বাজারের ব্যাগ। চন্দনের হাতেও একটা প্লাস্টিকের বাস্কেট।

ওরা কাছে এলে চামেলিবাবুর সঙ্গে আলাদা কথা হল দু’-চারটে।

বাজারের ব্যাগ তুলে নিয়ে যদু রান্নাঘরের দিকে চলে গেল।

তারাপদ সামান্য উত্তেজিত গলায় বলল কিকিরাকে, “একটা নিউজ আছে, সার ?”

"কী নিউজ ?"

চামেলিবাবুর দিকে তাকাল তারাপদ। "এখানে একটা ধর্মশালা আছে ?"

চামেলিবাবু যেন প্রথমটায় খেয়াল করতে পারেননি। পরে বললেন, "ধর্মশালা ! গিরিবাবার আখড়া। লোকে বলে বটে ধর্মশালা ! কেন ?"

"স্টেশন থেকে আধ মাইলটাক তফাতে। বিচলি গাঁওয়ের ..."

"ওটা ঠিক ধর্মশালা নয়," চামেলিবাবু বললেন, বলে হাত তুলে একটা দিক দেখালেন। "ওদিকে ছোট গাঁ আছে একটা, কয়েকটা মাত্র ঘর, লোকে বলে বিচলি গাঁও। ওপাশে ঝোপজঙ্গল শুরু হয়ে গিয়েছে। আমলকী গাছ আর মহুয়া ঝোপ। গিরিবাবা বলে এক সাধু ওখানে একসময়ে একটা চালা বেঁধেছিল। আশ্রম করেছিল। থাকত দু'-চারজন চেলাচামুণ্ডা। গিরিবাবা অনেকদিন হল গত হয়েছে। ওখানে লোকজন বিশেষ থাকে বলে শুনিনি। তবে কখনও কখনও এক-আধজন সাধুটাধু জুটে যায়। চলেও যায় দু'-চারদিন থাকার পর ...। তা সেখানে—"

"সেখান থেকেই একটা লোক উধাও হয়েছে," তারাপদ বলল।

"মানে ?" কিকিরা বললেন। "উধাও হয়েছে মানেটা কী ! ওটা কি বাসাবাড়ি, না হোটেল—যে একটা লোক আজ ছিল—কাল উধাও।"

চন্দন বুঝতে পারল, তারাপদ ব্যাপারটা ঠিক গুছিয়ে বলতে পারেনি। স্পষ্ট করে না বললে সত্যিই ধরা মুশকিল ঘটনাটা। চন্দন এবার বুঝিয়ে বলল ব্যাপারটা।

গিরিবাবার আশ্রমই হোক আর ধর্মশালাই হোক, যে দু'-তিন জন পড়ে আছে সেখানে, তারা সাদামাটা গেঁয়ো সাধু, নিজের মনে থাকে, কাজকর্ম সারে আশ্রমের, সকাল-সন্ধে ঘণ্টা বাজায় মন্দিরের, বাগান যেটুকু আছে দেখাশোনা করে। কোনও পথভোলা সাধুসন্ন্যাসী এখানে এসে পড়লে মাথা গোঁজার ঠাঁই পায়। নিজেই নিজের মতন করে দুটো রুটি-চাপাটি করে খেয়ে নাও, কুয়োর জল রয়েছে স্নান করো, ময়লা কাপড় কেচে নাও। শোওয়ার জন্য মাটি, দু'-চার আঁটি খড়ও জুটে যেতে পারে। তা গত দিন দুই আগে এক সাধুজি এসে হাজির, বেলার দিকে। বিকেলেও ছিল সে। সন্ধেবেলাতেও তাকে দেখা গিয়েছে। পরের দিন ভোর থেকে আর নয়। কিছু ফেলে যায়নি সে, নেহাতই একটা দেশলাইয়ের খাপ আর বিড়ির টুকরো ছাড়া। যাওয়ার আগে কাউকে কিছু বলে যায়নি, তাকে চলে যেতে দেখেওনি কেউ।

গতকাল থানার শর্মাজির লোক খোঁজাখুজি করে বেড়িয়েছে এখান-ওখান, ডেকে এনেছে অনেককেই থানায়, কেউ যদি কোনও হদিস দিতে পারে মৃত মানুষটির। পারেনি কেউ। আজই সকালে প্রথমে জানা গেল গিরিবাবার ধর্মশালার কথা। খবরটা রটে যাওয়ার জন্যই হোক কিংবা পুলিশের পোষা এই ইন্‌ফরমারের মুখে শর্মাজি ধর্মশালার কথা শুনলেন। শুনেই ছুটেছিলেন নিজে

ধর্মশালায়। খোঁজ নিলেন। কথাটা ঠিকই। এসেছিল একজন সামান্য বেলার দিকে। সারাদিন ছিল, তারপর রাত্রে সে উধাও।...

কিকিরা বললেন, "সেই সাধুই যে ওই ভদ্রলোক, তার প্রমাণ কী?"

"এমনিতে কোনও প্রমাণ নেই। ডেডবডি বিকেলে সদরে চালান হয়ে গিয়েছে। ধর্মশালার লোক এসে আইডেন্টিফাই করবে তার উপায় নেই।"

"তবে?"

"শর্মাজি রেলস্টেশনের টিকিট কালেক্টারের কাছে খোঁজ করে জেনেছেন—এক সাধু বাস্তবিকই এসেছিল। তার কাছ থেকে টিকিটও কালেক্ট করেছেন টি.সি। গুপ্তা বলে একজন তখন ডিউটিতে ছিলেন। তিনি বলেছেন, সাধুর মুখ তিনি দেখেছেন। দাড়ি ছিল, মাথা ভরতি রুক্ষ চুল। ঘাড় পর্যন্ত। গায়ে গেরুয়া আলখাল্লা। কাঁধে এক ঝোলা।"

চামেলিবাবু বললেন, "দাড়িঅলা গেরুয়া আলখাল্লা পরা এক সাধু আর ওই লোকটা—যে মারা গিয়েছে—দু'জনে এক হয় কেমন করে?"

তারাপদ বলল, "ব্যাপারটা এখানেই মিলছে না। গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।"

"শর্মাজির সঙ্গে তোমাদের দেখা হয়েছে বুঝি?" কিকিরা জানতে চাইলেন।

"খানিকটা আগেই হয়েছে, বাজারে।" তারাপদ বলল, "তিনিই বললেন ব্যাপারটা।"

কিকিরা তখন আর কিছু বললেন না। না বলে চামেলিবাবুর দিকে তাকালেন।

চামেলিবাবু ইঙ্গিতটা বুঝলেন। বুঝে রুপোর তাবিজ বা লকেটটা দেখালেন তারাপদদের। "এটাও আজ সকালে আমি পেয়েছি। ঘটনাটা যেখানে ঘটেছে তার কাছাকাছি এক ঝোপের কাছে।"

॥ ৫ ॥

দুটো দিন কাটল।

সদর থেকে কোনও খবর এসে পৌঁছল না। না আসাই স্বাভাবিক। বড়-বড় শহরে, যেখানে হাসপাতাল মর্গ পোস্টমর্টেম করার সব ব্যবস্থাই আছে—সেখানেও রাতারাতি কিছু হয় না। যথেষ্ট কাঠখড় পোড়ালেও অন্তত দুটো দিন তো কিছুই নয়, রিপোর্ট পেতে চার-পাঁচদিনও লেগে যায়। আর এ তো নেহাতই এই ছোট মফস্বল আধা-শহর, এখানে একটা বেওয়ারিশ লাশ পাওয়া গেলে তার বৃত্তান্ত জানতে সময় তো লাগবেই।

শর্মাজির দোষ নেই। তিনি আর কী করবেন!

সেদিন তারাপদ কিকিরাকে বলল, "সার, কলকাতা হলে..."

চন্দন বিরক্ত হল। বলল, "বাজে বকিস না। কলকাতা হলে রাতারাতি সব

হয়ে যায়, তোর ধারণা। কলকাতায় থাকিস, কাগজ পড়িস না! লাশ খোঁজ করতেই ক'দিন যায় দেখিসনি! একটা চুরি ডাকাতি, দিনের আলোয় মার্ডার—এসব নিত্যকার জিনিস ধরতে মাস কাবার হয়ে যায়—যায় না?"

তারাপদ হাসল। "খেপে যাস না! এমনি বলছিলাম... !"

চন্দন নীলচে রঙের পুলওভারটা গায়ে গলিয়ে নিল। এখন সন্ধে। আজ তারা চামেলিবাবুর বাড়িতে রাত্রে খেতে যাবে। গতকাল হয়ে ওঠেনি। অসুবিধে ছিল চামেলিবাবুর। দিন পালটে নিয়েছিলেন।

কিকিরার শরীর এখন ভাল। গোড়ার দিকে ঝপ করে নতুন জল-হাওয়ায় যে সর্দিজ্বর মতন হয়েছিল, চন্দনের ডাক্তারিতে তা সেরে গিয়েছে। তবু কিকিরা সাবধানী। জোব্বা চাপিয়েছেন গায়ে, গলায় মাফলার, মাথায় কাশ্মীরি টুপি।

যাদবচন্দ্র কাজ সেরে চলে গিয়েছে বিকেলের শেষে।

তারাপদও তৈরি।

"তাহলে চলো, বেরনো যাক," কিকিরা বললেন।

"চলুন।"

"ঘরে তালাটালা দিয়ে নাও। একটা লণ্ঠন জ্বলুক। যাওয়ার সময় ওই বিরজুমিস্ত্রিকে বলে যাবে, একটু যেন নজর রাখে এ দিকে।"

সামান্য পরেই তিনজনে বেরিয়ে পড়ল।

তারাপদ আর কিকিরার হাতে টর্চ। চন্দন আর অনর্থক আলো নেয়নি।

কৃষ্ণপক্ষ শেষ হয়ে শুক্লপক্ষ পড়েছে। আকাশ ভরতি তারা। চাঁদের আলো যেটুকু ফুটেছিল সন্ধের আগে, এখন আর চোখে পড়ে না। শীত এসে গেল।

টর্চের আলোয় পথ দেখে এগোতে এগোতে কিকিরা বললেন, "দেখো চাঁদু, আমরা এখানে এসেছি বেড়াতে। লিভার-টনিক, মানে এখানকার জল দু'-চার গ্লাস খাচ্ছি রোজ, হাঁটছি দু'বেলা অল্পবিস্তর। নট ব্যাড। তা বলে এখানে কোনও খুনখারাপি হলে ওটা আমাদের জানার কথা নয়। চোরছ্যাঁচড়, ধান্দাবাজ, চিট, নচ্ছার লোকজনকে পাকড়াও করার বেশি মুরোদ আমাদের নেই। বৃথা গোঁফ ফুলিয়ে লাভ কী! এই যে একটা লোক হুট করে মারা গেল। বা তাকে মারা হল—আমরা ও নিয়ে মাথা ঘামাতে গেলে ব্রেন শুকিয়ে যাবে। খুনটুন আমাদের ধাতে পোষায় না। এসব পুলিশের কাজ। নয় কী!"

চন্দন কিছু বলার আগেই তারাপদ খোঁচা মেরেই যেন বলল, "মাথা আর কে ঘামাচ্ছে! আপনিই বরং রোজ দাবার চাল দেওয়ার মতন মুখ করে ব্যাপারটা নিয়ে..."

"আবার ব্যাপার! তোমার সব কিছুতেই ব্যাপার!"

"আপনি মাথা ঘামাচ্ছেন না ?"

"না। যাকে মাথা ঘামানো বলে—তেমন করে মাথা ঘামাইনি তারাবাবু ! কেননা আমার মাথায় এসব ঢোকে না। ...তবে— !"

"কী তবে ?"

"আমার কাছে অবাক অবাক লাগে ! ভেরি স্ট্রেঞ্জ ! অনর্থক একটা খুন হবে কেন ?"

"কেন ?"

"কেন !" কিকিরা ধীরে ধীরে বললেন, খানিকটা অ-গোছালো গলায়, "একে একে বলি তাহলে ! ...প্রথমে আমার কেমন এক ধোঁকা লাগে যখন ভাবি, হরবখত যেসব জায়গায় খুনটুন হয়, মানে ক্রাইম জিনিসটা ডালভাত হয়ে গিয়েছে যেখানে—সেখানে এসব জিনিস মানিয়ে যায়। এখানে মানায় না। শান্ত সুন্দর একটা নিঝুম জায়গা হাবিলগঞ্জ। ক্রিমিন্যালদের আস্তানা এটা নয়। এখানে বড়জোর দু'-একটা গাঁইয়া লাঠালাঠি হতে পারে। সেটা মানায়। খুন এখানে মানায় না। অবশ্য যদি এই ঘটনাটাকে মার্ডার কেস হিসেবে ধরা হয়। অ্যাকসিডেন্ট কেস হলে বলার কিছু নেই ! কি চাঁদু, আমি রাইট কি না ! অ্যাম আই রাইট সার ?"

চন্দন মাথা নেড়ে সায় দিল।

কিকিরা বললেন, "আমার হিসেব ধরলে বলতে হবে, এখানে যা ঘটেছে তার পেছনে একটা অঙ্ক আছে। মানে কোনওরকম প্ল্যান। পরিকল্পনা।"

"কেমন প্ল্যান ?" তারাপদ বলল।

"সঠিক বলা মুশকিল। মনে হয়, দুটো পার্টিই এখানে হাজির হয়েছিল। একটা পার্টি কোনও মতলব নিয়ে এসেছিল, আর-একটা পার্টি হাজির হয়েছিল—কী বলব বুঝতে পারছি না, বোধ হয় কোনও লেনদেন মিটিয়ে ফেলতে !"

চন্দন মাথা নেড়ে বলল, "তা নাও হতে পারে। ধরুন, একজন ক্রিমিন্যাল অন্য এক ক্রিমিন্যালকে ফলো করে এখানে এসেছিল। উদ্দেশ্য একটাই। হয় এ ওকে মারবে, না হয় ও একে মারবে।"

হাঁটতে হাঁটতে আলপথের কাছে এসে পড়ল তিনজনে। টর্চ জ্বলছে। এই পথ ধরে ঝিল পেরোলেই মেঠো পথ। তারপরই চামেলিবাবুর বাগান।

চাঁদের আলোর অতি অস্পষ্ট আভাটুকুও আর নেই। তারার আলোয় অন্ধকার ঝিল যেন ঘুমিয়ে আছে। ঘটনা ঘটার পরের দিন থেকেই ঝিলটা যেন লোকের দেখার বস্তু হয়ে উঠেছে। লোকে আসে যায়, আর তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখে।

কিকিরা বললেন, "তা বলতে পারো। ...দুই রথীর লড়াই।"

"রথী বলবেন না সার," তারাপদ বলল, "দুই ক্রিমিন্যালের লড়াই।"

"যাক গে," কিকিরা বললেন, "লড়াইটা তো এখানে অন্য কোথাও হতে পারত। এমন ফাঁকা জায়গা, বিস্তর মাঠঘাট, চাই কী ঝোপজঙ্গলও কম নেই। এত ফাঁকা জায়গা থাকতে ওরা এই ঝিলের ধারে কেন ?"

"আপনিই বলুন !"

"আমি একটা কথাই বলব। আগেই বলেছি। চামেলিবাবুর বাগান থেকে আমাদের বাড়ির দিকে যাওয়ার এটাই একমাত্র শর্টকাট রাস্তা।"

"কিন্তু আমরা তো কোনও পক্ষ নই এখানে।"

"আমরা নই। কিন্তু এক পক্ষ নিশ্চয়ই এদিকে থাকে, চামেলিবাবুর বাগানের দিকে ?"

"সে কে ?"

"খোঁজ করছি। ভাবছি। ...আমি একটু-আধটু আলাপ জমাবার চেষ্টা করি সকলের সঙ্গে।"

"চামেলিবাবুকে কেমন মনে হয় ?"

"সন্দেহ করতে পারো। তবে কারণ খুঁজে পাচ্ছি না।"

"শীতলবাবু ?"

"না। বেচারি বুড়ো মানুষ। নিরীহ। হোমিওপ্যাথি প্লাস কবিরাজি করেন। ওঁকে বাদ দাও।"

"কচি, মানে কাঞ্চন ?"

"সন্দেহ করতে পারো। কিন্তু কচির কী স্বার্থ ?"

"তা ছাড়া সেদিন তো সে রাত্রে এখানে ছিল না।"

"এটা কোনও প্রমাণ নয়। ধোপে না টিকতে পারে। ইচ্ছে করলে, আমরা সবাই একটা চাতুরি বা ছল করতে পারি। থেকেও থাকি না, না থেকেও থাকি। বুদ্ধিমান ক্রিমিন্যালরা খুব ভাল অ্যালিবাই বানাতে পারে। যাক গে কচিকে আমি বাদ দিতে পারি। ওর কোনও স্বার্থ দেখতে পাচ্ছি না।"

আলপথের মাঝামাঝি এসে দাঁড়ালেন কিকিরা। টর্চের আলো ফেলে ঝিলটা দেখলেন।

শীতের বাতাস এল মাঠ থেকে। ঝিলের জোলো ঠাণ্ডাও এখানে।

চন্দন পা বাড়াল। "আর কে থাকল তাহলে ?"

তারাপদ বলল, "মাখনলাল দত্ত, কলকাতার এক ছাপাখানার ম্যানেজার। স্ত্রী আর ছেলে নিয়ে এসেছেন। ছেলেটা ছোট। বছর বারো বয়েস।"

চন্দন বলল, "বাজারে দেখেছি। আলাপও হয়েছে। বয়েস চল্লিশ-বিয়াল্লিশ হবে। হাঁপানির রোগী। সাধারণ ভদ্রলোক। মনে হয়, কলকাতার পৈতৃক বাড়িটাই ওঁর সম্পদ। প্রেস-ম্যানেজারি করে যা পান সেটা বোধ হয় বিরাট কিছু নয়।"

তারাপদ বলল, "ওঁকে বাদ দেওয়া যায়।"

কিকিরা আপত্তি করলেন না।

"ওই ছেলে দুটো সম্পর্কে সার কী বলেন ?" চন্দন বলল।

কিকিরা বললেন, "ওই পল্লব মুখার্জি আর লাডলি—"

"লাডলি হকি প্লেয়ার ছিল।"

"আলাপ হয়েছে ?"

"না।"

"আপাতত সন্দেহ যাচ্ছে না।"

"ওদের মোটরসাইকেল তো থানায় আটক পড়েছে সার। আপনি শর্মাজিকে নজর রাখতে বললেন। আর শর্মা একটা ছুতো করে বাইক আটক করে রাখলেন।"

কিকিরা মুচকি হাসলেন, "কার গোরুর গাড়িতে ধাক্কা মেরে একটা গোরুর পা জখম করে দিয়েছে ওরা..."

"পুলিশ সবই পারে।"

"ছোকরা দুটো সুবিধের হলে ভাল !" কিকিরা বললেন, "শর্মা ওদের একটু বাজিয়ে দেখতে চায়।" আলপথের প্রায় শেষে এসে পড়েছেন কিকিরারা। সামনের মেঠো রাস্তার গা ঘেঁষেই এদিক-ওদিক ছড়ানো গোটা পাঁচেক বাড়ি। শীতলবাবু, চিনুরা থাকে একপাশে। অন্য দিকে চামেলিবাবুর ভাড়া-দেওয়া তিন বাড়িতে তিন ভাড়াটে। লণ্ঠনের সামান্য আলো দেখা যাচ্ছিল বাড়িগুলোতে। কিকিরা বললেন, "শর্মা কি তোমাদের বলেনি ?"

"কী বলবেন ?"

"ছোকরা দু'জন সম্পর্কে খোঁজ করতে লোক পাঠিয়েছে ওদের ঠিকানায়। ওরা জেনুইন, না, জাল ?"

"মানে ?"

"মোটরবাইকটার রেজিস্ট্রেশন নাম্বার গোলমেলে। অন্য স্টেটের।"

চন্দন অবাক হল। খেয়াল করেনি অতটা। মোটরবাইকটা দেখেছে। বাজারেই দেখেছিল একদিন। কে আর খেয়াল করে বাইকের নম্বর দেখবে !

তারাপদ বলল, "সার, এ তো দেখছি—জট পাকিয়েই যাচ্ছে পর পর। তা ওই আরেক জন—ওঁর সম্পর্কে— ?"

"কে ? পাঁজামশাই ! গণপতি পাঁজা !"

"হ্যাঁ, পেটের রোগী ? আলসার পেশেন্ট ! থিয়েটার যাত্রার ড্রেস ডিজাইনার অ্যান্ড মেকার। চিৎপুরে দোকান ! আমি তো ভদ্রলোককে একদিনই দেখেছি। আপনি দেখেছেন ?"

"দেখেছি। ...আমার বাপু একটু ঘোরাফেরা স্বভাব। তোমরা যাও সকালে বাজারে বেড়াতে—আমি আমাদের বড় রাস্তা ধরে খানিকটা ওয়াকিং করি।"

"আসলে আপনি ঝিলের গা বরাবর বড় রাস্তাটা ধরে হাঁটেন," তারাপদ ঠাট্টা

করে বলল, "চোরের মন বোঁচকার দিকে।"

কিকিরা মুচকি হাসলেন। দেখা গেল না। টর্চের আলো পায়ের সামনে দোলাতে দোলাতে কিকিরা বললেন, "গতকালই পাঁজামশাইয়ের সঙ্গে খানিক আলাপ করলাম রাস্তার মধ্যে। আগেও মুখ-চেনা করেছি।"

"খেজুরে আলাপ ?"

"বলতে পারো। আমি একসময় একটু-আধটু যেতাম ওদিকে। চিৎপুর পাড়ায় রাজুবাবু বলে আমার এক দোস্ত ছিল। তার হাতে দরজি ছিল ভাল ভাল। ম্যাজিশিয়ানরা এক-একজন সাজপোশাকের দিকে খুব নজর দেয়। রাজাগজা সাজে, আরব্য উপন্যাসের শাহাজাদা সাজে, কেউ-বা দেখবে সাজ পালটে চিনে চুং ফুং সাজে। এগুলো খেলা দেখাবার অঙ্গ। সাজের বাহার আলাদা একটা এফেক্ট তৈরি করে, ইলিউশন। কাজেও লাগে। সাজের কেরামতিতেও ম্যাজিক হয়। ...তা পাঁজাবাবুর সঙ্গে খেজুরে গপ্প করতে করতে আমার মনে হল, দশ আঙুলে ছ'-ছ'টা আংটি পরে যে-লোক তার দৈব-ব্যাপারে যথেষ্ট বিশ্বাস আছে।"

"উনি কোনও দৈববাণী করলেন নাকি ? মানে বাড়ির সামনে ঝিলে অমন একটা ঘটনা ঘটে গেল..." চন্দন বলল।

"না। ও রাস্তায় হাঁটতেই চাইলেন না।"

"কেন ?"

"তা বলতে পারব না। তবে চাঁদু, ভদ্রলোককে আমার ভাল লাগেনি।"

"কী জন্যে ?"

"কী জন্যে ! ...দেখো, এক-একজন লোক থাকে যাদের দেখলেই তোমার কেমন খারাপ লাগে। চেহারার জন্যে নয়, তাদের মধ্যে এমন কিছু থাকে যা তোমাকে রিজেক্ট করবে, আসলে তুমি তার কাছে ঘেঁষতে চাইবে না।"

তারাপদ বলল, "ক্রিমিন্যাল টাইপের মনে হয় ?"

কিকিরা একটু ভেবে বললেন, "কোথায় যেন একরকম রোখ আর ধুরন্ধর ভাব আছে।"

"তাহলে গণপতি পাঁজাকে আপনি সন্দেহ করেন ?"

"না করে পারছি না।"

"কিন্তু পাঁজাবাবু বয়স্ক লোক। আধ-বুড়ো। তিনি কী করে অমন জোয়ান গোছের লোককে খুন করবেন ?"

"ঠিক কথা। কেমন করে ? আর কেনই বা ?" কিকিরা বললেন, "আমি তোমাদের মতন ওই কথাগুলো ভেবেছি। ভেবে কোনও উত্তর পাইনি। তবে নিজের হাতে খুন না করেও খুন করানো যায়। খুনে গুণ্ডার কি অভাব আজকাল ! টাকা দিলেই তোমার কাজ করে দেবে। তা ছাড়া পাঁজাবাবুর হাতেই তো তাঁর মহাভৈরব আছে। লোকটা দৈত্যবিশেষ।"

তারাপদ চন্দনের দিকে তাকাল। অন্ধকারে মুখ দেখতে পেল না। উপরন্তু একটা হোঁচট খেল।

চামেলিবাবুর বাড়ির কাছে এসে পড়েছিল তারা।

ডাইনে ঘুরে বসত বাড়ির ফটক। ফটক খুলে এগিয়ে যেতে যেতে চন্দন বলল, "ভেতরে গলা পাওয়া যাচ্ছে যেন !"

কিকিরা কান পেতে শুনলেন। তারপর বললেন, "চামেলিবাবু রেডিয়ো শুনছেন ! ট্রানজিস্টার।"

॥ ৬ ॥

নিজেরই গরজ ছিল শর্মাজির। নয়তো আরও কত দেরি হত কে জানে ! মফস্বলের এইসব অঞ্চলে কে কার কড়ি ধারে ! বড় কিছু না ঘটলে মাথা ঘামায় না কেউ। দিন ছয়-সাতের মাথায় জানা গেল, পোস্টমর্টেম রিপোর্ট বলছে, ঘটনাটা স্বাভাবিক নয়, পড়ে গিয়ে মাথায় মারাত্মক চোট পেয়ে লোকটি মারা যায়নি। তাকে আহত বা আঘাত করা হয়েছে মাথার পেছন দিকে। অর্থাৎ কোনও ভারী শক্ত জিনিস দিয়ে কেউ লোকটির মাথার পেছনে মেরেছিল। গুরুতর আঘাত অবশ্যই। উদ্দেশ্য সম্ভবত স্পষ্ট, লোকটিকে হত্যা করা।

থানায় বসে কথা হচ্ছিল।

শর্মা বললেন, "এ কেস অব মার্ডার।"

চন্দন, তারাপদ বা কিকিরা—কেউই আর অবাক হলেন না। একেবারে গোড়ায় যদি-বা একটু সন্দেহ কিংবা দ্বিধা থেকে থাকে—পরে যত দিন গিয়েছে তাদের আর দ্বিধা ছিল না। তবু, যতক্ষণ না কাগজে-কলমে বলা হয়, ওটা দুর্ঘটনা নয়—হত্যাই—ততক্ষণ জোর করে বলা যাবে না একটা কথাও, আইনত।

"লোকটি কে—তা কিন্তু জানা গেল না," কিকিরা বললেন।

"না। আইডেন্টিফিকেশন হল না। চেষ্টা করেছিলাম রায়সাহেব, সাকসেসফুল হলাম না। লাশ একেবারে পচে গিয়েছিল। সদরে মর্গের নামে যে বাড়িটা পড়ে আছে সেখানে কুত্তা পর্যন্ত ঢুকতে চায় না। সো হরিব্‌ল কন্ডিশন। আমি গিরিবাবার ধরমশালার মুটিয়াকে নিজে টাকাপয়সা দিয়ে থানার লোক সঙ্গে দিয়ে সদরে পাঠালাম। ওই যে সাধুজি ভেগে পড়ল ওহি লোক আর ওই আদমি আগর একই হয় ! তো মুটিয়া মর্গে গেল না। পালিয়ে এল। ভয়ে। বিমারি হয়ে গেল ব্যাটার।"

"লাশের কী হল ?"

"যা হয় !"

কিকিরা অনুমান করে নিলেন, বেওয়ারিশ লাশ পুড়িয়ে ফেলেছে ওরা।

কথাবার্তা শেষ হওয়ার পর কিকিরারা উঠে পড়ছিলেন, শর্মাজি বললেন, তিনি পুলিশের ক' বছরের চাকরিতে মারদাঙ্গা, গোলমাল এমনকি ছোটখাটো লুটের কেসও ঘেঁটেছেন, খুনখারাপির ঘটনা নিয়ে তাঁকে মাথা ঘামাতে হয়নি। এই প্রথম। "এক্সপিরিয়ান্স ছিল না রায়সাহাব, ডিফিট খেয়ে গেলাম। কিন্তু একটা কথা জানবেন, অফিশিয়ালি এই কেসটায় আমি মার খেয়ে গেলেও আনঅফিশিয়ালি আমি ব্যাক আউট করছি না।"

কিকিরা উঠে পড়লেন। বললেন, "ঠিক কথা, শর্মাজি। আপনি নিশ্চয় চেষ্টা করবেন দোষীকে খুঁজে বার করতে।" বলে দু' পা এগিয়েই হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লেন, "একটা কথা জিজ্ঞেস করব ?"

"জরুর।"

"আপনি যে টর্চটা সেদিন কুড়িয়ে এনেছিলেন স্পট থেকে—সেটা কোথায় ?"

"আমার কাছে। টর্চ, চাদ্দর, চামেলিবাবুর দেওয়া চেন তাবিজ..." বলে ইশারায় নিজের ঘরের আলমারি দেখালেন। "আন্ডার লক অ্যান্ড কী। প্যাকেট করে রাখা আছে। সিল করে।"

"টর্চটা আপনার হাতে প্রথম এসেছিল। আপনি ভাল করে দেখেছিলেন সার, ভেতরে কোনও কিছুই ছিল না ! একেবারে খালি ?"

"বিলকুল।...আপনিও তো দেখেছেন ?"

"টর্চটায়—মানে টর্চের মুখে তখন বালব ছিল ?"

"বালব আছে।"

"অবাক ব্যাপার ! কিছু বোঝা যায় না। ...চলি শর্মাজি।"

থানা থেকে বেরিয়ে কিকিরা বাজারের দিকেই হাঁটতে লাগলেন। বাজার বলতে যা বোঝায় সাধারণত তার সঙ্গে মিল নেই। মেঠো জমি, গাছ, ঢিবি, আশেপাশে কয়েকটা দোকান, মাঝখানে রেল স্টেশনের রাস্তা। রাস্তা ধরে এগিয়ে গেলে দু'পাশে পাকা আধপাকা এমনকি নিছক খাপরার চালার তলায় ছোটখাটো দোকান। মুদিখানা থেকে আয়ুর্বেদ ওষুধের দোকান, মনিহারি থেকে পান সিগারেট—সবই। রাস্তার পাশে বাজারও বসে শাকসবজির। চার-ছয় দোকানি। এখানে হাট বসে রবিবার, সেদিন হাটতলায় বিস্তর দোকানি এসেছে।

কিকিরারা হাঁটতে হাঁটতে কচি—মানে কাঞ্চনের দোকান পর্যন্ত এসে পড়লেন। দোকান খুলেছে কচি। বোধ হয় খানিকটা আগে। দু'-তিনজন খদ্দের দাঁড়িয়ে।

কী মনে করে কিকিরা কচির দোকানের দিকে পা বাড়ালেন।

কচি একটা ছেলেকে চায়ের পাতা দিল ওজন করে। অন্যজন কাপড়কাচা সাবানের টিকিয়া নেবে। দামদস্তুর করে না কচি। তবু পাঁচিশ পয়সা বেশি

নিল। দাম নাকি বেড়ে গিয়েছে। তৃতীয় খদ্দেরের সঙ্গে বচসা বেধে গেল কচির। ছেঁড়াফাটা একটা প্যাকেট গছাবার চেষ্টা করছে কচি, মেয়েটা নেবে না। কচি প্রথমে তাকে বোঝাতে চাইল, অবশ্য মেজাজি গলায়, মেয়েটা শুনবে না। কচি তখন হাঁকিয়ে দিল। "ভাগ। অন্য কোথাও যা। সাত সকালে ধারে মাল কিনবি—তার আবার ছেঁড়াফাটা। যা যা, তোর মালকিনকে বলবি, আমার এখানে এইরকম মালই পাওয়া যায়।"

মেয়েটা বোধ হয় কাছের কোনও বাড়িতে কাজ করে। রুক্ষ চুল, ময়লা এক কাপড় পরনে, ওপরে ছেঁড়া সুতির চাদর। খালি পা।

কিকিরারা দোকানে এসে দাঁড়ালেন।

কচি তাকাল। চেনাজানা হয়েছে কিকিরাদের সঙ্গে। তবে ওই মুখচেনা গোছের। অল্প আলাপ।

কচি হাসল না। মেয়েটাকে ভাগিয়ে দিয়ে তার মেজাজ খারাপ হয়ে গিয়েছে।

"কী হল ?" কিকিরা বললেন হাসিমুখেই।

"কিছু নয়। ...আরে, আমি কি নিজে এখানে প্যাকিং করি। মাল আনতে গিয়ে একটু ছিঁড়েফেটে যেতেই পারে। তার আমি কী করব !"

"তা ঠিক। সবাই কি বোঝে ?"

"মেয়েটা পাজি। বাড়িতে নিয়ে গেলে ওর মনিব—মালকিন বুঝত। নন্দীদার বউ আমায় বিলক্ষণ চেনে। জানে, আমি ভেজাল কারবার করি না। মেয়েটা পাজি। এখান থেকে নিল না, বলরামের দোকান থেকে নিয়ে যাবে। ওখানে খুচরো এটা-ওটা পায় যে ! টিপ, সেফটিপিন, চিনির ডেলা লজেন্স..." বলতে বলতে কচি তার ক্যাশের ডালা খুলে খুচরো কিছু গুনে নিল। নিয়ে চন্দনের দিকে বাড়িয়ে দিল। "আপনার কালকের ব্যালান্স। সত্তর পয়সা। তখন দিতে পারিনি।"

কিকিরা হাসিমুখে বললেন, "ব্যবসা চালাতে গেলে ওরকম কিছু গুঁজতে হয়। আপনিও..."

"থাক মশাই, আমাকে আর গুঁজতে বলবেন না—" কচি বিরক্ত হয়ে বলল, "এই ছোট্ট দোকানটা টিকিয়ে রাখতে গিয়ে আমার আট-দশ হাজার টাকা গলে গেছে। ক্রেডিট ! ধার। ধারে মাল দিয়েছি, উসুল করতে পারি না। এর কাছে একশো ওর কাছে দেড়শো—এই করে লাস্ট পাঁচ বছরে হাজার সাত-আট। জোর করে আদায় করতে গেলে খদ্দের পালাবে। কাজেই টাকাটা গুরুর নামে লিখে ফেলে রেখেছি। ছিপ জানেন তো ! ব্যবসার ছিপ ফেললে বঁড়শি অনেকটা টেনে নেয় জলে। মানে জলে পড়ে অনেক টাকা। খাতায় খরচ জলে লেখাই থেকে গেল !"

তারাপদ, চন্দন হেসে ফেলল।

কিকিরাও হাসলেন, "ব্যবসা বড় ঝকমারির কাজ। তবু ভাল। স্বাধীন বৃত্তি। ...ভাল কথা, খবরটা শুনেছেন ?"

"কীসের খবর ?"

"ঝিলে যে লোকটিকে পাওয়া গিয়েছিল—অ্যাকসিডেন্টে সে মারা যায়নি, তাকে খুন করা হয়েছে।"

কচির মুখ দেখে মনে হল, খবরটা শুনে সে আকাশ থেকে পড়ল না। অপ্রত্যাশিত খবর এটা নয়, কেননা আজ ক'দিন ধরেই ঘটনাটির আলোচনা উঠলেই এই শহরের প্রায় সবাই মোটামুটি এইরকমই অনুমান করছিল।

"কোথায় শুনলেন ?"

"থানায়। রিপোর্ট এসেছে। মার্ডার কেস।"

কচি অল্পসময় চুপ করে থেকে বলল, "আমাদের এখানে এমন কাণ্ড কখনও হয়নি। কেউ শোনেনি। অনেককাল আগে একবার ট্রেন অ্যাকসিডেন্টে ক'জন মারা গিয়েছিল বলে জানি। দিস ইজ ফার্স্ট টাইম একটা মার্ডার হল। ...ইস, এমন পিসফুল ছোট্ট একটা জায়গায় খুন। ভাবাই যায় না।"

কিকিরা মাথা নাড়লেন। "সত্যি ভাবা যায় না।"

কচিরই যেন অনুশোচনা হচ্ছে। বলল, "আমরা এত কাছে থাকি, ঝিলের গায়ে, কিছুই জানতে পারলাম না।...জানেন, আমি সাত তাড়াতাড়ি ঘুমোই না। রাত্রে খাওয়াদাওয়া সেরে ঘণ্টাখানেক রেওয়াজ করি। সারাদিন সময় পাই না। রাত্রে রেওয়াজ করা আমার অভ্যেস। সেতারটা নিয়ে বসি। মাঝেসাঝে বাদ যায়। তা আমি যে-ঘরে থাকি তার দক্ষিণের জানলা খুললে ঝিলটা দেখা যায়। এখন শীত পড়ছে। অন্য জানলা বন্ধ থাকলেও দক্ষিণেরটা খোলা থাকে। ঘরের পাশে অমন একটা খুন হয়ে গেল জানতে পারলাম না। সাড়াশব্দ চিৎকার কিছুই শুনলাম না—আশ্চর্য !"

কিকিরা একটু হাসলেন, দুঃখ জানিয়েই বোধ হয় বললেন, "আপনি তো ছিলেন না সেদিন।"

খেয়াল হল কচির। বলল, "তাই তো, আমি তো ছিলামই না।" বলেই একটু অন্যমনস্ক হল। পরে নিজেই বলল, "জানেন আমার মায়ের ঘুম পাতলা। মা বলছিল—সেদিন কেমন একটা ডাক শুনেছে। টিটিয়া পাখির ডাক যেন।"

তারাপদ আর চন্দন নিজেদের মধ্যে কথা বলছিল। লোক দেখছিল রাস্তায়। একটা বড় চৌকোনো বাক্সকে চাকা লাগিয়ে ঠেলার মতন করে, ঠেলাগাড়ি বানিয়ে এক কুমোর রাজ্যের হাঁড়ি কলসি মালসা সাজিয়ে মাঠে নেমে গেল।

কিকিরা কথা বলতে বলতে দু'-চারটে জিনিস কিনে নিলেন কচির দোকান থেকে। টাকাপয়সা মেটালেন। "আচ্ছা কচিবাবু, এখনও আপনি রেওয়াজ

করছেন তো ?”

“হ্যাঁ। কেন ?”

“আপনার নজরে আর কি কিছু পড়েছে, পরে ?”

ভাবল কচি। মাথা নাড়ল। বলল, “না। মানে আমি তো সেভাবে নজর করে বসে থাকি না। কেন বলুন তো ?”

“এমনি বললাম।”

“আপনি...আপনার কি মনে হয়...না। থাক গে ! আচ্ছা দাদা, আপনি কী ? মানে কী করেন ?”

“আমি !” হাসলেন কিকিরা। তারাপদদের দেখালেন, বললেন, “ওরা সব কাজকর্ম করে। ওর চাকরি, এর ডাক্তারি। আমি বেকার। বসে বসে দিন কাটাই। ...ভাল কথা, আমার টাকাটা দিয়েছি না ?”

“দিয়েছেন।”

“তাস আছে আপনার দোকানে ?”

“তাস ?” কচি দোকানের চারপাশে তাকাল। “তাসের প্যাকেট ছিল। সিজনে মাঝে মাঝে বাবুরা চায়। এখন কোথায় রেখেছি দেখতে হবে। পরে খুঁজে দেখব। কী করবেন তাস নিয়ে ? খেলবেন ?”

“পেশেন্স !” কিকিরা মজার মুখ করে হাসলেন। “আমি তাসের খেলাও দেখাতে পারি।”

“ও !”

“চলি !” বলে তারাপদদের ডাকলেন। “চলো হে।”

বিশ-পঁচিশ পা এগিয়ে এসে কিকিরা বললেন, “কচির ব্যাপারে আমার একটা ধাঁধা থেকে গেল ! ও সেদিন সত্যি কি এখানে ছিল না ?”

“ধাঁধার কী হয়েছে ? আপনি ওর বাড়িতে খোঁজ নিতে পারেন।”

“আমি ?”

“না হয় চামেলিবাবুকেই বলবেন। কিন্তু কেন সার ? কচি মামুলি ছেলে। ওকে এই মার্ডার কেসে টানছেন কেন ?”

“টানিনি। ওকে টানছি না। কিন্তু আমার মনে হয়, ওকে একটু ওয়াচফুল থাকতে বললে হত।...আচ্ছা, কচির মা কি সত্যিই সেদিন কোনও ডাক শুনেছিলেন !”

“কেন ?”

“কে-ন !...শুনলে বুঝতে হবে ওটা নিশাচরের ডাক। মিনিংফুল। ...তা থাক, আমার মন কী বলছে জানো তারাবাবু ! মন বলছে, খুনটা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু খুনের পর যে জাল গুটনো থাকে সেটা এখনও হয়নি। ...বরং আরও গুছিয়ে বললে বলতে হয়, খুন করার পাটটা মিটলেও পরের কাজটা মেটেনি। মিটলে চামেলিবাবু আমায় একটা জরুরি খবর দেওয়ার জন্যে পাঠাতেন না।”

তারাপদ আর চন্দন মুখ চাওয়াচাওয়ি করল।

কিকিরা পকেট থেকে একটুকরো কাগজ বার করে তারাপদদের দিলেন। বললেন, "ওঁর লোক সকালে এসে দিয়ে গিয়েছে। উনি নিজে বেরোতে পারেননি। হোঁচট খেয়ে বুড়ো আঙুল জখম।"

কাগজটা নিয়ে দেখল চন্দনরা।

চামেলিবাবু লিখেছেন : "আজ একবার অবশ্যই দেখা করবেন। নতুন খবর আছে। আমি নিজেই যেতাম। দরজার চৌকাঠে হোঁচট খেয়ে ডান পায়ের বুড়ো আঙুল ভেঙেছি বোধ হয়। ফুলে গিয়েছে খুব, নীল হয়ে কালসিটে পড়েছে। পায়ের পাতা ফেলতে পারছি না। আসবেন আপনারা। কথা আছে।"

চিঠির টুকরোটা ফেরত দিল চন্দন। কিকিরা রাস্তায় উঠলেন। আজ মাঠে একরাশ ফড়িং উড়ছে। বর্ষাকালের মতন। কাঁটাঝোপে বেগুনি রঙের ফুল ফুটে আছে।

তারাপদ বলল, "জরুরি কথাটা কী হতে পারে, সার ? আন্দাজ পাচ্ছেন ?"

"না, কী কথা আন্দাজ করতে পারছি না। তবে বুঝতে পারছি, এই ঘটনা নিয়েই কথা।"

"উনি কি শর্মার কাছে সদরের দফতর থেকে আসা রিপোর্টের কথা শুনেছেন ?"

"শুনতে পারেন। শর্মার কাছে খবর এসেছে কাল। চামেলিবাবুর সঙ্গে শর্মার যোগাযোগও আছে।"

"তাহলে কি এই খবরটাই উনি আমাদের শোনাতে চান ?"

"না বোধ হয়।"

চন্দন কী যেন ভাবতে ভাবতে বলল, "কিকিরা, আপনি যেন একটা আঁচ পাওয়ার অবস্থায় এসে পড়েছেন। কী ? গন্ধ পাচ্ছেন নাকি ?"

"না। এখনও অন্তত নয়। তা ছাড়া আমি তো আগেই বলেছি, খুনোখুনির কারবারে আমি নেই। আঁচ আমি বাস্তবিকই পাচ্ছি না। তবে একটা কথা আমি প্রায় জোর করেই বলতে পারি, মাখনবাবুর মতন মানুষদের সাধ্য নেই এমন ভয়ঙ্কর কাজ করার। কিন্তু এঁরা কেউ ঘুণাক্ষরেও সেদিন কিছু জানেননি, শোনেননি—ভাবতে আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। তবু না হয় তাঁরা কিছুই না জানলেন—তারপরও কি কিছুই ওঁদের নজরে পড়ল না আজ পর্যন্ত ! আমি তো আলাপ করে দেখলাম, ওঁরা একেবারে হাঁদাবোকার মতন ব্যবহার করেন।"

"ছেলে দুটো ? পল্লব আর হকি প্লেয়ার লাডলি ?"

"ঠাণ্ডা হয়ে আছে।...শর্মা ওদের এবার হয়তো ছেড়ে দেবে।"

তারাপদ বলল, "সার, ওদের ব্যাপারটা হল হিন্দি সিনেমার হিরো-মার্কা। নাচ-গান হুল্লোড়। আমার মনে হয় না, ভেতরে ওরা বদ। চামেলিবাবুকে

জ্বালাত হয়তো। সে মজা করেই। সিরিয়াসলি নয়।”

কিকিরা কিছুই বললেন না।

॥ ৭ ॥

চামেলিবাবুর বাগানের একটা প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এখানকার জমি এমনিতেই সমতল নয়, উঁচু নিচু, কোথাও চড়াই মতন, কোথাও ঢালু। চামেলিবাবুর বাগানের দিকটা ঢালু হতে হতে মাঠের সঙ্গে মিশে গিয়েছে, যত বড় বড় গাছপালা সবই যেন ধাপ ভেঙে ভেঙে মাটিতে নেমেছে—মানে মাঠের দিকে। ওঁর বসতবাড়ি একতলা হলেও সবচেয়ে উঁচু জায়গায়। জলবৃষ্টিতে বাড়ির আশেপাশে এককোঁটাও জল থাকে না, গড়িয়ে বাগানে নেমে যায়। গোয়ালঘর বসতবাড়ি থেকে বেশ খানিকটা তফাতে, খামারি ঘর চমৎকার। পুব দিকে, সেখানে খেতের ধান কলাই যা ওঠানো হয় জমা পড়ে। ধান ভাঙার কাজ হয় অন্যত্র, খামারি ঘরের গায়েই।

সন্ধে বলতে এখন ঘড়িতে ছটাও বাজে না, তার আগেই অন্ধকার। আজ অবশ্য অন্ধকার তেমন ঘন নয় এখনও। শুক্লপক্ষ। চাঁদ রয়েছে আকাশে। নবমী দশমী তিথি হবে।

চা খাওয়ার পাট চোকাবার আগেই চন্দনকে দিয়ে ডান পায়ের বুড়ো আঙুলটা দেখিয়ে নিয়েছেন চামেলিবাবু। না, ভাঙেনি। তবে জোর হোঁচট খেয়েছেন। গাঁটে লেগেছে। রক্ত জমে নীলচে আঙুল ফুলে আছে। একদিকে চুনহলুদ চলছে, অন্যদিকে শীতলবাবুর হোমিওপ্যাথি। ব্যথা কি তাতে তেমন কমে! তবে উনিশ বিশ।

চামেলিবাবু বললেন, “এবার কাজের কথা বলি। ...আমার এই বাড়ি থেকে ঝিলটা দেখা যায় জানেন তো রায়সাহেব।”

“জানি। দেখতেই পাওয়া যায়।”

“ভালই যায়। আমার বাড়িটা উঁচুতে। আর ওগুলো অনেক ঢালুতে।”

“বুঝেছি। ঝিলে...”

“শুনুন আগে সব।” চামেলিবাবু বললেন, “কাল পায়ের যন্ত্রণায় ঘুম আসছে না। একটু করে ঘুমোই, তন্দ্রার মতন হয়, আবার ঘুম ভেঙে যায়। ...তা তখন মাঝরাত হবে, আমার শোয়ার ঘরের পাশে বিজুয়া শোয়। বিজুয়াকে তো চেনেন। দেখছেন সবসময়। ও আমার হাতের লাঠি। আমার সব কাজ ও করে। বুড়োমানুষ, কখন কী হয়, বিজুয়া আজ ক'বছরই রাত্রে আমার পাশের লম্বা ঘরটায় শোয় রাত্রে। কাল আমি যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে বিছানায় উঠে বসেছি। একবার কলঘরে যাব। আমার সাড়া পেয়ে বিজুয়া এসে বলল, বাবু একবার বাইরে এসে দেখে যান ; ঝিলের ধারে ভুতুড়ে

আলো ঘুরে বেড়াচ্ছে।...বিজুয়াদের ভূতপ্রেতে বিশ্বাস থাকা অস্বাভাবিক নয়। ও ভয় পেয়েছিল বলে মনে হল। আমি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে বাইরে এসে দেখি, বিজুয়া ভুল বলেনি। একটা আলো, ঝিলের আলপথ ধরে ঘুরছে। ঘুরছে মানে, অনেকটা সেই আলেয়ার মতন এই একটা জায়গায় জ্বলল তা খানিক পরে নিভে গেল ; খানিকটা তফাতে আবার দেখি আলো। অদ্ভুত ব্যাপার, মশাই।"

কিকিরাও অবাক হচ্ছিলেন। চন্দন আর তারাপদ বলল, "আলেয়া ?"

"না," চামেলিবাবু মাথা নাড়লেন, "আলেয়ার আলো আমরা অনেক দেখেছি। আগেকার মাইনিং ফিল্ডে হরদম ওটা দেখা যেত। ওটা গ্যাসের ব্যাপার। ছেলেবেলায় আমরা বলতাম, মাঠেঘাটে ভূতগুলো ছুটে বেড়ায়। কালকের দেখা আলো আলেয়া নয়।"

"কেমন করে বুঝলেন ?"

"দেখে বুঝলাম। তা ছাড়া ঝিলের পাশে আজ পর্যন্ত কখনও কেউ আলেয়া দেখেনি।"

"কীসের আলো তবে ?"

"মনে হয় লণ্ঠনের।...কাল যখন আলোটা দেখি—তখন আর আকাশে চাঁদ নেই। ডুবে গিয়েছে। পুরো অন্ধকার।"

"তখন ক'টা হবে ?"

"পরে ঘড়ি দেখেছি, রাত সোওয়া দুই।"

"আপনি কতক্ষণ দেখেছেন ?"

"মিনিট দশ পনেরো বড়জোর। শীত করছিল। দাঁড়িয়ে থেকে কী আর করব। ঘরে চলে এলাম।"

চন্দন বলল, "আলোটা কতক্ষণ ছিল ?"

"তা বলতে পারব না।"

তারাপদ বলল, "সকালে কাউকে দেখতে পাঠিয়েছিলেন ?"

"বিজুয়াকেই পাঠিয়েছিলাম। ও ওই জায়গাটা দেখে আসার পর আমার চিরকুটটা রায়বাবুকে দিয়ে এসেছে।"

কিকিরা কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন, পরে বললেন, "কথাটা কি জানিয়েছেন কাউকে ?"

মাথা নাড়লেন চামেলিবাবু। "না।...শুনুন রায়সাহেব, আমার বিশ্বাস শুধু ঝিলপাড়েই আলো ছিল না, অন্য কিছুও থাকতে পারে।"

"শর্মাকে জানিয়েছেন কথাটা ?"

"না। আজ শর্মার সঙ্গে দেখা হয়নি। শুধু আপনাকেই জানিয়েছি। শর্মা যদি কাল আসে এদিকে, জানাব।"

"এটা ক'দিন হচ্ছে ?"

"বলতে পারব না। কালকেই চোখে পড়ল প্রথম।"

"ঠিক আছে। আজ আমরাও নজর করব। আমাদের বাড়ি থেকে ঝিল দেখা যায় না। তবে ছাদে উঠলে আপনাদের এদিকটা দেখা যায়।"

"দেখুন তো একবার। আমিও দেখব।"

তারাপদ বলল, "কিকিরা সার, আমাদের সঙ্গে চামেলিবাবুর একটা সিগন্যালিং কোড থাকলে ভাল হত। উনি যখন দেখতেন..."

কিকিরা বাধা দিয়ে বললেন, "সে পরে হবে। আগে আমরা দেখি।"

চামেলিবাবু বললেন, "আমি জোর করে বলতে পারি, ভূত প্রেত নয়, আলেয়াও নয়, কেউ একজন ওখানে আলো হাতে ঘুরে বেড়ায়।...আপনারা কলকাতার লোক, কথাটা ঠিক বুঝবেন না হয়তো। কিন্তু আমরা বনজঙ্গলে ফাঁকা মাঠেঘাটে পড়ে থাকি। আমরা দেখেছি, কেউ যদি দূরের মাঠ দিয়ে হাতে লণ্ঠন ঝুলিয়ে হেঁটে যায়, আলোটা দোলে। মাঝে মাঝে উঁচু নিচু জায়গায় এমনকী লণ্ঠনধারীর গায়ের আড়ালেও পড়ে যায়। এই আলো মশাই, তেমন নয়। আলো হাতে কেউ হেঁটে যায় না একনাগাড়ে, আলোটা দেখলাম ক'মুহূর্ত, তারপর আর নেই। আবার একসময়..."

কিকিরা হেসে বললেন, "রহস্য তো ভালই জমেছে চামেলিবাবু। এতদিন ছিল লোকটা কে, কেমন করে মারা গেল ? এখন আবার দেখা যাচ্ছে, ঝিলের আশেপাশে মাঝরাত্তিরে একটা ভৌতিক আলোও হাজির হয়েছে। মানে, এখন চলছে ভুতুড়ে খেলা। বোধ হয় হাতড়ানোর পালা..."

"হাতড়ানোর পালা ?"

"খোঁজখবর হচ্ছে হয়তো !"

"কীসের !"

"সেটাই তো বলতে পারছি না আমরা। বুঝতেও পারছি না। পারব হয়তো এবার।"

উঠে পড়লেন কিকিরারা। "আসি।"

"সাবধানে যাবেন।"

"আমরা ইচ্ছে করেই আলপথ দিয়ে যাব না এখন। বড় রাস্তা ধরে ঘুরে যাব। আপনিও বেশি হাঁটাচলা করবেন না। ব্যথা বাড়বে।"

কিকিরারা আর বসলেন না। ওঠার সময় মজা করে বললেন, "দেখবেন মশাই, ভূতকে ভয় দেখানোর জন্যে যেন দোনলা চালিয়ে দেবেন না। তাহলে ভূত পালাবে।"

মাঠের রাস্তায় এখন স্পষ্ট জ্যোৎস্নার আলো। শীতের কুয়াশা ততটা ভারী হয়নি। রাতও বেশি নয়। মাত্র সাড়ে সাত। চামেলিবাবুর বাগানের লাগোয়া পাঁচটা বাড়ি গায়ে গায়ে নয়। তবু আলো জ্বলছিল ল্যাম্পের, লণ্ঠনের। কিকিরা যেন আরও নজর করে করে বাড়িগুলো দেখছিলেন। শীতলবাবুর বাড়ি প্রায় অন্ধকার। কচির বাড়িতে বাতি জ্বলছে। অন্য তিনটে বাড়িও অন্ধকার নয়।

তারাপদ হঠাৎ হেসে বলল, "কিকিরা সার, আপনি তাহলে আজ ভূত দেখবেন ?"

"দেখব কি গো ! ভূত নিয়েই তো আমার কারবার।"

তারাপদ ঠাট্টাটা বুঝতে পেরে হেসে উঠল।

ঘড়ি দেখার দরকার হল না।

কিকিরা অনুমান করলেন, রাত দেড়টাও হয়তো হবে না, চামেলিবাবুর কথা বর্ণে বর্ণে মিলে গেল।

শীত কিন্তু বেশ। কিকিরা গা-মাথা যতই ঢাকা দিন না কেন—শীতে কাঁপুনি ধরে যায়। চাঁদের আলো মরে গেল। শুক্লপক্ষ, তিথিও বোধ হয় নবমী। অস্ত গেল চাঁদ। অন্ধকার। তারা ফুটে আছে এপাশে।

ঝিলের আলপথে আলো দেখা গেল।

কিকিরারা দেখলেন।

আলের উঁচু রাস্তায় কখনও, কখনও বা নীচে—ঝিলের গা ধরে একটা আলো জ্বলছে, থামছে। আড়াল পড়ে যাচ্ছে। আবার দেখা যাচ্ছে।

কিকিরা কিছুক্ষণ লক্ষ করতে করতে বললেন, "চাঁদু, তোমরা তৈরি ?"

"হ্যাঁ, সার।"

"ঠাণ্ডা লাগবে না ?"

"না সার, হেড টু ফুট এমনভাবে কভার করেছি যে, নর্থ পোলে চলে যেতে পারি।"

"তাহলে খানিকটা এগিয়ে যাও। এই ছাদ থেকে ঝিলটা আমি দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু ওপারে চামেলিবাগানের বাড়িগুলো নজরে পড়ছে না। তোমরা খানিকটা এগিয়ে বড় রাস্তায় জামগাছটার সামনে দাঁড়ালেই বাড়িগুলো দেখতে পাবে। একবার দেখে এসো ওই বাড়িগুলোর কোনওটা থেকে..."

"বুঝেছি সার। আলোর খেলা চলছে কিনা ?"

"হ্যাঁ। যেমন বলেছিলাম।"

"আয় তারা, চলে আয়।"

তারাপদ বলল, "চল। জয় মা কালী ! টর্চ নিয়েছিস ?"

চন্দনরা ছাদ থেকে নেমে গেল।

কিকিরা মাথা বাঁচাবার জন্য কয়েক পা সরে গেলেন। ছাদের সিঁড়িঘরের মাথায় অ্যাসবেস্টাসের শেড। এখান থেকেও ঝিলের দিকটা দেখা যায়।

আলোটা যে লণ্ঠনের, তা বোঝা যায়। টর্চের আলোর ধরন আলাদা। সাদাটে, উজ্জ্বল, স্থির। এই আলো ম্যাটমেটে, ঘোলাটে। মাঝে মাঝে আলোটা হারিয়ে যাচ্ছে, বা আড়ালে পড়ে যাচ্ছে। না, একেবারেই দপদপ করছে না।

কিকিরার মাথায় ঢুকছিল না, লোকটা কে হতে পারে ? কেনই বা এই

মাঝরাতে শীতের মধ্যে ঝিলের আলের পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে! কেন? মনে হয়, লোকটা যেন কিছু খুঁজছে। তন্নতন্ন করে। কিন্তু খোঁজাই যদি উদ্দেশ্য হয়—তবে দিনের আলোয় নয় কেন?

কিকিরা এটাও বুঝতে পারছিলেন না, ঠিক কতদিন ধরে আলোটা দেখা যাচ্ছে! হালে? না, আগে থেকেই! চামেলিবাবুর নজরে পড়েছে মাত্র গতকাল!

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ফিরে এল তারাপদরা। শীতে কাহিল।

কিকিরাও ছাদ থেকে নীচে নেমে এসেছেন।

তারাপদ আর থাকতে পারছিল না। ভীষণ উত্তেজিত। গা গরম করার জন্য হাত বাড়িয়ে সিগারেট চাইল চন্দনের কাছে। তারপর কিকিরাকে বলল, "সার, আপনি যা ভেবেছিলেন এক্কেবারে রাইট। চামেলিবাবুর বাগানের বাইরে যে পাঁচটা বাড়ি আছে, চামেলিস ফাইভ ফিঙ্গার—" ঠাট্টা করেই বলল তারাপদ, এই ঠাট্টাটা সে করে মাঝেমধ্যে। "ওই বাড়িগুলোর একটার মধ্যে থেকে আলোর সিগন্যালিং চলছিল।"

"কেমন সিগন্যালিং?

চন্দন বলল, "তারা পারবে না, আমি আপনাকে বুঝিয়ে বলছি।...একটা বাড়ির একটাই জানলা খোলা ছিল। জানলার বাইরের দিকে কেউ দাঁড়িয়ে ছিল না—আলো হাতে থাকলে বাইরে আলো পড়ত। মানে বাইরে আলো থাকলে আশপাশ থেকে চোখে পড়ত সহজেই। জানলার ভেতর দিকে ঘরের মধ্যে কেউ ছিল। তার আলোও টর্চের নয়, লণ্ঠনের। আলোটা কুপির আলোর মতন, কিংবা সাধারণ মোমের। ওই আলো কখনও ডাইনে কখনও বাঁয়ে কখনও ওপরে নীচে ঘোরানো হচ্ছিল। এক দু'বার দেখলাম ক্রশ চিহ্ন করল। সারকেলও করেছিল।...কোনও সন্দেহ নেই—ওপারে জানলার আড়াল থেকে কেউ সাঙ্কেতিকভাবে কিছু বোঝাতে চাইছিল ঝিলের লোকটাকে।"

"কোন বাড়ি বুঝতে পারলে?"

"পাঁজামশাইয়ের। ওটাই তো পশ্চিম দিকে একটেরে।"

তারাপদ বলল, "আমরা আরও অনেকটা এগুলে ঝিলের লোকটাকে আন্দাজ করতে পারতাম। এগিয়ে যেতে সাহস হল না। আপনি বারণ করেছিলেন। আমরা টর্চও জ্বালিনি, পাছে ওরা আলো দেখে ধরে ফেলে ওদের ওপর কেউ নজর রাখছে।"

কিকিরা বললেন, "ঝিলের লোকটা কখন ফিরে গেল?"

"ওপাশ থেকে বার কয়েক বাতি কম-বেশি করল। নিভিয়ে দিতেই লোকটা চলে গেল।"

"অন্ধকারে আর কিছু দেখতে পেলে না?"

"না, সার।"

কিকিরা চুপ। চন্দন বলল, "শর্মাজিকে ব্যাপারটা জানিয়ে আমরা এবার থার্ড পার্টি হয়ে যাই, কিকিরা! অযথা এই গণ্ডগোলের মধ্যে গিয়ে কাজ নেই। এসেছিলাম বেড়াতে, দু'দিন আরামসে থাকব, খাবদাব ঘুমোব, তা না কোথায় কে খুন হল, থানা পুলিশ...আমাদের মাথা ঘামিয়ে লাভ কী বলুন?"

কিকিরা মাথা নাড়লেন, যেন স্বীকার করে নিলেন কথাটা। বললেন, "মাথা আমরা ঘামাতাম না। সেদিন সকালে তারা তোমায় ডেকে নিয়ে গেল, তুমি ঝিলের কাছে গিয়ে একটি মানুষকে দেখলে। মারা গিয়েছে। তারপর থানা পুলিশ, স্টেটমেন্ট...। জড়িয়ে না গিয়ে কী করব! যাক গে, তুমি ঠিকই বলেছ। শর্মাকে এবার কথাটা জানাতে হয়। আমরা জানাতে পারি, চামেলিবাবুও পারেন। তবে চামেলিবাবুর চেয়ে আমরা আরও একটু বেশি দেখেছি।"

তারাপদ বলল, "সার, আপনি ঠিকই বলেছিলেন। গণপতি পাঁজা লোকটাকে সত্যিই সুবিধের মনে হচ্ছে না।"

"তাই দেখছি। একজন থিয়েটার যাত্রার ড্রেস মেকার, সাধারণ মানুষ, পেশাও মামুলি, পাঁজাবাবুর বয়েসও হয়েছে, ভদ্রলোক কেন এইসব গোলমেলে ব্যাপারের মধ্যে থাকবেন, আমি বুঝতে পারছি না।"

"আমাদের বুঝে দরকার নেই। যার বোঝার বুঝবে। আপনি চামেলিবাবুকে বলুন শর্মাজিকে ঘটনাটা বলতে। না হয় দু'জনেই বলুন।"

"ডাব্‌ল ভার্সান!" তারাপদ ঠাট্টা করে বলল।

কিকিরা আর একটু বসে উঠে পড়লেন। "নাও, শুয়ে পড়ো। রাত কাবার হতে চলল।" বলে কিকিরা উঠে পড়লেন, নিজের ঘরে শুতে যাবেন।

ঘড়ি দেখার দরকার ছিল না। রাত যে শেষের দিকে টলে পড়ছে—বোঝাই যায়।

॥ ৮ ॥

চামেলিবাবু নিজেই হয়তো যেতেন পারলে, কিন্তু হাঁটার ক্ষমতা নেই থানা পর্যন্ত। কাজেই চিঠি লিখে থানা থেকে শর্মাজিকে ধরে আনলেন। কিকিরারাও ছিলেন।

সকালে বসা হয়নি। অন্য কাজ ছিল শর্মাজির। বিকেলেই এসেছেন তিনি। আর এখন বিকেল মানে আধ-সন্ধে।

কিকিরারাও এসে পড়েছেন সময়ে।

চামেলিবাবুর বসার ঘরে চা খেতে খেতে ঘটনাটা শুনলেন শর্মা। প্রথমে চামেলিবাবুর মুখে, পরে কিকিরাদের কাছে।

শর্মা ঠাণ্ডা মাথায় ভাবলেন খানিক, তারপর বললেন, "চামেলিজি, ওই

গণপত তো আপনার বাড়িতে ভাড়া থাকেন। আপনি আগে জানলেন না, আদমি কেমন ?” শর্মা গণপতিকে বলে ‘গণপত’।

চামেলিবাবু বললেন, “না। আগে জানব কেমন করে! ভাড়া চেয়েছিল। দিয়ে দিলাম।”

“আপনার চেনা কেউ রেকমেন্ড করেছিল ?”

“না, সেভাবে কেউ করেনি। চিঠি লিখেছিল ভদ্রলোক। এর আগে হরিবাবু বলে এক ভদ্রলোক ছিল বাড়িটায়, পুজোর আগে। কাশীপুরের লোক। কাপড়ের ব্যবসা শোভাবাজারে। তার মুখে আমার বাড়ির কথা শুনে চিঠি লিখেছিল...”

“ক'মাস ভাড়া নিয়েছেন গণপত ?”

“দু'মাস।”

“আছেন কত দিন ?”

“পনেরো বিশ দিন হল।”

“আপনার কাছে আসেন ?”

“না। দু'-একদিন এসেছেন। কথা বেশি বলেন না। স্ত্রী মারা গিয়েছেন ক'বছর আগে। ভেতরে কোনও আফসোস আছে। মুখ দেখে তাই মনে হয়।... আমিই বরং খোঁজ নিতাম পাঁজার।”

“রায়সাহাব,” শর্মাজি কিকিরার দিকে তাকালেন, “গণপতিবাবুকে আজই থানায় তুলে নিয়ে যেতে পারি। থানায় ডেকে নিয়ে যাওয়া ডিফিকাল্ট নয়। তাতে কোনও কাম হবে না। অফেন্স ? কোনও অফেন্স তো চাই। নিজের ঘরে আলো জ্বালায়—এ তো অফেন্স নয়!”

কিকিরা মাথা হেলালেন। এ তো সাফ কথা। রাম শ্যাম যদু মধু—যে কোনও লোক যখন খুশি তার বাড়িতে আলো জ্বালাতে পারে, তাতে তার দোষটা হচ্ছে কোথায় ? মিছিমিছি এই বাজে কারণ দেখিয়ে কাউকে থানায় ধরে নিয়ে যাওয়া যায় না। এমনকী...

কিকিরার আর ভাবা হল না, তার আগেই শর্মা কথা বললেন, “আজ আমি আমার লোক নিয়ে নাইটে ঝিলের আশপাশে থাকব। ওয়াচ করব। ওই লোকটাকে পাকড়াও করব! লেট আস সি... !”

চামেলিবাবু বললেন, “আজ যদি লণ্ঠনধারী ঝিলের কাছে না আসে ?”

কিকিরা বললেন, “মনে হয় আসবে।” বলে একটু হাসলেন, বললেন আবার, “আমি শিকারী নই, বনেজঙ্গলেও ঘুরে বেড়াই না। শুনেছি, বাঘসিংহ নাকি তার আধমরা বা মরা শিকার যেখানে ফেলে যায় সেখানে বারবার ঘুরে আসে। আমরা জানি না। কিন্তু আমার বিশ্বাস—ওই ঝিলের আশপাশে কোনও কিছু খোঁজার চেষ্টা হয়। সেটা সামান্য জিনিস নয়। ওই লণ্ঠনধারী আজও আসবে। পাঁজাবাবু কি জানতে পারছেন, আমরা ওঁদের আলোর

খেলাটা নজর করেছি ! করেননি। তিনি জানেন না। বরাত জোরে আমরা যা দেখেছি তা নেহাত তুচ্ছ নয় চামেলিবাবু, এই গিঁটটা খুলতে পারলে হয়তো অনেক জট আলগা হয়ে যাবে।"

চামেলিবাবু স্বীকার করলেন কথাটা। "দেখুন, কপালে যদি লেগে যায় আজ !"

শর্মাজি আর অপেক্ষা করতে চাইলেন না। সামান্য শলা-পরামর্শ করে তিনি উঠে পড়লেন।

মাঝরাতের পর পরই ঘটনাটা ঘটে গেল।

ঝিলের আলপথ ধরে যে-লোকটা ঘোরাফেরা করছিল, সে ধরা পড়ে গেল। তার বিন্দুমাত্র সন্দেহ হয়নি যে ঘন অন্ধকারে, ঝিলের গায়ে বাঁকা হয়ে ঝুলে পড়া গাছটার আড়াল থেকে কেউ আচমকা বেরিয়ে এসে তাকে ধরে ফেলবে।

তবু হয়তো সে পালাবার চেষ্টা করত। কিন্তু বুঝতে পারল তাতে লাভ হবে না। পুলিশের হুইশলের শব্দ, টর্চের আলো, জনা কয়েক সেপাইয়ের ছুটে আসা, দারোগাজির হাতের অস্ত্রটি তাকে আর পালাবার সাহস জোগাতে পারল না।

লোকটাকে চট করে দেখলে মনে হয় না, ও মানুষ। চেহারায় যতটা ভীতিকর তার চেয়েও বেশি আতঙ্কজনক তার সাজপোশাক। ঘন কালো, কর্কশ এক কম্বলের কাপড় কেটে যেন তার গায়ে এক বেয়াড়া জোব্বা বা জামা চাপানো রয়েছে। গলা থেকে পা পর্যন্ত ঢাকা। মাথা মুখ গলা কালো টুপিতে আড়াল করা। হনুমান-মার্কা টুপি। শুধু চোখ নাক দেখা যাচ্ছে। টুপির গলার কাছে একটা কালচে মাফলার। হাতে দস্তানা। সেটাও কালচে রঙের। পায়ের জুতো গামবুট ধরনের। অল্প আলো বা অন্ধকারে দেখলে লোকটাকে বুনো জন্তু বলেই মনে হয়।

ধরা পড়ে গেল লোকটা। তার হাতের লণ্ঠন কেড়ে নিল একজন সেপাই।

কিকিরারাও ততক্ষণে হাজির হয়ে গিয়েছেন ঝিলের ধারে।

শীতের দিন। তবু ঘন ঘন হুইশলের শব্দ, সেপাইদের চেঁচামেচিতে চামেলিবাবুর প্রতিবেশীদের কারও কারও হয়তো ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। জানলাও খুলে গেল দু'-এক বাড়ির।

শর্মাজি আর দাঁড়াতে রাজি নয়।

লোকটাকে ধরে রাখল দুই সেপাই। অন্য একজনকে শর্মা হুকুম করলেন, গণপতি পাঁজার বাড়িতে গিয়ে পাহারায় থাকতে। ভোর হলেই তাঁকে তুলে নিয়ে থানায় যেতে।

"রায়সাহাব, আপনারা ঘর চলে যান। রাত বহুত হয়ে গেল। কাল থানায় আসবেন।"

কিকিরা পাঁজাবাবুর অনুগত লোকটিকে দেখছিলেন। দেখছিলেন আর ভাবছিলেন, বুনো জন্তুর মতন পোশাক পরলেও লোকটাকে অনেক বেশি ভৌতিক দেখায়। এরকম কাউকে রাত্রে আচমকা দেখলে ভয়ে মূর্ছা যাওয়া অসম্ভব নয়। হার্টফেলও হতে পারে দুর্বল চিত্তের মানুষের।

"তোমার নাম ভৈরব ?" কিকিরা বললেন।

লোকটা জবাব দিল না কথার। সে যেন এখনও ভাবতে পারছে না যে কেমন করে সে ধরা পড়ে গেল।

জবাব না-পাওয়ায় কিকিরা যেন একটু হেসে বললেন, "তুমি বাপু কতক্ষণ আর বোবা হয়ে থাকবে ! থানায় যাও, পুলিশের গুঁতো খেলে বোবারাও 'বাবা' বলে। কথা ওরা বলিয়ে নেবে।"

চন্দন বলল, "চলুন, সার। আজ আর নয়। ঠাণ্ডা লেগে গিয়েছে।"

কিকিরাও আর দাঁড়াতে রাজি নন। তারাপদকে টানলেন। "চলো।" যেতে গিয়ে শর্মার দিকে তাকালেন। "কাল আপনার সভা কখন বসবে দারোগাসাহেব ?"

"স-ভা !"

"আমরা তো যাব।"

শর্মা বুঝতে পারলেন। বললেন, "সাড়ে ন' দশ বাজে আসুন।"

"চামেলিবাবু ?...পায়ে ব্যথা।"

"আনিয়ে নেব।"

"চলি।"

কষ্টই হচ্ছিল যেতে। ঝিলপারের চারদিক কুয়াশায় ঢাকা। কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস আসছে উত্তরের। আকাশের তারাগুলিও যেন আবছা হয়ে এসেছে হিমে কুয়াশায়।

যেতে যেতে কিকিরা বললেন, "বুঝলে চাঁদু, পাঁজাবাবু, থিয়েটার যাত্রার ড্রেস মেকার, সাজ মাস্টার হতে পারেন। ওঁর সুনাম কতটা, আমি জানি না। তবে লোকটির অন্য মিস্ত্রিও আছে, চাঁদু। হয়তো সেটাই আসল ! দেখা যাক, কী বলেন উনি !"

॥ ৯ ॥

থানায় শর্মাজির অফিস ঘরে চামেলিবাবুরা সবাই বসে ছিলেন। কিকিরারা একপাশে ; চামেলিবাবু শর্মার মুখোমুখি। বাঁদিকে একটা কাঠের চেয়ারে গণপতি পাঁজা। গণপতি পাঁজাকে দেখলে মনে হবে না, উনি ভয়ে তটস্থ হয়ে বা বিহ্বল হয়ে বসে আছেন। শক্ত মানুষ। গলার স্বর মিনমিনে নয়, খানিকটা নিস্পৃহ ও গম্ভীর।

প্রথমটায় তিনি শর্মাজিদের কথা শুনলেন। চামেলিবাবুর রাগারাগি দেখলেন। না জেনেশুনে অচেনা লোককে বাড়িভাড়া দিয়ে কত মূর্খামিই না করেছেন তিনি— চামেলিবাবু আফসোস করছিলেন। অবশ্য এটা সবসময় সর্বক্ষেত্রে ঠিক নয়। ভাড়া তিনি অজানা অচেনাকেও দেন, তবে একটু দেখে শুনে।

এক তরফা নানান কথা শোনার পর গণপতি পাঁজা বললেন, অধৈর্য হয়েই, "আপনারা আমাকে থানায় ধরে এনেছেন কেন ? ধরে এনেছেন প্রমাণ করতে যে আমি সেদিনের ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে আছি। এই তো ?"

চামেলিবাবু বললেন, "আলবাত। আপনি ছাড়া..."

হাত তুলে চামেলিবাবুকে থামতে বললেন গণপতি, তারপর চামেলিকে যেন উপেক্ষা করেই শর্মাজির দিকে তাকালেন। বললেন, "আমাকে আপনি আসামি হিসেবে দাঁড় করাতে চাইছেন দারোগাবাবু ! তা আপনি পারেন। সন্দেহ করে মামলা সাজাতে পারেন। কিন্তু আমার তরফেও আইন আছে। বড় বড় উকিল ব্যারিস্টারও খাড়া করতে পারি। সহজে আপনি আমায় ফাঁসাতে পারবেন না।"

শর্মা উত্তেজিত হলেন না। ঠাণ্ডা গলাতেই বললেন, "আপনি যা বলার বলতে পারেন। আমার কাজ আমি করব।"

"করুন।" বলে কিকিরার দিকে তাকালেন গণপতি। "আপনি এদের দলে ঢুকে পড়েছেন ! ভালই করেছেন। মশাই, মানুষ চেনায় ভুল আমার কমই হয়। আপনাকে চিনতে আমার ভুল হয়নি। তবে আপনারা যে এতটা নেচে উঠবেন, বুঝতে পারিনি।"

কিকিরা অমায়িক মুখ করে হাসলেন। "আমারও হয়নি।"

"হয়নি ?"

"না।"

"তাহলে আপনি বলতে চাইছেন, আমি খুনি !"

"নিজের হাতে আপনি কী করেছেন আমি বলতে পারব না। তবে ওই মানুষটির খুনের পেছনে আপনার হাত থাকতে পারে।"

গণপতি সামান্য চুপ করে থাকলেন। দেখলেন কিকিরাকে তীক্ষ্ণভাবে। শেষে বললেন, "অশ্বিনী দালাল, ওরফে প্রেমলাল, ওরফে খুশিবাবু, জানেন লোকটাকে ? নাম শুনেছেন ? পুলিশের খাতায় লোকটা নামকরা স্মাগলার। বাইরে থেকে মাল আনে। সোনা, ড্রাগস— সব ব্যাপারেই হাত আছে। ক্রিমিন্যাল। একটা দল আছে ওর। ব্যবসা ছড়ানো। ব্যাঙ্ক ডাকাতিও করেছে।"

কিকিরা রীতিমতো অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। স্মাগলারদের সম্বন্ধে তাঁর কোনও ধারণা নেই। কাগজে পড়েন মাঝে মাঝে, গল্পেও হয়তো শুনেছেন—

কারও কারও নাম— তবে পাকা স্মাগলার চোখে দেখেননি।

শর্মাজিও নড়েচড়ে বসলেন। এখানে স্মাগলার?

চন্দন আর তারাপদ মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। চামেলিবাবু চুপ।

"তাতে কী!" কিকিরা বললেন শেষপর্যন্ত, নিজেকে সামলে নিয়ে, "স্মাগলার হলে তাকে আপনি ধরিয়ে দিতে পারতেন, কোনও মানুষকে খুন করার অধিকার আপনার নেই।"

"আমি খুন করিনি।" গণপতি বললেন, একটু থেমে আবার, "আর অধিকার না থাক শোধবোধের ব্যাপার ছিল।"

"কে খুন করেছে?"

"ইচ্ছে করে কেউ করেনি। গণ্ডগোলে হয়ে গিয়েছে।"

"গণ্ডগোলে হয়ে গেল?"

"হ্যাঁ। দু'জনে যদি লড়াই করে, একজন অন্যজনকে টুঁটি টিপে মারার চেষ্টা করে তাহলে যে যা পায় হাতের কাছে— তাই দিয়ে অন্যকে জখম করে। স্বাভাবিক ব্যাপার এটা। প্রেমলাল জখম হয়েছিল।"

"কে করেছিল! ভৈরব!"

"হ্যাঁ।"

"আপনি হুকুম করেছিলেন?"

"না," মাথা নাড়লেন গণপতি, "আমি খুন করতে হুকুম করিনি। চিরকালের মতন অকেজো করে দিতে বলেছিলাম। প্রেমলাল বাহাদুরি করতে গেল। ভৈরবের গায়ে অসুরের ক্ষমতা, তা ছাড়া ও লড়ালড়ির সময় ঝিলের পাড়ে একটা পাথরের টুকরো পেয়ে যায়, ভারী পাথর, প্রেমলালের মাথায় মেরেছিল। তার আগে প্রেমলালের ভোজালিতে সামান্য লেগেছিল ভৈরবের পিঠের দিকে। প্রেমলাল ভোজালি চালালেও জায়গা মতন জখম করতে পারেনি ভৈরবকে।"

শর্মা বললেন, "প্রেমলালকে জখম করার পর তাকে ঝিলের জলে পাথরের ওপর ফেলে দিয়েছিল আপনার ভৈরব।"

"হ্যাঁ।... তবে এখানে ও নির্দোষ। ওর মাথায় বুদ্ধিটা খেলেনি। ওটা আমিই বলেছিলাম।"

"আপনি ওখানে ছিলেন?"

"সত্যি কথা বললে বলতে হয়—ছিলাম", গণপতি বললেন, "নগদ টাকার তোড়া ওকে দিতে হলে থাকব না নিজে।"

শর্মা আর কিকিরা পরস্পরের দিকে তাকালেন। হয়তো চমকেও উঠেছিলেন ভেতরে ভেতরে। টাকা! তোড়া! কেন?

"আপনি ওকে টাকা দিতে গিয়েছিলেন কেন?"

গণপতি যেন তামাশা করছেন, বললেন, "টাকা ছাড়া প্রেমলালের সঙ্গে

লেনদেনের কারবার হয় ! সোনার কাঠি শুনেছেন ? হংকং গোল্ড স্টিক !"

"সেটা আবার কী ?" চামেলিবাবু বললেন।

"পিনও বলতে পারেন।... হাই ক্লাস টুথ প্রিক কিংবা ধরুন ইনজেকশানের ছুঁচ নিশ্চয় দেখেছেন। এগুলো সেইরকম। জিনিসটা শুনতে যত মামুলি মনে হচ্ছে— আসলে তেমন নয়। সোনার কাঠি, খাঁটি, ভীষণ শক্ত, ওরা বলে— কী বলে যেন— মানে দেখতে কাঠি হলেও ওজনে কাঠি নয়।"

"এসব আসে কোথা থেকে ?"

"হংকং, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর— চোরাপথে ঘুরেফিরে আসে।"

"ওই লোকটা যে মারা গিয়েছে, সে এসব আনাত ?"

"লাইনে ছিল। আগেই বলেছি, ও স্মাগলার। ওর হাত হয়ে বাজারে সোনা, স্টোন, নেশাটেশাও ঘুরত।"

"মানে আপনি বলতে চাইছেন, বাইরে থেকে এইসব মাল সে নিজে বা লোক দিয়ে এখানে আনাত ?"

"হ্যাঁ। তবে ওর মাথার ওপর লোক ছিল। প্রেমলালের মনিব। তার কাজকর্মের কথা আমি বেশি জানি না। শুধু জানি, বাইরে বাইরেই সে মক্কেল বেশি ঘুরত।"

"এখানকার বাজারে ওই সোনার কাঠির দাম কত হতে পারে ?"

"দা-ম ! তা এক-একটা কাঠি কম করেও আটশো হাজার।"

"সোনার বিস্কুটের কথা শুনেছি। কাঠি কখনও শুনিনি।"

"এসব হালে হয়েছে। চোখে ধুলো দেওয়ার জন্যে !... কাঠবাদাম জানেন তো, চিনেবাদাম নয়, সেই কাঠবাদামের মধ্যে করে চুনি আসে, হিরের কুচি আসে শুনেছেন ? তবে বাদামগুলো কাঠবাদাম নয়, দেখতে অবিকল ওইরকম। নকল বাদাম। ধরা যায় না।"

শর্মা ড্রয়ার খুলে আবার বন্ধ করে দিলেন। ছোট্ট একটা জায়গার সাধারণ দারোগা। এত কথা কেমন করে জানবেন। "স্টিক বা কাঠি, নিডল আসে কীভাবে !"

"যেভাবে আসে, না দেখলে আপনারা বুঝতে পারবেন না।" গণপতি বললেন, "অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা। তবে বেশিরভাগ সময়ে আসে বড় টর্চের ব্যাটারির সেলের মধ্যে। পিনগুলো লম্বায় ইঞ্চি দুই। বাণ্ডিল করা থাকে সেলের মধ্যে, ওপরের দিকটা অবিকল ওই সেলের মতন প্যাকিং। লেবেলিং। চট করে দেখলে ধরার উপায় নেই, ব্যাটারির সেল বলেই মনে হবে।"

কিকিরা বুঝতে পেরে গেলেন। একবার তাকালেন শর্মার দিকে। তারপর চোখ ফিরিয়ে গণপতিকে দেখলেন। "ও, আপনিই তাহলে টর্চ থেকে

সেলগুলো বার করে নিয়েছেন ? তিন সেলের টর্চ ! কত টাকার মাল ছিল পাঁজাবাবু ?"

গণপতি মাথা নাড়েন। "না, আমি বার করে নিইনি। নিতে পারিনি। নিতে পারলে কম করেও আড়াই লাখ টাকা হত।" মনে মনে একটা হিসেব ছিল যেন ওঁর।

"কেন পারলেন না ?"

"আমার সঙ্গে কথা ছিল নগদ পঞ্চাশ হাজার পাবে প্রেমলাল। টোপ দিয়ে রেখেছিলাম। এখানে অত টাকা আমি পাব কোথায় ? অবশ্য ওকে কথাটা জানাইনি। তা সেদিন একটা ছুতো দেখিয়ে বললাম, হাজার পাঁচ-সাত নাও, বাকি টাকা কলকাতায় গিয়ে অমুকের কাছ থেকে নিয়ে নিয়ো। আমি চিঠি লিখে এনেছি।"

"ও ! টাকা নিয়ে গোলমাল ? পাওনা-গণ্ডা আদায়..."

"এককথার মানুষ আমি। কারবার আমার কাছে কারবার। প্রেমলাল চেল্লাতে লাগল। আমি বারণ করলাম। ও আমায় গালাগাল দিতে লাগল। বলল, টাকা দেব কথা দিয়েই আমি তাকে ডেকে আনিয়েছি। হ্যাঁ, তা ঠিকই। আনিয়েছিলাম। তবে সে অন্য মতলবে। প্রেমলালকে একটা ছুতো দেখাবার চেষ্টা করলাম। ও আরও খেপে গেল। ভৈরবকে বললাম, ওকে ধরতে। তখন ঝটপট লেগে গেল। ধস্তাধস্তি। প্রেমলাল ভোজালি চালাল। তারপর টর্চ থেকে ব্যাটারির সেলগুলো বার করে ঝিলের মধ্যে ফেলে দিল ছুড়ে ছুড়ে।

শর্মাজি বললেন, "সেলগুলো আপনি পাননি ?"

"না।"

"ওগুলো ঝিলের মধ্যে পড়ে আছে ?"

"ঝিলের মধ্যে আছে। না, আশপাশেও পড়েছে দু'-একটা ছোড়ার সময় জানি না।"

"আপনি ভৈরবকে দিয়ে রাত্রে সেগুলো খোঁজেন।" কিকিরা বললেন।

"অত টাকা..." গলার স্বর অন্যরকম শোনাল ! তামাশা করলেন নাকি !

"তা দিনের বেলায় খোঁজেন না কেন ?"

"না, দিনে নয়। ও মারা যাওয়ার পর আমি ঝিলের আশেপাশেও যাইনি। কার চোখে পড়ে, কী সন্দেহ হয়, কে বলতে পারে ! পুলিশের নজর ছিল, আপনারাও ঘোরাঘুরি করতেন ঝিলের কাছে।"

"সাবধানের মার নেই—" হাসলেন কিকিরা। "তা রাতের খোঁজটা শুরু হয়েছিল কবে থেকে ?"

"এই তো দিন তিনেক...।"

"আপনার ভৈরব ওভাবে আলো নিয়ে অন্ধকারে..."

"ভৈরব দিনকানা !"

"দিনকানা ! মানে !....শুনেছি প্যাঁচারা দিনে..." কিকিরা ঠাট্টা করলেন।

"রাতকানা তো শুনেছেন। দিনকানাও হয়। ভৈরব দিনের বেলায় ভাল দেখতে পায় না, ঝাপসাটে দেখে। এ ওর প্রায় জন্মগত রোগ। ডাক্তার দেখিয়েছি অনেক। তাঁরা বলেন, বুঝতে পারি না ; তবে এমন হয় পাঁচ লাখে হয়তো দু'-একজন। রোগের একটা নামও বলেন। ...এক-একজন মানুষ নিয়মের বাইরে থেকে যায় মশাই, প্রকৃতির খেয়াল।"

শর্মা নিজের চেয়ার ছেড়ে উঠলেন। বললেন, "প্রেমলালই এখানে এসে ওই ধরমশালায় ছিল ? গিরিবাবার ধরমশালায় ?"

"হ্যাঁ।"

"দাড়িগোঁফ লাগিয়ে গেরুয়া আলখাল্লা পরে এসেছিল, ভেক ধরে ?"

"হ্যাঁ। ভেক ধরতে কী আছে দারোগাবাবু। এক-দু'দিনের ভেক। প্রেমলাল কোন মুলুকে না চক্কর মারে ! তা ছাড়া ওর ওপর নজর আছে পুলিশের।"

"হুঁ ! ও আপনাকে জানিয়ে এসেছিল তাহলে !"

"চিঠি লিখে এসেছিল। চিঠি আমার কাছে আছে। আমি আসতে বলেছিলাম। ও চিঠি পড়লে আপনি কিছু বুঝবেন না। সাঁটে লেখা।"

"বেশ," কিকিরা বললেন, "চিঠি পেয়ে আপনি কেন লিখলেন না যে আপনার কাছে এখানে অত টাকা নেই।"

"সত্যি কথা আগেই বলেছি। ওকে আমি এখানে আনতেই চেয়েছিলাম।... তার কারণ ছিল। কী কারণ জানতে চাইবেন না। তবে সেদিন তবু ওকে আমি টাকার ব্যাপারে মিথ্যে বলিনি। টাকা আমার কাছে ছিল না। ও বলল, টাকা নিয়ে কালই সকালে ও গোরখপুর চলে যাবে। সেখান থেকে নেপালে। অনেক টাকার মাল আনতে হবে।"

শর্মা উঠে গিয়ে তাঁর অফিস ঘরের আলমারির তালা খুললেন। তারপর একটা প্যাকেট বার করে আনলেন। কোরা কাপড়ে মোড়া। গালার সিল চার-পাঁচ জায়গায়।

নিজের চেয়ারে বসে প্যাকেটটার গালা ভাঙলেন।

ভেতরের জিনিসগুলো সামনে রাখলেন শর্মা। বললেন, "এই টর্চ ! শাল ! চিনতে পারেন ?"

মাথা নাড়লেন গণপতি। "টর্চটা ওর হাতে ছিল। আমার হাতে আসেনি।"

"এই টর্চের ভেতরেই তো ছিল আসল জিনিস," কিকিরা মুচকি হেসে বললেন।

গণপতি জবাব দেওয়ার প্রয়োজন মনে করলেন না প্রথমে। পরে কী ভেবে বললেন, "প্রেমলাল জখম হওয়ার পর ওর হাত থেকে টর্চটা আমরা কেড়ে

নিতে পারতাম। কেন নিইনি কে জানে!"

"টর্চের ভেতর মাল ছিল না বলে।"

চামেলিবাবু আচমকা বললেন, "আচ্ছা পাঁজাবাবু, এই অন্ধকারে আপনার বন্ধুটি এল কেমন করে? তার চোখ কি আঁধারিতে জ্বলে?"

গণপতি নির্বিকারভাবে বললেন, "আরও একটা পকেট টর্চ ছিল ওর কাছে, আসল টর্চ, সেটা কোথায় আমি জানি না। পেয়েছেন নাকি?"

শর্মা মাথা নাড়লেন। না, পাননি।

"পুকুরের জলে পড়ে আছে হয়তো।" গণপতি বললেন।

শর্মা এবার রুপোর তাবিজ আর ছেঁড়া চেনটা দেখালেন। "এটা কার? চিনতে পারেন?"

গণপতি দেখলেন তাবিজ-লকেট আর চেনটা, হাত বাড়িয়ে নিলেন না। শুধু তাকিয়ে থাকলেন।

"কার এটা?" শর্মা আবার জিজ্ঞেস করলেন।

গণপতি কিছু বলার আগে কিকিরা বললেন, "গণপতিবাবুর দৈব বিশ্বাস খুব। অত আংটি আঙুলে। দামি দামি পাথর। তাই না, মশাই!... ওই তাবিজ-তক্তিও আপনার!"

জবাবটা দিতে সময় নিলেন গণপতি। বললেন, "হ্যাঁ। দৈবে বিশ্বাস। তবে তাতে কী?"

"তাতে আর কিছু নয়, শুধু প্রমাণ হয়, আপনি সে-সময় সেখানে ছিলেন। বোধ হয় ধস্তাধস্তির সময় এগিয়েও গিয়েছিলেন। কিন্তু বয়েস হয়েছে। লড়ালড়ি কি আপনার পোষায়! লাভের মধ্যে ওটা ছিঁড়ে হাত থেকে পড়ে গিয়েছে।"

গণপতি চুপ।

"কী আছে ওতে?"

"ধরুন, প্রসাদী ফুলপাতা।"

"ঠাকুরদেবতার ফুলপাতা নিয়ে কিছু বলতে নেই গণপতিবাবু! তবে আপনি কি সত্যি কথা বলছেন?"

গণপতি এবার বিরক্ত হলেন। বললেন, "ভেঙে দেখুন। ...আমি দৈব বিশ্বাস করি আর না করি তাতে আপনাদের কী! ...হ্যাঁ, করি। দৈব মেনে নিয়েছি বলেই পর পর কত বড় ঘা সইতে পেরেছি জীবনে আপনারা তার কী জানেন! ...আমার ছেলে গিয়েছে। তাজা ছেলে! ওই শয়তান প্রেমলাল তাকে নেশায় ভিড়িয়েছিল। ছেলেটা নিজের সর্বনাশ করছিল। আমাদেরও। শেষে একদিন গলায় দড়ি দিয়ে মরল। রাগে, অভিমানে। মাথা বিগড়ে গিয়ে। প্রেমলাল মুখে আহা-উহু করল। মনে মনে ভাবল, নেশার চক্করে পড়লে এরকম কতই না যায়! আরও একটা গেল। ...আমার স্ত্রী সন্তানশোক সহ্য করতে না পেরে পরের বছরেই মারা গেল।" গণপতি থামলেন, যেন

পুরনো কথা মনে এসে গেল পর পর। সামান্য থেমে নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, "চোরাই কারবার আমার ছিল না। টাকা আমার আছে। ...তবু একদিন আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, ওই প্রেমলালকে আমি দেখে নেব। ওকে আর মানুষের চেহারায় বাঁচতে দেব না সংসারে। ... আমার ভেতরের কথা ওকে বুঝতে দিইনি। ধীরে ধীরে ভাবসাব করেছি। কমসম চোরা কারবারও করেছি ওর সঙ্গে। ...এবার ওকে এখানে টেনে এনেছিলাম আমি। ভুলিয়ে। নয়তো হাজার পঞ্চাশ ষাটের কারবার তো কলকাতাতেই হওয়ার কথা। এখানে কেন!" গণপতি থেমে গিয়ে এদিক ওদিক তাকালেন, "একটু জল খাওয়াতে পারেন! ...যা বলছিলাম। বলছিলাম প্রেমলালকে ভুলিয়ে এখানে আনার একটাই কারণ, কলকাতায় ওর অনেক শাগরেদ। এখানে ও একা। ও একলা। আমরা দু'জন। আমি আর ভৈরব। ভৈরবকে দোষী করবেন না দারোগাবাবু! ও বোকা, ওর মাথা বলে কিছু নেই। আমার হুকুমই ওর কাছে সব।"

শর্মা জল আনতে বলেছিলেন হাঁক মেরে।

জল আসার আগেই কিকিরা বললেন, "আপনি প্রতিশোধ নিতে চেয়েছেন বলছিলেন, প্রেমলালকে একরকম শেষ করতেই চাইছিলেন। ও তো মারা গিয়েছে সেদিনই। তাহলে আজ ক'দিন রাত্রে কী খুঁজে বেড়াচ্ছেন ভৈরবকে ঝিলের কাছে পাঠিয়ে? নিজেই বলেছেন, সেই সোনার কাঠিওলা ব্যাটারিগুলো। তাই না?"

গণপতি কেমন মুখ করে হাসবার চেষ্টা করলেন একটু। ধীরে ধীরে বললেন, "না, সোনা নয়। সোনা বললে আপনাদের মগজে ঢুকবে, তাই সোনা বলেছিলাম। বাজারি সোনা দিয়ে আর আমি কী করব! ওই সোনার কী দাম আমার কাছে!"

"তবে?"

গণপতি চোখের ইশারায় তাবিজটা দেখালেন। "ওটারই খোঁজ করছিলাম। ওর মধ্যে সত্যি সত্যি ফুলপাতা নেই। আছে আমার ছেলে আর স্ত্রীর চিতার ছাই। প্রেমলালের জন্যে ওদের আমি চিতায় উঠিয়েছি। মন থেকে সেটা তাড়াতে পারতাম না। এই ক'বছর ওটা হাতেই ছিল। আজ আর নেই। বড় ফাঁকা লাগছিল। তবে সবই শেষ হয়ে গিয়েছে কখন। হয়তো কলকাতায় ফিরে ওটাও গঙ্গার জলে ফেলে দিতাম একদিন।"

চামেলিবাবু অপলকে তাকিয়ে থাকলেন।

তারাপদ আর চন্দন একদৃষ্টে তাবিজের দিকে তাকিয়ে ছিল।

শর্মা যেন অস্বস্তি বোধ করে অন্যমনস্কভাবে কালো শালটার কোণা খুঁটছিলেন।

কিকিরা একটিও কথা বললেন না। ততক্ষণে জল এসে গেল। একজন সেপাই গ্লাসে করে জল এনে টেবিলে রাখল।

সোনালি সাপের ছোবল

সোনালি সাপের ছোবল

বেশ সুর করে টেনে টেনে— 'হ্যাপি বার্থ ডে টু ইউ' বলতে বলতে তারাপদ ঘরে ঢুকল। সাহেবি কায়দায় 'ইউ'-টাকে বলল, 'য়্যু'। হাতে ফুলের তোড়া।

কিকিরা কাগজ পেন্সিল নিয়ে বসে বসে কীসের এক আঁকজোক করছিলেন। তাকালেন মুখ তুলে।

ফুলের তোড়া এগিয়ে দিয়ে তারাপদ বলল, "ধরুন সার, আপনাকে একটা প্রণাম করি।"

কিকিরা ফুলের তোড়া নিলেন। তারাপদ প্রণাম করল।

"আজ আমার বার্থ ডে তোমায় কে বলল ?" কিকিরা বললেন।

তারাপদ হাসল। "আপনিই একদিন বলেছিলেন। দোলপূর্ণিমার আগের দিন। ঠিক কি না ?"

কিকিরা বললেন, "সে-বছর তাই ছিল শুনেছি। তা বলে প্রতি বছর কি একই তারিখে দোলপূর্ণিমা হয় হে, তারাবাবু ! দিন পালটে যায়।"

"আরে তাতে কী ? আমাদের কাছে পাঁজি থাকে না, সার ; অতশত বুঝি না। হিসেবটা ওই দোলপূর্ণিমা নিয়ে। ইজি হিসেব। অ্যাডভান্স হলে ক্ষতি নেই। আবার লেট হলেই বা কী ! আসলে তো আপনাকে 'উইশ' করা।"

"বুঝেছি। আমার পিসিমার হিসেব।"

"সেটা আবার কী ?"

"আমার পিসিমা হিসেব করত, যখন আমাদের বুধন গোয়ালা টাকায় চার সের দুধ দিত তখন পাঁচকড়ি জন্মেছে, আবার যখন টাকায় দু' সের দুধ হল—তখন এল সাতকড়ি।"

তারাপদ প্রথমটায় বোঝেনি। পরে বুঝল, বুঝেই জোরে হেসে উঠল।

কিকিরাও হাসলেন। তারপর ফুলের তোড়াটা এগিয়ে দিয়ে চোখের ইশারায় ঘরের একপাশে রেখে দিতে বললেন।

তারাপদ ফুলের তোড়া নিয়ে রেখে দিল।

"চাঁদুর খবর কী ?" কিকিরা বললেন।

"আসছে। ও আপনার জন্যে একটু মুখরোচক কিনে চলে আসবে।"

"বাঃ! ব্যবস্থাটি ভাল।"

তারাপদ বসল। বসেই চেঁচিয়ে জল চাইল বগলার কাছে। কলকাতায় গরম পড়ে আসছে। ফাল্গুন মাসের একেবারে শেষ। বেলা বেড়ে গিয়েছে অনেকটা। সকালের সূর্যই কেমন ঝাঁঝিয়ে উঠছে। বাতাস শুকনো। মাঝে মাঝে হলকা ওঠে দুপুরে, যেন কাছাকাছি কোথাও আগুন ধরে গিয়ে তার তাত আসছে বাতাসে।

"তোমাদের বাঁক্ড়ো বিষ্টুপুর কেমন হল ?" কিকিরা বললেন।

"ভালই। হইচই হল খুব।"

তারাপদরা দু-তিনদিন কলকাতায় ছিল না। চন্দনের এক ডাক্তার বন্ধুর বোনের বিয়ে ছিল বাঁকুড়ায়। বন্ধু চন্দনের—সেই সূত্রে তারাপদরও। সেই বন্ধুই ধরে নিয়ে গিয়েছিল ওদের। গতকালই ফিরেছে তারাপদরা।

আজ সোমবার। আগামীকাল দোল। অফিস ছুটি। আজ অফিস ফেরতই এসেছে তারাপদ। চন্দনও আসবে। একটু দেরি হতে পারে।

ফাল্গুনের শেষ বেলার আলো এবার মরে আসছে। একটু পরেই ঝাপসা অন্ধকার হয়ে আসবে। ঘরে এখনও বাতি জ্বালানো হয়নি।

বগলা জল নিয়ে এল।

জল নিল তারাপদ। গলা যেন কাঠ হয়ে ছিল তারাপদর, এক চুমুকেই জলের গ্লাস শেষ।

বগলা চলে গেল।

"আপনার খবর কী ?" তারাপদ বলল।

কিকিরা কাগজ পেন্সিল সরিয়ে রেখে বললেন, "একটা চাকরি নিচ্ছি।"

"চা-ক-রি! আপনি ?" তারাপদ যেন আকাশ থেকে পড়ল—ভাবটা এই রকমই।

কিকিরা সহজভাবেই বললেন, "সেদিন ব্যাঙ্কে গিয়েছিলাম। শুনলাম আমার ব্যালেন্স তলানিতে। মানে, এর পর অনাহার। নো ফুড। তা মনটা বিগড়ে গেল। ব্যাঙ্ক থেকে ফিরে আসছি, হঠাৎ পানুবাবুর সঙ্গে দেখা। পানু মল্লিক। ক্রিমিন্যাল কেসের ওকালতি করেন। আমায় দেখে খপ করে ধরে ফেললেন। সঙ্গে সঙ্গে চাকরি। ম্যানেজার-কাম-কেয়ারটেকার। থাকা খাওয়া ফ্রি।"

তারাপদ তখনও বিশ্বাস করতে পারছিল না। কিকিরা তামাশা করছেন নিশ্চয়। চাকরি করার মানুষ তিনি নন। তা ছাড়া, উনি ধনী না হন, গচ্ছিত যথেষ্ট না থাকুক, একেবারে খাওয়া-পরার ব্যবস্থা থাকবে না—এমন হতেই পারে না। অপব্যয়ী, বিলাসী—কোনওটাই নন কিকিরা। যা আছে তাতে দুটি মানুষের (তিনি ও বগলা) দিব্যি চলে যায়। আর মাঝেমধ্যে আয়ও হয় বইকী! উঠতি ম্যাজিশিয়ানদের খেলার নকশা করে দেন, সাজসরঞ্জাম কারিগরের ব্যবস্থা

করেন—তাতে কিছু হাতে আসে। দু'-চার হাজার টাকা ওঁর ক্লায়েন্টরাও দেয়। অবশ্য এখানে তিনি জোর-জবরদস্তি করেন না। যে যা দেয়—জোর করেই কিকিরার পকেটে গুঁজে দেয়।

তারাপদ বিশ্বাস করল না চাকরির কথা। হালকা ভাবেই বলল, "কোন কোম্পানির চাকরি, সার ?"

"কোম্পানি নয় ; এক ভদ্রলোকের ..."

"ভদ্রলোকের ! প্রাইভেট পার্টি ! কে সে ?"

"হরিচন্দনবাবু। হরিচন্দন মুখোপাধ্যায়।"

"কী নাম বললেন ? হরি—"

"হরিচন্দন।"

"এমন নাম জীবনে শুনিনি। হরিহর, হরিমাধব, হরিধন ... এসব অনেক শুনেছি। এ একেবারে হরিচন্দন— ! দারুণ।"

"নামে শুধু নয় হে, অন্যদিক থেকেও দারুণ। ফ্যামিলি হেরিটেজ প্রায় সেই ফোর্ট উইলিয়ামের আমল থেকে। বিস্তর ধনী ছিলেন পূর্বপুরুষ। গাছের ডাল ভাঙতে ভাঙতে এখন তিনি যে-ডালের ডগায় বসে আছেন, সেই ডালে একজন বিলেত ফেরত ব্যারিস্টার, একজন কাউন্সিলার, একজন রায়বাহাদুর ছিলেন। আপাতত সেই বংশে হরিচন্দন নিজে, তাঁর ছেলে ধরণী, আর হরিবাবুর স্ত্রী। ছেলে কলকাতায় থাকে না। বম্বেতে রয়েছে। ব্যবসা করে। পুতুল আর খেলনার ব্যবসা। এক্সপোর্ট বিজনেসই বেশি।"

তারাপদ যেন সব গুলিয়ে ফেলছিল। বলল, "দাঁড়ান, একটু বুঝে নিই। ... আগে বলুন, পানুবাবুটি কে ? তাঁর সঙ্গে আপনার দেখা হল হঠাৎ আর আকাশ থেকে চাকরি খসে পড়ল ! আরব্য রজনী নাকি ?"

কিকিরা মুচকি হেসে মাথা নাড়লেন। পকেট হাতড়ে তাঁর সেই পাতলা চুরুট বার করলেন একটা। ধরালেন ধীরে সুস্থে। তারপর বললেন, "পানুবাবু আমার ওল্ড ফ্রেন্ড। বউবাজার পাড়ায় থাকার সময় আমাদের একটা ক্লাব ছিল। তাস, দাবা খেলা হত, আর বছরে একবার করে থিয়েটার লাগানো হত—'চন্দ্রগুপ্ত', 'কর্ণার্জুন', 'ষোড়শী'—এইসব। পানুদা ভাল অ্যাক্টার ছিলেন না। তবে গলায় জোর ছিল। হাজার হোক ক্রিমিন্যাল প্র্যাকটিস করেন তো !"

"আপনার এমন মাই ডিয়ার বন্ধু কত জন, সার ?"

"অ-নেক। বন্ধুর ভ্যারাইটিও কম নয়। কলকাতার সেরা পকেটমার লাল্লুচাঁদও আমার বন্ধু ছিল।"

"বাঃ ! তা পানুবাবু আপনাকে চাকরি দিলেন ?"

"দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন," কিকিরা চুরুটের মুখের দিকে ছাই সরিয়ে আগুন ঠিক করে নিতে নিতে বললেন।

"একটু ঝেড়ে কাশুন তো ! বড্ড মিস্ট্রি হয়ে যাচ্ছে।"

"সবটা শুনতে চাও ! তা হলে তো অনেক বলতে হবে। আসল কথাটাই বলি : পানুবাবু একটা কাজে শিয়ালদা কোর্টে এসেছিলেন। কাজ শেষ করে নিজের গাড়িতে ফিরছিলেন, যাবেন সেই পুলিশ কোর্ট। রাস্তায় আমায় দেখতে পেয়ে গাড়ি থামিয়ে চেঁচাতে লাগলেন। কাছে যেতেই হাত ধরে টেনে তুললেন তাঁর গাড়িতে। দুপুরবেলায় অত্যাচার। ছাড়াতে পারি না। আমায় প্রায় বগলদাবা করে নিয়ে গিয়ে তাঁর চৌখুপিতে আটকে রেখে ডাবের জল, চা, পান, সিগারেট দিয়ে আপ্যায়ন। নিজের টুকটাক কাজ সেরে শেষে কাজের কথা পাড়লেন। বললেন, ব্রাদার কিঙ্কর, তুমি একেবারে ঠিক সময়ে দেখা দিয়েছ। ভগবানের মনে ছিল, ভাই ; পেয়ে গিয়েছি। তোমায় একটা কাজ করতে হবে। আমার খুব চেনাজানা এক ভদ্রলোক—হরিচন্দনদা বেজায় ঝামেলায় পড়েছেন। তুমি একটিবার হাত লাগাও।"

"আচ্ছা ! ... তা পানুবাবু কি আপনার এখনকার খোঁজখবর রাখেন ?" তারাপদ বলল।

"রাখেন খানিকটা। দু'-চার মাস অন্তর পুরনো ক্লাবেও যাই গল্পগুজব করতে।"

"তারপর ?"

"ঝামেলার ব্যাপারটা বললেন উনি।"

"কী ?"

"হরিচন্দনবাবুর একটা বাড়ি আছে কদমপুরে। কলকাতার কাছেই। বাড়িটা শখ করে করা। কান্ট্রি হাউস। ছোট বাড়ি, দেদার গাছপালা, মায় একটা কুকুর। একসময় শখ করে করলেও এখন আর যাওয়া-আসা নেই। বাড়িটাকে তিনি একরকম ওল্ড হোম করে ফেলেছিলেন। মানে, খানিকটা বয়স্ক লোকের—যাদের বড়সড় কোনও রোগব্যাধি নেই, অথচ সংসারে ঠিকমতন যত্ন পায় না, অবহেলা করে ছেলে, ভাইপো—তেমন কয়েকজনকে সেখানে তিনি ঠাঁই দিয়েছিলেন।"

তারাপদ অবাক হয়ে শুনছিল। বলল, "ক'জন মানে ?"

"ছ'জন ছিল।"

"বেশ। তা ..."

"তার মধ্যে দু'জন আর নেই। একজন আগুনে পুড়ে মারা গিয়েছে, আর-একজন গত মাসে অদ্ভুতভাবে আত্মহত্যা করেছে।"

তারাপদ কৌতূহল বোধ করল। বলল, "আগুনে পোড়া আর আত্মহত্যা করায় অবাক হওয়ার কী আছে ! এমন তো হয়-ই। হরিচন্দনবাবু এই দুটো ব্যাপারকে অস্বাভাবিক মনে করছেন নাকি ?"

"হ্যাঁ," কিকিরা মাথা হেলিয়ে বললেন, "তিন-চার মাসের মধ্যে পর পর

ঘটনা দুটো ঘটায় তিনি অস্থির হয়ে পড়েছেন ; বিমূঢ় বলতে যা বোঝায়—তারও বেশি, ভীষণ উদ্বিগ্ন। ভয় পেয়ে গিয়েছেন।"

"কেন ?"

"সেটাই তো কথা হে ? কেন ?"

"রহস্য আছে নাকি ?"

"আছে বলেই তিনি মনে করেন।"

তারাপদ সামান্য সময় চুপ করে থাকল। উঠে গিয়ে বাতিটা জ্বেলে দিল ঘরের। ফিরে এসে বসল আবার। তারপর বলল, "চাকরির ব্যাপারটা ঠিক হল কেমন করে ? তখন তখনই ?"

"না। পানুবাবু বিকেলে হরিচন্দনবাবুর বাড়ি গিয়ে কথা বললেন। পরের দিন সকালে তাঁর লোক এল আমার কাছে চিঠি নিয়ে। পানুবাবু লিখেছেন, ব্রাদার কিঙ্কর—আমার সঙ্গে হরিচন্দনদার কথাবার্তা হয়ে গিয়েছে। অলমোস্ট ফাইন্যাল। তুমি পরশু দিন—দোলের পরের দিন বিকেলে তাঁর বাড়ি গিয়ে নিজে দেখা করবে। কথা বলবে। আমি আলাদা একটা চিঠি তোমায় লিখে দিলাম। হরিচন্দনদাকে দেখাবে। ভাই, আমাকে উদ্ধার করো। অন্তত একবার চেষ্টা করে দেখলে তোমার তো কোনও ক্ষতি হবে না। কাজটা হাতে নিলে তোমার কিছু প্রাপ্য হবে। কথা বলে রেখেছি।"

তারাপদ জিভে একটা শব্দ করল। বলল, "কাজটা আপনি হাতে নিচ্ছেন তা হলে ?"

"ইচ্ছে আছে। এখন পরশু দিন হরিচন্দনবাবুর সঙ্গে দেখা করি। কী বলেন তিনি শুনি। তারপর ... ! তা তুমিও আমার সঙ্গে যাচ্ছ !"

"আমি ?"

"তিনে মিলে করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ !" কিকিরা রগড় করে বললেন। "পানুবাবুকে আমার বলা আছে হে, আমরা হলাম তিন টেক্কা, এক টেক্কা হাতে নিয়ে খেলায় নামি না।"

এমন সময় চন্দনের গলা পাওয়া গেল। এসে পড়েছে সে। বগলাকে কী বলল, তারপর ঘরে এসে হাসিমুখে কিকিরার দিকে এগিয়ে গেল। "আপনার জন্মদিনে আমার প্রণাম ও শুভেচ্ছা, সার। দিন একটু পদধূলি দিন।"

"তোমরা আমার জন্মদিনটাকে একেবারে গুবলে দিলে !" কিকিরা বললেন মজা করে।

"গুবলে দিলে— ! মানে ?"

"গুবলেট— ! যাক গে, তুমি নাকি কী সব খানা নিয়ে আসছ !"

"বেশি কিছু আনিনি। যা গরম পড়ে যাচ্ছে ! এই একটু নান, চিকেন পাকৌড়া, স্যালাড আর সামান্য মিষ্টি।"

"বাঃ, খাসা ! ... তা তোমরা আজ আসবে জানলে আমি দু'-একটা কুকিং

করতে পারতাম। পরে হবে।"

চন্দন সরে গিয়ে তারাপদর কাছাকাছি বসবার আগেই তারাপদ বলল, "চাঁদু, কিকিরা একটা চাকরি নিয়েছেন।"

"কী ?"

"চাকরি।"

"কীসের চাকরি ?" চন্দন বুঝতে পারল না।

"ম্যানেজার-কাম-কেয়ারটেকার ...! বলুন না সার আপনার চাকরির ব্যাপারটা।"

"তুমিই বলো।"

বগলা চা নিয়ে এসেছিল। তারাপদদের হাতে হাতে চায়ের কাপ এগিয়ে দিল। কিকিরা এখন লিকার খাবেন। দুধ চিনি দুই-ই বাদ। ক'দিন সন্ধের চায়ে দুটোই বাদ দিয়েছেন, খেয়াল। দুধে নাকি অ্যাসিড হচ্ছে !

চা খেতে খেতে তারাপদ কিকিরার চাকরি নেওয়ার বৃত্তান্ত শোনাল চন্দনকে।

মন দিয়ে শুনছিল চন্দন। মাঝে মাঝে জিগ্যেসও করছিল দু'-একটা কথা।

তারাপদর কথা শেষ হলে চন্দন কিকিরাকে দেখল সামান্য সময়। পরে বলল, "আপনি দুটো দিন চুপ করে বসে থাকতে পারেন না ? দিন দিন কী হয়ে যাচ্ছেন ! ছেলেমানুষ।"

"চুপ করেই তো বসে থাকি ! বসে থাকতে থাকতে কী দশা হয়েছে জানো ? পেটে টান পড়েছে।"

"আপনার কতটুকু পেট !"

"তাই বা ভরে কেমন করে !"

"বুঝতে পারছি। তা হলে হরিচন্দনবাবুর কাজটা আপনি নিচ্ছেন ?"

"দেখি, কথাবার্তা বলি। ধরে নাও, যদি কথায় বনে, কাজটা নেব।"

চন্দন আর কিছু বলল না।

॥ ২ ॥

বাই লেন না লেন—ধোঁকা লেগে যায় গলির মুখে এসে দাঁড়ালে। একটা ট্যাক্সি গলতে পারে মাত্র এইটুকু চওড়া। পঁচিশ ত্রিশ গজ এগিয়ে গেলেই যেন হঠাৎ সব পালটে যায়। গলি খানিকটা চওড়া হয়ে গিয়েছে ঠিকই তবে তার চেয়েও বেশি চমক লাগে পাঁচিলঘেরা বাড়িটাকে দেখলে। এই গলিতে এমন বাড়ি যেন সম্ভব নয়। তারাপদ অবাক হয়ে গিয়েছিল।

উঁচু পাচিল, প্রায় পাঁচ ফুট লম্বা। অবশ্য রংচং আর নেই, ছাই ছাই কালচে দেখায় ; কোথাও বা শ্যাওলা ধরার দাগ, চুন সুরকির বদলে ইট বেরিয়ে

রয়েছে। মাঝে মাঝে ফাটল, গাছের চারা গজিয়েছে ফাটলের মুখে।

লোহার ফটক ছিল ডানদিকে। ফটকটা আধ-খোলা। ফটকের গায়ে আধমরা লতানো গাছ।

কিকিরার পাশাপাশি পা বাড়িয়ে ভেতরে এল তারাপদ। সামনে মাঠ। একসময় বাগান ছিল, এখন বারো আনাই নেড়া। বাকি চার আনায় দু'-চারটে সাধারণ গাছ আর আগাছার ঝোপ। ওরই মধ্যে চোখে পড়ে একটা কাঠচাঁপার গাছ, শিউলি ঝোপ, মামুলি কয়েকটা রঙ্গন গাছ।

সামনের বাড়িটা দোতলা। একেবারে পুরনো ছাঁদের। মোটা মোটা থাম, চওড়া বারান্দা, দোতলার বারান্দায় লোহার নকশাকরা রেলিং। নীচের তলার একপাশে এক ছোট কোঅপারেটিভ ব্যাঙ্ক, অন্যপাশে কোনও ওষুধ কোম্পানির গুদাম।

তারাপদ বলল, হালকা ভাবেই, "সার, এ যে একেবারে চিচিংফাঁক হয়ে গেল। কী দেখছি বুঝতে পারছি না, চোখে ঠিক দেখছি তো!"

কিকিরা বললেন, "কলকাতার পুরনো পাড়ায় এমন বাড়ি অনেক আছে এখনও।"

"এটা কোন পাড়া যেন?"

"পাথুরেঘাটা।"

নীচে লোকজন চোখে পড়ল না তেমন। ওষুধ কোম্পানির দরোয়ান, জনা দুয়েক কম বয়েসি ছোকরা, ছোট ডেলিভারি ভ্যান, বোধ হয় খারাপ হয়ে গিয়েছে, কথাবার্তা বলছিল তিনজনে।

কিকিরা দোতলার সিঁড়ি খুঁজে নিলেন। "এসো।"

সিঁড়ির ধাপগুলো মাঝারি উঁচু, কিন্তু চওড়া যথেষ্ট, আর লম্বাও।

তারাপদ বলল, "কতকালের বাড়ি হবে, কিকিরা? শ'খানেক বছরের পুরনো তো হবেই।"

"শ' তো সেদিনের কথা, আরও পুরনো।"

সিঁড়ির একটা বাঁক শেষ হল, পরের বাঁক ডান-হাতি। কিকিরা ইশারা করলেন। বাঁকের মুখে দেওয়ালে একটা হরিণের শিং আটকানো। মাথা নেই হরিণের, শুধু একটা কালো কাঠের ওপর আশ্চর্য কায়দায় শিং দুটো লাগানো। জায়গাটায় আলো নেই, ছায়া। তবু আন্দাজে মনে হয়, ধুলো আর ময়লা জড়িয়ে আছে শিংয়ের চারপাশে। কাঠে।

দোতলায় এসে দাঁড়ালেন কিকিরারা।

চওড়া বারান্দা। লম্বাও কম নয়। এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক পায়চারি করছিলেন বারান্দায়। দেখতে পেয়ে গেলেন কিকিরাদের।

কিকিরা হাত তুলে নমস্কার করলেন। "পানুবাবু আমায় পাঠিয়েছেন। আপনি হরিচন্দনবাবু!"

মাথা নেড়ে উনি বললেন, "হ্যাঁ। আমি হরিচন্দন। ... আসুন, আপনারই অপেক্ষা করছিলাম।" কথা বলতে বলতে তারাপদর দিকে তাকালেন একবার।

কিকিরা জামার পকেট থেকে পানুবাবুর চিঠিটা বার করে এগিয়ে দিলেন।

চিঠি নিতে নিতে হরিচন্দন বললেন, "পানু আজ সকালেও ফোন করেছিল। নামটা আপনার কী যেন, কিঙ্কর ..."

"কিঙ্করকিশোর রায়। ছোট করে কিকিরা।"

চিঠি দেখতে দেখতে হরিচন্দন বললেন, "পানুর সঙ্গে আমার আগেও কথা হয়েছে। শুনেছি সবই। ... আসুন, বসুন।"

বারান্দার মাঝমধ্যিখানে একটা ভারী সেকেলে আর্মচেয়ার। বেতের বুনুনি আগাগোড়া, তার ওপর হালকা গদি। চেয়ারের পাশে গোলমতন শ্বেতপাথরের টেবিল। বড় নয় তেমন। টেবিলের ওপর চায়ের কাপ, পট, চশমার খাপ, একটা গোলমতন প্লাস্টিকের জার। তার মধ্যে দু'-তিনটে চুরুট। লাইটারও পড়ে আছে পাশে।

হরিচন্দনবাবু আবার বসতে বললেন। কাছেই বারান্দার গায়ে গায়ে সাজিয়ে-রাখা গোটা তিনেক কাঠের চেয়ার। হাতলঅলা। একই রকম দেখতে চেয়ার তিনটে। মজবুত, ভারী চেয়ার।

নিজের চেয়ারে বসলেন হরিচন্দনবাবু। হাত তুলে ইশারায় বললেন, "এগিয়ে নিন চেয়ারগুলো। আমি আবার কানে খানিকটা কালা। দূরে বসলে কথাবার্তা শুনতে পাব না ঠিকমতন।"

তারাপদ চেয়ার টেনে এনে কাছাকাছি রাখল।

কিকিরা হরিচন্দনবাবুকে দেখছিলেন। বয়েস হয়েছে ভদ্রলোকের। পঁয়ষট্টির কম বলে মনে হয় না। মাথায় লম্বা, গড়ন দোহারা। অভিজাত মুখশ্রী। শক্ত থুতনি, লম্বা নাক। মাথার পাতলা চুল সবই পেকে গিয়েছে। ওঁর পরনে ধুতি, গায়ে ফতুয়া পাঞ্জাবি, আদ্দির। পায়ে রবারের চটি। সাদা।

হরিচন্দনবাবু ডাকলেন কাউকে।

কিকিরা আর তারাপদ এতক্ষণে বসে পড়েছেন।

ভেতরের ঘর থেকে একজন বেরিয়ে এল। এ-বাড়ির কাজের লোক। মাঝবয়েসি।

হরিচন্দনবাবু বললেন, "কে রে, সাধন! চা-টা দে এখানে। একটু পরে বাতি জ্বেলে দিয়ে যাবি।"

দিনের আলো মরে আসছে। বারান্দায় ছায়া নেমে কালচে ঝাপসা হয়ে এল। এটা বোধ হয় দক্ষিণ-পশ্চিম দিক।

হরিচন্দন বললেন, "রায়মশাই, পানুর মুখে আমি আপনার কথা শুনেছি। পানুকে আমি খুব বিশ্বাস করি। ওর বড়দা আমার বন্ধু ছিল। নামকরা ডাক্তার

ছিল সে। রোগী দেখার সময় হাসিঠাট্টা করত, বুঝতে দিত না সে একজন রাশভারী ডাক্তার। তা সে নিজেই একদিন চলে গেল হঠাৎ।”

“আমি জানি পানুবাবুর দাদা বড় ডাক্তার ছিলেন।” কিকিরা বললেন।

“জানেন তবে! ... যাক, কাজের কথা হোক। পানুর মুখে আমি শুনেছি ঠিকই তবে সেটা পরের মুখে ঝাল খাওয়া। আপনার মুখ থেকে শোনাই ভাল। কী করেন আপনি ?”

“এমনিতে কিছু করি না। বেকার!” কিকিরা হাসলেন মুচকি।

“পানু বলেছিল, আপনি প্রাইভেটলি ইনভেস্টিগেশান করেন। ডিটেকটিভ!”

“আজ্ঞে না। আমি ডিটেকটিভ নই। কোনও কালেই ছিলাম না। আসলে আমি ম্যাজিশিয়ান ছিলাম এককালে। খেলা দেখাতাম। কপাল দোষে আমার সেই পেশাটি চলে গেল। এখন ...”

“আপনি ম্যাজিশিয়ান! পানু একবার বলেছিল বটে। তা সেই খেলা দেখানো ছেড়ে নতুন করে এখন—”

“আজ্ঞে, আমি একটু শখ করে চোর ছ্যাঁচড় পাজি নচ্ছার ধরার চেষ্টা করি। পানুদার হল ওকালতি, ক্রিমিন্যাল কেস, আমাকে ক্রিমিন্যাল ক্যাচার বলতে পারেন।” কিকিরা হাসি হাসি মুখে বললেন, “আমাদের দেশে ঘটি বাটি চালা, চালপোড়া খাওয়ানো, এসব কতরকমই হয়। আমাকেও তার মধ্যে ফেলতে পারেন। হাতুড়ে বিদ্যে, মাঝে মাঝে লেগে যায়, আবার—”

হরিচন্দন হালকাভাবে হাসলেন। “ঠিক আছে। আমি পানুর সঙ্গে কথা বলে বুঝেছি, আপনাকে দিয়ে হতে পারে। ডিটেকটিভের দরকার আমারও ছিল না। দরকার ছিল এমন লোক যে আমার মৃণালকুঞ্জে নজর রাখতে পারবে। কাজটা আপনি নিয়ে নিন।”

কিকিরা বললেন, “কাজটা কী ?”

“বলছি।” বলে হরিচন্দন তারাপদর দিকে তাকালেন, “এই ছেলেটি— ?”

“তারাপদ। আমার চেলা। আরও একজন আছে, চন্দন। তাকে পরে একদিন দেখবেন। আমরা তিনজনে মিলে কাজ করি। কেন, পানুবাবু আপনাকে বলেননি ?”

মাথা হেলালেন হরিচন্দন। “বলেছিল। নামটাম বলেনি; বলেছিল—আপনার শাগরেদ আছে।” বলতে বলতে বার কয়েক শুকনো কাশি তোলার মতন শব্দ করলেন গলায়। বোধ হয় গলা শুকিয়ে গিয়েছিল। এই সময়টা বড় খারাপ। গরম পড়ছে, অথচ সকাল সন্ধেতে সামান্য ঠাণ্ডা ভাব এসে যায়। তা ছাড়া ধুলো উড়ছে ক'দিনই। বাতাসে বুঝি আবিরের গুঁড়ো ওড়ে এখনও। দোল গিয়েছে কাল। আজও তার জের রয়েছে কোথাও কোথাও।

কিকিরা বললেন, "আপনার কাজটা যে কী, আমি ঠিক জানি না। ভাসা ভাসা শুনেছি পানুবাবুর মুখে। আপনি 'মৃণালকুঞ্জ'-র কথা বললেন, সেটা কী ?"

"বাড়ির নাম। কদমপুরে যে-বাড়িটা আছে আমার, তার নাম। আমার মায়ের নাম ছিল মৃণালিনী। মায়ের নামে বাড়ি।"

"বাড়ি আপনি করেছিলেন ?"

"না," মাথা নাড়লেন হরিচন্দন। "বাবা করেছিলেন। একতলা একটা ছোট বাড়ি। আমাদের কিছু জমিজায়গা বাগান ছিল ওখানে। সেগুলোর বেশিরভাগটাই বাবা বেচে দেন। সামান্য রেখেছিলেন। আমার মায়ের এক অসুখ করল। অদ্ভুত অসুখ। বছরের অর্ধেক দিন গায়ে জ্বর, সঙ্গে কাশি আর শ্বাসকষ্ট। কলকাতা শহরের কত বড় বড় ডাক্তার দেখল, কেউ ধরতে পারল না। কেউ বলে যক্ষ্মা, কেউ বলে হাঁপানি, আবার কারও ধারণা, হার্টের গোলমাল। ডাক্তাররা বললে, মাকে নিয়ে গিয়ে ফাঁকায় আলো-বাতাসে রাখলে মা খানিকটা ভাল থাকবে। তখন বাবা ওই বাড়িটা করেন। বর্ষা আর শীত বাদে বেশিরভাগ সময় মা ওখানে থাকত। শেষে একদিন মা চলে গেল।" হরিচন্দন থামলেন, নিশ্বাস ফেললেন বড় করে।

কিকিরার দুঃখই হল। ভালও লাগল হরিচন্দনকে। কোনওরকম লুকোচুরি নেই। যা ঘটে গিয়েছে—সাদাসিধেভাবে বলছেন।

"বাড়িটা একতলা ?" তারাপদ বলল হঠাৎ। এতক্ষণ সে একটাও কথা বলেনি। মুখ বুজে বসে ছিল। দেখছিল হরিচন্দনবাবুকে।

হরিচন্দন বললেন, "একতলাই ছিল প্রথমে। পরে, বারো চোদ্দো বছর পরে— বাবাও তখন নেই, আমি ওটাকে দোতলা করি। অবশ্য দোতলার মাথায় টাইল্‌স বসিয়েছিলাম।"

"দোতলা করতে গেলেন কেন ?"

"এমনি ; শখ করে। ভাবলাম একটা গ্রামের বাড়ি থাকুক না, মাঝে মাঝে এসে থাকা যাবে। কলকাতায় আমরা যেখানে থাকি— তার অবস্থাটা দেখছ তো !" তারাপদকেও বললেন কথাগুলো। একটু থামলেন। আবার বললেন, সামান্য হেসে, "তখন আমার নিজের ফার্মও ভাল চলছে। হাতে টাকা। পৈতৃক বিষয় তো আছেই। শখ করেই করেছিলাম। কখনও ফ্যামিলি নিয়ে আট-দশদিন কাটিয়ে আসতাম। শনি-রবিবার একবার করে তদারকিও করে আসতে হত। বাগানের টাটকা শাকসবজিও নিয়ে আসতাম।"

"শেষমেশ আর যেতেন না ?" কিকিরা বললেন।

"ঠিকই ধরেছেন," হরিচন্দন বললেন, "বয়েস বাড়ল। কোমরের দিকে কী

হল যে— শয্যাশায়ী হয়ে থাকলাম মাস তিনেক। নিজের ব্যবসা— মানে ফার্মটা অন্যকে গছিয়ে দিলাম। আর ভাল লাগত না। ছেলেটাও বোম্বাই চলে গেল।... তা মৃণালকুঞ্জ পড়েই থাকল ফাঁকা। ... তারপর একদিন আমার স্ত্রীর সঙ্গে কথায় কথায় বাড়িটার একটা গতি করার ব্যবস্থা করলাম। বিক্রি করব না। টাকায় আমার দরকার নেই। ভাল যদি কিছু করা যায়...”

“স্বাস্থ্য নিবাস !”

“আরে না, স্বাস্থ্য নিবাস নয়। আমার এক বন্ধু— রামকমলের অবস্থা দেখে মনে হল, বুড়ো বয়েসে যার দেখার কেউ থাকে না— তার বড় কষ্ট। দেখার লোক যদি-বা থাকে, কেউ আর তেমন করে দেখে না। নিজের ছেলে ভাইপোও অবহেলা করে, মনে মনে ভাবে, বুড়োটা আপদ। ... এই রকম পাঁচ কথা ভাবতে ভাবতে বাড়িটাকে আমি— কী বলব— বৃদ্ধ নিবাস বানিয়ে ফেললাম।”

“এটা কবে করলেন ?”

“বছর পাঁচেক আগে।” বলে হরিচন্দন টেবিলের দিকে হাত বাড়ালেন। গোল কৌটোটা টেনে নিলেন। কাচের মতন স্বচ্ছ প্লাস্টিকের জার। তার মধ্যে কয়েকটা মাত্র চুরুট। ঢাকনা খুলে একটা চুরুট উঠিয়ে নিলেন। বললেন, “দিনে দুটো। একটা ও-বেলায়, একটা এ-বেলায়।” বলে হাসলেন একটু। “যা বলছিলাম। আমার মৃণালকুঞ্জে সেইসব আধ-বুড়ো, বুড়োদের থাকতে দেওয়া হয় যাদের কোনও বড় আধিব্যাধি নেই। কারণ বড় অসুখবিসুখ করলে দেখবে কে ? কেই বা সেবা করবে ?”

তারাপদ বলল, “কাছে কোনও ডাক্তার নেই ?”

“না। মাইলটাক দূরে এক হাতুড়ে আছে ; আর কলোনিতে এক হোমিও বদ্যি। আমাদের রজনীবাবুও শুনেছি দু'-চার শিশি নাক্স, পালসেটিলা, অ্যাকোনাইট রাখে। গৃহ চিকিৎসা। বেয়াড়া রোগী পুষে ঝামেলা বাড়াতে চাইনি আমি।”

“কিন্তু মানুষের শরীর যখন, অসুখ তো করতেই পারে।”

“হ্যাঁ, সাধারণ জ্বরজ্বালা, পেটের গোলমাল কার না হয়! হলে সেই রজনীবাবু, না হয় হাতুড়ে। বড় জোর হোমিওপ্যাথ ডাক্তারকে ধরতে হয়। বাড়াবাড়ি দেখলে হেল্‌থ সেন্টার। তিন মাইল... ।”

সাধন চা নিয়ে এল। বাহারি ট্রে। মনে হল, বেতের তৈরি। চা আর মিষ্টি, একটা প্লেটে নোনতা বিস্কিট।

চা আর খাবার রাখল সাধন। যাওয়ার সময় বাতি জ্বেলে দিয়ে গেল বারান্দার।

“নাও, একটু চা খাও,” বলে কিকিরার দিকে তাকালেন। পরের মুহূর্তে কী খেয়াল হল, লজ্জার মুখ করে হাসলেন, বললেন, “ভুল হয়ে গেল, আজকাল

মুখের ঠিক থাকে না, পানুর বন্ধু আপনি, তুমি করে বলে ফেললাম। নিন, চা খান।"

কিকিরা বললেন হাসিমুখেই। "'তুমি' বলে ঠিকই বলেছেন। পানুবাবুকে আমি দাদা বলি, মুখোমুখি কথার সময় পানুদা। আপনি পানুদার দাদার বন্ধু। আমাকে তুমি বলার হক আপনার আছে। বয়েসে আপনি বড়।"

"আমার সিক্সটি সেভেন। তোমার ?"

"পঞ্চাশ ধরেছি এবার।"

"অনেকটাই ছোট বয়েসে।"

কিকিরারা চা নিলেন।

চুরুট ধরানো হয়ে গিয়েছিল হরিচন্দনের। ধোঁয়া টানলেন। "তা হলে তুমি রাজি হচ্ছ ? চোখে একবার বাড়িটা দেখলে—"

"দেখব," কিকিরা বললেন, "আমি নিজেই দেখার কথাটা তুলতাম। কী ভাবে দেখতে যাব বলুন ?"

"আমি তোমাদের নিয়ে যাব। কবে যাবে ?"

"যেদিন আপনি বলবেন।"

"কালকেই চলো। আমি গাড়ি নিয়ে যাব। তোমরা এখানে এলে, এখান থেকেই যাওয়া যাবে। না হয় তোমাদের তুলে নিতে পারি। কোথা থেকে তুলব বলো ! তবে বিকেলের দিকেই যাওয়া ভাল। ধরো, চারটে নাগাদ। এখন বেলা বড় হয়েছে। হাতে সময় থাকবে বাড়িটা দেখার।"

কিকিরা তারাপদর দিকে তাকালেন।

তারাপদ বলল, "আমার অসুবিধে হবে না। খানিকটা আগে আগে ছুটি নিয়ে অফিস থেকে বেরিয়ে পড়ব। তবে চাঁদু—"

"কে চাঁদু ?"

"আমার আরেক শাগরেদ। আগেই বলেছি আপনাকে। চাঁদু— মানে চন্দন ডাক্তার।"

"ও ! ... তা তোমরাই আগে চলো। দেখে নেবে জায়গাটা, আমার বাড়ি মৃণালকুঞ্জ ; তারপর ওই ডাক্তারকে নিয়ে যেয়ো।"

কিকিরা চা খেতে খেতে বললেন, "আপনার কাছ থেকে জানার কথা অনেক আছে। তবে তার আগে বাড়ি আর জায়গাটা একবার দেখে নিতে চাই। কলকাতা থেকে কতটা দূর হতে পারে ?"

"মাইলের হিসেবে বারো চোদ্দো। যশোর রোড দিয়ে যেতে হয়।"

"এখন ওখানে ক'জন আছেন ?"

"চারজন। ছিল ছয়। দু'জন চলে গেল। ওই চারজন বাদ দিলে রাঁধুনি, কাজের লোক আর মালী একজন। মালীই আমার বাড়ির দরোয়ান।"

"যাঁরা আছেন তাঁরা নিজেরা খরচাপাতি করেই..."

"না না," মাথা নাড়লেন হরিচন্দন, "খরচাপাতি বলতে বাঁধাধরা কিছু নেই। যার যেটুকু সামর্থ্য দেন ; কেউ দু'-চারশো, —কেউ বা পাঁচ-ছয়— বাকিটা আমার। দু'বেলা খাওয়া আর সাদামাঠা জলখাবার— টাকাপয়সা আমাকেই দিতে হয়।"

কিকিরা কয়েক মুহূর্ত দেখলেন হরিচন্দনকে। "আপনার তা হলে দায় অনেক। টাকাও যায় মাসে মাসে কম নয়।"

"যায়, তবে রাজার হালে তো ওরা থাকে না। সাদাসিধে খাওয়া-দাওয়া। কাজের লোকদের সব খরচটাই আমার। তবে কি জানো ভায়া, আমার গায়ে লাগে না। একটা ভাল কাজ করব বলেই তো হাত দিয়েছিলাম। টাকার কথাও মাথায় ছিল। দেখলাম, আমার যা আছে তার থেকে খানিকটা গেলেও আমরা মরে যাব না। অন্য কোনও দায় আমার নেই। ছেলে বাইরে। তার ব্যবসাও ভাল চলে। এ-বাড়িতে আমরা মাত্র দুটি প্রাণী আর কাজের লোক। নীচে ভাড়া বসিয়েছি। ভাড়ার টাকায় যা হাতে আসে তার সঙ্গে আরও দু'-পাঁচ হাজার যায় আমার মাসে-মাসে। ভাবি, যা করছি— আমার মায়ের নামেই করছি। টাকা জমিয়ে যক্ষ সেজে বসে থেকে আমি কী করব!"

কিকিরা কেমন মুগ্ধ হয়ে শুনলেন কথাগুলো।

॥ ৩ ॥

পুরনো দিনের মানুষ, কাজেকর্মে এলানো নয়, ঘড়ির কাঁটা ধরেই যেন চলেন হরিচন্দন। কিকিরাদের মিনিট দশেক দেরি হয়েছিল আসতে। কারণ চন্দন। সেও হাসপাতালের বাকি কাজ অন্য একজনকে দেখতে দিয়ে কিকিরাদের সঙ্গী হয়েছিল।

হরিচন্দনবাবু তৈরি। তাঁর গাড়ি নীচে দাঁড়িয়ে। ড্রাইভার পেছনের ডালা উঠিয়ে কী যেন দেখে নিচ্ছিল।

চন্দন নিচু গলায় তারাপদকে বলল, "অস্টিন অফ ইংল্যান্ড। ম্যাচ করে গিয়েছে বৃদ্ধের সঙ্গে। এসব জাঁদরেল গাড়ি কলকাতায় এখন রেয়ার দেখা যায়।"

তারাপদ গাড়ির কিছু বোঝে না ; বলল, "কেন, রাস্তায় বিগড়ে যাবে নাকি?"

"মনে হয় না ; দেখে মনে হচ্ছে যত্ন করে রাখা, ওয়েল মেনটেইন্‌ড।"

কিকিরা চন্দনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন হরিচন্দনের, তারপর সামান্য কুণ্ঠার সঙ্গে বললেন, "আমাদের একটু দেরি হয়ে গেল বোধ হয়।"

"ও কিছু নয়। আসুন—।"

হরিচন্দনবাবু পেছনের সিটেই বসলেন। পাশে কিকিরা। জানলার অন্য

ধারে তারাপদ। চন্দন সামনে বসল।

ড্রাইভারের নাম বনমালী। মাঝবয়েসি। হরিচন্দনবাবু বললেন, "বনমালী, এক কাজ করো, বাগবাজার ধরে টালা হয়ে দত্তবাগান। যশোর রোড ধরে নেবে।"

গাড়িতে স্টার্ট দিল বনমালী।

কিছুক্ষণ কোনও কথা নেই। হরিচন্দনের পাশে কিকিরা, কিকিরার পাশে তারাপদ। কথাবার্তা বলার জন্যেই বোধ হয় কিকিরাকে পাশে বসিয়েছিলেন হরিচন্দনবাবু।

খানিকটা এগিয়ে এসে হরিচন্দন বললেন, "রায়মশাই আপনাকে আগেই একটা কথা বলে নিই।"

কিকিরা আলগাভাবে হেসে বললেন, "আবার আপনি কেন, দাদা। তুমিই ঠিক হয়েছিল কাল।"

"ও, হ্যাঁ। একেবারে নতুন তো— ! মনে থাকে না। ...যাক গে, আমি যা বলছিলাম। তোমাকে আমি নিয়ে যাচ্ছি যেখানে, সেখানের লোকজন যারা আছে—তারা হয়তো জানতে চাইবে, তুমি কে ? মুখে না বললেও মনে মনে ভাববে নিশ্চয়, এই লোকটা আবার কে ?"

"তা ভাবতেই পারে।"

"আমি কিন্তু বলব, তুমিই এখন থেকে মৃণালকুঞ্জর নতুন ম্যানেজার-কাম-কেয়ারটেকার। কী, আপত্তি নেই তো ?"

"আজ্ঞে না ; কাজটা আমি হাতে নিয়েছি যখন, তখন আপত্তি কীসের !"

"ভাল কথা। ...তুমি কবে থেকে আসতে পারবে ?"

"যখন থেকে আপনি বলবেন। কাল পরশু—যে কোনও দিন থেকে।"

"তবে পরশুই চলে আসবে। বনমালী তোমায় পৌঁছে দিয়ে যাবে।"

কিকিরা একবার ঘাড় বেঁকিয়ে তারাপদকে দেখলেন। তারাপদ শুনতে পাচ্ছে কথাগুলো। চন্দন সামনে বসে। তার কানে গেল কিনা কে জানে !

"আপনার আগের ম্যানেজারের কী হল ?" কিকিরা বললেন। জানেন তিনি, শুনেছেন, তবু বললেন।

"দীননাথ ! সে পালিয়েছে।"

"ঠিক কবে পালাল ?"

"মুরলীবাবু আত্মহত্যা করার পর। ব্যাপারটা এমন আচমকা ঘটে গেল যে, দীননাথের মাথা বিগড়ে গেল। ভয়ও পেয়ে গিয়েছিল। তার ওপর থানা পুলিশের হাঙ্গামা। পোস্টমর্টেমও হয়েছিল বডির। দীননাথ আমায় এসে বলল, সে আর চাকরি করবে না। একটা দিনও আর থাকবে না মৃণালকুঞ্জে। ...তো আমি বললাম, বেশ, না থাকবে থেকো না। দীননাথ চাকরি ছেড়ে দিল।"

তারাপদ ঘাড় বেঁকিয়ে কথা শুনছিল হরিচন্দনের। বলল, "উনি এত ভয় পেলেন কেন ? আগেও তো..."

"হ্যাঁ, মাস দুই-আড়াই আগে বেচারি শ্রীকান্তবাবু আগুনে পুড়ে মারা গেলেন। সেও অদ্ভুত ! তখন থেকেই দীননাথ ভয় পেয়ে গিয়েছিল। তবু চলে যেতে চায়নি।"

"ভয়ের কারণটা কী ? অবশ্য এটা ঠিক যে, পরপর দুটো বড় দুর্ঘটনা ঘটলে নার্ভ শক্ত রাখা কঠিন," কিকিরা বললেন। "দীননাথ কি দুর্বল মনের মানুষ ছিলেন ? মানে খানিকটা ভিতু ধরনের ?"

"কেমন করে বলব ! ও প্রায় দু' বছর মৃণালকুঞ্জর দেখাশোনা করেছে। আগে কখনও অমন ছটফট, কান্নাকাটি করেনি। এবার একেবারে হাতেপায়ে ধরে ফেলল একরকম। সে কিছুতেই আর চাকরি করবে না। আমিই বা তাকে জোর করে ধরে রাখি কেমন করে ! ছেড়ে দিলাম।"

কিকিরা বুড়ো আঙুলের ডগা দিয়ে কপালের ওপর দিকটা চুলকে নিতে নিতে কী ভেবে বললেন, "দীননাথের বয়েস কত হয়েছিল ? আপনার চেনা ?"

"বয়েস পঞ্চাশের ওপর। আমার মুখচেনা ছিল। আগে ও আমাদের এদিকেই থাকত। কাজ করত একটা হোসিয়ারি কোম্পানিতে। কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর যখন যা জুটত তাই করত। শেষে ওই যে—আজকাল যেটা খুব চলে— ফিনান্সিয়াল ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানি—কী যেন নাম—তার এজেন্ট..."

কথা শেষ করতে পারলেন না হরিচন্দন, দমকা কাশি এসে গিয়েছিল। সামলাতে লাগলেন।

কিকিরা বললেন, "একজন বয়স্ক মানুষের হঠাৎ এমন ভয় পাওয়ার—আশ্চর্য !"

"আরে কী বলব— !" হরিচন্দন বললেন, "ওর মাথায় কোত্থেকে এক উদ্ভট ভাবনা জুটে গেল কে জানে ! আমায় বলল, মৃণালকুঞ্জে কোনও অশুভ আত্মা প্রেতাত্মার নজর পড়েছে।"

"কী ?" কিকিরা অবাক ! তারাপদও ঘাড় ঘুরিয়ে হরিচন্দনকে দেখতে লাগল। চন্দন সামনের সিটে বসে, মাথা-ঘাড় পেছন দিকে হেলিয়ে দিল। কিকিরা বললেন, "অশুভ আত্মা প্রেতাত্মা ! তার মানে ?"

হরিচন্দন বললেন, "মানে আমি জানি না, ভায়া। আমিও বুঝিনি। দীননাথ যা বলেছিল তার মর্ম হল : কোনও অশুভ আত্মা মৃণালকুঞ্জের ওপর নজর দিয়েছে।"

"কেমন করে বুঝল দীননাথ !"

"ও বলল, যে দু'দিন দুটো দুর্ঘটনা ঘটল, সেই দু'দিনই একটা জিনিস লক্ষ করেছে ও। সন্ধে থেকে মৃণালকুঞ্জে কেমন একটা বিচ্ছিরি বাজে ধূপের গন্ধ

পাওয়া যায়, রাত্রে মনে হয় আশেপাশে কোথাও একটা সাপুড়িয়া তার বাঁশি বাজাচ্ছে, শব্দটা অস্পষ্ট কিন্তু বাজতেই থাকে, আর মাঝরাতে এমনভাবে কুকুর কাঁদে যে, ভীষণ অস্বস্তি হয়। তার ওপর গাছপালার আওয়াজ তো আছেই।"

তারাপদ বলল, "ভৌতিক ব্যাপার! অশরীরী। ...তা উনি—দীননাথবাবু কখন থেকে এটা বুঝলেন? প্রথমবারের পর— ?"

"প্রথমবার ও অতটা ঠাওর করতে পারেনি। গোড়ায়। পরে সন্দেহ হচ্ছিল। দ্বিতীয়বারের পর দীননাথ মন থেকে আর ধারণাটা তাড়াতে পারল না। ঘাবড়ে গিয়েছিল। ভয় পেয়েছিল ভীষণ।"

বনমালী ভাল গাড়ি চালায়। না জোরে না ধীরে, একই ভাবে চালিয়ে যায়। অকারণ হর্ন দেওয়া নেই, হুটহাট ব্রেক মারা নেই। ততক্ষণে যশোর রোড ধরে ফেলেছে বনমালী।

রাস্তাঘাট ফাঁকা নয়, আবার শেষ বিকেল থেকে যেমন ভিড় বাড়ে তেমন ভিড়ও নেই। পাতিপুকুরের ব্রিজের কাছে অল্প জ্যাম ছিল, গাড়ি দাঁড়াল সামান্যক্ষণ; আবার চলতে লাগল।

চন্দন একই ভাবে বসে। মাঝেসাঝে বনমালীকে দু'-একটা কথা বলছিল।

হরিচন্দনবাবুর কী যেন মনে পড়ে গেল হঠাৎ, কিকিরাকে বললেন, "ও, হ্যাঁ; একটা কথা খেয়াল হল। দীননাথ বলছিল, দু' দিনই—ঘটনা দুটো ঘটে যাওয়ার পর সে আমাদের মৃণালকুঞ্জর সামনের দিকের ফটকের বাইরে পিলারের পাশে একটা জিনিস দেখেছে। মাটির বড় ধুনুচি, ঘুঁটে পোড়া, এক মুঠো হলুদ রং মেশানো চাল, মাটির ছোট্ট ধেবড়া পুতুল—এক-দেড় আঙুল লম্বা বড় জোর। সাপের খোলস আর সিঁদুর মাখানো আমপাতা, একটা জবাফুল...।"

তারাপদ বলল অবাক গলায়, "তুক?"

"হতে পারে," হরিচন্দন বললেন, "দীননাথের কথায়, তুক।"

কিকিরা বললেন, "ভৌতিক কাণ্ডকারখানা, তার সঙ্গে তুকতাক। এ তো বেশ জমে গিয়েছে, দাদা।" বলে হাসলেন মুচকি।

"তোমারও কি ভূতে বিশ্বাস আছে, রায়?"

"খাঁটি ভূতে ভয় পেতে পারি," কিকিরা বললেন, "নকল ভূতে ভয় পাই না।"

"আমি—" হরিচন্দন ঠাট্টার গলায় বললেন, "একসময় ভূতচর্চা করেছি। আমার দুই জেঠতুতো খুড়তুতো ভাইয়ের সঙ্গে বাড়ির চিলেকোঠায় বসে প্ল্যানচেট করতাম; সার্কেলেও বসেছি।"

"পেয়েছেন ভূতদের?"

"দু'বার পেয়েছি। একবার এক ফরাসি ভূত এল চন্দননগর থেকে, আর-একবার আগ্রা থেকে এক পালোয়ান ভূত। দু'জনেই যে কী বলতে চাইল বুঝলাম না! ব্যাপারটা নিয়ে রগড় মন্দ হয়নি। তা রায়ভায়া, মৃণালকুঞ্জে ভূত

আসার কোনও কারণ দেখছি না। আমার পিতামশাই মাতাঠাকরুন সজ্ঞানে গঙ্গালাভ করেছেন। আমি এখনও মরিনি। গিন্নিও বেঁচে। ছেলে খাসা ব্যবসা করছে। বউমা ঘরসংসার করে আর ফাঁকেফোকরে পুতুলের ডিজাইন করে। নাতি বাচ্চা। পড়াশোনা করে স্কুলে। তা হলে ভূতটা আসবে কোথা থেকে ?”

বনমালী আচমকা ব্রেক করল। একটা গোরু এসে পড়েছিল রাস্তার মাঝখানে, অন্য একটা মোষের তাড়া খেয়ে।

হরিচন্দন দেখলেন। বললেন, “বনমালী, সামলে চলো।”

নাগেরবাজারের কাছে হালকা ভিড়। তারপর রাস্তা বেশ ফাঁকা। বিকেল পড়ে এলেও আলোয় ঘোলাটে ভাব ধরেনি।

মৃণালকুঞ্জ বড় রাস্তার গায়ে নয়। বাসরাস্তা থেকে একটা আধাআধি পাকা রাস্তা, পাথরের টুকরো আর খোওয়া ছড়ানো, খানিকটা এবড়োখেবড়ো, চলে গিয়েছে ডাইনে। পশ্চিম দিকে। ছোট গ্রাম, মাঠঘাট, খেত, গাছপালা—চোখের সামনে শান্ত একটা ছবি ভেসে ওঠে। রোদ মরে আসছে, আলো রয়েছে। বাতাস রয়েছে ফাল্গুন-চৈত্র মাসের। ফাল্গুন শেষ হয়েছে সবে গতকাল।

ইলেকট্রিক তারের খুঁটি দেখতে পেল চন্দন। কী যেন বলল।

বড়জোর সিকি মাইল, হয়তো তারও কম। মাঝপথে একপাশে একটা টিনের শেড, খানিকটা জায়গা পাঁচিল ঘেরা। ছোট কারখানার মতন দেখায়। হয়তো তাই। তবে বন্ধ।

“কারখানা ! এখানে ?” চন্দন বলল পেছন দিকে ঘাড় হেলিয়ে।

হরিচন্দন একটা কানে কম শোনেন। কিন্তু চন্দনের কথা মোটামুটি কানে গিয়েছিল। বললেন, “বন্ধ হয়ে গিয়েছে। জেলি, সস, পপকর্ন, চিপস—এইসব ফুড প্রোডাক্টসের কারখানা করেছিল একটা কোম্পানি। দুই বন্ধু। বছরখানেকের মধ্যে গণেশ উলটে গেল। ওসব কি এখানে চলে ? তবে আমার খানিকটা সুবিধে হল। ওরা জারুল মোড় থেকে ইলেকট্রিকের তার টেনে এনেছিল—পয়সা খরচ করে। আমার মৃণালকুঞ্জ পর্যন্ত—বাকিটা আমি ব্যবস্থা করে নিলাম। কম খরচে হল।”

আবার মাঠ। সবজি খেত। চমৎকার শশা, কুমড়ো ফলিয়েছে খেতের মালিক। বাঁশঝাড়। নিমগাছ।

মৃণালকুঞ্জ এসে গেল।

কিকিরারা গাড়ি থেকে নামলেন। বাইরে থেকে দেখলেও তারিফ করতে হয়। হাত কয়েক উঁচু পাঁচিল, তার ওপর বেঁকানো লোহার পোস্ট, কাঁটাতার। ফটক দিয়ে ভেতরে ঢুকলেই প্রথমে নজরে পড়ে কাঁটাঝোপের বেড়া, রাংচিতে। সামনের মাঠে বাগান। সাধারণ ফুলের গাছ। যত্ন বিশেষ নেওয়া

না হলেও একেবারে অযত্নে জঙ্গল হয়ে যায়নি। বড় গাছের মধ্যে আম, পেয়ারা, এমনকী একটা বেলগাছও চোখে পড়ে।

মৃণালকুঞ্জর বাড়িটার ধরন বা ছাঁদ— অনেকটা ইংরেজি 'এল' (L) অক্ষরের মতন। নীচের তলায় পাকা গাঁথুনি ছাদ, দোতলার মাথায় টালির ছাদ। বাড়িটার গায়ে গায়ে করবী, টগর, কাঠচাঁপা আর লতাপাতা চোখে পড়ে।

মালী এসে দাঁড়াল সামনে।

হরিচন্দন কিকিরাকে বললেন, "এখানকার মালী, চৈতন্য। ও-ই আবার দরোয়ান।" বলে চৈতন্যর দিকে তাকালেন, "বাবুরা কোথায় ?"

বাবুদের মধ্যে একজনকে কাছাকাছি দেখা যাচ্ছিল। বাগানের একপাশে বসে যেন কিছুর পরিচর্যা করছিলেন।

চৈতন্য বলল, "ডাকব বড়বাবু ?"

"হ্যাঁ।" মাথা নাড়লেন হরিচন্দন।

কয়েক ধাপ সিঁড়ির গায়েই লম্বা বারান্দা। সিমেন্ট ফেটেফুটে গিয়েছে। মাঝেমাঝেই মেরামতির দাগ। একটা কাঠের চেয়ার, ভাঙা মোড়া, একটা বেঞ্চি আর কাঠের টেবিল পড়ে ছিল।

তারাপদ আর চন্দন পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। দেখছিল। নিজেদের মধ্যে কথাও বলছিল নিচু গলায়।

হরিচন্দন বললেন, "ভাগের মা গঙ্গা পায় না বলে একটা কথা আছে, রায়। জানো তো ? অনেক বলেকয়েও বাড়িটা আমি সাফসুফ রাখতে পারলাম না। দীননাথ চলে যাওয়ার পর আরও বেহাল হয়ে আছে।"

"এখন কে দেখাশোনা করে ?"

"কেউ না। ঠাকুর, বামুনে যা পারে রাঁধে আর নকুল বেটা একবার হয়তো ঝাড় মারে ঘরদোরে। চৈতন্যই এখন মুরুব্বি।"

"যাঁরা আছেন তাঁরাই তো খানিকটা দেখাশোনা করতে পারেন।"

"একটু আধটু করে হয়তো। আগ বাড়িয়ে কেউ দায় নিতে চায় না।"

আরও দু'-পাঁচটা কথার মাঝখানে চৈতন্য মৃণালকুঞ্জর বাসিন্দাদের ডেকে আনল।

হরিচন্দনবাবুকে নমস্কার করলেন সকলেই। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলেন কিকিরাদের।

কোনও ভূমিকা না করেই হরিচন্দনবাবু কিকিরার সঙ্গে প্রৌঢ় ভদ্রলোকদের আলাপ করিয়ে দিতে লাগলেন।

"ইনি বলাইবাবু। বলাইচাঁদ দত্ত।... উনি রজনীবাবু—রজনীকান্ত চাটুজ্যে। আর উনি সলিল দাশগুপ্ত। ...কই, জলধরবাবু—সামনে আসুন ; জলধর হালদার।... আপনাদের দেখাশোনার জন্যে এঁকে আনলাম, নতুন মানুষ। এঁর নাম কিঙ্করকিশোর রায়। আমার চেনাজানা। এখন থেকে ইনিই

মৃণালকুঞ্জর হেড। আপনাদের দেখাশোনা ইনিই করবেন। নতুন কেয়ারটেকার।"

কিকিরার মুখে অমায়িক হাসি। বিনীত ভঙ্গি। স্বাভাবিক সৌজন্য দেখিয়ে নমস্কার করলেন ভদ্রলোকদের।

ভদ্রলোকরা বোধ হয় সামান্য অবাকই হয়েছিলেন। বেখাপ্পাভাবে হাত তুলে প্রতিনমস্কার জানালেন।

হরিচন্দন বললেন, "দীননাথ চলে যাওয়ার পর আপনারা সবাই ভয়ে ভয়ে আছেন। আগেরবার এসে আমি দেখলাম ঘাবড়ে গিয়েছেন আপনারা। না, না, ঘাবড়াবার কিছু নেই। সংসারে এমন ঘটনা ঘটে, দুর্যোগ আসে। ভয়টয় পাবেন না কেউ। এবার যাঁকে বসিয়ে যাচ্ছি—তিনি শক্ত ধাতের মানুষ! ...কী জলধরবাবু? জোর পাচ্ছেন তো মনে! জোর করুন। দীননাথ একটা ভিতু, মুখ্যু। ওর কথাবার্তা ভুলে যান। যা প্রাণে চায় বলেছে। গপ্প ফেঁদেছে। নিন, আপনারা এবার আগের মতন থাকুন। আমি তো বলছি, কোনও ভয় নেই।"

তারাপদরা সামান্য তফাতে দাঁড়িয়ে দেখছিল মৃণালকুঞ্জর বাসিন্দাদের।

চারজন মানুষই বৃদ্ধ নয়, মানে কাউকেই সত্তর-বাহাত্তর বলে মনে হয় না। অথর্ব অক্ষমও নন। এঁদের অবশ্যই প্রৌঢ় বলা যায়, কিংবা আধ-বুড়ো। বলাইবাবুর চেহারা দেখলে বাষট্টির কম মনে হয় না। মাথায় বেঁটে, গোল ধাঁচের গড়ন, মাথায় টাক, হাত-পা শক্ত হলেও মাপে খাটো। মুখ গোল, চোখও গোল, বড় বড়; নাক মোটা। গায়ের চামড়া যেন কুঁচকে গিয়েছে। মুখেরও। ভদ্রলোক একটা ঢলঢলে প্যান্ট পরে গায়ে সুতির স্পোর্টস গেঞ্জি গলিয়ে হাতে বেতের মোটা মতন লাঠি নিয়ে যেন কোথাও ঘুরতে বেরুচ্ছিলেন। হয়তো বিকেলে হাঁটাচলা করার অভ্যেস রয়েছে। পায়ে ক্যানভাসের বুটজুতো। খাকি রঙের।

চন্দন নিচু গলায় তারাপদকে বলল, "চেহারা দেখে মনে হচ্ছে ব্লাডসুগারের পেশেন্ট।"

রজনীকান্ত ঢেঙা, রোগা, শীর্ণ। মাথায় সামান্য সাদা চুল। মুখের ধাঁচ লম্বা, সোজা নাক, কপাল কুঁচকোনো, গাল তুবড়ে গিয়েছে। হাতে-কাচা ধুতি আর আধ-ময়লা পাঞ্জাবি পরনে। পায়ে চটি। রজনীকান্তই বাগানে বসে গাছের পরিচর্যা করছিলেন সামান্য আগে। ডাক পেয়ে বাগান ছেড়ে উঠে এসেছেন। হাতে একটা লোহার শিক। ভদ্রলোকের বয়েস সাতষট্টি কি আটষট্টি হবে! না, সামান্য কমই! চোখের তলায় চামড়া ঝুলে পড়েছে।

সলিলবাবু আর গৌরবাবু মোটামুটি মাঝারি মাথার মানুষ, না-লম্বা না-বেঁটে। সলিলবাবুর হয়তো বাষট্টি-চৌষট্টির আশেপাশে বয়েস। গায়ের রং ময়লা। চৌকোনো মুখ। মাথার মাঝখানে টেরি। চুল সামান্য।

কাঁচাপাকা। দোহারা গড়ন। চোখে চশমা। পরনে গেরুয়া রঙে ছাপানো লুঙ্গি, গায়ে একটা পাতলা বুশ শার্ট, দু'-একটি মাত্র বোতাম লাগানো আছে, বাকিগুলো খোলা। চোখের দৃষ্টি সতর্ক।

জলধরবাবুকে দেখলেই মনে হয় ভদ্রলোক যেন সবেই ষাট ছাড়িয়েছেন। মাথার চুল পাকেনি বললেই চলে, মোটা গোঁফ, গোঁফের চুলে সাদা দাগ ধরেছে। গায়ের রং কালো। চোখের দৃষ্টিতে কেমন এক বিরক্তি মেশানো। সামান্য লালচে চোখ। হাতের আঙুল মোটা মোটা। ডান হাতে একটি পলার আংটি। ভদ্রলোকের পরনে ছিল ধুতি আর গায়ে ফতুয়া।

হরিচন্দন আর দেরি করলেন না। কিকিরাকে বললেন, "এসো, বাড়িটা তোমায় দেখিয়ে দি।" বলেই কী খেয়াল হল, তারাপদদের ডাকলেন হাত নেড়ে। তারপর মুখ ফিরিয়ে বলাইবাবুদের দিকে তাকালেন। "এরা দু'জন রায়ের লোক। ওরা সঙ্গে এসেছে।" বেশি কিছু বললেন না।

কিকিরাদের নিয়ে হরিচন্দন বাড়ি দেখাতে চললেন।

নীচের তলায় ঘুরতে ঘুরতে কিকিরা বললেন, "হরিচন্দনদা, এখানে প্রথম ঘটনা তা হলে ওই আগুনে পোড়া ?"

"হ্যাঁ। শ্রীকান্তবাবু আগুনে পুড়ে মারা গেলেন।"

"তার আগে কিছু হয়নি ?"

"না। মৃণালকুঞ্জে কিছু হয়নি। তবে মৃণালকুঞ্জ ছেড়ে দু'-চারজন চলেও তো গিয়েছে। তাদের মধ্যে সতীনাথবাবু মারা গিয়েছেন শুনেছি।"

"ছেড়ে চলে গিয়েছেন যাঁরা তাঁরা কি এমনিই গিয়েছেন, না— ?"

"কারও হয়তো পোষায়নি। কেউ বা শেষপর্যন্ত কিছু ভেবে আত্মীয়দের কাছেই ফিরে গিয়েছেন। কিংবা ওরাই ফেরত নিয়ে গিয়েছে। একজন তো বরাবরের মতন হরিদ্বারে চলে গেলেন। ধর্মটর্ম করে বাকি জীবনটা কাটাবেন।"

"এখানে তা হলে বরাবর কেউ থাকে না ?"

"আছে। রজনীবাবু আছেন। বলাইবাবুর বছর দুই হতে চলল। ...শোনো রায়, আমার এখানে ছ'জনের বেশি লোকের থাকার ব্যবস্থা নেই। কেউ যদি চলে যায়, অসুবিধে হচ্ছে ভেবে—আমি তাকে আটকাবার কে ? যাবে যাক। তার জায়গায় আবার কেউ এসে পড়ে।"

"প্রথম ঘটনাটা কবে যেন ঘটেছিল, দাদা ?"

"পাকাপাকি হিসেবে—এই তোমার কার্তিক মাসের শেষে।"

"দ্বিতীয়টা—মানে আত্মহত্যার ঘটনাটা ?"

"গত মাসে, মাঘ মাসে।"

হরিচন্দন এবার সিঁড়ি ধরে দোতলায় উঠতে লাগলেন।

পরের দিন কিকিরার ঘরে মিটিং বসেছিল : চন্দন, তারাপদ আর কিকিরা।

চন্দন বলল, "কাল তা হলে আপনি মৃণালকুঞ্জে চললেন ? বাক্স বিছানা বাঁধা হয়ে গিয়েছে ?" ঠাট্টার গলাতেই বলল সে।

কিকিরা বললেন, "ওয়ান সুটকেস অন্‌লি। বিছানার দরকার নেই। ম্যানেজারের ঘরে খাট বিছানা আছে। একটা চাদর নিয়েছি। আর টুকটাক।"

কথাটা ঠিকই। মৃণালকুঞ্জের ম্যানেজার-কাম-কেয়ারটেকারের ঘরটি ছোট হলেও ব্যবস্থা আছে শোওয়াবসার। খোলামেলা ঘরই বলা যায়। তিনটে মাঝারি মাপের জানলা। দুটি জানলা পুব ঘেঁষে—বাকিটা দক্ষিণে। ঘরে পাখাও আছে। অন্য কোনও ঘরে পাখা নেই। খাওয়ার সরু লম্বাটে ঘরে অবশ্য আরও একটা ছোট পাখা লাগানো আছে মাছি তাড়াবার জন্যে।

কিকিরা সবই খুঁটিয়ে দেখে নিয়েছেন কাল। জলের ব্যবস্থা বলতে বাঁধানো কুয়ো। তার ওপর হাত-টিউবওয়েল, ঝাঁকি মেরে জল তুলতে হয় ; ওরই পাশে একটা ছোট মাপের পাম্পসেট। নল ডোবানো আছে কুয়োর ভেতর। দরকারে দোতলাতেও জল তোলা যায়। ওটা জরুরি নয় হয়তো।

চন্দন বলল, "আপনি তো ম্যানেজার হয়ে মৃণালকুঞ্জে চললেন। এখানকার কী হবে ?"

"কেন, বগলা রয়েছে। আমি কলকাতায় না থাকলে বগলাই বাড়ি দেখাশোনা করে। তা ছাড়া কদমপুর গায়ের পাশেই ; মাত্র মাইল দশ-বারো। ওখান থেকে বাসে আসতে ঘণ্টা-সোয়া ঘণ্টা। আমিও ভিজিট দেব হে।"

চন্দন সিগারেট ধরাল। তারাপদর গলা খুসখুস করছে, সিগারেট খাবে না। ধোঁয়া গিলে নিল চন্দন। বলল, "আপনি ম্যানেজারি করবেন। করুন। আমরা কী করব ?"

কিকিরা বললেন, "আমায় কি নিরেট কাঁঠাল পেয়েছ ! যা ভাববার আমি ভেবে রেখেছি।"

"যেমন ?"

"যেমন ধরো, তারাপদকে আমি মৃণালকুঞ্জর সাপ্লায়ার করব !"

"সাপ্লায়ার !" তারাপদ অবাক ! "কী বলছেন, সার ? কীসের সাপ্লায়ার ?"

"চাল, ডাল, তেল, নুন..."

"বাঃ বাঃ ! মুদিখানার জিনিস— !"

"তাতে কী ! কলকাতা থেকে তুমি হপ্তার মুদিখানার জিনিস পৌঁছে দেবে। হরিচন্দনবাবুর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। উনি বলেছেন, তোমার যেভাবে ইচ্ছে তোমার শাগরেদদের কাজে লাগাও, আমার কোনও আপত্তি নেই।"

তারাপদ বিরস মুখ করে বলল, "তা বলে গ্রসারি সাপ্লায়ার ?"

"কাজই বড় কথা, কী করছ বড় কথা নয় !" কিকিরা জ্ঞান দেওয়ার মুখ করে বললেন, "গীতায় বলেছে..."

"প্লিজ, আপনার গীতা থাক। ... কিন্তু আগে কি এইভাবে জিনিস সাপ্লাই হত মৃণালকুঞ্জে ? না, লোকাল মার্কেট থেকে নেওয়া হত !"

"আগে কী হত বাদ দাও। মাঝেসাঝে হত। এখন থেকে রেগুলার হবে। আমার ম্যানেজমেন্টে যা ভাল বুঝব—করব। নতুন ম্যানেজার-কেয়ারটেকারের মরজি।"

"মরজি !"

"শোনো হে তারাবাবু, চাঁদু—তুমিও শোনো," কিকিরা মেজাজি গলায় বললেন, "আমি সিস্টেম পালটে দেব মৃণালকুঞ্জর। সাদামাঠাই খাওয়াব মেম্বারদের—বা বলতে পারো যাঁরা আছেন তাঁদের—তবে যত্ন করে ; যা জুটল হাতের কাছে, চালিয়ে দেব না। ওঁদের দিকে নজর দেব। মেলামেশা করব, গল্পগুজব চালাব, আড্ডা জমাব। মানে বলাইবাবু, রজনীবাবুদের ফ্রেন্ড হয়ে যাব। ওঁদের মন পেতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে বোঝাতে হবে, আরও একটু ডিসেন্টভাবে তাঁরা থাকতে পারেন। একটুকরো সাবান, সামান্য মাথার তেল—এসব তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে তাঁদের মাথা ঘামাবার দরকার নেই। আমি আছি।"

"তারপর ?"

"তারপর একে একে ওঁদের পেট থেকে কথা বার করতে হবে। সাবধানে। আমায় পছন্দ না হলে, বিশ্বাস না করলে মনের কথা বলবেন কেন !"

"আপনিও তবে মনে করেন, মৃণালকুঞ্জে কোনও মিস্ট্রি আছে ?"

"হরিচন্দনবাবুর সন্দেহ বিশ্বাস করলে তোমায় তো মানতেই হবে—দুটি মৃত্যুর পেছনে রহস্য আছে।"

চন্দন মাথা নাড়ল। মানতে বাধ্য হল যেন কথাটা। বলল, "তারা না হয় চালডালের সাপ্লায়ার হল—"

কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে কিকিরা হেসে বললেন, "ঘাবড়াবার কিছু নেই হে তারাবাবু! তোমায় মোট মাথায় করে যেতে হবে না। ওই যে স্কুটার ভ্যান—জিনিস ডেলিভারি দেয়, তাতে করেই জিনিস নিয়ে যাবে। হরিচন্দনদা ব্যবস্থা করে দেবেন। তোমার শুরুটা এইভাবে হবে !"

"আর আমার ?" চন্দন বলল।

"তুমি ! তোমাকে আমি আমার বন্ধুর ভাই-টাই বানিয়ে ফেলব। মানে, বন্ধুর ভাই ; আর পুরনো প্রতিবেশীও।" বলতে বলতে কিকিরা নিজের মাথার চুল ঘাঁটলেন। হাসলেন আলগাভাবে। "ধরো, ব্যাপারটা এইরকম দাঁড়াবে যে—আমি যেন নিজের খেয়ালে বাড়ি ছেড়ে মৃণালকুঞ্জে চলে এসেছি, তোমাদের আপত্তি সত্ত্বেও, ফলে দাদার হুকুমে তুমি আমার খোঁজখবর নিতে

আসো। ...কী, পছন্দ হয় ?”

“না।”

“না কেন ?”

“আপনি কি নাবালক যে, আপনার খোঁজ নিতে আসব রোজ ?”

“রোজ কেন আসবে ! দু’-চারদিন অন্তর আসবে। তুমি স্কুটার চালাতে জানো। স্কুটার হাঁকিয়ে চলে আসবে। যেন বেড়াতেই এসেছ ! মাঠঘাট, বিশুদ্ধ বায়ু—নো পলিউশান...”

চন্দন মাথা নাড়ল। “গোঁজামিল হয়ে যাচ্ছে, সার। মৃণালকুঞ্জের বাসিন্দাদের কনভিন্স করাতে পারবেন না। ...আপনি যা বলছেন—আপনার খোঁজ নিতে আসা—সেটা এক-দু’বার হতে পারে, বারবার হয় না।”

“হয় না ?” কিকিরা মাথা দোলাতে লাগলেন। ভাবছিলেন, না কি ভাববার ভান করছিলেন ! শেষে বললেন, “হয়। ...ধরো তুমি না হয় নিছক হাওয়া খেতে এলে না, তোমার মাথায় একটা মতলবও এসেছে হঠাৎ।”

“মতলব ! কীসের মতলব ?”

“ওই বন্ধ কারখানাটা কেনার মতলব।”

“ওটা তো বন্ধ। আমি বিজনেসম্যানও নই। কারখানা কিনে কী করব !”

“ওই তো মজা। কিনবে কেন ? কেনা-কেনা ভাব করবে। হরিসংকীর্তন পার্টিতে সবাই তো দু’ হাত তুলে নাচে না, অনেকে বসে বসে মাথা দোলায়। সেই রকম। একটা চাল মারবে, যেন তুমি কারখানাটা সম্পর্কে ইন্টারেস্টেড। আরে, আজকাল কত লোক ফাঁকা জায়গায় ঘরবাড়ি বানাবার বিজনেসে নেমে গিয়েছে। প্রমোটার হয়ে যাচ্ছে রাতারাতি। জলের দরে জমি কিনে দোতলা, তেতলা ফ্ল্যাটবাড়ি করছে দু’ নম্বরি, তিন নম্বরি ইট সিমেন্ট দিয়ে। জুতসই একটা নাম দিয়ে দিচ্ছে বাড়িগুলোর, গ্রিন পার্ক, সানি গার্ডেন...। তুমি না হয় প্রমোটার নাই বা হলে—তা বলে একটা বন্ধ কারখানার দিকে তোমার নজর পড়তে পারে না ?”

“ওটা সার একেবারেই বন্ধ। ক্লোজ্‌ড। ফটকও খোলে না।”

“ভুল বললে। মিস্টেক। তোমাদের চোখ নেই। কারখানার ফটক বন্ধ হলেও একজন চৌকিদার আছে। ফটকের গায়েই তার আস্তানা। আমি দেখেছি। হরিচন্দনবাবুও বলেছেন কথায় কথায়।”

তারাপদ এতক্ষণ চুপ করে ছিল। এবার বলল, “কিকিরা, আপনার মোদ্দা কথাটা কী ? আপনি নিজে থাকবেন ওই মৃণালকুঞ্জে, আর আমরা থাকব বাইরে ? এই তো !”

হাসলেন কিকিরা। “ধরেছ ঠিক। তোমরা বাইরে থেকে আমাকে মদত দেবে। তোমাদের খেলা বাইরে থেকে। আমার ভেতর থেকে। একজন পাকা ম্যাজিশিয়ানের অ্যাসিস্টেন্ট হ্যান্ডরা খেলাটাকে পারফেক্ট করে। তারা

ডুবোলে ম্যাজিকমাস্টারও ডুবে যায়।”

চন্দন বিশেষ খুশি হল না। বলল, “এভাবে আপনি একলা ও বাড়িতে থাকলে যদি একটা বিপদ হয়?”

“বিপদ! আমার! হবে না হে! আমি নিজেকে বাঁচিয়ে নিতে জানি। গোলমাল বুঝলে তোমরা আছ, ডেকে নেব।”

“যা ভাল বোঝেন করুন সার,” চন্দন বলল, যেন হতাশ হয়েই।

কিকিরা পকেট হাতড়ে সরু চুরুট বার করলেন। দেশলাই চাইলেন চন্দনের কাছে। বললেন, “ঘাবড়াও মাত। চাণক্য পণ্ডিত বলেছেন, বুদ্ধি থাকলে বিপদ বুঝলেই একশো পা পিছিয়ে আসবে।”

“রাখুন আপনার চাণক্য পণ্ডিত। আপনি যাদের সঙ্গে থাকতে যাচ্ছেন তাঁদের আপনি চেনেন না জানেন না। এদের মধ্যে কে শত্রু কে মিত্র হতে পারে—তাও জানার কথা নয় আপনার। তা ছাড়া মৃণালকুঞ্জে যা ঘটেছে তার সঙ্গে ওখানকার বাসিন্দাদের সম্পর্ক নাও থাকতে পারে। হয়তো নেই। দুটো ঘটনাই নিতান্তই দুর্ঘটনা হতে পারে। আপনি তখন—”

“তুমি যা বলছ তা কারেক্ট হতে পারে। আবার এমনও হতে পারে, হরিচন্দনবাবুর সন্দেহ বৃথা নয়। ...তা সে পরে দেখা যাবে। আপাতত আমি কাজটা নিয়ে ফেলেছি। মাসখানেক অন্তত দেখি। যদি বুঝি ঘটনা দুটোর পেছনে কোনও রহস্য নেই, ফিরে আসব। আমায় কেউ জোর করে আটকে রাখছে না।”

তারাপদ হঠাৎ বলল, “ওখানে যাঁরা আছেন, যাঁরা ছিলেন—তাঁদের সম্পর্কে কম-বেশি ইনফরমেশান— ?”

“একটা খাতা আছে মৃণালকুঞ্জে। হরিচন্দনদা বলেছেন, রেজিস্টার। তাতে মোটামুটি খবরাখবর লেখা আছে। বাকিটা আমি আদায় করে নেব।”

তারাপদ আর কিছু বলল না, চন্দনের দিকে তাকাল। রাত হয়ে এসেছে। এবার তারা উঠবে।

॥ ৫ ॥

দিন তিনেক পরের কথা। কিকিরা মৃণালকুঞ্জে আস্তানা গেড়েছেন সবে।

সেদিন বেশ গরম পড়েছে। সারাটা দিন কেমন রুক্ষ হয়েই কাটল। সকালে ঝাঁঝালো রোদ, দুপুরে হাওয়া নেই তেমন। মাঠঘাট গাছপালার জন্যে খানিকটা সয়ে যাচ্ছিল গরম। বিকেলের আলো মরতে প্রায় সন্ধে। তারপর বোঝা গেল, শুক্লপক্ষ চলছে। জ্যোৎস্না ফুটে উঠতে লাগল চারপাশে। আরও পরে এলোমেলো হাওয়া উঠল চৈত্রমাসের।

কিকিরা নিজের ঘরটিতে বসে পাখা চালিয়ে একটা খাতার পাতা

ওলটাচ্ছিলেন। এই খাতাটাকে সঠিকভাবে মৃণালকুঞ্জর রেজিস্টার বলা যাবে না, তবে অনেকটা ওই ধরনের।

মৃণালকুঞ্জে যাঁরা এসেছেন, থেকেছেন, চলেও গিয়েছেন—তাঁদের নামধাম, সামান্য পরিচয়, চলে গিয়ে থাকলে—কবে গিয়েছেন—তার একটা বৃত্তান্ত লেখা আছে। কিকিরা পাতা ওলটাতে ওলটাতে কল্পনায় মানুষগুলির মুখ দেখছিলেন। কারও কারও কথা পড়ে দুঃখও হচ্ছিল। কিন্তু কী আর করা যাবে!

পুরনো পাতা শেষ করে কিকিরা পরের দিকের পাতাগুলোয় মন দিলেন।

রজনীকান্ত আপাতত এখানের সবচেয়ে পুরনো বাসিন্দে। খাতায় তাঁর পরিচয় লেখা রয়েছে, রজনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়; পিতা স্বর্গত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। আদি নিবাস মথুরগঞ্জ, বর্ধমান জেলা। বয়েস পঁয়ষট্টি। পারিবারিক ভাবে তিনি আত্মীয়হীন। স্ত্রী বিগত। সন্তানাদি নেই। একমাত্র একটি বোন ছিল ছোট। বিবাহিতা। দুর্গাপুরে থাকতেন। তিনিও আর নেই। ভাগনে ভাগনি ছিল—কিন্তু তারা কোনও সম্পর্ক রাখেনি মামার সঙ্গে দীর্ঘকাল। কেন রাখেনি—তার কথা কোথাও লেখা নেই।

কিকিরা রজনীকান্তকে যেটুকু দেখেছেন—তাতে ভদ্রলোককে দুঃখী নিঃসঙ্গ মনে হয়। কম কথা বলেন। বোধ হয় হাঁপানি রোগ আছে, অল্পতেই শ্বাসকষ্ট হয়।

রজনীকান্ত একসময় রানিগঞ্জের দিকে কোলিয়ারিতে চাকরি করতেন। দপ্তরের চাকরি।

কিকিরা শব্দ পেলেন পায়ের। মুখ তুলে তাকালেন। বলাইবাবু।

"কী করছেন? আসব নাকি?" বলাইবাবু দরজা থেকেই বললেন।

"আসুন।" কিকিরা খাতা বন্ধ করে পাশে সরিয়ে রাখলেন।

বলাইবাবু ভেতরে এলেন।

"কিছু করছিলেন নাকি?" বলাইবাবু বললেন। পরনে লুঙ্গি। মেটে রঙের। গায়ে হাতকাটা গেঞ্জি।

"খাতাপত্র দেখছিলাম একটু," কিকিরা আসল কথাটা চাপা দিয়ে বললেন, "হিসেব তোলা নেই অনেকদিনের; পাকা হিসেব। বসুন।"

কিকিরা বিছানায় বসেই খাতা দেখছিলেন। পাশে জানলা। বাইরের বাতাসও আসছিল মাঝে মাঝে, দমকা বাতাস। পাখাও চলছে।

বলাইবাবু চেয়ারটা টেনে বসলেন। একটাই চেয়ার। বসেই বললেন, "কীসের হিসেব দেখবেন মশাই! ওসব কি আর আসল হিসেব, দীনু ম্যানেজারের জাল হিসেব।"

কিকিরা স্বাভাবিক গলায় বলল্লেন, "যা আছে—তাই দেখছি।"

"দেখুন। দেখে লাভ হবে না।"

"তবু দেখি। হরিবাবু জানাতে বলেছেন।" কিকিরা মিথ্যেই বললেন, এরকম কোনও কথা হরিচন্দনবাবু বলেননি। কথাটা শেষ করেই হঠাৎ কিকিরা বললেন, "দীনুবাবু এখানে দেড়-দু' বছর ছিলেন শুনেছি। মানুষটি কেমন ?"

"ও আবার মানুষ নাকি ! ধ্যুত মশাই। চোর জোচ্চোর ধান্দাবাজ লোকটাকে মানুষ বললে বাড়াবাড়ি হয় ! দীনু একটা জন্তু ছিল। শুধু নিজের ধান্দা। ও আমাদের যেভাবে রেখেছিল, মনে হত আমরা গোরু ছাগল। ওর দয়ায় বেঁচে আছি। দুটো নোংরা ভাত, জলের মতন ডাল, একটা ঘ্যাঁট, পোড়াধোড়া রুটি... ওকে আমরা গালমন্দ করলেও কানে তুলত না। লজ্জা ছিল না। দু'-কানকাটা।"

"তা আপনারা হরিবাবুকে বলতেন না ?"

"হরিচন্দনবাবু এখানে আসতেন মাসে এক-আধদিন। তাঁর কাছে নালিশ করতে লজ্জা করত। তবু বলেছি।"

"লাভ হয়নি !"

"উনি আড়ালে দীনু ম্যানেজারকে হয়তো বলতেন কিছু। দু'-চারদিন ইতরবিশেষ হত—আবার যে-কে-সেই। পুরনো ম্যানেজারের অভ্যেসই খারাপ ছিল। যেখান থেকে পারো দু' পয়সা কামাও। চোর। ডিসঅনেস্ট।"

কিকিরা ভাবছিলেন কী বলবেন ! নজরে পড়ল, বলাইবাবু লুঙ্গির কোমরের কাছে ভাঁজ থেকে বিড়ির বান্ডিল আর দেশলাই বার করলেন। বান্ডিলটা আলগা, কয়েকটা মাত্র আছে।

"আপনার বিড়ি চলবে ? আপনি তো চুরুট খান।"

"দিন একটা।"

বিড়ি ধরানো হল। ধোঁয়া ছেড়ে কিকিরা বললেন, "আপনি এখানে কতদিন আছেন বলাইবাবু ?"

"ওয়ান অ্যান্ড হাফ ইয়ার্স। পাকা হিসেবে এক বছর সাত মাস।"

"বাড়ি কোথায় আপনার ? আপনি এখানে এসে জুটলেন কেমন করে ?"

বলাইবাবু সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন না। গোল গোল চোখ অন্যমনস্ক হয়ে গেল হঠাৎ। ছাদের দিকে তাকালেন। পাখাটা দেখলেন যেন। হাতের বিড়িটা মুখে তুলতে গিয়েও তুললেন না। ঘাড় নামালেন। ইতস্তত করে বললেন, "বাড়িঘর আমার নেই, মশাই। আদি বাড়ি ছিল যশোরে। আমি দেখিনি, আমার বাপজেঠাও দেখেননি। ওঁরা—ওঁদের আমলেই আমরা দেশছাড়া। বাবা মার্চেন্ট শিপ—জাহাজে কাজ করতেন। জেঠা সাত ঘাটের জল খেয়ে গিরিডিতে বসেছিলেন পাকাপাকি ভাবে। তখন মাইকার ব্যবসার বাজার ছিল। ব্যবসা চালাতে চালাতে ঝট করে মারা গেলেন। বাবা গিয়েছেন তারও আগে জাহাজেই। স্পেসিস। মা আগেই গত। জেঠাই আমাকে মানুষ করেন। জেঠাইমা তাঁর দ্বিতীয় পক্ষ। জেঠতুতো ভাই ছিল একরকম।

জেঠাইমাও। জেঠা চলে যাওয়ার পর—দিনদিন আমি পর হয়ে পড়লাম।”

কিকিরা বিড়ির টুকরোটা ফেলে দিলেন। মন দিয়ে কথা শুনছিলেন বলাইবাবুর।

“আমি ছোকরা বয়েসে রেলের পরীক্ষা দিয়ে গার্ডের চাকরিতে ঢুকেছিলাম। মালগাড়ির গার্ড। আমার শেষ ডেরা ছিল ধানবাদ। তারপর...”

“ঘরসংসার করেননি ?”

“না। জেঠতুতো ভাই যে ব্যবহারই করুক তার ছেলেটাকেই একরকম মানুষ করেছিলাম ছেলের মতন। তার বিয়ে-থাও দিলাম। ওরা আমার সঙ্গে দুর্ব্যবহার শুরু করল। কত না অপমান, অসম্মান করেছে! আমি বুঝতে পারলাম, পর কখনও আপন হয় না। সংসারটা বড় স্বার্থপর। শেষমেশ একদিন রাগ করে ওদের কাঁচকলা দেখিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। এখান ওখান ঘুরে এই ঘাঁটিতে আশ্রয় নিয়েছি। আমার কোনও পরোয়া নেই। টাকা যেটুকু থাকার আছে। আমি এখানে সাতশো টাকা দিই মাসে মাসে। কিন্তু যা দিই তার বদলে যা পাই—সেটা কিস্যু না। তবু আছি। আই লাইক দিস প্লেস।”

কিকিরা মাথা দোলাচ্ছিলেন কথাগুলো শুনতে শুনতে। শেষে বললেন, “মন্দ কী দেন! আজকের দিনে সাতশো অবশ্য বেশি নয়, তবু আপনি মোটামুটি ভালই দেন।”

“আমি হায়েস্ট,” বলাইবাবু বললেন, “অন্যরা কী দেয় খোঁজ করুন। রজনীদা চার-পাঁচশো, সলিলবাবুও শ'পাঁচ-ছয়। জলধর আমার সমান সমান। তা ছাড়া ওই দীনু-বেটা আমাদের কাছ থেকে এটা-সেটার নাম করে তিরিশ-পঞ্চাশ আদায় করত।”

কিকিরা হিসেবের মধ্যে গেলেন না। মাত্র চারজনের হিসেব ধরলে যে টাকা হয়—হাজার দুই-আড়াই—তাতে আজকের দিনে কোথাও মাথাগোঁজা, দু'বেলা ডালভাত জোটানো মুশকিল। বাড়িটা আছে, হরিচন্দনবাবুর ভাতা আছে, সবজি বাগানের লাউ কুমড়ো শাক রয়েছে—তাই এদের চলে যায়।

কথা ঘুরিয়ে নিলেন কিকিরা। “আচ্ছা বলাইবাবু, শ্রীকান্তবাবুর ওই আগুনে পোড়ার ঘটনাটা কী ? আমায় বলতে পারেন!”

“আপনি শোনেননি ?”

“শুনেছি। হরিবাবু বলেছেন। তবে তিনি তো এখানে থাকেন না, শোনা কথা বলেছেন। দীনুবাবুর মুখে শোনা ; আপনাদের মুখেও শুনেছেন। ব্যাপারটা ঠিক কী ঘটেছিল জানেন আপনি!”

বলাইবাবু তাঁর মাথার টাকে হাত বুলিয়ে নিলেন ; মুখের ভাবে আফসোস। শব্দ করলেন জিভে। “আর বলবেন না! সেই দৃশ্য ভাবলে সারা গা এখনও শিউরে ওঠে। আমি যখন তাঁকে দেখলাম—তখন ওঁর চেহারাটা—কী বলব—বেগুন পোড়ার মতন হয়ে গিয়েছে। হরিব্‌ল। চোখে দেখা যায় না।

বেচারি শ্রীকান্তবাবু ! ইস...”

“আপনারা কিছু করতে পারলেন না ? আপনি কি...”

“আরে, আমি তো ছিলামই না !”

কিকিরা সতর্ক হলেন। “ছিলেন না ?”

“না, মশাই। আমি আর থাকলাম কোথায় ! থাকলে চেষ্টা করতাম। যে চাকরি করেছি তাতে কতরকম আপদ বিপদ যে গিয়েছে, গাড়ি বেলাইন হওয়া, ওয়াগন ভেঙে লুটের চেষ্টা, বনেজঙ্গলে আটকে পড়া, আগুন লেগে যাওয়া... কত ঝঞ্ঝাট ঝামেলা মাথায় করে দিন কাটিয়েছি। এমনকী দু'-একবার ডাকাতদের গুলিও ছুটে এসেছে গার্ডের দিকে।”

“কোথায় ছিলেন সেদিন ?” কিকিরা মামুলিভাবে বললেন, বেশি কৌতূহল প্রকাশ করলেন না।

“যাত্রা শুনতে গিয়েছিলাম।”

“যাত্রা ! এখানে ?”

“আমি বরাবরই যাত্রা ভালবাসি। থিয়েটারও ভাল লাগে। তবে যাত্রার মতন আমায় টানে না। আমি যাত্রা-পাগলা !”

“এখানে— ?”

“এখানে মানে ! এখানে গাঁ-গ্রাম নেই নাকি ! এই তো গায়েই রয়েছে বেলেমাটি, তারপর শীতলপুর। শীতলপুরটা বড় গ্রাম। জগদ্ধাত্রী পুজো হয় গ্রামে। বড় রাস্তার সঙ্গে লিঙ্ক আছে। সেখানে যাত্রা হচ্ছিল। কার্তিক মাস। যাত্রার মরশুম। কলকাতার একটা ছোট দল পালা গাইছিল। 'বন্দিনী পদ্মাবতী'।”

“তাই নাকি ! এখানকার গ্রামে—”

“আপনি নতুন এসেছেন, জানেন না। এদিককার প্রায় সব গাঁয়ে পুজোপার্বণ হয়, যাত্রার আসর বসে। লোকাল যাত্রাপার্টিও আছে। একটু ঘুরেফিরে দেখলেই দেখতে পাবেন, কত কী আছে গাঁয়ে : মুদিখানা থেকে চায়ের দোকান, দরমার বেড়া-দেওয়া সেলুন, মুড়ি তেলেভাজা, মেঠাই...।”

কিকিরা কথার মাঝখানে বললেন, “অত রাত্রে যাত্রা দেখে ফিরছিলেন ! একলা !”

“রাত্রে ফিরব কেন ! পালা ভাঙতেই দুটো-আড়াইটে বেজে গেল। বাকি রাতটুকু আসরে কাটিয়ে ভোর ভোর ফিরছিলাম। এখানে পৌঁছতেই দেখি ছুটোছুটি, হইচই লেগে গিয়েছে। প্রথমে বুঝিনি। ভেতরে পা দিতেই দেখি— ! উঃ ! সে কী দৃশ্য দেখলাম রে বাবা ! হায় ভগবান !”

“ঘটনাটা সকালে ঘটেছিল ?” কিকিরা বললেন। তিনি অবশ্য আগেই জেনে নিয়েছেন হরিচন্দনের কাছে।

“স-কা-ল ! তা সকাল বলতে পারেন। ভোর হয়ে আলো ফুটেছে।”

"আগুনটা লাগল কেমন করে ?"

"কেমন করে লাগল জানি না। শ্রীকান্তবাবুর অভ্যেস ছিল সাত ভোরে ত্রিফলার জল খাওয়া। রাত্রে ভিজিয়ে রাখতেন। ওই বদ জিনিসটা খেয়ে নিজেই কেরোসিন স্টোভ জ্বালিয়ে গরম জল করতেন। চায়ের লিকার খেতেন পায়চারি করতে করতে। আগুন লেগেছিল স্টোভ থেকে।"

"কেউ কিছু করতে পারল না ?"

"ওই তো কথা ম্যানেজারবাবু ! আগুন বড় ভয়ংকর জিনিস ! লাগতে এক পলক, সর্বনাশ করতে পাঁচ-দশ মিনিটও লাগে না। যার লাগে সে এমন ঘাবড়ে যায় যে, তখন সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলে। কী করবে ঠাওর করতে পারে না। ছোটাছুটি শুরু করে, চেঁচায়। শ্রীকান্তবাবু একেবারে ঘরের বাইরে বেরিয়ে বাগানে ছোটাছুটি করছিলেন। তারপর পাগলের মতন পেছনে ওই পুকুরের দিকে ছুটে যান। জলে ঝাঁপ মারতে যাচ্ছিলেন। ততক্ষণে পাঁচজনে জেগে উঠে তাঁর পিছু পিছু দৌড়চ্ছে। যার যা মনে আসছে বলছে চেঁচিয়ে... কিন্তু সবাই তো বুড়ো—কে আর এগিয়ে তাঁকে ধরবে ! শেষে উনি ঝলসে গিয়ে ডোবাই বলুন আর পুকুর বলুন—তার সামনে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন।"

"ইস !"

"ওঁকে একটা দড়ির খাটিয়ায় চাপিয়ে তিন মাইল দূরে হেল্‌থ সেন্টারে নিয়ে যেতে যেতে বেলা ন'টা-দশটা। ডাক্তাররা বলল, আশা নেই। বিকেলের পর মারা গেলেন শ্রীকান্তবাবু। বেচারি !"

"উনি নীচের তলায় থাকতেন না ?"

"হ্যাঁ। ওঁর ঘরে মুরলীদা থাকতেন। তিনি ভাল করে ব্যাপারটা বোঝার আগেই শ্রীকান্তবাবু মাঠে। ...তা কাণ্ড দেখে মুরলীদাও চলে গেলেন সেদিন।"

কিকিরা মাথা হেলালেন অন্যমনস্ক ভাবে।

॥ ৬ ॥

তারাপদ এল রবিবার, একটু বেলা করেই। যেমন ভাবে আসার কথা তেমন ভাবেই। আধ-পুরনো এক স্কুটার ডেলিভারি ভ্যান, পেছন দিক ঢাকা। সামনে বসেই এসেছে তারাপদ, ড্রাইভারের পাশে বসে।

কিকিরা বাইরেই দাঁড়িয়ে দিলেন। ভ্যানটা এসে একেবারে বাড়ির বারান্দা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পড়ল। হাঁকডাক করলেন কিকিরা ঠাকুরকে, কাজের লোকজন ডেকে জিনিসপত্র নামিয়ে নিতে বললেন। চাল ডাল আটার বস্তা তেল মশলাপাতি নামানো হতে লাগল।

তারাপদ জল খেল। ড্রাইভার ছোকরাও।

চায়ের পাট চুকল কিকিরার ঘরে বসেই। তারপর উনি বললেন, "চলো, একটু ফাঁকায় যাই।"

বাড়ির পেছন দিকে কুয়োতলা, টিউবওয়েল। কাছাকাছি সবজিবাগান। কাঠা তিন-চার জমিতে সবজি ফলানো হয়। একপাশে দু'-তিনটি পেঁপেগাছ। শীর্ণ। ওদিকে কলাঝোপ। তারপর পুকুর। ছোট পুকুর, ডোবাও বলা যায়। পুকুরের গায়ে গায়ে একটা ছোট নিমগাছ, বাবলা! অল্প ঝোপ।

ছায়া ছিল এদিকটায়। চৈত্রের রোদ রীতিমতন প্রখর হয়ে উঠেছে। বাতাসও ছিল।

তারাপদকে নিয়ে কিকিরা ছায়ায় বসলেন।

মুখ গলা ঘাড় মুছতে মুছতে তারাপদ বলল, "কেমন কাটছে, সার?"

"চমৎকার। কলকাতার বাইরে এখনও খানিকটা নেচার আছে। আলো বাতাস ফাঁকা মাঠঘাট..."

"আপনি নেচার নিয়ে মজে আছেন, না কাজকর্ম এগুচ্ছে?" তারাপদ ঠাট্টা করে বলল। বলে পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট দেশলাই বার করল। "নিন, খান একটা।"

দু'জনের সিগারেট ধরানো হয়ে গেলে কিকিরা বললেন, "এখন পর্যন্ত যা খোঁজখবর করলাম তাতে জোর করে কিছু বলতে পারছি না। তবে একটা গোলমাল থাকতে পারে।"

"আঁচ করছেন?"

"করছি। ... আমি একে একে এঁদের পরিচয়গুলো দেখছিলাম। খাতায় লেখা আছে— যেটুকু থাকার। বাকিটা আলাপ জমিয়ে জানবার চেষ্টা করছি। একটা কথা কী জানো? এঁরা যে যেমন পরিচয় জানিয়েছেন সেটাই মেনে নিতে হচ্ছে। তবে ওটা পুরোপুরি ঠিক কিনা বলতে পারব না। ঘরসংসার ছেড়ে বুড়ো বয়েসে এখানে এসে ঠাঁই নিয়েছেন এঁরা, তা নিন; কিন্তু সবাই তো নিরাশ্রয় ছিলেন না। বা একেবারেই আত্মীয়স্বজনহীন নন।"

"সার, আমি বুড়ো নই। তবে দু'-একটা ঘটনা নিজের চোখেই দেখলাম। আমাদের অফিসের প্রভাতদা মাত্র গতবছর রিটায়ার করেছেন। মাঝেসাঝে তিনি অফিসে আসেন পুরনো লোকজনের সঙ্গে দেখা করতে। প্রভাতদাকে চেনা যায় না। এক বছরেই যেন পাঁচ বছর বয়েস বেড়ে গিয়েছে। এসেই নিজের দুঃখকষ্টের পাঁচালি গাইতে শুরু করেন। ছেলেদের ব্যবহার, বউমাদের তাচ্ছিল্য, স্ত্রীর অসুখবিসুখ— কত কথাই বলে যান। বুঝতে পারি, উনি ক্ষুব্ধ, বিরক্ত। আসলে বুড়োমানুষের গায়ে হয়তো সহজে ফোসকা পড়ে।"

"তা খানিকটা পড়ে। অভিমান..."

"শিবনাথদা আবার অন্য ধাতের। বলেন, বেটারা আমার টাকার দিকে নজর রেখে বসে আছে। বাপ গেলে খামচাখামচি করবে। আমি একটা পয়সাও

কাউকে দিয়ে যাব না। লিখে যাব, আমার অবর্তমানে তোমাদের বউদি— সে চলে গেলে সব টাকা যেন আশ্রমে দেওয়া হয়...।”

“মেজাজি মানুষ। ... তা শোনো, এই যে যাঁরা এখানে আছেন তাঁদের মুখের কথা ভেরিফাই করার তো উপায় নেই। তোমায় বিশ্বাস করে নিতে হবে। তবে সবসময় বিশ্বাস হয় না। যেমন ধরো সলিলবাবুর কথা। তাঁর মেয়ে থাকে ঢাকুরিয়ায়। জামাইয়ের ব্যবসা। টিভি রেডিয়ো ক্যাসেট প্লেয়ারের দোকান রয়েছে। ভালই চলে দোকান। গাড়ি নেই, তবে মোটরবাইক আছে। মেয়ে তো বাবাকে নিজের কাছে রাখতে চায়। সলিলবাবু একসময় মেয়ের কাছে ছিলেনও। তারপর তাদের ছেড়ে চলে আসেন।”

“মেয়ে-জামাইয়ের কাছে থাকতে চাননি।”

“তা হতেই পারে। অনেকেই থাকতে চায় না। কিন্তু উনি মাঝে মাঝে মেয়েকে দেখতে কলকাতায় যান। নাতির ওপর টান ভীষণ। জামাই সম্পর্কে চুপচাপ।”

“কী করতেন ভদ্রলোক ?”

“চা-বাগানে কাজ করতেন। ডুয়ার্সে। দু’-তিনটে বাগান বদলেছেন। শেষে আসামে চলে যান। আসামে বছরখানেক ছিলেন। বড়বাবু। রিটায়ার করে শিলিগুড়িতে এসে একটা ঘরবাড়িও করেন। তারপর সব বেচেবুচে কলকাতায়। মেয়ের কাছে থাকতেন। তাও পোষাল না। এখন এই মৃণালকুঞ্জে।”

তারাপদ ভাবছিল। “স্ত্রী নেই ?”

“না। শিলিগুড়িতেই মারা গিয়েছেন।”

“মানুষ কেমন ?”

“বাইরে থেকে ভেতর বোঝা মুশকিল। তোমায় একটা কাজ করতে হবে।”

“বলুন।”

“আমি তোমায় ঠিকানা দিয়ে দেব সলিলবাবুর মেয়ের বাড়ির। জামাইয়ের দোকানেরও জায়গাটা বলে দেব। একটু খোঁজ নেবে।”

“কী কেস ?”

“আপাতত কিছু নয়। পরে বোঝা যাবে। উনি কেন মেয়ের কাছে থাকেন না ? মাঝে মাঝে যান কলকাতায়, বড়জোর রাত কাটিয়ে চলে আসেন। জামাই সম্পর্কে চুপচাপ।”

“সন্দেহ ?”

“এই মুহূর্তে নয়। তবে শ্রীকান্তবাবু আগুনে পুড়ে মারা যাওয়ার দিন বলাইবাবু মৃণালকুঞ্জে ছিলেন না রাত্রে। যাত্রা শুনতে পাশের গ্রামে গিয়েছিলেন। আর মুরলীবাবু আত্মহত্যা করার দিন সলিলবাবু এখানে

অ্যাবসেন্ট ছিলেন। বলেন মেয়ের বাড়িতে গিয়ে আটকে পড়েছিলেন।"

তারাপদ বলল, "তবে তো এই দুই ভদ্রলোকই বাদ যান।"

কিকিরা মুচকি হাসলেন। বললেন, "দেখা যাক। অ্যালিবাই ইজ নো প্রুফ। বুদ্ধিমানরা চারদিক নজর রেখে কাজ করে।" উঠে পড়লেন কিকিরা। "ওঠো, আজ আর বেশি নয়। পরের বার যখন আসবে এখানেই দুটো ডালভাত খেয়ে যাবে।"

উঠে পড়েছিল তারাপদ। আরও রোদ চড়েছে। বেশ গরম। বাগানের পাশ দিয়ে আসতে আসতে তারাপদ বলল, "শ্রীকান্তবাবুর আগুন লেগে পুড়ে যাওয়ার ব্যাপারটা তো বললেন, শুনলাম। মুরলীবাবুর আত্মহত্যার ব্যাপারটা শুনলাম না।"

কিকিরা বাড়িটার দিকে তাকালেন। জলধরবাবু স্নান করতে এসেছেন কুয়োতলায়। দোতলার সরু বারান্দায় বলাইবাবু খালি গায়ে দাঁড়িয়ে। এদিকেই তাকিয়ে আছেন।

হাঁটতে হাঁটতে কিকিরা ইশারায় বাড়ির দোতলার দিকটা দেখালেন। বললেন, "ওই দোতলার পশ্চিম দিকে একটা থাম আছে। ইটের। বারান্দার রেলিং নিচু, পলকা। এক ইটের গাঁথনি। ওই থামের কাছ থেকে রেলিং ভেঙে নীচে পড়েছিলেন। কিংবা ঝাঁপ দিয়েছিলেন। নীচে একরাশ ভাঙা ইট, রাবিশ জড়ো করা রয়েছে। পড়ার পর মাথায় লেগেছিল। ঘাড়ও ভেঙেছিল। হাত-পা জখম। ভদ্রলোকের আর জ্ঞান ফেরেনি। মৃত অবস্থাতেই তাঁকে হেল্‌থ সেন্টারে নিয়ে যাওয়া হয় বলতে পারো।"

তারাপদ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। "সে কী! অদ্ভুত তো!"

"আরও অদ্ভুত হল, শ্রীকান্তবাবু আর মুরলীবাবু নীচের তলায় একই ঘরে থাকতেন। একই ঘরের দু'জনে চলে গেলেন। ঘরটা এখন বন্ধই পড়ে আছে।"

"স্ট্রেঞ্জ! ... দোতলায় কারা থাকে।"

"বাকি চারজন। দুটো ঘরে। কোনার ছোট ঘরটা তালাবন্ধ পড়ে আছে। হরিবাবুর জিনিসপত্র পড়ে থাকে। গুদোম ঘর। ... যাক, পরে কথা হবে। চাঁদু কবে আসবে?"

"আজ বিকেলেই আসতে পারে।"

॥ ৭ ॥

বিকেলেই এল চন্দন। হালকা মেজাজেই। মৃণালকুঞ্জর ভদ্রলোকরা তখন আশেপাশে পায়চারি করছেন। বলাইবাবু নিত্যদিনের মতন হাঁটাচলা করতে বাইরে গিয়েছেন।

কিকিরাও বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। বললেন, "এসো।"

"ঠাণ্ডা জল খাওয়ান আগে। যা গরম, সার।"

কিকিরা জল আনতে বললেন কাজের লোকটিকে। নাম তার গঙ্গাধর। "আমার ঘর থেকে আনবে।"

"আছেন কেমন ?" চন্দন জিগ্যেস করল।

"ভাল। তারা এসেছিল ওবেলা।"

"জানি। আসবে বলেছিল। ...আপনার কাজকর্ম এগুচ্ছে ?"

"সবেই শুরু। গাছে না উঠতেই এক কাঁদি হয় নাকি ?"

হাসল চন্দন। "গাছে কতটা ক্লাইম্‌বিং করলেন ?"

"মাত্র হাত পাঁচেক," কিকিরাও ঠাট্টা করে বললেন, "হনুমান বাঁদররা তড়াক তড়াক লাফ মারে হে ! আমি মনুষ্য। শনৈঃ শনৈঃ আরোহণ করছি।"

চন্দন হাসতে লাগল। "শনৈঃ শনৈঃ আরোহণ ! আপনি দারুণ !"

অন্য দু'-একটা হালকা কথার মধ্যে জল এল।

জল খেল চন্দন। "বাঃ, বেশ ঠাণ্ডা তো !"

"আমার ঘরের কুঁজোর জল।"

"ফ্রিজ হার মানে।"

"চা খাবে ?"

"এখন নয়।"

"চলো তবে—এক পাক ঘুরে আসি।" বলে হাঁটতে শুরু করলেন। চন্দনও এগিয়ে চলল পাশাপাশি। তার স্কুটার পড়ে থাকল সিঁড়ির কাছে, করবী ঝোপের পাশে।

কয়েক পা এগিয়ে আসতেই জলধরবাবুর মুখোমুখি হতে হল কিকিরাকে। বিন্দুমাত্র ইতস্তত করলেন না কিকিরা। হাসি হাসি মুখ, আলাপি গলা ; বললেন, "হাঁটুর ব্যথা কমল খানিক ! রজনীবাবুর আর্নিকা তবে কাজে দিয়েছে। দেখবেন, আবার হোঁচট খাবেন না। এই বয়েসে হাড়গোড় ঢিলে হয়ে যায়, হালদারমশাই। মেশিন পুরনো হলে নাটবল্টু ঢিলে হবে—এ তো আপনিও বোঝেন।" বলেই চন্দনকে দেখালেন, "আমার এই ব্রাদারের সঙ্গে সামনে থেকে একটু ঘুরে আসি। ব্রাদারের জায়গাটি বেশ পছন্দ হয়ে গিয়েছে। প্রথমে আমায় ভাগিয়ে নিয়ে যাবে ভেবেছিল। এটা নাকি অজ পাড়াগাঁ। আমি থাকতে পারব না। ওর দাদা—আমার বুজুম ফ্রেন্ড—সে একেবারেই আমাকে এখানে ঘাঁটি গাড়তে দিতে রাজি নয়। বলে, ম্যালেরিয়া না হয় সাপের কামড়ে মারা যাব। ব্রাদার আমাকে দেখতে এসেছে। বেঁচে আছি, না, মরে গিয়েছি।"

"এঁকে তো আগের দিনও দেখেছি ; আপনাদের সঙ্গে এসেছিলেন," জলধর বললেন।

"দেখেছেন। দাদার হুকুমে হালচাল দেখতে এসেছিল।" বলেই কিকিরা

হাত দিয়ে আশপাশ দেখালেন। "ব্রাদারের এখন মত পালটে গিয়েছে। বলছে, জায়গাটা তো বেশ। এখানে জমিজায়গার দর কেমন ? একটা কিছু করলে হয়। আসলে ব্যবসাদার লোক তো। বয়েস কম হলে কী হবে, বিজনেস ব্রেইন !"

জলধর কিছু বললেন না। দেখতে লাগলেন চন্দনকে।

"যাই, একটু ঘুরে আসি। বেলা রয়েছে এখনও। এসো চাঁদু।"

কিকিরা চন্দনকে নিয়ে এগিয়ে চললেন।

মৃণালকুঞ্জর বাইরে এসে চন্দন হাসতে লাগল। "ভালই দিয়েছেন। আপনি সার দিনকে রাত করতে পারেন।"

কিকিরা হাসলেন। "না হে, অতটা পারি না। তবে দরকারে দু'-দশটা মিথ্যে বোলচাল দিতেই হয়। ম্যাজিক দেখাবার সময় রুমালে লাগানো এক ফোঁটা আতরকে অ্যারেবিয়ান পারফিউম বলে চালাতাম।"

"বুঝতেই পারি ! আপনার সঙ্গে কম দিন তো হল না।"

"তা হল। ...এদিককার খবর শুনেছ কিছু ?"

"না। তারার সঙ্গে কাল দেখা হবে। আপনিই বলুন।"

"আমি তোমায় একটা সামারি দিচ্ছি। তারার কাছে বিস্তারিত শুনবে।"

"বিস্তারিত।" চন্দন হাসছিল।

কিকিরা কথাটা কানে তুললেন না। হাঁটতে হাঁটতে মৃণালকুঞ্জের কথাগুলো বলতে লাগলেন অল্প কথায়। দুটো দুর্ঘটনার কথা, এখানে যাঁরা আছেন—তাঁদের কথা।

কথা বলতে বলতে প্রায় বন্ধ কারখানার কাছাকাছি চলে এসেছিলেন কিকিরা। তারপর দাঁড়িয়ে পড়লেন।

চন্দন মন দিয়ে শুনছিল সব। বলল, "প্লে জমে গিয়েছে বলুন !"

"না, জমেনি এখনও। জমব জমব করছে। ...ভাল কথা, কারখানাটা দেখেছ।"

"কারখানা বন্ধ হলেও ফটকের পাশে দরোয়ানের গুমটি। তার গায়ে টিনের চালা লাগিয়ে দরোয়ানজি বোধ হয় চা বিড়ি খইনি পাতার দোকান চালায়। একটা ভাঙা বেঞ্চি আর দু'-একটা পাথরের চাঁই পড়ে আছে বসার জন্যে।"

"আমি দেখেছি। দরোয়ানকে দেখলে ?"

"না। এখন তার দোকান বন্ধ। আমার মনে হল, দরোয়ানের কাছে লোকজন আসে যায়। তা ছাড়া এই রাস্তা ধরে যারা তাদের গাঁয়ে যায়—হয়তো দু' দণ্ড বসে চা লেড়ো বিস্কুট খায়। বিড়ি কেনে। খইনি নেয়।"

"কারখানাটা কাদের ছিল জানো ?"

"কেমন করে জানব !"

"দুই পার্টনারের। একজন বাঙালি, পাল ; আর অন্যজন অ-বাঙালি, খাটোয়া। টাইটেল খাটোয়া। খোঁজখবর নিয়েছি আমি। ব্যবসার শুরু থেকেই মার খাচ্ছিল। তবু বছর খানেকের বেশি চালাবার চেষ্টা হয় কারখানা। শেষে বন্ধ। এখন থাকার মধ্যে ওই পাহারাদার দরোয়ান। শুনলাম পাল কদাচিৎ আসে অবস্থাটা দেখে যেতে। বেচে দেওয়ার মতলব রয়েছে ওদের। জমিজায়গা এটা-সেটার দাম পেলে ছেড়ে দেবে। কিন্তু কেনার লোক জুটছে না।"

"এসব খবর কে দিল আপনাকে ?"

"কেন ! মৃণালকুঞ্জের বাবুরা। মালী চৈতন্য। রাধু বামুনঠাকুরও।"

"কারখানাটা বন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে, থাকতেই পারে। তার সঙ্গে মৃণালকুঞ্জের দুটো ঘটনার সম্পর্ক কী ? ওদের কেউ তো আর শ্রীকান্তবাবু মুরলীবাবুর মৃত্যুর জন্যে দায়ী নয়।"

কিকিরা জবাব দিলেন না প্রথমে। চন্দনের কাছে সিগারেট চাইলেন। ধরানো হয়ে গেল সিগারেট। বললেন, "দায়ী নয়। কিন্তু আমার একটা খটকা আছে।"

"কীরকম ?"

"শ্রীকান্তবাবু আগুনে পুড়ে মারা যাওয়ার দিন বলাইবাবু মৃণালকুঞ্জে ছিলেন না বলছেন। যাত্রা শুনতে পাশের গ্রামে গিয়েছিলেন। কথাটা পুরোপুরি সত্যি কিনা যাচাই করতে হবে।"

"মানে ?"

"এমন তো হতে পারে, উনি যাত্রার পালা শেষ হওয়ার আগেই, কিংবা শেষ হওয়ার পর পরই চলে এসে কারখানায় কোথাও লুকিয়ে ছিলেন। দরোয়ানের ঘরেও হতে পারে। তারপর একেবারে ভোররাতে..."

চন্দন একটু ভাবল। মাথা চুলকোতে লাগল। পরে বলল, "মৃণালকুঞ্জের ফটক খোলা পেল কেমন করে ? মালী কি ফটক খুলে রাখে ?"

কিকিরা ডান চোখটার পাতা প্রায় আধবোজা করে ধূর্তের মতন বললেন, "না, ফটক খোলা থাকে না। তবে ভেতর থেকে চাবি দেওয়াও থাকত না। আমি খোঁজ নিয়েছি। অবশ্য ভেতর থেকে তালাচাবি দেওয়ারই কথা। মালী চৈতন্য তা দিত না। ভাবত, বেকার চাবি দেওয়া। কে আর আসবে চুরিচামারি করতে ! কীই বা চুরি করবে ! এদিকে চোর ছ্যাঁচড়ই বা কোথায় !"

"ফাঁকি মারত !"

"অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল। আমি আসার পর কড়া হুকুম করেছি, তালাচাবি লাগাতে।" সিগারেটের টুকরোটা ফেলে দিলেন কিকিরা। বললেন, "তা ছাড়াও কথা আছে। শ্রীকান্তবাবু যখন জামাকাপড়ে আগুন লাগিয়ে বাইরে ছোটাছুটি করছেন, অন্যরা জেগে উঠে তাঁর আশেপাশে জড়ো হয়ে

চেঁচাচ্ছে—তখন কে আর নজর করতে যাবে—ফটক খোলা না বন্ধ ! কে বা এল তখন বাইরে থেকে !”

চন্দন মেনে নিল যুক্তিটা। বলল, “আপনি বলাইবাবু সম্পর্কে পরিষ্কার নন ?”

“এখনও নয়। তুমি পাশের গাঁয়ে, শীতলপুরে খোঁজ নিয়ে দেখবে, সেদিন যাত্রা কখন শুরু হয়েছিল, শেষ হয়েছিল কখন ! ওই দিনই জগদ্ধাত্রী পুজো ছিল গাঁয়ে। বলাইবাবুর মতন কোনও ভদ্রলোককে কেউ আগাগোড়া দেখেছে কিনা আসরে ? যাত্রায় কোন পালা চলছিল ? নামই বা কী ?”

“সময় লাগবে।”

“লাগুক। ...যদি দেখি বলাইবাবু মিথ্যে কথা বলছেন, বুঝতেই পারব—কোনও কারণ আছে মিথ্যে বলার। কী কারণ ?”

“আপনি নিজে বাইরে গিয়ে খোঁজখবর করেন না ?”

“না। আমি ফটকের বাইরে দশ হাতও যাই না। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত এঁদের চোখে চোখে রাখি। আমার মনে হয়—এঁরাও আমাকে নজরে রাখেন !”

“আপনাকে বিশ্বাস করেন না ভদ্রলোকরা।”

“বাইরে থেকে ওঁদের বোঝা যায় না। ভেতরে কে কী করেন বলতে পারব না।”

“আপাতত তা হলে আপনার সাসপেক্ট নম্বর এক হল বলাইবাবু ! আর দুই হল সলিলবাবু ?’

“হ্যাঁ, এই দুই ভদ্রলোকের মধ্যে একজন প্রথম দুর্ঘটনার দিন হাজির ছিলেন না মৃণালকুঞ্জে। দ্বিতীয়জন ছিলেন না পরের ঘটনার দিন।”

“এটা তো হতেই পারে। ব্যাপারটা অ্যাকসিডেন্টাল। বা ধরুন কাকতালীয়।”

“হলে ভাল। না হলে সন্দেহের কারণ থাকে ! দুই বুড়ো কেন অকারণ মিথ্যে কথা বলবে ! ...আর সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার কী জানো ? দুটো ঘটনাই ঘটেছে ভোররাতে বা শেষরাতে। প্রথমটা তো ভোররাতেই। দ্বিতীয়টা, শেষরাতে হতে পারে। কেউ ঠিক করে বলতে পারছে না। বলছে, তখন তো ঘুমিয়ে ছিলাম।”

“একটা লোক পড়ে গেল, কেউ কোনও শব্দও পেল না।”

“না। শীতকাল। মাঘ মাস। জানলা-দরজা বন্ধ করে, লেপ মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছে সবাই। কেমন করে জানবে ! ওঁদের মুখে এই কথাটাই শুনি। সকালে উঠে যে প্রথম দেখেছে মুরলীবাবুকে সে হল রাধু বামুনঠাকুর। তারই চেঁচামেচিতে অন্যরা উঠে আসে।”

চন্দন নিজের মনে ভাবতে লাগল। যুক্তি হিসেবে কথাটা মেনে নিতে হয়।

সামান্য পরে কিকিরা বললেন, “চলো ফিরি, আমি আর এগুব না।”

কিকিরারা ফিরতে লাগলেন।

চন্দন বলল, "সার, আমি হাসপাতালে কাজ করি। কত তুচ্ছ সাধারণ ঘটনা থেকে আগুন লেগে যায় তার কথা জানি। আর আগুন লাগলে শতকরা নব্বুই জন মানুষ দিশেহারা হয়ে যায়। বোধবুদ্ধি কাজ করে না। কাজেই শ্রীকান্তবাবুর আগুন লাগা সম্পর্কে আমি চট করে একটা ধারণা করতে পারি না। ওটা অ্যাকসিডেন্ট হতে পারে। ...মুরলীবাবুর ব্যাপারটা বলতে পারছি না। তবে বেকায়দায় পড়ে গিয়ে ঘাড়ে মাথায় তেমন চোট পেলে—সে না বাঁচতেও পারে। ঘাড় ভাঙলে মানে ফার্স্ট ভারটিব্রা আর সেকেন্ড ভারটিব্রার মধ্যে তেমন জখম হলে ভয়ংকর ব্যাপার। মাথার জখমও ডেঞ্জারাস।"

"সব মানছি। তবু শেষ পর্যন্ত দেখতে চাই। হরিচন্দনবাবুর মনেও সন্দেহ রয়েছে।

"আমি আপনাকে চলে আসতে বলছি না। দুটো দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়াটা কোয়েনসিডেন্স হতে পারে। এমন হয়।"

"তারাও বলছিল কথাটা। দেখা যাক না কী হয়!"

কথা বলতে বলতে ফটকের কাছাকাছি এসে গেল চন্দনরা। চন্দন হঠাৎ বলল, "ভাল কথা, ফটকের বাইরে সেই ধুনুচির তুক—ঘুঁটে পোড়া, হলুদ চাল, সাপের খোলস, মাটির পুতুল—তার কী হল? এখানকার কেউ দেখেছেন?"

"প্রথমবার নজরে পড়েনি। দ্বিতীয়বার পড়েছে। চৈতন্য দেখেছে, কাজের লোক দেখেছে, এখানকার বাবুরাও।"

"সাপুড়ের বাঁশি শুনেছেন?"

"না।"

"এখানকার বাসিন্দারা কি ভয়ে ভয়ে আছেন?"

"ভয় পেয়েছেন কিনা বলতে পারব না, তবে সকলের মনেই খুঁতখুঁতুনি আছে।"

"দেখুন কী হয়! ...আমি পরে আসব আবার। আপনি যে কাজগুলো করতে বললেন, সেগুলো সারতে সময় লাগবে। অন্তত হপ্তাখানেক।"

॥ ৮ ॥

জলধরবাবুর অভ্যেস হল, সন্ধেবেলায় দোতলার বারান্দায় পায়চারি করতে করতে দু' হাতে তালি বাজিয়ে দেবদেবীর গান গাওয়া। পরনে ছালিবস্ত্র, গায়ে ফতুয়া, কখনও বা খালি গায়েই, 'হে গোবিন্দ রাখো শরণ', কখনও 'শিবশঙ্কর নমো হে নারায়ণ', কখনও বা সাদামাঠা ভক্তিসংগীত, 'ভজ গোবিন্দ কহ গোবিন্দ'।

সেদিন জলধর রামপ্রসাদি ঢঙে একটি গান গাইছিলেন, এমন সময় কিকিরা

দোতলায় উঠে এলেন।

জলধর গান থামিয়ে তাকালেন। "কী খবর ম্যানেজারবাবু ?"

"কিছু না। এমনি এলাম। আপনার গলা শুনে। গানবাজনার চর্চা হচ্ছিল নাকি ?"

"একটু আধটু। বাঁশিতে ফুঁ দিতে পারতাম। ...তা হঠাৎ গানবাজনার কথা কেন ?"

"গান শুনে মনে হল। রোজই তো শুনতে পাই।"

"শেষ বয়েসে ভগবানের নাম নিই একটু। জীবনটা তো কেটে গেল..."

কিকিরা হাসলেন, "এত তাড়াতাড়ি। কত আর বয়েস আপনার! ষাট হয়তো ছাড়িয়েছেন। এখনও অনেক পড়ে আছে।"

"কেমন করে বুঝলেন ?"

"বুঝব না কেন! স্বাস্থ্য ভাল আপনার। বড় আধিব্যাধি নেই। চরক বলেছেন, পিত্ত ও কফ যাদের নাশ হয়—তারা দীর্ঘজীবী হয়।" বলে কিকিরা হাসলেন।

"আপনি চরক বোঝেন ?"

"বুঝি না। তবে আমার মাতামহ বদ্যি ছিলেন তো... ! আর আপনিও তো দেখেছি, রোজ সকালে তুলসীপাতা খান।"

"ও !"

"আপনার রুমমেট কোথায় ?"

"পাশের ঘরে দাবা খেলছেন।"

"চলুন আপনার ঘরে গিয়ে বসে দুটো গপ্প করি।"

"গপ্প ! আসুন !"

কাছেই জলধরের ঘর। জলধরবাবু আর বলাই দত্ত একই ঘরে থাকেন দোতলায়। পাশের ঘরে সলিলবাবু আর রজনীকান্ত।

জলধর ঘরে এসে বসলেন।

কিকিরাও বসলেন বলাইবাবুর বিছানায়। দু' হাত জোড় করে মাঝের আঙুলে ঘষতে ঘষতে ছেলেমানুষের মতন বললেন, "পরশু আপনাদের একটা ফিস্ট দেব।"

"ফিস্ট ?"

"ওই সামান্য মুখ-বদলের খাওয়া। একটা বড় মাছ পেলে ভাল হয়। দেখি কী করা যায়। তা জলধরবাবু, আমি নতুন, আগে যা পাতে পড়ত আপনাদের, তার চেয়ে ভাল কিছু হয়েছে ?"

জলধর ঘাড় কাত করলেন। "হয়েছে। একটা স্বাদ পাচ্ছি আজকাল। দীনুবাবুর আমলে কী যে মুখে তুলতে হত... !"

"শুনেছি। হরিবাবুকে আমি বলেই এই চাকরিতে এসেছি যে, হতচ্ছেদা করে

আমি কিছু করতে পারব না। বয়স্ক ভদ্রজনরা আছেন যেখানে, সেখানে দু' মুঠো ভাত ছড়িয়ে দিলেই হয় না। আপনি চ্যারিটি করছেন না। ভাল একটা কাজ করতে চান। ভাল কাজ করতে হলে মন থেকে, ওই যে কী বলে, দয়াদাক্ষিণ্য করার মেন্টালিটি পালটাতে হবে। অবশ্য উনি, হরিবাবু মানুষটি ভাল, ওঁর নিজের মধ্যে ইগো নেই। তাচ্ছিল্যও করতে চান না কাউকে।"

"ভাল বলেই মনে হয় ওঁকে।"

"আপনার এখানে ক' বছর হল ?"

"ক' বছর ! বছরখানেকের বেশি। আমি এসেছি বলাইবাবুর পর।"

কিকিরা সব জানেন। নামের খাতা—মানে রেজিস্টারে দেখেছেন। কিন্তু সেটা তিনি বুঝতে দিতে চান না। কাউকেই আঁচ করতে দেননি যে, তিনি প্রত্যেকের নাড়িনক্ষত্রের খবর নেওয়ার চেষ্টা করছেন।

গল্প করার ঢঙেই কিকিরা বললেন, "আপনিই কি সবচেয়ে কম আছেন এখানে ? অন্যরা শুনলাম, দুই আড়াই তিন বছর ধরে আছেন—।"

"একরকম তাই।"

"দেশ বাড়ি কোথায় ছিল ? মানে আমি বলতে চাইছি, এই বয়েসে লোকে নিজের ভিটেমাটিতে..."

"আমার দেশের বাড়ি পুববাংলায়। সেখানে যাওয়া হয়নি। আমার মা সেই কোন কালে নবদ্বীপে এসে স্কুলের চাকরি নিয়েছিলেন। বাবাকে আমি দেখিনি।" একটু চুপ করে থেকে আনমনা হয়ে অন্যদিকে তাকিয়ে থাকলেন। নিশ্বাস ফেললেন বড় করে। "ছেলেবেলাটা আমার একরকম কেটে গিয়েছিল। মা আমাকে সদানন্দবাবার আশ্রমের স্কুলে রেখে দিয়েছিল, কালনার কাছে। ছুটিছাটায় মায়ের কাছে। ...পুরনো কথা আর কী বলব ! মা চলে যাওয়ার সময় আমি ছোকরা। একটা চাকরিও জুটিয়ে নিয়েছিলাম। সরকারি চাকরি। কলকাতাতেই। তারপর চলে গেলাম আন্দামান। তখন ওদিকে যাওয়া সুবিধের ছিল। সরকারি কাজ করতাম। বছর পাঁচেক কাটিয়ে ফিরে এলাম। ভাল লাগত না। একা একা লাগত। অবশ্য ওখানে বাঙালিও ছিল। মেলামেশা করে মন ভরত না। ফিরে ওয়েন অ্যান্ড বিলওয়েটে চাকরি করেছি। শিপমেন্ট কোম্পানি। ঘরসংসারও করেছিলাম। একটু বয়েসেই। কপালে দুঃখ ছিল মশাই, না হলে স্ত্রী ওইভাবে মারা যায় !"

"কীভাবে ?"

"মাঝদুপুরে ফ্ল্যাটে ডাকাতি। এমনভাবে জখম করল ওকে যে, তিনটে দিনও বাঁচল না।"

কিকিরা সহানুভূতির শব্দ করলেন। খাতায় অবশ্য এটা লেখা নেই। জলধর বিপত্নীক—এইমাত্র লেখা আছে।

আত্মীয়তার সুর এনে ভারী গলায় বললেন কিকিরা, "জীবন বড় গোলমেলে

হালদারমশাই। মাথার ওপর বসে কে যে ঘুঁটি চালছেন—কেউ কি জানে! তবে আপনি পোড়খাওয়া মানুষ। ভেঙে পড়বেন বলে মনে হয় না। ...আমি ভাবছিলাম, আপনার মতন মানুষ এখানে না এসে আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে থাকলে হয়তো মনের দিক থেকে শান্তি পেতেন।"

জলধর অদ্ভুত এক মুখভঙ্গি করলেন। "আত্মীয়! খুব কম গাছের ডাল সোজা হয়, বেঁকাই বেশি। আমার আত্মীয় বলতে একটি ছেলে। সে হল সেলফিশ, ইররেসপনসিবল, ইডিয়েট, গাধা। নচ্ছার। তার ফ্যামিলি নিয়ে দিল্লি চলে গিয়েছে। সেখানে জুতোর ব্যবসা করে। ফ্যাক্টরি করেছে জুতোর। জু-তো! ছ্যাঃ!"

কিকিরা কথা পালটালেন। "একালের ব্যাপারই আলাদা। ছেলেছোকরাদের মতিগতি বোঝা যায় না। কী আর করবেন। যার যেমন মন চায়—"

"চাক। আমার কাঁচকলা। আমি পরোয়া করি না। একলা এসেছি, একলা যেতে হবে।"

"তা ঠিক। একলা চলো রে—!"

"খাঁটি কথা। ...কে কাকে দেখে? কে কাকে বাঁচায়! যার কপালে যেমন আছে তাই হবে।"

কিকিরা সঙ্গে সঙ্গে কথাটা ধরে নিলেন। বললেন, "কপাল। যা বলেছেন সত্যিই তাই। শ্রীকান্তবাবু মুরলীবাবুর কথাই ভাবুন।"

"স্যাড। আহা রে, দুই বুড়োমানুষ কীভাবে চলে গেলেন!"

"বিচ্ছিরি ভাবে। আচ্ছা হালদারমশাই, এই যে দু'জন মানুষ মাস কয়েকের মধ্যে এইভাবে চলে গেলেন, আপনার ভয়টয় করে না?"

"ভয়! ...না ভয় নয়, তবে অস্বস্তি হয়।"

"মৃণালকুঞ্জে কি কোনও অশুভ শক্তির নজর—"

"অশুভ! বলতে পারেন অশুভ। তবে এমনটা হয়। খারাপ যখন হয়—তখন পর পর হয়ে যায়। কেন হয় কে জানে!"

কিকিরা যেন কৌতূহলবশেই বললেন, "আমি যা শুনেছি—তা শুনেই বলছি— মুরলীবাবু নাকি ঝাঁপ দিয়েছিলেন। কথাটা কি ঠিক?"

"আমিও তাই শুনি।"

"উনি ঝাঁপ দেবেন কেন? থাকতেন একতলায়; দোতলায় এসে ঝাঁপ দিলেন!"

"তাই তো দিলেন।"

"কেন? ওঁর কি মাথাখারাপ হয়ে গিয়েছিল!"

"না, তা কেমন করে বলব! তবে শ্রীকান্তবাবুর ওইভাবে আগুনে পুড়ে মারা যাওয়ার পর উনি যেন কেমন হয়ে গিয়েছিলেন। মনমরা, বিচলিত। একই ঘরে থাকতেন দু' জনে, হুট করে একজন চলে গেল—! কিছুই করতে

পারলেন না।”

“অনুতাপ।”

“হবে হয়তো।”

“আপনারা কিছুই জানতে পারলেন না।”

“না। কেমন করে জানব! শীতের দিন। দরজা জানলা বন্ধ। মাঝরাত বা শেষরাতে কেউ যদি ওপরে উঠে এসে থাকে—জানা সম্ভব নয়।

“যে জায়গায় গিয়ে উনি ঝাঁপ দিয়েছিলেন— সেখানকার— মানে বারান্দার রেলিং কি আগেই ভাঙা ছিল ?”

“ও আবার রেলিং কোথায়, এক ইটের এক গাঁথনি, তাও ফোকর করা। হ্যাঁ, নড়বড়ে ছিল। ফাটল ধরেছিল। সারাবার কথাও শুনতাম। দীনুবাবু মুখে বলতেন— এবার সারাব মিস্ত্রিমজুর ডেকে, কিন্তু কই গা করতেন কোথায়!”

“ভদ্রলোক ওইভাবে ওখানে গিয়ে—”

জলধর কথা শেষ করতে দিলেন না কিকিরাকে, মাঝখানে বললেন, “তবে একটা কথা। এখানে ওই সময়টায় ভীষণ কুয়াশা নামত। পাঁচ হাত দূরের জিনিসও নজর করা যেত না। মুরলীবাবু ভুল করে—”

কিকিরা মাথা নাড়লেন। “না সার, কুয়াশা নামুক আর নাই নামুক— ভদ্রলোক একতলা ছেড়ে দোতলায় আসবেন কেন অমন সময়! বাথরুম নীচেও আছে। দোতলায় রাত্রে কাজ চালাবার মতন একটা বাথরুমও আছে জানি। তবু ওই জন্যে দোতলায় নিশ্চয় আসেননি। তাই না, বলুন ?”

জলধর আর কী বলবেন! মাথা নাড়লেন।

উঠে পড়লেন কিকিরা। “চলি, অনেকক্ষণ গল্পগুজব হল।” ...পা বাড়িয়ে হঠাৎ আবার বললেন, “আচ্ছা, এখানে কোনও ভৌতিক ব্যাপার ঘটছে ? শোনা যায় কিছু ?”

জলধর বললেন, “আমি কোনও শব্দ শুনিনি। দীনুবাবু অবশ্য বলতেন।” বলতে বলতে থেমে গেলেন তিনি।

॥ ৯ ॥

সপ্তাহ কেটে গেল।

কিকিরা মোটামুটি আলাপ জমিয়ে নিয়েছেন চার প্রৌঢ়ের সঙ্গেই। মালী চৈতন্য, বামুনঠাকুর রাধু আর কাজের লোক নকুলের সঙ্গেও তিনি সরলভাবে হাসি তামাশা করে কথা বলেন। এদের অবজ্ঞা অগ্রাহ্য করা উচিত নয়। বরং ওদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করলে লাভ আছে। রাধুদের পেটেও কথা আছে। সুযোগ বুঝে ধরতে পারলে অনেক কথাই হয়তো বেরিয়ে আসতে পারে।

এখন পর্যন্ত অবশ্য কিকিরা মৃণালকুঞ্জের রহস্যের ব্যাপারে সুবিধে করতে

পারেননি তেমন। শুধু অনুমান, ধারণা, সন্দেহ কোনও প্রমাণ নয়। চার প্রৌঢ়ের মধ্যে রজনীকান্তই যেন অন্য রকম মানুষ। কথা কম বলেন। কোনও অভিযোগ জানান না। দুঃখী বিষণ্ণ মনে হয় তাঁকে সবসময়। ভদ্রলোকের একমাত্র কাজ হল— সকাল বিকেল বাগানে ঘুরে ঘুরে গাছপালা দেখা, খুরপি বা একটা লোহার শিক হাতে গাছের গোড়া খুঁচনো, অবশ্য ফুলগাছের ; নিজের হাতে জলও দেন। বেলফুলের ক'টি মাত্র গাছ, তারও কী যত্ন। হেনা ঝোপের শুকনো পাতা পরিষ্কার করেন নিজের হাতে। টগরের মরা শুকনো ডাল ছেঁটে দেন।

কিকিরা লক্ষ করেন সব। কিছু বলেন না। রাত্রে ভদ্রলোক বেশিরভাগ সময় শুয়ে থাকেন, বড়জোর পুরনো কাগজ পড়েন।

মাঝে একদিন ঝড়ও হয়ে গেল সন্ধেবেলায়। বৃষ্টি হল নামমাত্র।

কিকিরা অধৈর্য হলেন না। অপেক্ষা করে থাকলেন তারাপদদের জন্যে।

তারাপদ এল পরের সপ্তাহে। হাতে একটা নাইলনের ব্যাগ। বাসেই এসেছে।

এল বিকেলে। ব্যাগ থেকে চা-পাতার বড় প্যাকেট, গুঁড়ো দুধের কৌটো, খুচরা আরও কিছু নামিয়ে রাখল। হেসে বলল, "সাপ্লায়ার কি শুধু হাতে আসতে পারে ?"

কিকিরা হাসলেন। "তোমার মস্তিষ্ক আছে।"

"আপনার দয়ায়।"

"তা হলে একটু চা খাও। এখানকার চা। তুলসীপাতার ফ্লেভার পাবে।"

"হয়ে যাক। তবে আমার চা ভাল দোকান থেকে আনা।"

"ওটা থাক এখন।" বলে রাধুকে ডাকলেন।

রাধু এল। চা দিতে বললেন কিকিরা। তারপর ইশারায় তারাপদর আনা জিনিসগুলো নিয়ে যেতে বললেন।

রাধু চলে গেলে কিকিরা দরজার দিকে তাকালেন। কেউ নেই। নিচুগলায় বললেন "কোনও খবর ?"

"হ্যাঁ। অনেক ঝামেলা করে জোগাড় করেছি। অচেনা মানুষ কারুর বাড়িতে গিয়ে মেয়েদের সঙ্গে কথা বলা যায় না। সলিলবাবুর জামাইয়ের দোকানেই গিয়েছিলাম। কাস্টমার সেজে। ক্যাসেট কিনব। আলাপ কি জমতে চায়! ধানাই-পানাই। যাকে হিন্দি সিনেমায় বলে, আগারা-বাগারা। সেরেফ গপ্প বানালুম। এক বন্ধুর সঙ্গে একটা জায়গায় গিয়েছিলাম সেদিন। সেখানে বুড়োদের এক ধর্মশালা টাইপ আস্তানা দেখলাম। আলাপও হল দু'-একজনের সঙ্গে। সলিলবাবু বলে একজন ছিলেন। বললেন তাঁর জামাইয়ের টিভির দোকান আছে ঢাকুরিয়ায়। এই সেই দোকান। আশ্চর্য।

অ্যায়সা মিথ্যে চালালাম, সার। দুটো সিগারেট গেল। শেষে কথায় কথায় আবার সলিলবাবুর নাম...."

"বললে ?"

"বললাম। সে যে কত কায়দা করে, সার ! শ্বশুরমশাইয়ের নাম শোনামাত্র জামাই যেন বুলডগের মতন গর্জে উঠল।.... জামাইয়ের চেহারাটাও বুলডগের মতন। মুখটা যা ফেরোশাস দেখতে।"

"গর্জে উঠল কেন ?"

"ঈশ্বর জানেন। বুঝলাম সম্পর্ক ভাল নয়।"

"আচ্ছা ! সেদিনের কথা তোলোনি ?"

"তুলেছি। কায়দা করেই। জামাই বললে, দোকান বন্ধ করে ফিরে গিয়ে বাড়িতে শ্বশুরমশাইকে দেখেনি। তিনি এসেছিলেন শুনেছে। আবার চলেও গিয়েছেন।"

কিকিরা কৌতূহল চাপতে পারলেন না। "গিয়েছিলেন আবার চলেও এসেছেন। মানে মেয়ের বাড়িতে রাত্রে ছিলেন না !"

"না", মাথা নাড়ল তারাপদ।

"তা হলে রাত্রে তিনি ছিলেন কোথায় ? এখানে ফিরে আসেননি। নিজের মুখেই বলেছেন, সেদিন কলকাতায় মেয়ের বাড়ি গিয়ে আর ফেরা হয়নি।"

"মিথ্যে কথা।"

"অফকোর্স ! সলিলবাবু মিথ্যে কথা বললেন কেন ? হোয়াই ! মুরলীবাবুর দোতলা থেকে ঝাঁপ মারার কথা পরের দিন সকালে এখানে এসে শুনেছেন তিনি। তখন মুরলীবাবু অজ্ঞান অচেতন। হয়তো মারাই যাচ্ছেন। গিয়েছেনও বলা যায়।"

তারাপদ বলল, "সাসপেক্ট !"

"হ্যাঁ। সন্দেহ করতেই হবে।"

"কিন্তু সলিলবাবুর উদ্দেশ্য কী ? মোটিভ ? মানে— আমি বলছি— মুরলীবাবুর ঝাঁপ দেওয়ার পেছনে সলিলবাবুর হাত আছে বললে— একটা কারণ তো বার করতেই হবে। কী মোটিভ থাকতে পারে সলিলবাবুর !"

কিকিরা নিজের মাথার লম্বা লম্বা চুলে আঙুল জড়িয়ে টানতে লাগলেন। ভাবছিলেন। অন্যমনস্ক। চিন্তিত। শেষে বললেন, "বলতে পারছি না। খোঁজ করতে হবে। কেন উনি মিথ্যে কথা বলবেন ? কী এমন আছে যা লুকোতে চান ? আশ্চর্য !"

রাধু চা নিয়ে এল। চায়ের আগে জল। রাধুই ঘরে রাখা কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে দিল।

চলে গিয়েছিল রাধু। তারাপদ চা খেতে খেতে বলল, "আপনি কেন হাবুডুবু খাচ্ছেন ?"

কিকিরা মাথা নাড়লেন। "না, ঠিক তা নয় ; তবে ধাঁধায় রয়েছি।"

"সলিলবাবুকে চেপে ধরুন!"

"ধরব বইকী ! তবে এখন নয়। দেখি বলাইচাঁদের ব্যাপারটা কী হয় ! চাঁদু কি লেগে পড়েছে, জানো ?"

"হ্যাঁ। পরশু ওর সঙ্গে দেখা হয়েছে।"

"তারা, আমার মন বলছে, মাত্র তিন-চার মাসের মধ্যে দুটো দুর্ঘটনা— একই বাড়িতে বিনা কারণে হয়নি। আমি স্বীকার করছি, কখনও কখনও যুক্তিতর্কের বাইরে এমন অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটে। একই পরিবারের দু'জন চলে যায়। নিয়তির টান। কিন্তু এখানে তা নয়। একই ঘরের পাশাপাশি তক্তপোশে শুয়ে থাকা দুই বুড়ো চলে গেল পর পর, একজন আগুনে পুড়ে, অন্যজন ছাদ থেকে লাফ মেরে। শ্রীকান্তবাবুর না হয় কাপড়েচোপড়ে আগুন ধরে গিয়েছিল আচমকা— অল রাইট, কিন্তু মুরলীবাবু কেন একতলা থেকে দোতলায় এসে ঝাঁপ মারবেন ?"

"একতলা থেকে ঝাঁপ দেওয়া যায় না, সার।"

"ঠিক। কিন্তু আত্মহত্যা করার পাগলামি মাথায় এলে, উনি গলায় দড়ি দিতে পারতেন। না হয় বিষ খেতেন। বা অন্যভাবে....। না, আমি কনফিউজড। কেন উনি দোতলায় এলেন ? আর কেনই বা এমন জায়গা থেকে ঝাঁপ দিলেন যেখানের রেলিং আলগা নড়বড়ে, নীচে পাহাড়প্রমাণ রাবিশ !"

তারাপদ অবাক আর আতঙ্কের গলায় বলল, "কেউ কি ওঁকে ঠেলে ফেলে দিয়েছিল ?"

কিকিরা চুপ। একটা চুরুট ধরালেন। "চলো, বাইরে যাই।"

চা শেষ করে তারাপদ উঠে দাঁড়াল।

বাইরে এসে কিকিরা বললেন, "শোনো, আমি একবার হরিচন্দনবাবুর সঙ্গে দেখা করতে যাব।"

"কবে ?"

"ক-বে ! পরশু দিন। বিকেলে। তুমি চাঁদুকে বলবে ওখানে হাজির থাকতে। তুমিও চলে আসবে। হরিবাবুর সঙ্গে আমার কথা আছে।"

"যেমন বলবেন।"

"তুমি এবার এগোও। বাসে যেতে হবে। পরশুদিন বাকি কথা...।"

তারাপদকে সঙ্গে করে ফটক পর্যন্ত গেলেন কিকিরা। এগিয়ে দিয়ে বললেন, "সাবধানে যাবে।"

হরিচন্দনবাবুর মুখোমুখি বসে ছিলেন কিকিরা। পাশে তারাপদ আর চন্দন।

কিকিরা প্রথমে মৃণালকুঞ্জের বৃত্তান্ত শোনালেন। তিনি যাওয়ার পর যা যা দেখেছেন, শুনেছেন। কার সঙ্গে কথাবার্তা কী হয়েছে—তাও বললেন।

হরিচন্দনবাবু মন দিয়ে শুনছিলেন। মাঝে মাঝে প্রশ্ন করছিলেন। তিনি যে ক্রমশই বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ছিলেন বোঝা যাচ্ছিল। কিন্তু উত্তেজিত হচ্ছিলেন না। তাঁর কথাবার্তা শুনে ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছিল, ভাল কিছু করতে গিয়ে মন্দ হলে মানুষ যেমন হতাশ বিরক্ত হয়, অনেকটা সেইভাবে হতাশ হয়ে পড়েছেন।

কিকিরা বললেন, "সলিলবাবু মিথ্যে কথা বলছেন— আগেই আপনাকে বললাম। বলাইবাবুও ততটা সত্যবাদী নন। তিনিও হয়তো মিথ্যে বলছেন। চন্দনের কাছে শুনুন।"

হরিচন্দন চন্দনের দিকে তাকালেন।

চন্দন মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, "আমি খোঁজখবর করে যা জেনেছি—তাতে বুঝলাম, বলাইবাবু যাত্রা দেখতে গিয়েছিলেন ঠিকই। কিন্তু পালা শেষ হওয়া পর্যন্ত তিনি ছিলেন কিনা কেউ বলতে পারছে না।"

"বলাইবাবুকে কি গাঁয়ের লোক চেনে?" হরিচন্দনবাবু বললেন।

"কেউ কেউ মুখে চেনে। উনি সকাল বিকেল হাঁটাহাঁটি করেন। ভদ্রলোককে ঘোরাফেরা করতে দেখেছে আশেপাশে। তা ছাড়া বলাইবাবু তো গাঁয়ের মানুষ নন। সেজেগুজেই গিয়েছিলেন। কার্তিকের শেষ বলে ঠাণ্ডার ভয়ে গায়ে গরম কোট লম্বা, মাথায় টুপি, হাতে ছড়ি আর টর্চ। সহজেই তাঁকে নজরে পড়ছিল।"

"ও!"

"আরও একটা ব্যাপারে গোলমাল হচ্ছে। সেদিন সময়মতন যাত্রার দল পৌঁছতে পারেনি বলে পালা শুরু হতে দেরি হয়েছিল। ওদের এক ইম্পর্টেন্ট অভিনেতা অসুস্থ হয়ে পড়েছিল হঠাৎ। তাকে আনতে পারেনি। কাজেই বায়না-দেওয়া কর্তাদের সঙ্গে যাত্রাপার্টির বচসা হয়। পরে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে পালা নামাতে হয়েছিল।"

কিকিরা সঙ্গে সঙ্গে বললেন, "বলাইবাবু আমায় এসব কথা বলেননি।"

হরিচন্দন যেন বিভ্রান্ত। বললেন, "বলাইবাবু তা হলে কি যাত্রাও পুরো দেখেননি।"

"আমায় তো অন্য কথা বলেছেন।" কিকিরা বললেন, "যাত্রার আসরে বসে বাকি রাত কাটিয়েছেন।"

তারাপদ বলল, "মিথ্যে কথা! ফাঁকা আসরে বসে থাকলে কারও নজরে

আসত।"

হরিচন্দন অসহায়ের মতন কিকিরার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বললেন, "আমি কী করব, রায়! মৃণালকুঞ্জ থেকে সব ক'টাকে তাড়িয়ে দেব! বন্ধ করে দেব বাড়িটা?"

কিকিরা বললেন, "এত তাড়াতাড়ি নয়। আর ক'দিন দেখি। তবে একদিন আপনাকে কদমপুরে যেতে হবে। গিয়ে বলতে হবে, মানে শাসাতে হবে যে, মৃণালকুঞ্জ বন্ধ করে দিচ্ছেন আপনি। সাতদিন সময় দিচ্ছি, যে যার মতন ব্যবস্থা করে নিন। পাততাড়ি গুটোন। এখন অবশ্য আপনাকে যেতে হবে না। আমি জানাব যখন, তখন যাবেন।"

হরিচন্দন চুপ করে থাকলেন। মুখের ভাবে বিরক্তি, দুঃখ।

কিকিরা হঠাৎ বললেন, "একটা ব্যাপার আমি লক্ষ করছি। আপনার মৃণালকুঞ্জে যা ঘটেছে সবই এই ক' মাসের মধ্যে। মাস চারেক বড়জোর। তার আগে কোনও ঘটনা ঘটেনি?"

"না। নয় নয় করেও এই ক' বছরে দশ-বারোজন এসেছেন। কেউ কেউ চলেও গিয়েছেন নিজের মরজিতে। কিন্তু আগুনে পোড়া, আত্মহত্যা— এসব ঘটেনি কোনওদিন।"

"আমি ভেবেচিন্তে দেখেছি, জলধরবাবু ছাড়া অন্যরা বেশিদিন আছেন মৃণালকুঞ্জে। জলধরই শুধু বছরখানেক। উনি আসার আগে কোনও খারাপ ঘটনাই ঘটেনি বাড়িটাতে", কিকিরা বললেন। "যা যা ঘটল সবই জলধরবাবু আসার পর।"

হরিচন্দন কিকিরার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন সামান্য সময়। তারপর মাথা নাড়লেন। "হ্যাঁ। তুমি ঠিকই বলেছ! জলধর এসেছেন বছরখানেক। আর দুটো ঘটনাই ঘটেছে গত কয়েক মাসের মধ্যে। তোমার কি মনে হয় এর মধ্যে জলধরের হাত আছে?"

"এখন বলতে পারছি না। মানুষটি যতই কেননা হাতে তালি বাজিয়ে সন্ধেবেলায় ঠাকুরদেবতার গান করুন, আমার মনে হয় উনি অতটা দেবদ্বিজের ভক্ত নন। ভক্তি আর ভাব এক জিনিস নয়, দাদা। ভদ্রলোক বেশ চতুর। ওঁর মুখের কথা আর মনের মতলব আলাদা হতেই পারে। তা ছাড়া জলধরবাবু যা যা বলেছেন ওঁর সম্পর্কে, তা সত্যি না বানানো কে বলবে!"

"ভেরিফাই করা যায় না?" তারাপদ বলল।

"করা মুশকিল। অন্তত আন্দামানের ব্যাপারটা। অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে। অত হাঙ্গামা করতে গেলে সময় নষ্ট হবে।"

"তা হলে?" হরিচন্দন বললেন।

"আমি অন্য কোনও উপায় খুঁজছি। অসুবিধে কী জানেন, যাঁরা মারা গিয়েছেন তাঁদের তো আর ফিরে পাব না যে, দু'-এক কথা শুনে কাউকে সন্দেহ

করব ! মরা মানুষ সাক্ষী হয় না, দাদা !.... তা সে অন্য কথা। আপাতত আমরা বলাইবাবু আর সলিলবাবুকে বাজিয়ে দেখি। তাঁরা দু' জনেই কী লুকোতে চাইছেন !"

হরিচন্দন বললেন, "দেখো।...আমাকে না শেষ পর্যন্ত মৃণালকুঞ্জ তুলেই দিতে হয় ! দু'জন তো গিয়েছেন, আবার কোন দিন কেউ চলে যান যদি..."

"না না, অত ভাববেন না। আজ উঠি।" কিকিরা উঠে পড়ার উদ্যোগ করলেন।

"তুমি ফিরবে কেমন করে ? বনমালীকে বলি পৌঁছে দিয়ে আসুক।"

"না। আজ আমি ফিরব না। বলে এসেছি, কলকাতায় আমার কাজ আছে আপনার সঙ্গে, অন্য দরকারও আছে। কাল বেলার দিকে আমি ফিরব। বাসে। আপনি ব্যস্ত হবেন না। আসি দাদা। চলো তারাপদ।"

রাস্তায় এসে চন্দন বলল, "আপনি বাড়ি যাবেন ?"

"হ্যাঁ। রাতটা কাটিয়ে কাল ফিরব।"

"চলুন তবে।"

"তোমরাও যাবে ! দরকার নেই। আমি একটু ঘুরেফিরে যাব। আমার কয়েকটা জিনিস জোগাড় করতে হবে। আমার চেলাদের কাছে পেয়ে যাব।"

"আপনার শিষ্য ? লাইনের লোক ?"

কিকিরা হাসলেন। "কারেক্ট।"

"ম্যাজিকঅলা..."

"একটা বাঁশি চাই, সাপুড়েরা যে-বাঁশি বাজায়।"

"সাপুড়ের বাঁশি ?" তারাপদ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

"আকাশ থেকে পড়ছ নাকি ? ফলিং ফ্রম স্কাই ! ম্যাজিশিয়ানদের খেলা দেখাবার ছলাকলা সাজপোশাক বাদ দাও। রাস্তায় মাদারির খেলা দ্যাখোনি কখনও ! তারাও কেমন সাপুড়ের বাঁশি বাজায়, আর বড় একটা ঝুড়ির মধ্যে একটা বাচ্চাকে ঢুকিয়ে দিয়ে ঝুড়ির মাথা বন্ধ করে দেয়। তারপর বাঁশি বাজাতে বাজাতে ঝুড়ির মধ্যে এক হাত লম্বা ছোরা চালায় চার-পাঁচটা। পরে যখন ছেলেটা বেরিয়ে আসে, একেবারে যেমন কে তেমন !... তোমরা কলকাতার ছেলে—এসব রাস্তাঘাটের মামুলি খেলা দেখবে কেমন করে ?"

"সাপুড়ের বাঁশি আপনি কী করবেন ?"

"জলধর বলেছেন তিনি আগে একটু বাঁশিতে ফুঁ দিতে পারতেন। আমি অবশ্য পারি না। কলজেতে সে-দম নেই। তবে পিপলুকে পাব। পিপলু সাপুড়ে সেজে বাঁশি বাজিয়ে ঝুড়ির মধ্যে থেকে প্যাঁচানো দড়ি বার করে। রোপ ট্রিক। ওকে ধরে নিয়ে গিয়ে কোথাও থেকে একটা টেপ রেকর্ড করিয়ে নিতে পারব।"

চন্দন আর তারাপদ মুখ চাওয়াচাওয়ি করল।

শেষে চন্দনই বলল, "আপনিও তা হলে বুজরুকি বিশ্বাস করলেন ! সাপুড়ের বাঁশি ছাড়াও ধুনুচি, হলুদ চাল, সিঁদুরমাখা আমপাতা, জবাফুল, সাপের খোলস..."

"কী যে বলো তুমি ! প্লাস্টিকের সাপ, গিরগিটি কোনটা না পাওয়া যায় বাজারে ! ছেলেমানুষের খেলনা, যাত্রা থিয়েটারের নকল সাপ। আর এ তো শুধু একটু খোলস ! বাকি যা তা..."

"বুঝেছি।" তারাপদ মাথা হেলিয়ে বলল, "আর গন্ধ !"

"হয়ে যাবে। অখাদ্য ধূপ অনেক পাওয়া যায় বাজারে। না হলে কেমিক্যাল দোকানে খোঁজ করব।"

"জলধর তা হলে আপনার টার্গেট !"

মাথা নাড়তে নাড়তে কিকিরা বললেন, "জলধর একা নয়, ওঁদের দু'জনও আমার নজরে আছেন— বলাইবাবু আর সলিলবাবু !"

অল্পসময় চুপচাপ।

তারাপদ বলল, "আমরা তা হলে কী করব ?"

"তুমি পরশুর পরের দিন তরশু যাবে। দু'-একটা জিনিসপত্র নিয়ে যেয়ো হাতে করে। চাল আটা লাগবে না। আছে। বরং পিপলুকে বলে যাব— তোমার হোটেলে গিয়ে যা যা দেওয়ার দিয়ে আসবে। একটা ব্যাগে করে নিয়ে যাবে। ডেলিভারির তে-চাকা নিয়ে এসো না।... আর চাঁদু, তুমি এবার ওই বন্ধ কারখানার দরোয়ানকে ক্যাচ করো। যেমন করে হোক পটিয়ে কারখানার ভেতরে ঢোকো একবার। দেখো যদি কিছু প্রমাণ পাও।"

চন্দন মাথা নাড়ল। "ও-কে সার ! আমি ম্যানেজ করার চেষ্টায় থাকব। মুশকিল কী জানেন, আপনাদের মৃণালকুঞ্জ আর কারখানা এত কাছাকাছি— ভয় হয় আপনাদের ওখানে কারও নজরে পড়ে যাই !"

"যাও তো যাবে। তুমি বিজনেসম্যান ! বন্ধ কারখানার ব্যাপারটা দেখতে যেতেই পারো।"

"বেশ ! যা বলবেন— !"

"তা হলে তোমরা এবার এসো। আমি নিজের কাজে যাই।"

"আসুন। সার, আপনি কিন্তু সাবধানে থাকবেন।"

"আমায় নিয়ে ভেবো না। আমি তিনটে চোখ নিয়ে থাকি ওখানে। আমায় কাবু করা সহজ হবে না।"

"না হলেই ভাল।"

"আমি আসি। সন্ধে হয়ে যাচ্ছে। আর দেরি করলে আমার কাজ হবে না।" কিকিরা একটা ট্যাক্সি ধরে নিলেন বড় রাস্তা থেকে।

বাড়ির সামনে বাগানে সলিলবাবু পায়চারি করছিলেন। আজ বিকেল থেকেই গুমোট বাড়ছে। আকাশের চেহারা থমথমে। বাতাস নেই। সলিলবাবু ধীরে ধীরে হাঁটছিলেন। মাঝে মাঝেই ধুতির কোঁচার একটা প্রান্ত আলগা করে তুলে নিয়ে মুখের, গলার ঘাম মুছছিলেন।

হঠাৎ কিকিরার গলা পেলেন। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালেন। কিকিরাকে তিনি আগেই দেখেছেন বাগানে। ওপাশে ছিলেন। রজনীবাবুও বাগানে, ফটকের কাছে। আজ হাতে খুরপি বা শিক নেই। চৈতন্য মালীর সঙ্গে কী কথা বলছিলেন। বোধ হয় ফটকের গায়ে মাধবীলতার ডালগুলো যেভাবে ঝুলে পড়েছে, শুকনো পাতা জমেছে গোড়ায়—তা নিয়ে কথাবার্তা হচ্ছে।

সলিলবাবু বুঝতে পারেননি কিকিরা কখন ওপাশ থেকে এপাশে এসে দাঁড়িয়েছেন, একেবারে তাঁর পাশে। গলা শুনে কিকিরার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালেন।

কিকিরা আবার বললেন, “আকাশ দেখেছেন ?”

সলিলবাবু মুখ তুলে আকাশ দেখলেন। আগেও দেখেছেন।

“কী মনে হচ্ছে, ঝড়বৃষ্টি হবে এক পশলা ?” কিকিরা বললেন।

“মেঘ হচ্ছে...”

“এখন কালবৈশাখীর সময়। চৈত্র মাস—।”

“হলে ভালই। বড় গুমোট।”

“ঝড় হবে। আমার তাই মনে হচ্ছে। আকাশ কিন্তু কালো হয়ে আসছে ওদিকটায়।”

সলিলবাবু হাঁটতে লাগলেন। পাশে কিকিরা।

দু’-পাঁচটা এলোমেলো সাধারণ কথা। কিকিরা কলকাতা থেকে ফিরেছেন বেলা এগারোটা নাগাদ। রোদের তাতে সব যেন পুড়ে যাচ্ছে তখন। কলকাতায় আজ কী ভয়ংকর এক অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে বাসে বাসে ধাক্কা লেগে শ্যামবাজারের মোড়ে, তার কথা বলতে বলতে দশ-বিশ পা এগিয়ে এলেন কিকিরা, সলিলবাবুকে নিয়ে।

“না। ঝড় হবেই,” কিকিরা বললেন শেষে। ঝড়ের প্রথম ধুলো উড়ে এল।

আকাশ সত্যিই কালো হয়ে আসছে দেখতে দেখতে।

সলিলবাবুও মাথা হেলালেন।

“চলুন ভেতরে যাই। হঠাৎ ঝড় উঠলে ধুলোর ঝাপটা খেতে হবে।”

“ভেতরে আরও গুমোট।”

“আমার ঘরে বসবেন। পাখা আছে।”

সলিলবাবু আকাশের দিকে তাকালেন আবার। সামান্য আগেও মেঘগুলো এত কালো মনে হয়নি। সত্যিই ঝড় আসছে। মেঘের দল ছুটে আসছিল হু-হু করে। রজনীবাবুও পা চালিয়ে ফিরে আসছেন।

পা বাড়ালেন সলিলবাবু, "চলুন।"

বারান্দায় উঠে এসে সলিলবাবু বললেন, "ঘরের দরজা জানলা খোলা আছে। বন্ধ করে দিয়ে আসি।"

"আসুন। রজনীবাবুও ফিরে আসছেন। তিনিই বন্ধ করে দিতে পারেন।"

"তা হোক। আমি যাই।"

কিকিরা বললেন, "আসুন তবে। আসবেন কিন্তু। আপনার সঙ্গে আমার ক'টা জরুরি কথা আছে।"

সলিলবাবু দেখলেন কিকিরাকে কয়েক পলক, তারপর চলে গেলেন।

দেখতে দেখতে ঝড় এসে গেল। কালবৈশাখীর ঝড়। মাঠঘাট থেকে ধুলো শুকনো পাতা খড়কুটো উড়িয়ে এনে চারপাশ অন্ধকার করে ফেলল। মেঘও ডাকছিল। সোঁদা গন্ধ ভেসে আসার পর পরই বৃষ্টি।

সলিলবাবু এলেন। কিকিরার ঘরে আলো জ্বলছে। পাখাও চলছিল। একটিমাত্র জানলা খোলা। ঝড় নেই ; বৃষ্টি রয়েছে তখনও।

"বসুন," কিকিরা বললেন।

বসলেন সলিলবাবু। কিকিরা নিজের খাটের ওপর বসে।

"আজকের রাতটা তা হলে স্বস্তি, কী বলুন," বললেন কিকিরা। "রাতে ভালই ঘুম হবে।"

সলিলবাবু জবাব দিলেন না। ক'দিনের ভ্যাপসা গরমের পর আজকের ঝড়বৃষ্টি যে স্বস্তিদায়ক, তা তো জানা কথা।

কিকিরা অনর্থক বেশি ভূমিকায় গেলেন না। সরাসরি বললেন, "আপনাকে ক'টা কথা জিজ্ঞেস করি। আমি এখানে আসা পর্যন্ত নানান কথা শুনি। ভয়ও হয় একটু আধটু। রোগাপটকা মানুষ, বুঝতেই তো পারছেন। সাহস কম। ...আচ্ছা সলিলবাবু, ওই ব্যাপারটায় আপনার কী ধারণা ? প্রথম দুর্ঘটনাটার কথা বলছি। শ্রীকান্তবাবু যে আগুনে পুড়ে মারা গেলেন, এটা কি ওঁরই দোষে ! মানে অসাবধানতার জন্যে ?" বাকি কথাটা শেষ করলেন না কিকিরা।

সলিলবাবু তাকিয়ে থাকলেন। "কেন ?"

"না, এমনি জিজ্ঞেস করছি। আপনাদের পুরনো ম্যানেজার দীনুবাবু হরিবাবুকে বলেছেন, এই বাড়িতে নাকি একটা অশুভ আত্মা প্রেতাত্মা ভর করেছে।"

সলিলবাবু বললেন, "দীনুবাবুর সেরকম ধারণা হয়েছিল আমরাও শুনতাম। কার কী ধারণা হয়, কেন হয়—কেমন করে বলব !"

"দ্বিতীয় ঘটনাটাও..."

"মুরলীবাবুর আত্মহত্যা সম্পর্কেও আমি কিছু জানি না। সেদিন আমি ছিলাম না। আগেই বলেছি আপনাকে।"

"মেয়ের বাড়ি গিয়েছিলেন কলকাতায়। ঢাকুরিয়ায়। ফিরতে পারেননি।"

"না।"

কিকিরা এবার চোখে চোখে তাকালেন সলিলবাবুর। তারপর হঠাৎ বললেন, "আপনি কি মেয়ের বাড়িতে ছিলেন সেদিন ?"

সলিলবাবু যেন থতমত খেয়ে গেলেন। মুখটা কেমন কুঁচকে গেল। "ও কথা জিজ্ঞেস করছেন কেন ?"

কিকিরা এবার সরাসরি বললেন, সামান্য শক্ত গলায়। "শুনলাম মেয়ের বাড়িতে আপনি দেখা করতে গিয়েছিলেন, কিন্তু ছিলেন না।"

"কে বলল ?" সলিলবাবু চমকে উঠলেন। গলা উঠল না।

"আপনার জামাই।"

সলিলবাবুর মুখচোখের চেহারা পালটে গেল। ভয় পেয়েছেন। বিভ্রান্ত। মুখ নামিয়ে নিলেন।

কিকিরা বললেন, "কথাটা ঠিক ?"

সলিলবাবু চুপ। মুখ তুলছিলেন না।

অল্প সময় চুপ করে থেকে কিকিরা চমৎকার এক গল্প বানালেন। বললেন, "কাল আমি যখন হরিবাবুর বাড়িতে কয়েকটা কাজের কথা বলতে যাই, তখন দেখি সেখানে হরিবাবুর এক দূর সম্পর্কের ভাইপো বসে ছিলেন। ভদ্রলোক পুলিশ অফিসার। বড় অফিসারই। তাঁর সঙ্গে উনি কথাবার্তা বলছিলেন। এই বাড়ির কথাই। উনি দু'-দুটো দুর্ঘটনার কথা শোনাচ্ছিলেন। অফিসার ভদ্রলোক প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মাথা নাড়তে লাগলেন। আমার মনে হল, উনি বিশ্বাস করলেন না।"

সলিলবাবু কেমন যেন সন্ত্রস্ত হয়ে বললেন, "আমার কথা উঠেছিল ?"

"আপনাদের দু'জনের কথাই উঠল। বলাইবাবু, আপনি—"

"আমি সত্যিই সেদিন এখানে ছিলাম না। ...কিন্তু আমার জামাইয়ের কথা কে বলল !"

"যেই বলুক আপনি নিজে কী বলেন ! হরিবাবুই হয়তো তলায় তলায় খোঁজখবর করছেন।"

সলিলবাবু জবাব দিচ্ছিলেন না কথার। বৃষ্টি কমে আসছিল। ঠাণ্ডা বাতাস আসছে, ভিজে মাটি গাছপালার গন্ধ।

কিকিরা সলিলবাবুকে আরও ঘাবড়ে দিতে চাইছিলেন। বিশ্বাস করাতে চান পুলিশের ব্যাপারটা ফেলনা নয়। বললেন, "আপনি জানলেও জানতে পারেন, হরিবাবু এই দুটো দুর্ঘটনাকে মেনে নিতে পারছেন না। তাঁর সন্দেহ রয়েছে।

তলায় তলায় তিনি খোঁজখবর নিচ্ছেন।”

সলিলবাবু হঠাৎ বললেন, “আপনি কে ? পুলিশের কেউ ?”

কিকিরা হেসে ফেললেন, “মশাই, আমার এই হ্যাংলা চেহারা। রোগাপটকা মানুষ আমি। বয়েসটাও বিবেচনা করুন। আমি কি পুলিশের লোক ! আপনার কি মাথাখারাপ হয়েছে !”

খানিকটা ধাঁধায় থাকলেন সলিলবাবু। কী মনে করে পরে বললেন, “আপনাকে যদি সত্যি কথাটাই বলি—তাতে কী লাভ হবে আমার !”

“বেশ তো, আমায় না বলেন, হরিবাবুকেই বলবেন।” কিকিরার গলা শুনে মনে হল তিনি জোরজবরদস্তি করছেন না। “হরিবাবু শীঘ্রি একদিন আসছেন এখানে। তাঁকেই বলবেন। তবে কথা কী জানেন সলিলবাবু, আমায় বললে আপনার কোনও ক্ষতি নেই। হরিবাবুকে আমি বোঝাতে পারব। আর আপনি আমায় না বললেও হরিবাবুর কাছ থেকে আমি জানতে পারব।”

সলিলবাবু ভাবছিলেন। নস্যি নেওয়ার অভ্যেস আছে তাঁর। পকেট থেকে নস্যির ডিবে আর ময়লা রুমাল বার করে নস্যি নিলেন। “আপনাকেই বলি। বিশ্বাস করবেন আমার কথা ?”

“কেন করব না ! আমাকে দিয়ে আপনার ক্ষতি হবে ভাবছেন কেন ! সত্যি কথা বললে লাভও হতে পারে।”

সলিলবাবু কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, “তা হলে বলি, সেদিন মেয়ের বাড়িতে আমি ঘণ্টা দুয়েকও ছিলাম না। মেয়ে-জামাইয়ের ওপর আমার টান কম। নাতিটার টানেই যাই। মেয়ের কাছে যাব কী বলুন ! গেলেই শুধু টাকার কথা। আজ পাঁচ হাজার চায়, কাল সাত হাজার, পরশু দশ হাজার। টাকা চায় জামাইয়ের ব্যবসার নাম করে। এটার জন্যে দরকার, ওটার জন্যে দরকার। জামাইয়ের উসকানি আছে, জানি। জামাইয়ের দোকান তো খারাপ চলে না। তবু কেন যে এত চাই চাই ! জামাইটি আমার ভাল নয়। বিয়ের সময় থেকেই কম দিইনি। আমার সারা জীবনের যা উপার্জন সঞ্চয়, তার অর্ধেকটাই ওদের জন্যে খরচ হয়ে গিয়েছে। ...আর ভাল লাগে না। সেদিন মেয়ে হাজার দশেক টাকা চেয়ে বসল জামাইয়ের নাম করে। আমার মাথা গরম হয়ে গেল। ঘেন্নাও হল। মেয়েকে বললাম, ‘পারব না।’ বলেই ও বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে এলাম।”

চুপ করলেন সলিলবাবু, যেন দম নিচ্ছিলেন। কিকিরা শুনছেন মন দিয়ে। বৃষ্টি বুঝি থেমে এল। শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না।

সলিলবাবু বললেন আবার। “আপনাকে একটা কথা বলি। মেয়েটি আমার প্রথম পক্ষের স্ত্রীর। সে চলে যাবার পর আবার বিবাহ করতে হয়। আমার দ্বিতীয় স্ত্রীর হাতেই মেয়ে আমার মানুষ। স্নেহ ভালবাসা কম পায়নি। তা আমার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীরও একটি সন্তান হয়। ছেলে। বিকলাঙ্গ বলতে

পারেন। হাবাগোবা। বছর চোদ্দো-পনেরো বয়েস থেকেই তার মাথার গোলমালও দেখা দেয়। এখন সে পাগল। বাঁশদ্রোণীর দিকে একটা সাধারণ উন্মাদ আশ্রমে সে থাকে। আমি তাকে দেখতেও যাই। খরচাপাতিও দিতে হয়। সেদিন মেয়ের বাড়ি থেকে বেরিয়ে ছেলেকে দেখতে গেলাম। তার অবস্থা দেখলাম গুরুতর। ওখানেই সন্ধে হয়ে গেল। মনও খারাপ। আমি আর এখানে ফিরে আসার চেষ্টা করিনি। চেতলায় আমার এক বন্ধু আছে। সেখানেই রাত কাটিয়ে পরের দিন এখানে ফিরলাম। ফিরে দেখি ভয়ংকর অবস্থা। মুরলীবাবুকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে হেল্‌থ সেন্টারে। তাঁর বাঁচার আশা নেই।"

কিকিরা প্রতিটি কথা মন দিয়ে শুনেছেন। নিশ্বাস ফেললেন। দুঃখও হচ্ছিল সলিলবাবুর জন্যে।

"আপনি যদি খোঁজ নিতে চান—আমি সেই উন্মাদ আশ্রম আর বন্ধুর বাড়ির ঠিকানা দিচ্ছি, নিজে গিয়েও খবর করতে পারেন।"

কিকিরা মাথা নাড়লেন। "আপনার কথা আমি এখন অন্তত অবিশ্বাস করছি না।"

"আমি একবর্ণও মিথ্যে বলিনি। হরিবাবুকে আপনি আমার কথা জানাতে পারেন।"

"জানাব। ...আচ্ছা, একটা কথা বলুন তো?"

"কী বলব?"

"আপনি যে সেদিন ফিরতে পারবেন না এ-কথা কি এখানকার কাউকে বলেছিলেন?"

"দেখুন, আমরা সবাই বুড়ো মানুষ। এ তো বাচ্চাদের হোস্টেল বোর্ডিং নয় যে, কোথাও যেতে হলে আগে বলতে হবে, পারমিশন নিতে হবে! আর ফিরতে পারব না সেটা জানিয়ে যেতে হবে! দীনুবাবু জানতেন আমি কলকাতায় যাচ্ছি।"

"ফিরতে পারবেন না—তাও জানতেন।"

"না; কেমন করে জানবেন। আমার তো ফেরারই কথা।"

"ও! তা হলে এখানকার কেউই জানতেন না যে আপনি ফিরবেন না?"

"হ্যাঁ। ...তবে আমি হয়তো রজনীবাবুকে বলেছিলাম, শীতের দিন, রাত হয়ে গেলে ঠাণ্ডা লাগিয়ে ফিরব না।"

"বলেছিলেন কিনা মনে করতে পারছেন না ঠিক?"

"না। রজনীবাবু আর আমি একই ঘরে আছি কতদিন ধরে। বললে ওঁকেই বলতে পারি; আর কাউকে নয়। তবে আমি ফিরতে পারব না, নিজেও কি জানতাম!"

কিকিরা বসার ভঙ্গি পালটে নিলেন। "রজনীবাবু মানুষটি বড় চুপচাপ।

নিরীহ। নিজের মনে থাকেন। কেমন লাগে আপনার রুমমেটকে ?”

“ভালই লাগে। উনি বরাবরই ওইরকম। শান্ত, সাতপাঁচে থাকেন না। ওঁরও অনেক দুঃখ আছে। ভাগ্যও বড় মন্দ। একবার মা, স্ত্রী আর একটিমাত্র ছেলেকে নিয়ে গিয়েছিলেন হরিদ্বার টরিদ্বার বেড়াতে। ঘোরাঘুরি করার সময় বাস উলটে অনেকেই মারা যায়। ওঁর মা, স্ত্রী, ছেলে—কাউকেই আর তিনি ফিরিয়ে আনতে পারেননি। এই শোক কি সামলে ওঠা সম্ভব! উনিও পারেননি। চাকরি করতেন সাধারণ। সেখানেও মন বসাতে পারলেন না। রিটায়ার করলেন আগে আগে। হাতে টাকাপয়সাও জমল না। তারপর থেকে কোনও রকমে দুটো খেয়েপরে দিন কাটাচ্ছেন। ওঁর অভাবও রয়েছে। বুঝতে দেন না।”

কিকিরা এতটা জানতেন না। কষ্টই হল।

দু'জনেই নীরব। শেষে কিকিরা বললেন, “আর একটা কথা আপনাকে জিগ্যেস করি। দীনুবাবু যেসব কথা হরিবাবুকে বলতেন—তার মধ্যে সাপুড়ের বাঁশি, বিচ্ছিরি গন্ধ, ফটকের কাছে তুকতাক করার কথাও বলেছেন। আপনি...”

“আমিও শুনেছি।”

“শ্রীকান্তবাবু মারা যাওয়ার দিন, মুরলীবাবুর চলে যাওয়ার দিনও—”

“মুরলীবাবু চলে যাওয়ার দিন আমি এখানে ছিলাম না। বাঁশি শুনব কেমন করে ? পরের দিন যখন ফিরে এলাম এখানে তখন কী অবস্থা যাচ্ছে বুঝতেই পারছেন ! ফটকের কাছে কী আছে না আছে কে আর নজর করবে ?”

“প্রথমবার, মানে শ্রীকান্তবাবুর ওই ঘটনার দিন— ?”

“মনে করতে পারছি না।”

“এখানে আর কোনও দিন সাপুড়ের বাঁশি শুনেছেন ?”

“তা শুনেছি। ...ম্যানেজারবাবু, এটা একরকম গ্রাম। মাঠঘাট খেত ঝোপঝাড় চার পাশেই। সাপ এখানে থাকবেই। এই বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে গরম বর্ষায় সাপ দেখা যায়। আমরা সাবধানে থাকি। ...তা ছাড়া, এই আপনার শীত আসার সময় থেকে দেখেছি— মাঝে মাঝে বেদেরা মাঠেঘাটে সাপ ধরতে আসে। বাঁশিও বাজায়। তবে কীভাবে সাপ ধরে জানি না। শুনেছি ওটা ওদের জন্মগত শিক্ষা। গর্ত দেখলেই বুঝতে পারে। সাপ ধরে বিক্রিও করে বলে শুনি। বিষ থেকে নাকি ওষুধ হয়।”

কিকিরা আর কথা বাড়ালেন না। সলিলবাবুও উঠে পড়লেন।

তারাপদ এসেছিল ঠিক দিনে। হাতে একটা মাঝারি কিট ব্যাগ।

কিকিরা ব্যাগ খুলে দেখে নিলেন যা যা চেয়েছিলেন সব আছে কি না!

"এভরিথিং ও-কে, সার?"

মাথা হেলিয়ে সায় দিলেন কিকিরা।

"কতটা এগুলেন?"

"খানিকটা। সলিলবাবু বাদ গেলেন।"

"মানে, সাসপেক্ট নন।"

"না। অন্তত পনেরো আনা নয়।"

"বলাইবাবু?"

"এখনও চেপে ধরিনি। আজ ধরব।"

"চাঁদু কাল এসে কারখানার দরোয়ানজিকে ম্যানেজ করে গিয়েছে, জানেন?"

"না। এখানে আসেনি। ভালই করেছে। ... সরাসরি নজরের বাইরে থাকতেই বলেছিলাম। রেজাল্ট কী? কারখানার ভেতরে ঢুকেছিল?"

"এক নজর দেখেছে। তবে কারখানার ফটকের ও-পাশে দরোয়ানজির ঘর। ফটকের গা ঘেঁষে। সেই ঘরের গায়ে গায়ে আরও একটা ছোট ঘর আছে। চাঁদু বলল, কারখানা থেকে জিনিস বেরুবার সময় ওই ঘরে বসে কেউ চেকিং করে নিত। মোদ্দা কথা, ডেলিভারি জিনিসের হিসেব রাখত।"

"ঘরে কিছু পেয়েছে?"

"তেমন কিছু নয়। ঘরে একটা দড়ির খাটিয়া, একটা ধুলোভরা ভুট-কম্বল, আর এক পাটি জুতোর ছেঁড়া ফিতের টুকরো।"

কিকিরা কৌতূহল বোধ করলেন। "ফিতের রং।"

"খাকি। তাই তো বলল।"

কিকিরা কী যেন ভাবছিলেন। পরে বললেন, "চলো, একটু বাইরে যাই।"

বাইরে বিকেল নেমেছে আগেই। চৈত্রমাস বলে আলো রয়েছে যথেষ্ট। রোদও ফুরোয়নি। গাছের মাথার দিকে উঠে যাচ্ছে রোদ। গরম যেন সামান্য কম। গত পরশুর কালবৈশাখী আর বৃষ্টির পর তাপ কমেছে অল্প।

তারাপদকে নিয়ে বাইরে এসে ঘুরতে ঘুরতে সবজি বাগান আর পুকুরের কাছে এলেন কিকিরা।

"বসবে? থাক, মাটি এখনও তলার দিকে ভিজে। কাদা লাগতে পারে। একটা সিগারেট দাও।"

তারাপদ সিগারেট দিল।

সিগারেট ধরিয়ে চারপাশে তাকাতে তাকাতে কিকিরা হঠাৎ বললেন,

"ওদিকটায় দেখো," বলে হাত তুলে আঙুল দিয়ে কী যেন দেখালেন।

তারাপদ বলল, "কী দেখব ?"

"ওই যে দেখছ জায়গাটা, যত রাজ্যের ভাঙা ইট, পাথর, রাবিশ জড়ো হয়ে ঢিবি হয়ে আছে—ঠিক ওইখানে পড়ে গিয়েছিলেন মুরলীবাবু। ঝাঁপ দিয়েছিলেন বলেন এঁরা।"

"ওটা পরিষ্কার করাননি ?"

"না। এখনও করাইনি। লাভও বা কী হবে! ... একটা জিনিস লক্ষ করছ ? মৃণালকুঞ্জর বাড়ির ওটা পেছন দিক। দোতলার বারান্দা দেখা যাচ্ছে। বারান্দার গায়ে রজনীবাবু, বলাইবাবুদের ঘর। পাশাপাশি।"

তারাপদ দেখল। "ওটা কী সাদা মতন ?"

"কোনটা ?"

"ওই যে ঢিবির প্রায় পাশেই।"

"ওটা তুলসীমঞ্চ।" বলেই একেবারে আচমকা কিকিরার কী মনে হল, বললেন, "জলধরবাবু রোজ সকালে মঞ্চের কাছে এসে হাত জোড় করে প্রণামমন্ত্রনাম করেন। কয়েকটা তুলসীপাতা ছিঁড়ে মুখে দেন। বলেন, তুলসীপাতা হল ভীষণ উপকারী, সব বয়েসের মানুষের পক্ষে। তুলসীপাতার রস দিয়ে ওষুধও হয়।"

তারাপদ হেসে বলল, "মধু আর তুলসীপাতা ... সর্দিকাশিতে বাচ্চা বেলায় খেয়েছি।"

"চলো।"

"কোথায় ?"

"ওই তুলসীমঞ্চটা একবার দেখি। অত সাদা দেখাচ্ছে। হালে চুনকাম করেছে নাকি কেউ ?"

তারাপদ এগিয়ে চলল কিকিরার সঙ্গে।

মঞ্চের কাছাকাছি এসে দাঁড়ালেন কিকিরা। ইট দিয়ে বাঁধানো তুলসীমঞ্চ। ফুট তিনেক উঁচু। তুলসীগাছের পাতাগুলি সব সবুজ নয়, রোদের তেজে কিছু পাতা শুকিয়ে এসেছে।

কিকিরা মন দিয়ে মঞ্চ আর গাছটি দেখছিলেন। চোখে পড়ল, রজনীবাবু দশ-পনেরো হাত তফাতে নিজের মনে কী যেন দেখছেন।

কিকিরা ডাকলেন রজনীবাবুকে।

রজনীবাবু এগিয়ে এলেন ধীরে ধীরে। হাতে খুরপি।

"রজনীবাবু ? আপনাদের এখানে আর তুলসীঝোপ নেই ?"

"কেন থাকবে না ; আছে।"

"এটি মঞ্চ। বাঁধিয়ে করা।"

"জলধরবাবু করেছেন। উনি বলেন, এটি বৃন্দাবনী তুলসী। নিজেই

তুলসীচারা আনিয়ে মঞ্চ করেছেন। বৃন্দাবনের মাটি ... পুণ্যস্থান ...”

“ও ! নিজের হাতেই করেছেন নাকি ?”

“না। বাইরে থেকে রাজমিস্ত্রি ধরে এনেছিলেন। যা করেছেন নিজেই দাঁড়িয়ে থেকে।”

“ধর্মেকর্মে ভদ্রলোকের খুব মতি। সকালে মুখে তুলসীপাতা না দিলে ওঁর মুখ শুদ্ধ হয় না। সন্ধেবেলায় দু' হাতে তালি বাজিয়ে নমঃ গোবিন্দ জয় গোবিন্দ করেন।” কিকিরা যেন মুচকি হাসলেন। “এই মঞ্চটি কবে তৈরি হয়েছে ?”

“কবে ! গত গরমে। বর্ষার আগে আগেই। বর্ষার জলে গাছটা বেড়ে উঠল। এখন একটু শুকোবে। আবার বাড়বে বর্ষায়।”

কিকিরা আর কিছু বললেন না।

রজনীবাবুও সরে গেলেন অন্য পাশে।

আরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে কিকিরা তুলসীমঞ্চটা দেখলেন। “তারা, তুলসীগাছের এত যত্ন কারা করে ? হিন্দুবাড়িতে বিধবারা করে, বুড়িরা করে। মেয়ে বউরাও সন্ধেবেলায় প্রদীপ দে[illegible]। এখানে তেমন কেউ নেই। তবে হ্যাঁ, জলধরবাবু আছেন। বোধ হয় উনি পরম বৈষ্ণব। ... নাও, চলো।”

কিকিরার পাশে পাশে হাঁটতে লাগল তারাপদ।

বাড়ির সামনের দিকে এসে তারাপদ বলল, “আপনি সামান্য একটা তুলসীমঞ্চ দেখে এত গম্ভীর হয়ে গেলেন কেন ?”

“গম্ভীর হলাম কোথায় ! ভাবি। আগেও নজরে এসেছে মঞ্চটা, কিন্তু মাথা ঘামাইনি।”

“কী ভাবছেন ?”

“জলধরবাবুর কথা ভাবছি। ... আচ্ছা, ওই মঞ্চটার গায়ে যে চুনকাম করা দেখলে, তা নতুন নতুন মনে হল না ! মানে, আগেও চুনকাম ছিল, আবার কলি ফেরানো হয়েছে। তাই না !”

“বোধ হয়। আমি কি অত খেয়াল করেছি !”

“যাক গে, তুমি যাবে কখন ?”

“এবার যাব। বাস ধরতে হবে।”

“চলো, একটু চা খেয়ে যাও। এখনও আলো আছে। তুমি ঠিক সময়ে গিয়ে বাস ধরতে পারবে।”

ঘরে আসার আগেই কিকিরা রাধুঠাকুরকে ডেকে এক কাপ চা করে দিতে বললেন।

চা খেয়ে তারাপদ যখন চলে যাচ্ছিল, কিকিরা তাকে এগিয়ে দিতে গিয়ে হঠাৎ বললেন, “আগামী শনিবার তোমরা এখানে থাকবে রাত্রে। আমার গেস্ট। চাঁদুকে বোলো। রবিবার তার ছুটির দিন।”

পরের দিন খানিকটা বেলায় বলাইবাবু সকালের ঘোরাফেরা শেষ করে ফিরে আসতেই দেখলেন, কিকিরা বাইরের বারান্দায় বসে আছেন।

কিকিরা দেখছিলেন বলাইবাবুকে। ভদ্রলোক রোদের তাতে ভ্যাপসা গরমে যেন ভিজে জল হয়ে গিয়েছেন। মুখে গলায় ঘাম, গায়ের জামাও ভিজে রয়েছে অনেক জায়গায়।

"কী মশাই, চান করে এলেন যে!" কিকিরা বললেন।

রুমালে মুখ মুছতে মুছতে বলাইবাবু বললেন, "বেলা হয়ে গেল! যা চড়া রোদ।"

"কোথায় গিয়েছিলেন?"

"ওই দুর্গা ভাণ্ডারে। বকুলপুরের তেমাথায়।"

"মর্নিং ওয়াক করতে?"

"আরে না মশাই, দু'-একটা জিনিস কেনার ছিল। দাড়ি কামানোর সাবান ফুরিয়েছে, ব্লেডও নেই। আমার আবার বড় ঘামাচি হয় গরমে। বরিক পাউডারের সঙ্গে মামুলি কিছু মিশিয়ে নিই। তাও এত বেলা হত না। তেমাথায় গেলাম যখন তখন একবার পোস্ট অফিসটাও ঘুরে এলাম। ছোট পোস্ট অফিস। চিঠিপত্তর ..."

"ও! আপনাদের এখানে চিঠিপত্র বিলি করার লোক আসে না?"

"না। কে আসবে এতদূর! তবু যখন কারখানাটা ছিল একটা পিওন আসত সাইকেলে চেপে। আসত কারখানার জন্যে। মাসোহারা ছিল। তখন তবু তার টিকি দেখতাম এখানে। কারখানা পর্যন্ত আসত বলে আরও একটু এগিয়ে আমাদের কৃপা করে যেত। হালফিল আর আসে না। পুজোর সময় এক-আধদিন হয়তো আসে। বকশিশ তো নিতে হবে।"

"বসুন না! দাঁড়িয়ে কেন?"

"বড় ঘামছি।"

"আমার ঘরে যাবেন! পাখার তলায় বসবেন খানিক।"

"চলুন।" বলে পা বাড়িয়ে নকুলকে ডাকলেন। বার কয়েক।

নকুল কাজে ব্যস্ত ছিল। সময় লাগল আসতে।

দুটো পোস্টকার্ড আর একটা ইনল্যান্ড এগিয়ে দিলেন বলাইবাবু। বলে দিলেন কাকে কাকে দিতে হবে।

কিকিরা বললেন, "মাত্র তিনটে চিঠির জন্যে আপনি—"

"ভাল কথা বললেন আপনি! চিঠি—! আমাদের কে চিঠি দেবে! মাসান্তে কারও যদি একটা আসে! আসেও না। ন'মাসে ছ'মাসে বড়জোর একটা পোস্টকার্ড। আমরা আছি এই পর্যন্ত। দু'-একটা চিঠি যা আসে, পড়ে থাকে

পোস্ট অফিসে। কেউ যখন যায় ওদিকে, নিয়ে আসে হাতে হাতে।”

কিকিরারা ঘরে এলেন। পাখা চালিয়ে দিলেন তিনি। নিজের হাতে জল গড়িয়ে দিলেন বলাইবাবুকে।

বলাইবাবু জল খেলেন। তেষ্টা পেয়েছিল খুব। জল খেয়ে আরামের শব্দ করলেন।

“একটা বিড়ি দিন, খাই। আছে নাকি পকেটে ?”

“আছে। নিন। ... এই তো তিন বাণ্ডিল কিনে আনলাম।”

বিড়ি ধরানো হয়ে গেল দু'জনেরই।

কিকিরা দু'-পাঁচটা সাধারণ কথার পর বললেন, “বলাইবাবু, আজ সন্ধেবেলায় দাবায় বসবেন নাকি ? না হলে একবার আসতেন এখানে !”

“কেন ? রোজ তো দাবায় বসি না। সময় কাটাবার জন্যে বসি মাঝে মাঝে। সলিলবাবু কাঁচা খেলোয়াড়। আমিও পাকা নই। রজনীবাবু দাবা বোঝেন না। এ-ব্যাপারে মাস্টার ছিলেন মুরলীবাবু। তা তিনি তো আর নেই। ... আপনি জানেন নাকি দাবা ?”

মাথা নাড়লেন কিকিরা। “আমি একেবারেই অচল। গজ নৌকো কাকে বলে তাও জানি না।”

বলাইবাবু বিড়ির ধোঁয়া টানলেন। “সন্ধেবেলায় আসতে বলছেন কেন ?”

“আমার একটু দরকার আছে।”

“দ-র-কার ! আমার সঙ্গে !”

“কথা আছে।”

“এখনই বলুন না !”

“এখন হবে না। সন্ধেবেলায়— ! কেন, আপনি ...”

“না না, আমার আর কী কাজ ! আসব !”

কিকিরা বিড়ি টানতে টানতে বললেন, “কড়া নাকি ?”

“মিঠেকড়া।”

হাসলেন কিকিরা।

সন্ধেবেলায় বলাইবাবু হাজির। কিকিরা বসতে বললেন। মৃণালকুঞ্জর ব্যবস্থা নিয়ে দু'-দশটা মামূলি কথা।

শেষে কিকিরা বললেন, “আপনার কাছে কয়েকটা কথা আমি জানতে চাই। হরিবাবুও আপনার কথা বলেছেন।” শেষের কথাটা বানানো।

বলাইবাবুর চোখে যেন চাপা হাসি। বললেন, “আপনি কী জানতে চান আমি জানি।”

কিকিরা অবাক ! “জানেন ?”

মাথা হেলিয়ে বলাইবাবু বললেন, “যাত্রা দেখার কথা ! সেদিন আমি কেন

পুরো পালা না দেখেই চলে এসেছিলাম ?”

কিকিরা অবাক হলেন। বললেন, “আপনি আমায় আগে অন্য কথা বলেছেন। বলেছিলেন পালা শেষ হওয়ার পর আসরে বসে বাকি রাতটুকু কাটিয়ে আপনি এখানে ফিরেছেন।”

“তাই বলেছিলাম। ... ওটা ঠিক কথা নয়। যাত্রা শুরু হতে দেরি হয়েছিল। আমি ঘণ্টা দুয়েক ছিলাম। তারপর ফিরে আসি। একলা আসিনি। অত রাতে মাঠঘাট ভেঙে ঠাণ্ডায় কুয়াশায় একা আসা যায় ! আমার সঙ্গে শিবপ্রসাদ ছিল। কারখানার দরোয়ান। তাকে আমি নিয়ে গিয়েছিলাম। ওকে সঙ্গে নিয়েই ফিরেছি।”

“ফিরেছেন মানে কারখানায় ফিরেছেন। দরোয়ানের ঘরের পাশের কুঠরিতে শুয়ে রাত কাটিয়েছেন।”

“হ্যাঁ। ... দেখুন ম্যানেজারমশাই, আমি গর্দভ নই। দরোয়ান শিবপ্রসাদ আমার চেনাজানা। ওর গুমটি ঘরের পাশে চারপাইয়ায় বসে আমি কতদিন চা বিড়ি খেয়েছি, সুখদুঃখের গল্প করেছি। আপনাদের লোক যে শিবপ্রসাদের কাছে গিয়েছিল, খোঁজখবর করেছিল আমার, আমি জানি। শিবু আমায় বলেছে।”

কিকিরা রীতিমতন অপদস্থ বোধ করলেন। চাঁদুর কথা তা হলে সবই শুনেছেন বলাইবাবু। হেরে গিয়ে ঘাবড়ে যাওয়ার মানুষ অবশ্য নন তিনি। বললেন, “কথাটা আপনি শুনলেও ব্যাপারটা অন্যরকম দাঁড়াচ্ছে বলাইবাবু। এই মৃণালকুঞ্জর সকলেই জানে, আপনি নিজেও বলেছেন যে, যাত্রা দেখে ফিরে এসে দেখলেন, শ্রীকান্তবাবু আগুনে পুড়ে ঝলসে গিয়েছেন। এখানের কাউকে কি বলেছেন আপনি, আসলে আপনি কোথায় ছিলেন মাঝরাতের পর থেকে ? দরোয়ান শিবপ্রসাদ আপনার হয়ে সাক্ষী দিলেও এখানকার বাকিরা তো অন্য কথা বলবেন ! তাই না ?”

বলাইবাবু চুপ। টাক মাথায় হাত বুলোতে লাগলেন।

কিকিরা বললেন, “আপনার কি মনে হয় না, ওয়ান ভার্সেস ফাইভ হলে ব্যাপারটা কোন দিকে ঝুঁকে পড়বে ? কেন আপনি সেদিন ছিলেন না তার না হয় কারণ দেখালেন ! কিন্তু মিথ্যে কথাটা বলতে গেলেন কেন ? আইন কী বলবে আপনি বুঝতে পারছেন !”

বলাইবাবু এবার যেন বিচলিত হলেন। বিড়িও ধরিয়ে নিলেন অভ্যাশবশে।

“আপনি কথা লুকোচ্ছেন ! কেন ?”

বলাইবাবু কী বলতে গিয়ে থেমে গেলেন। বিড়ির টুকরোটা ফেলে দিলেন জানলা দিয়ে। শেষে বললেন, গলার স্বর একেবারে পালটে গিয়েছে। বললেন, “ম্যানেজারবাবু, মানুষ ভাবে এক, হয় আর-এক। আমি শ্রীকান্তবাবুকে

বাঁচাতে চেয়েছিলাম, পারলাম না।”

কিকিরা তাকিয়ে থাকলেন। অপলক।

“সেদিন আমি যদি ঘুমিয়ে না পড়তাম শিবপ্রসাদের ওখানে, তা হলে হয়তো ওই ঘটনা ঘটত না। ঘুমই আমার কাল হল! বুড়ো মানুষ, অতটা হাঁটাহাঁটি, ঠাণ্ডা—শরীরে অত ধকল সয়নি। ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।”

“আপনি তা হলে জানতেন শ্রীকান্তবাবু...”

“আন্দাজ করেছিলাম। তবে ওঁর বিপদ হতে পারে জানতাম। আগুন ধরে যাবে জানতাম না।”

“কেমন করে জানলেন?”

“তবে আগের কথাটা বলি। শ্রীকান্তবাবু মানুষ খারাপ ছিলেন না। শরীর স্বাস্থ্য নিয়ে খুঁতখুঁতুনি ছিল। তা সেটা থাকতে পারে। ওঁর যেটা বদ অভ্যেস ছিল—উনি ভীষণ সন্দিগ্ধ স্বভাবের ছিলেন। লুকিয়ে অন্যের কথা শুনতেন, অন্যের চিঠিপত্র এলে লুকিয়ে পড়তেন। মুখ বন্ধ খাম হলে দেখতেন সেটা খোলা যায় কিনা। না গেলে অবশ্য খুলতেন না। ... তা একদিন একটা ব্যাপার হল। চৈতন্য গিয়েছিল বাজারে, সকালের দিকে তেমাথার মোড়ে। ফেরার সময় দুটো চিঠি নিয়ে এল। একটা মুরলীদার। অন্যটা জলধরবাবুর। জলধরের চিঠিটা ছিল খামে। তবে ভাল করে আঁটা ছিল না। আজকালকার খামের মুখে আঠার যা হাল! শ্রীকান্তবাবুর যা অভ্যেস, চিঠি খুলে পড়া। উনি সেই কাজটিই করলেন!”

কিকিরা বললেন, “কী ছিল চিঠিতে?”

“কী ছিল! যা ছিল তা তো বিশ্বাস করা যায় না। জলধরকে একজন শাসানো চিঠি দিয়েছে। চিঠিতে লিখেছে, অনেক ঘুরে আট-আটটি বছর অপেক্ষা করে শেষ পর্যন্ত সে খুঁজে পেয়েছে প্রতারক জোচ্চোর জলধরকে।”

“প্রতারক!”

“ওই চিঠিতেই ছিল—আগামী আটই নভেম্বর—সে আসবে। পুজোর কথা অবশ্য ছিল না। তবে জগদ্ধাত্রী পুজোর পরের দিনই আট তারিখ। ভোররাত্রেই সে আসবে। হিসেবনিকেশ শেষ করবে সেদিনই। তার আসার সংকেত হবে বাঁশি। সাপুড়ের বাঁশি।”

কিকিরা আস্তে আস্তে মাথা নাড়লেন। মনে মনে যেন ভাবছিলেন কিছু।

বলাইবাবু বললেন, “অদ্ভুত একটা ব্যাপার হল, চিঠির একপাশে আঁকা একটা সাপের ছবি।”

“সাপের ছবি। ছাপা?”

“না; হাতে আঁকা। কালো কালিতে। কলমে।”

“চিঠি যে লিখেছে তার নাম?”

“নাম দেয়নি পুরো। শুধু ইংরিজিতে ছোট করে লেখা বি.এস।”

"চিঠিটায় সেন্ডারের ঠিকানা ছিল না ?"

"না।"

"পোস্ট অফিসের ছাপ, সিল..."

"পড়া যায় না।"

কিকিরা কী যেন ভেবে বললেন, "তা এই চিঠির কথা আপনি জানলেন কেমন করে ?"

"শ্রীকান্তবাবু আমাকে দেখিয়েছিলেন। তা ছাড়া চিঠিটা আমিই জলধরবাবুকে দিই।"

"খামের মুখ খোলা অবস্থায় ?"

"একেবারে খোলা অবস্থায় নয়। একটু মুখ এঁটে।"

"চিঠির কথা আর কেউ জানেন না ?"

"মুরলীবাবু আর শ্রীকান্তবাবু একই ঘরে থাকতেন। মুরলীবাবু জানলেও জানতে পারেন। শ্রীকান্তদা অন্য কাউকে বলেছিলেন কিনা বলতে পারব না।"

কিকিরা এবার নিজের সরু চুরুট ধরালেন। মাথার চুল ঘাঁটলেন। ভাবছিলেন।

বলাইবাবু বললেন, "একটা উড়ো চিঠি পেয়ে চট করে সব বিশ্বাস করা যায় না, ম্যানেজারবাবু ! তা ছাড়া ওই চিঠিটা তো হেঁয়ালির মতন। স্পষ্ট করে লেখা নেই কিছু। প্রতারক বললেই কি প্রতারক হয় ! কীসের প্রতারণা ? কবে কখন করা হয়েছে ? কাজেই আমরা চুপচাপ ছিলাম। তবে হ্যাঁ, শ্রীকান্তবাবুকে দেখতাম জলধরকে দেখলেই কেমন একটা মুখ করতেন।"

"আর আপনি ?"

"আমি কিছু বুঝতে দিইনি জলধরবাবুকে। তবে সাবধানে থাকতাম। ... আসলে কী জানেন, সেদিন—মানে জগদ্ধাত্রী পুজোর দিন জলধর যখন বললেন, নিজেই, আমার সঙ্গে যাত্রা দেখতে যাবেন, তারপর যাওয়ার সময় হঠাৎ মত পালটে নিলেন, তখনই আমার মনে মনে কেমন যেন লাগল। ভেতরে একটা কু গাইল। মানুষের মন তো ! ... আমি পালার মাঝখানে উঠে এলাম। ভেবেছিলাম, শেষরাতে এখানে ফিরে আসব। যদি কিছু হয় ! কিন্তু ঘুমই আমার সর্বনাশ করল। সময় মতন আসতে পারলে হয়তো অগ্নিকাণ্ড আটকাতে পারতাম। পারিনি। বড় কষ্ট হয় নিজের বোকামির জন্যে।"

কৃষ্ণপক্ষ। তিথি বোধ হয় ত্রয়োদশী। ঘন অন্ধকার। আকাশের তারার আলোও এই নিবিড় অন্ধকারকে বিন্দুমাত্র হালকা করতে পারছে না। হয়তো মৃণালকুঞ্জের বড় বড় গাছগুলির মাথা থেকেও আঁধার ছড়িয়ে পড়েছে বলে চারপাশে কোনও কিছুই চোখে পড়ে না।

রাত শেষ হওয়ার মুখে। হেনা ঝোপের আড়াল থেকে যে বদ গন্ধটা ছড়ানো হয়েছিল সন্ধেবেলায়, সেটাও নেই। ফটকের সামনে ধুনুচি।

কিকিরা জানেন, একেবারে রাত ফুরোবার সময় অতি অস্পষ্ট একটু আলো ফুটতে পারে অল্পের জন্যে। সে কিছুই নয়। এখনও খানিকটা দেরি আছে তার। চৈত্রের এই শেষরাতে বাতাস দিচ্ছিল। এলোমেলো। তবু ঠাণ্ডা। গাছপালার পাতার শব্দ শোনাই যায় না।

মৃণালকুঞ্জের বাইরে মাঠঘাট অসাড়। যেন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন।

কিকিরা আর অপেক্ষা করলেন না।

প্রথমে ধরা যায় না, বোঝাও যায় না। সামান্য পরে বোঝা যায় এই শব্দ—বাঁশির। সাপুড়িয়ার বাঁশির সুর। জোর নয়, আবার ধীরেও নয়।

কিকিরাকেও চেনা যায় না। দেখাও অসম্ভব। ঘন কালো আলখাল্লায় গলা থেকে পা পর্যন্ত ঢাকা। পায়ের সরু পাজামাটাও কালো। মাথায় কালো রুমালের ফেট্টি। এ যেন কোনও ভৌতিক চেহারা। চোখমুখ অবশ্য স্বাভাবিক রেখেছিলেন কিকিরা।

মৃণালকুঞ্জের পেছনের দিকেই গাছের আড়ালে লুকিয়ে ছিলেন কিকিরা। তাঁর বুকের কাছে ঝোলানো বিদেশি ক্যাসেট প্লেয়ারে সাপুড়িয়া বাঁশির রেকর্ড করা টেপটা বাজছিল। এই প্লেয়ারটার সুবিধে হল, দেখতে ছোট—আওয়াজ অত্যন্ত স্পষ্ট, শব্দ বাড়ানো-কমানো তো মামুলি ব্যাপার, তার চেয়েও বড় কথা, টেপের অটোমেটিক রিওয়াইন্ডিং সিস্টেম আছে। ফলে হাতে করে পালটাতে হয় না। টেপ শেষ হয়ে নিজের থেকেই আবার গোড়া থেকে বাজতে শুরু করে। একটানা যতক্ষণ খুশি বাজাও। তবে অসুবিধে এই যে, কিকিরাকে ব্যাটারিতে বাজাতে হচ্ছিল। যদিও এই জাতের ব্যাটারি হালে বাজারে এসেছে, আয়ু বেশি—তবু তার ইতি আছে একসময়।

আপাতত কিকিরা সে-কথা ভাবছিলেন না। ভাববার কারণও ছিল না।

কিকিরা ঠিক এক জায়গায় না দাঁড়িয়ে থেকে মাঝে মাঝে আড়াল রেখে সরে যাচ্ছিলেন। ফলে বাঁশির আওয়াজও নির্দিষ্ট একই জায়গা থেকে আসছিল না। সরে যাচ্ছিল।

পাঁচ দশ পনেরো কুড়ি মিনিট—কতটা সময় কেটে যাচ্ছে তার হিসেব কিকিরা করছিলেন না।

শুকতারা জ্বলজ্বল করছে। চৈত্রের এই ভোররাতের বাতাসে গা সিরসির করে উঠল সামান্য।

এমন সময়, যা আশা করেছিলেন কিকিরা, তার আভাস পেলেন।

দেখা যায় না। তবু ছায়ার মতন কে যেন বেরিয়ে এল বাড়ি থেকে। পেছনের দিকেই হেঁটে আসছিল।

কিকিরা জানেন, তারাপদ আর চন্দন—যে যার মতন জায়গায় লুকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একজন বারান্দার থামের আড়ালে, অন্যজন কুয়োতলার বাঁধানো পাড়ের আড়ালে।

বিপদ হতে পারে কিকিরার, নাও হতে পারে। ঝুঁকি নেওয়ার দরকার কী! তা ছাড়া সাহায্যের প্রয়োজন কখন কী হয়!

এবার একটু আলোর মতন দেখা দিল। মাত্র মুহূর্ত কয়েক। কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশীর চাঁদের রেখা দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল।

লোকটা, যা ভেবেছিলেন কিকিরা, পায়ে পায়ে সাবধানে দু'-দশ পা এগিয়ে টর্চ জ্বালল। ছোট টর্চ। বোধ হয় কাচের ওপর হাত চাপা দিয়ে রেখেছে—যাতে আলো না ছড়িয়ে পড়ে।

এ-পাশ ও-পাশ দেখতে দেখতে লোকটা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। কী ভাবল। ওর এক হাতে টর্চ থাকলেও অন্য হাত ফাঁকা নয়। তবে সেই হাতে কী আছে কিকিরা দেখতে বা অনুমান করতে পারছিলেন না।

ছোরা, ভোজালি, চপার? না কি অন্য কোনও অস্ত্র?

লোকটি এবার ধীরে ধীরে সাবধানে এগিয়ে তুলসীমঞ্চ পর্যন্ত গেল। দাঁড়াল। দেখল। বসল। নীচেটাও দেখল। এবার টর্চের কাচে হাত নেই।

কিকিরা টেপ বন্ধ করে দিলেন।

আর সঙ্গে সঙ্গে একবার টর্চের আলো ফেলে চারপাশ দেখে—লোকটি বাড়ির দিকে হাঁটতে লাগল। টর্চ নিভিয়ে।

কিকিরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন।

তাঁর কাজ হয়ে গিয়েছে।

তবু সামান্য অপেক্ষা করে বাড়ির দিকেই পা বাড়ালেন কিকিরা।

হালকা শিস।

তারাপদ আড়াল থেকে বেরিয়ে এল।

বারান্দায় চন্দন।

কিকিরা নিচু গলায় চন্দনকে বললেন, "কাল সকালেই তুমি হরিবাবুর কাছে চলে যাবে। বলবে, দেরি না করে গাড়ি নিয়ে চলে আসতে।"

হরিচন্দনবাবু বললেন, "রায়, তুমি ওই তুলসীমঞ্চটা ভেঙে ফেলতে বলছ ?"

"হ্যাঁ। একেবারে পুরোপুরি। মাটি পর্যন্ত খুঁড়ে ফেলতে হবে।"

মৃণালকুঞ্জর সকলেই হরিচন্দনকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছেন।

হরিচন্দন সামান্য ইতস্তত করে বললেন, "এই চৈত্রমাসে তুলসীমঞ্চটা ভেঙে ফেলবে !"

"উপায় নেই, দাদা !"

জলধর হঠাৎ বললেন, "ওটা আমি বৃন্দাবন থেকে আনিয়েছি। পবিত্র বৃন্দাবন থেকে আনানো তুলসী চারাটাকে কষ্ট করে বাঁচিয়ে রেখেছি, ওটা আপনাদের কী দোষ করল ?"

কিকিরা কোনও জবাব দিলেন না জলধরের কথার, হরিচন্দনকে এগিয়ে যেতে বললেন।

"বেশ। ওদের ডাকো।"

মালী চৈতন্য, কাজের লোক নকুল, এমন কী রাধুঠাকুরকেও ডেকে নিলেন কিকিরা। ড্রাইভার বনমালীকেও দেখা গেল।

ব্যাপারটা যে কী হচ্ছে, মৃণালকুঞ্জর বাসিন্দেরা বুঝতে পারছিলেন না।

হরিচন্দনের পেছনে পেছনে সকলেই তুলসীমঞ্চর দিকে এগিয়ে গেলেন। রোদ চড়ছে। নকুল একটা ছাতা এনে দিল হরিবাবুকে। ততক্ষণে বনমালী ড্রাইভারও এসে দাঁড়িয়েছে। মালী চৈতন্য কোদাল আর শাবলও নিয়ে এল।

শুরু হল মঞ্চ ভাঙা।

রজনীবাবুরা হাত কয়েক তফাতে গাছের ছায়া খুঁজছিলেন। কথাও বলছিলেন নিজেদের মধ্যে নিচু গলায়।

কিকিরা চন্দনরা রোদের মধ্যেই দাঁড়িয়ে। জলধর একপাশে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছেন। মঞ্চের ইটগুলো খসে পড়ছিল একটা একটা করে। ইট, প্লাস্টার।

মঞ্চ ভাঙা হল। ইট ছড়িয়ে পড়েছে চারপাশে। মঞ্চের মাটি।

এবার মাটি।

কিন্তু এ কী ?

মাটির তলায় একটা পাথরের স্ল্যাব।

কিকিরা চন্দনদের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলেন।

পাথরের মোটা স্ল্যাবটা ওঠাতে বললেন কিকিরা। শাবলের ডগায় মাটি আলগা করে নিল চৈতন্য মালী। তারপর ওরা দু' তিনজনে মিলে পাথরটা তুলে নিল। ভারী পাথর।

তারপরই চমক। কিকিরা ঝুঁকে পড়ে দেখলেন।

চারকোনা গর্ত। হাত সোয়া হাত গভীর। গর্তের পাশগুলো লালচে রঙের গার্ডেন টাইল্‌স দিয়ে ঘেরা, যাতে পাশের মাটি বা জল ভেতরে না ঢুকতে পারে। গর্তের মধ্যে একটা কী যেন রাখা আছে। মোটা পলিথিনে মোড়া। পলিথিনের গায়ে রং ধরেছে মাটি আর লাল টালির।

কিকিরা তুলে নিতে বললেন জিনিসটা।

জলধর রুক্ষভাবে বললেন, "তুলবেন না। ওর মধ্যে আমার গুরুদেবের অস্থি রয়েছে। আপনারা অন্যায় কাজ করছেন।"

চৈতন্য মালী হাত নামিয়ে তুলব কি তুলব না করছিল।

হরিচন্দন হঠাৎ বললেন, "আপনার গুরুদেবের অস্থিই যদি রেখে থাকেন জলধরবাবু, ভাববেন না। আমি নিজে নতুন করে আরও সুন্দর করে আপনার তুলসীমঞ্চ তৈরি করিয়ে দেব। ... নে রে চৈতন্য, তোল।"

জিনিসটা তোলা হল।

পলিথিনের মোড়কটা খুলে ফেলল চৈতন্য। অ্যালমুনিয়ামের চারকোনা পাত্র। মোটা চাদরের অ্যালমুনিয়াম। ওপরে ঢাকনা।

ততক্ষণে অন্যরাও ছায়া থেকে সরে সামনে এসে ঝুঁকে পড়েছে।

হরিচন্দন নিজেই বললেন, "ভেতরে চলো। এই রোদে আর দাঁড়িয়ে থাকা যাচ্ছে না। ভেতরে গিয়ে দেখব, কী আছে ওর মধ্যে।"

ভেতরে বারান্দায় পাখা নেই। দুটি মাত্র পাখা মৃণালকুঞ্জের। একটি খাওয়ার ঘরে, অন্যটি ম্যানেজারবাবুর ঘরে।

খাওয়ার ঘরেই এলেন সকলে। পাখা চালিয়ে দেওয়া হল। হাত চারেকের এক লম্বা টেবিল রয়েছে খাওয়ার ঘরে, আর ভাঙা আধ-ভাঙা ক'টা চেয়ার। একটা বেঞ্চি।

কিকিরা নিজের হাতে অ্যালমুনিয়াম পাত্রটির মুখের ঢাকা খুলতে গিয়েও পারলেন না। ভীষণ আঁট।

চন্দন এগিয়ে এসে পাত্রটির ঢাকনা খুলল।

পাত্রের মধ্যে চামড়ার বাক্স। চৌকোনো।

সেটাও খুলে ফেলা হল।

তারপর সকলেই যেন একসঙ্গে চমকে উঠে কেমন এক শব্দ করলেন।

হরিচন্দনবাবুর গলা যেন আটকে গেল বিস্ময়ে। কিকিরাও ভাবতে পারেননি। অন্যরাও নিশ্চল।

সাপ। তবে সোনার। একটা সোনার সাপ পাকানো লেজের ওপর ভর দিয়ে ফণা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। চওড়া ফণা। ফণার কারুকার্যের চেয়েও চোখে পড়ে তার দুটি চোখ। লাল টুকটুকে দুটি চুনি বসানো চোখে। সাপের মাথার ওপর এক সোনার প্রদীপ। চতুর্মুখী। পঞ্চমুখী নয়। প্রদীপের মুখে একটি করে হীরের টুকরো।

এমন একটি অত্যাশ্চর্য জিনিস দেখা যাবে কে ভেবেছিল !

সকলেই প্রথমে চুপ। তারপর দু'-একটি অস্ফুট শব্দ।

হরিচন্দনবাবু ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন জলধরকে। নিজেকে সংযত রাখা মুশকিল। তবু বললেন, "এই আপনার গুরুদেবের অস্থি ?"

জলধর কথা বললেন না। তাঁর মুখের চেহারা অদ্ভুতভাবে বিকৃত হয়ে গিয়েছে।

কিকিরা বললেন, "এটি উনি কোথাও থেকে চুরি করেছিলেন। এমন জিনিসের দাম কয়েক লাখ টাকা তো হবেই, তা ছাড়া এর অ্যান্টিক ভ্যালু ? কবেকার জিনিস, কোথায় ছিল—আমরা তো বলতে পারব না, এ-ব্যাপারে যাঁরা অন্তত আন্দাজ দিতে পারেন—তাঁদের কাছে নিয়ে যেতে হবে। ... জলধরবাবু, জিনিসটি আপনি পেলেন কোথায়, কবে ? সত্যি কথাই বলুন। আপনার চিঠির কথা আমরা জানি। বলাইবাবু রয়েছেন এখানে।"

জলধর কাউকেই দেখলেন না। বললেন, "আন্দামানে। ভবানীশঙ্কর বলে একজনের সঙ্গে আমার ভাব ছিল। সে চুরি করেছিল। ওটা কোথাকার, আমি জানি না। ওর ইতিহাস বলতে পারব না। তবে এইটুকু জানি, ওটা সুমাত্রা বা জাভা থেকে পাওয়া। বিদেশি টুরিস্টের একটা ছোট দল একবার আন্দামানে আসে। তার মধ্যে এক সাহেব, হয়তো কোটিপতি, আবার কিওরো, ওটি এনেছিলেন। ভবানীশঙ্কর পোর্টে চাকরি করত। সে চুরি করে আমায় রাখতে দিয়েছিল।"

"মানে, পরে কোনও সময়ে ওটা বেচে দিতে পারলে টাকাটা দু'জনে ভাগাভাগি করে নেবেন। তাই না ?" কিকিরা বললেন।

জলধর সে-কথার জবাব দিলেন না। বললেন, "ভবানীশঙ্কর একবার অসুস্থ হয়ে পড়ল। ভাল রকম। বেঘোর জ্বর। আমি আন্দামান থেকে পালিয়ে এলাম।"

"সোনার সাপ চুরি করে ?"

"হ্যাঁ। আমার মনে হয়েছিল, মেনিনজাইটিস রোগের মতন যে ব্যাধি হয়েছে ভবানীশঙ্করের, তাতে হয়তো সে বাঁচবে না।"

"বাঃ ! আপনি তবে ভাল বন্ধু।"

"বন্ধুত্বের কথা বাদ দিন। কে কার বন্ধু ! ধরে নিন, আমি লোভে পড়ে এই কাজ করেছি। তারপরও নিশ্চিন্ত ছিলাম না কলকাতায় এসে। গা-ঢাকা দিয়ে থেকেছি অনেকদিন। শেষে আমি আর ভবানীশঙ্করের কোনও খোঁজ পাইনি।"

হরিচন্দনবাবু বললেন, "আপনি মশাই চাকরিবাকরিও তো করতেন। ঘরসংসারও করেছেন শুনেছি।"

"কোনওটাই মিথ্যে নয়। মিথ্যে বলতে আমার টাইটেলটা পালটে

নিয়েছিলাম। এফিডেভিট করে। বিশ্বাসের জায়গায় হালদার।”

কিকিরা বললেন, “এসব কথা পরে। আগে বলুন, আপনি শ্রীকান্তবাবুকে পুড়িয়ে মারতে চেয়েছিলেন ?”

“চেয়েছিলাম। ভদ্রলোক আমাকে সন্দেহ করতেন। খারাপভাবে দেখতেন। তিনি যে আমার চিঠিটা খুলে পড়েছেন তাও স্পষ্ট বুঝেছিলাম আমি। এটা ওঁর বদ অভ্যেস ছিল। উনি নিজের হাতে সেজে পান খেতেন। ছোট ছোট পান। জিভ লাল হয়ে থাকত। চিঠি পড়ে খামের মুখ আঁটার সময় জিভের লালা লাগিয়ে ছিলেন। তার দাগ ছিল।”

কিকিরা বলাইবাবুর দিকে তাকালেন। মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বলাইবাবু বললেন, “হ্যাঁ, পান খেতেন ; বলতেন অজীর্ণ অম্বলের জন্যে পান খান।”

হরিচন্দনবাবু বললেন, “আপনি ওঁর ঘরে ঢুকে গায়ে আগুন ধরিয়ে দিলেন ?”

“শ্রীকান্তবাবু ত্রিফলা খাওয়ার পর কেরোসিন স্টোভ জ্বেলে চায়ের লিকার তৈরি করে খেতেন। সকলেই জানে। সেদিনও তাই করছিলেন। কেরোসিন স্টোভ জ্বললে ঘরে গন্ধ হয়—ধোঁয়াও হয় খানিকটা। কার্তিক মাস। ওঁদের ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল না। সামান্য ফাঁক করা ছিল। উনি স্টোভের সামনে বসে জল গরম করছিলেন। আগুন তো জ্বলছিল। আমি নিঃসাড়ে ঢুকে ওঁর ঘাড় গলা স্টোভের ওপর ...” জলধর বাকিটা বললেন না। বলার দরকার করে না, অনুমান করা যায়।

সকলেই নিঃশব্দ। শিউরে উঠেছিলেন সকলেই। বুকের মধ্যে কাঁপছিলেন।

কিকিরা বললেন, “মুরলীবাবু ?”

“উনি বোধ হয় এক ঝলক দেখতে পেয়ে গিয়েছিলেন আমাকে। শ্রীকান্তবাবু চিৎকার করে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ওঁর ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। আমি অবশ্য মুড়ি দিয়ে ঘরে ঢুকেছিলাম। তবু—তবু ঘুমজড়ানো চোখে আমাকে দেখে থাকতেও পারেন মুরলীবাবু ...। কারণ পরে উনি আমাকে কেমন চোখে যেন দেখতেন। দেখে থাকলে উনিই একমাত্র সাক্ষী।”

“কিন্তু ওঁকে আপনি—”

“উপায় ছিল না। মুরলীবাবুকে আমিই ধোঁকা দিয়ে দোতলায় ডেকে এনেছিলাম ঘুম ভাঙিয়ে। বলেছিলাম, ‘শিগ্‌গির আসুন—বলাইবাবু কেমন যেন করছেন।’ উনি গায়ে চাদর জড়িয়ে চলে এলেন।”

“কেন ?”

“ওঁকে ডেকে আনার সময় বাঁশিটা বাজছিল। সাপুড়ের বাঁশি। ওই বাঁশি হয়তো উনিও শুনেছিলেন।” —একটু থামলেন জলধর। “নিয়তি।”

“আপনি ওঁকে দোতলার বারান্দা থেকে ঠেলে ফেলে দিয়েছিলেন ?”

"দিয়েছিলাম। ভাঙা বারান্দা। পলকা। ফেলে দেওয়ার আগে মাথার পেছনে জখমও করেছিলাম।"

নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন সকলে। রজনীবাবু বসে পড়েছেন। ঘামছিলেন। পাখার বাতাস তাঁর গায়ে লাগছে না। সলিলবাবুর মুখ ফ্যাকাশে।

হরিচন্দনবাবুও অসুস্থ বোধ করছিলেন।

সকলেই যখন স্তব্ধ, বিচলিত, শ্বাস প্রায় রুদ্ধ হয়ে এসেছে, তখন জলধর একবার দরজার দিকে তাকালেন। চন্দন দাঁড়িয়ে আছে। পাশে তারাপদ।

সোনার সাপটির দিকে চোখ ফিরিয়ে নিলেন জলধর। মনে হল, তিনি যেন বুঝতে পেরেছেন, সোনার সাপও ছোবল দেয়। বড় করে নিশ্বাস ফেলে জলধর বললেন, "পুলিশ ডাকবেন না ?"

কিকিরা বললেন, "ডাকব।" বলে হরিচন্দনের দিকে তাকালেন।

জলধর বললেন, "একটা কথা। দয়া করে আমার ছেলেকে জানাবেন না। আমার নিজেরও ভুল হয়েছে। কলকাতায় থাকার সময় ওটা ব্যাঙ্কের লকারে ছিল। এখানে আসার পর সাতপাঁচ ভেবে নিজের চোখে চোখে রাখব বলে নিয়ে এসেছিলাম। না আনলে কী হত জানি না !"

কেউ কোনও কথা বললেন না।

হায়দার লেনের তেরো নম্বর বাড়ির কফিন বাক্স

হায়দার লেনের তেরো নম্বর বাড়ির কফিন বাক্স

"তারাপদ, তোমার ফোন।"

মুখ তুলে তাকাল তারাপদ। জয়দেবদার টেবিলে ফোন। ফোনটা তিনি নামিয়ে রেখেছেন একপাশে।

হাতের কাজ সরিয়ে রেখে তারাপদ উঠল। অফিসে তাকে ফোন করার তেমন কেউ নেই। চাঁদু কদাচিৎ করে। চেনাজানা দু'-একজন হয়তো। তবে অফিসের ফোন হতে পারে। বি ডি কোম্পানির বা মুখার্জিদের।

তারাপদ নিজের টেবিল ছেড়ে উঠে জানলার দিকে এগিয়ে গিয়ে জয়দেবদার সামনে দাঁড়াল। ফোন তুলে নিল।

"হ্যালো?"

"আমি ফিরেছি।" কিকিরার গলা।

"ও আপনি! কবে ফিরলেন?"

"গত পরশু সন্ধেবেলায়। কাল আর তোমায় জানাতে পারিনি। ব্যস্ত ছিলাম।"

"কাজ মিটেছে?"

"তা মিটেছে। ওদিকে খুব বৃষ্টি হচ্ছে। এখানেও দেখছি শুকনো নেই।"

"না। এই তো একটু আগেই এক পশলা হয়ে গেল এদিকে। আবার হতে পারে। বর্ষা এসে গিয়েছে...।

কিকিরা শেষের কথাটা শুনতে শুনতেই বললেন, "কাল একবার আসবে। বিকেলেই এসো। শনিবারে তোমার আধবেলা অফিস।"

"কাল একবার মাঠে যাব ভেবেছিলাম। অনেকদিন খেলা দেখিনি। আমাদের টিম নাকি দারুণ শুরু করেছে।"

"রাখো তোমার টিম। ধ্যাড়ানো টিম, তার আবার খেলা! বিকেলেই চলে আসবে। জরুরি খবর আছে।"

তারাপদ ইতস্তত করে বলল, "জরুরি?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। জরুরি। বুঝলে তারাবাবু— ঘনঘোর রহস্য, সাঙ্ঘাতিক মিস্ট্রি, একটা কালো ট্রাঙ্ক, একটা কফিনের বাক্স, আর নস্যির ডিবে—। আমি এখন রেখে

দিচ্ছি। পারলে চাঁদুকে একবার খবর দিও।”

কিকিরা ফোন ছেড়ে দিলেন।

তারাপদ কেমন থ’ মেরে গিয়েছিল। দু’ মুহূর্ত। তারপর ফোনটা রেখে দিল।

জয়দেবদা বেয়াড়া এক হিসেবের মধ্যে ডুবে আছেন। প্রায় তেরো হাজার টাকার বাড়তি পেমেন্ট হয়ে গিয়েছে। দুর্গাপুরের এক পার্টি টাকাটা মেরে দিয়ে চুপ করে বসে আছে। মাল সাপ্লাই করেনি পুরো, অথচ তার বিল পাস হল কেমন করে? পাঁজাসাহেব খেপে গিয়েছেন। কী হচ্ছে এসব! চোখ বুজে সবাই ঘুমোয় নাকি? মোহিত দত্তকে পাঠিয়ে দিয়েছেন দুর্গাপুরে, এর পর নিজেই হয়তো উকিলবাড়ি ছুটবেন!

তারাপদ নিজের টেবিলে ফিরে এল। এখন যেরকম তোলপাড় চলছে অফিসে, এটা দু’-একদিনের বেশি চলবে বলে তার মনে হয় না। জয়দেবদা পাকা মাথার মানুষ। কাগজপত্র দেখতে দেখতে ভুলটা ঠিক বার করে ফেলবেন।

তারাপদ যে-ঘরে বসে সেটা ছোট। জনা চারেকের বসার ব্যবস্থা। পাশের ঘরটা বড়। সেখানে সাতজন ; পিয়ন বেয়ারা সমেত। গোটা অফিসে সব মিলিয়ে জনা বারো স্টাফ। কোম্পানি বড় নয়, ছোট। কারখানা বেলেঘাটায়।

তারাপদর পাশে জানলা নেই। অনাদির দিকে একফালি লম্বাটে জানলা রয়েছে। অন্যমনস্কভাবে সেই দিকেই তাকাল তারাপদ। বাইরে বৃষ্টি নেই, কিন্তু পড়ন্ত দুপুর বেশ মেঘলা হয়ে আছে। বৃষ্টি আবার আসতে পারে, নাও পারে। সবেই বর্ষা পড়েছে। আষাঢ় মাসের মাঝামাঝি চলছে বোধ হয়। জুলাই শুরু হল।

কিকিরা যে কী বললেন তারাপদর মাথায় ঢুকছিল না। কালো ট্রাঙ্ক, কফিনের বাক্স, নস্যির ডিবে— মানেটা কী? উনি কি রসিকতা করলেন! করতেও পারেন। আসলে কিকিরা দিন চারেকের জন্যে রানিগঞ্জ গিয়েছিলেন। ওঁর নিজের কেউ নেই কোথাও, তবে দূর সম্পর্কের জ্ঞাতিগোষ্ঠী দু’-একজন আছে, পুরনো বন্ধুবান্ধবদের কেউ। এক বন্ধু মারা গিয়েছেন সদ্য। তাঁর শ্রাদ্ধশান্তি ছিল। বন্ধুর ছেলে চিঠি লিখেছিলেন একবার যদি যেতে পারেন কাকাবাবু। কিকিরা মানুষটির মায়ামমতা সামাজিক কর্তব্যবোধ যথেষ্ট। তিনি না গিয়ে কি পারেন! যাওয়ার আগে বলে গিয়েছিলেন তারাপদদের।

কিন্তু ফিরে এসেই কালো বাক্স আর কফিনের গল্প ফাঁদলেন কেন? অযথা, না কি নিছকই তারাপদকে তলব করার ছুতো! কে জানে!

কালই তবে তারাপদকে কিকিরার বাড়ি যেতে হবে? এটা ঠিকই যে, তারাপদ ফুটবল খেলা নিয়ে মাতামাতি করে না। সে ফুটবল-পাগল নয়। তার নিজের কোনও দলও নেই। তবে তারাপদ যে বোর্ডিং হাউস বা হোটেলে থাকে সেখানে কানু বলে একটা ছেলে থাকে, কানাই পাল। কানু চাকরি করে জাদুঘরে। আর ফুটবল খেলে বি ডিভিশন লিগে। তার ক্লাব ইয়াং স্পোর্টিং। কানুর পাল্লায় পড়ে তারাপদকে ইয়াং স্পোর্টিংয়ের মেম্বার হতে হয়েছে। মাঝেসাঝে মাঠেও যেতে হয়

কানুর তাগাদায়। কালকের খেলাটা নাকি ইজ্জতের খেলা ছিল কানুদের, মাঠে যাব বলেছিল তারাপদ। কী আর করা যাবে, যাওয়া হবে না। পরে কানুকে কিছু একটা বলে সামাল দিতে হবে। কানু ছেলেটা ভাল। চেহারাও শক্তসমর্থ। রোজ সকালে আধ বাটি ভিজে ছোলা আর ভিজিয়ে রাখা চিনেবাদাম খায়। বোর্ডিংয়ের ছাদে গিয়ে ডনবৈঠক মারে সকালে।

যাকগে, কাল বিকেলে তা হলে তাকে কিকিরার বাড়ি যেতেই হচ্ছে। যাবে। তবে চাঁদুকে পাওয়া যাবে বলে মনে হচ্ছে না। চাঁদু এখন খানিকটা ঝামেলায় রয়েছে। তার বদলির হুকুম হয়েছে অন্য হাসপাতালে। কোয়ার্টারও পাবে। চাঁদু চেষ্টা করছে আরও অন্তত একটা বছর তার পুরনো হাসপাতালে থাকার। হয়তো তার ধরাধরি কাজে দেবে না। তবু চেষ্টা!

খানিকটা সময় অন্যমনস্ক থাকার পর তারাপদ আবার কাজে মন বসাতে চেষ্টা করল। পারল না। কিকিরা আবার কী নতুন উৎপাত জুটিয়ে নিয়েছেন— কে জানে!

চন্দনকে পাওয়া গেল।

"কী রে! বৃষ্টিতে ভিজলি?"

"দু'-চার ফোঁটা!" তারাপদ রুমালে মুখ মাথা মুছতে মুছতে বলল। "তোর কী অবস্থা? হবে কিছু?"

"না। আমার বস্‌কে বললাম, সার এখানে থাকলে একটু পড়াশোনা করতে পারতাম। যেখানে ঠেলে দিচ্ছে আর বোধ হয় হবে না।"

"কী বললেন?"

"হাসলেন। বললেন, বাবা ওপরঅলার মরজি, আমি আর কী করব! তবু তো দু'-একজনকে বলেছিলুম। চান্স দেখছি না।"

"তুই বেকার ঘাবড়াচ্ছিস! যেখানেই যাস তোর কাজ তো একই।"

"পুরনো হাসপাতালের একটা মায়া থাকে রে, তারা। তা ছাড়া সবাই চেনা, ফেসিলিটি ছিল অনেক। নতুন জায়গায় বনিবনা কেমন হবে কে জানে।... ছেড়ে দে, যা হওয়ার হবে। চা আনতে বলি।"

"বল।"

চা আনতে বলে চন্দন একবার অকারণে দেওয়ালে টাঙানো আয়নার সামনে দাঁড়াল। নিজের মুখ দেখল। গালে হাত বুলিয়ে নিল। ফিরে এসে বিছানায় বসল আবার। "তোর খবর কী?"

"দুপুরে অফিসে কিকিরার ফোন।"

চন্দন তাকিয়ে থাকল। "কিকিরা ফিরেছেন?"

"গত পরশু। ফিরেই আজ বললেন, ঘনঘোর না ঘনঘটা রহস্য : কালো বাক্স—ট্রাঙ্ক, কফিনের বাক্স, আর নস্যির ডিবে। ভয়ঙ্কর মিস্ট্রি!"

চন্দন কিছুই বুঝল না। বন্ধুর মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকল। পাতা পড়ল না চোখের। "মানে?"

"জানি না।"

"কিকিরা তো রানিগঞ্জ গিয়েছিলেন। মিস্ট্রিটা এল কেমন করে?"

"ভগবান জানেন।"

"উনি কি রানিগঞ্জ থেকে মিস্ট্রি বয়ে এনেছেন?"

"আমি ভাই কিছুই জানি না। যা বললেন বললাম তোকে।"

চন্দন মাথা নাড়ল, বিশ্বাস করল না। "কিকিরার জোক। ঠাট্টা।"

"কে জানে! কাল যেতে বলেছেন, অবশ্য করেই। তোকেও খবরটা দিতে বলেছেন।"

"আমার হবে না। কাল আমি একটা সেমিনারে যাব।"

"কখন?"

"বিকেলে।"

"ফিরবি কখন?"

"তার কি ঠিক আছে! রাত আটটা ন'টা হতে পারে। দু'জন ফিজিশিয়ান আসছেন বাইরে থেকে ; চেস্ট স্পেশালিস্ট ফেমাস ডক্টরস। একজন আলিগড় থেকে, আর একজন মাদ্রাজ থেকে।"

তারাপদর খেয়াল হল, বাইরে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নেমে গিয়েছে। শব্দ শোনা যাচ্ছিল। এই বৃষ্টির যা তোড়, কম করেও আধ ঘণ্টা চলবে।

"আমাকে একলাই যেতে হবে," তারাপদ বলল।

"চলে যা।"

"যাব। কিন্তু কিকিরাকে নিয়ে আর পারা যাচ্ছে না।"

"কেন?"

"ধ্যুত! যে যা পারছে এনে ঘাড়ে চাপিয়ে দিচ্ছে ; আর উনিও ঝঞ্ঝাটগুলো মাথা পেতে নিয়ে নিচ্ছেন। কী দরকার!"

চন্দন হাসল। বলল, "পরোপকার। আজকাল আবার নেশাও ধরে গিয়েছে।"

"এই নেশাই একদিন ওঁকে বিপদে ফেলবে।"

॥ ২ ॥

কিকিরা যে কার সঙ্গে কথা বলছিলেন, তারাপদ বুঝতে পারল না।

বগলাও কাছে নেই। সদর দরজা খুলে দিয়ে নীচে গিয়েছে কী যেন আনতে। মুহূর্ত কয়েক দাঁড়িয়ে থেকে তারাপদ কিকিরার বসার ঘরে ঢুকল।

"এই যে, এসো!" কিকিরা ডাকলেন। সঙ্গে সঙ্গে হাঁচি। বার পাঁচ-সাত। মাঝের একটা হাঁচি এমন বিকট শোনাল, মনে হল রোগাসোগা মানুষটির নাকচোখের শিরাই না ছিঁড়ে যায়! হাতে রুমাল ছিল কিকিরার। নাক-মুখ মুছলেন।

তারাপদ কিকিরাকে নজর করে দেখল। চোখ লালচে, ছলছল করছে, মুখও সামান্য ফোলা দেখাচ্ছিল। মানে, সদ্য বর্ষায় ভিজে কাঁচা সর্দি ঝামরেছে ওঁর।

অন্য লোকটিকেও নজর করল তারাপদ। মুখ দেখলেই বোঝা যায়, চিনেপাড়ার লোক। পুরোপুরি না হলেও আধাআধি চাইনিজ তো হবেই। মাথার অর্ধেকই যেন টাক, পাতলা চুল, গোল থ্যাবড়ানো মুখ, ছোট ছোট চোখ, ভোঁতা নাক ; গায়ের রং খানিকটা হলদেটে। বয়েস কমপক্ষেও বছর পঁয়ত্রিশ। চল্লিশও হতে পারে। বোঝা মুশকিল। পরনে প্যান্ট, গায়ে বুশ শার্ট।

কিকিরা বললেন, "এসো তারা, আলাপ করিয়ে দিই। এই জেন্টেলম্যানের গোটা তিনেক নাম। আমরা জ্যাকি বলে ডাকি। জ্যাকি সুঙ।" বলে তারাপদর দিকে আঙুল তুলে দেখালেন জ্যাকিকে, "তারাপদ। মাই পার্টনার।"

জ্যাকি মাথা নুইয়ে সম্ভাষণ জানাল তারাপদকে।

তারাপদ তখনও বোকার মতন দাঁড়িয়ে। বুঝতে পারছে না—জ্যাকি কে? আর কেনই বা তার আবির্ভাব?

কিকিরা রুমালে নাক মুছলেন আবার। হাসি হাসি ভাব করে বললেন, "জ্যাকি নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট বাংলা বোঝে। বলতেও পারে। টেরেটি, বউবাজার, ধর্মতলা করে ওর দিন কেটেছে। কাকার জুতোর দোকান বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটে। দু'-তিন জেনারেশান এখানে। ওয়েলেসলিতে জ্যাকির দাঁত তোলার চেম্বার। না না, পাশ করা ডেন্টিস্ট নয়, তবে ওটা ওদের ফ্যামিলি প্রফেশান। বাবা ফটাফট দাঁত তুলতেন। হুট করে বাবা মারা গেলে মায়েরও পেশা হল দাঁত তোলা। এখন জ্যাকি।" কিকিরা আবার হাঁচলেন। নাক পরিষ্কার করলেন রুমালে। মজার গলা করেই বললেন, "এদের স্পেশালিটি কী জানো, তারাপদ? পেশেন্টকে নিয়ে ঠুক-ঠুক করবে না। যদি দাঁত তোলাতে চাও, একটা গুলি আগে, একবার কুলকুচো, তারপরই এক টান। ব্যস। সাফ। রাত্রে আর-একটা গুলি। কী জ্যাকি—আমি রাইট?"

জ্যাকি হাসল। তারাপদ দেখল, জ্যাকির সামনের একটা দাঁতের ডগায় সোনা সামান্য ; যেন পিন করে বাঁধানো। বাদামি রং দাঁতের।

তারাপদর মনে হল, ওই সোনা-বাঁধানো দাঁতটা বোধ হয় বিজ্ঞাপন। জ্যাকি নিশ্চয় সোনা দিয়ে দাঁত বাঁধাতে পারে। সে শুনেছে, চিনে ডেন্টিস্টরা এ-ব্যাপারে এক্সপার্ট।

নিজের দাঁতের ওপর আলগা জিব বুলিয়ে নিল তারাপদ অকারণেই। এবার বসল একপাশে।

জ্যাকি এবার উঠবে। বলল, "টাইম হয়ে গেল ; আমি চলি অ্যাঙ্কল।" জ্যাকির

উচ্চারণে খানিকটা গোলমাল রয়েছে, 'হয়ে' 'গেল' 'হোয়ে' 'গ্যালো' শোনাল।

কিকিরা ঘাড় হেলালেন। "এসো।"

"নেক্সট কবে মিট হবে?" জ্যাকির কথা বলার ধরনই বোধ হয় এরকম।

"আমি যাব। খবর পাবে। তোমায় ভাবতে হবে না।"

জ্যাকি আবার একবার তার হাতঘড়ি দেখল। সোনালি চেন ব্যান্ড। উঠে পড়ল। তারাপদের দিকে এগিয়ে দু'হাতে তার হাত ধরল একবার। হাসল। তারপর এগিয়ে গিয়ে ঘরের কোণ থেকে তার ওয়াটার প্রুফ আর মাথার হেলমেট উঠিয়ে নিয়ে হাত নাড়ল।

চলে গেল জ্যাকি।

তারাপদ কয়েক পলক তাকিয়ে থাকল দরজার দিকে। মনে পড়ল, বাড়ির নীচে একটা স্কুটার দেখেছিল সে। ওটা তবে ওই লোকটির। কিকিরার দিকে চোখ ফেরাল তারাপদ। "এটিকে কোত্থেকে জোগাড় করলেন?"

"বাতিটা জ্বেলে দাও। ঘোলাটে হয়ে গিয়েছে। বাইরে..."

তারাপদ উঠে পড়ল। বাতি জ্বালাল। বাইরের জমা মেঘ বোধ হয় ঘন হয়ে এসেছে। বাদলার গন্ধ। বৃষ্টি আসতে পারে।

"ক'টা বাজল হে?"

"সাড়ে পাঁচ।"

"চাঁদু?"

"আসতে পারবে না। সেমিনারে গিয়েছে।"

বগলা ফিরে এসেছে খানিকটা আগেই, তার নড়াচড়া, কাজকর্মের শব্দ পাওয়া যাচ্ছিল। বাতি জ্বেলে দিয়ে এসে তারাপদ বসল। বলল, "বললেন না?"

"তুমি জ্যাকির কথা বলছ? জ্যাকি আমার ওল্ড নেফু, আমায় অ্যাঙ্কল বলে। চাচা ভাতিজা আর কী! ওর বাবা আমার দুটো দাঁত তুলেছিল। কী হাত! ম্যাজিক হ্যান্ড। বন্ধুত্ব হয়েছিল। হুট করে মরে গেল বেচারি। একটু সন্দেহ আছে মরা নিয়ে। জ্যাকি তখন দুরন্ত ছোকরা। বাপের ধমকানিতে মাঝে মাঝে বাবার চেম্বারের পাশের ঘরে বসে দাঁত-বাঁধানোর কাজ শেখে। জ্যাকির মা গত যুদ্ধের সময় অনেকের সঙ্গে বর্মা থেকে পালিয়ে আসে। বয়েস কম। এখানেই থাকত, চিনেপাড়ায়। পরে বিয়ে হয়। স্বামীর কাছে হাতেখড়ি দাঁত-তোলার কাজে। তা ছাড়া টেলারিংও করত। এখন বুড়ি। অথর্ব।"

"আপনি সার ধান ভানতে শিবের গীত গাইছেন—!"

"না হে! একটু আধটু জানিয়ে রাখছি। তোমরা তো হালের ছোকরা, অনেক কিছুই দেখোনি। আমিও যে সব দেখেছি, তাও নয়, তবু তোমাদের চেয়ে বেশি দেখেছি। কলকাতায় আমার পঁচিশ তিরিশ বছর থাকা হল। চোখে যা দেখেছি তাই বা তোমরা দেখলে কোথায়! শুনেছি আরও বেশি। যেমন ধরো, কলকাতা শহরের এই বউবাজার পাড়া, ধর্মতলা স্ট্রিট, কিড স্ট্রিট—একসময় চাইনিজ—

মানে চিনে দাঁতের ডাক্তারদের বিস্তর পসার ছিল। ওটা ওদের বংশগত ব্যাপার। প্রফেশানাল হেরিটেজ বলতে ওদের ওই দাঁত তোলা, বাঁধানো, জুতোর দোকান, রেস্তোরাঁ, কার্পেন্টারি...!" কিকিরা আবার হাঁচলেন। সামান্য বিরক্ত যেন। "বর্ষার মুখে ভেজা খুব খারাপ, বুঝলে তারা। আর বয়েসও তো হচ্ছে। যা বলছিলাম, পাঞ্জাবিদের ছেলেগুলো গোঁফ ওঠার আগেই গাড়ির স্টিয়ারিং ধরতে শিখে যায়, বড়বাজারে গিয়ে দেখবে—ষোলো সতেরোও বয়েস হয়নি, ছেলেগুলো বাপের গদির পাশে ঘুরঘুর করছে। ফ্যামিলি ট্রাডিশন আর কী! চিনেদের দাঁত তোলার ব্যাপারটাও সেইরকম। আগে ভালই ছিল ওদের এই পেশাটা। এখন কমে গিয়েছে। তবে আছে...।"

"জ্যাকি কি আপনার মক্কেল, না, শুধুই ভাইপো?" তারাপদ ঠাট্টা করে বলল।

"দুই-ই।"

"মানে?"

"জ্যাকি বিপদে পড়েছে হে!...ওর মা এখন বুড়ি। তার ওপর একটা পা আর নাড়তে পারে না। কোমর থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত অসাড়।"

"কেন?"

"ওটা ডাক্তারি শাস্ত্র। আমি বলতে পারব না। চাঁদু যদি বলতে পারে। তবে তার দ্বারাও হবে বলে মনে হয় না। অনেক ডাক্তারই তো দেখেছে, যে যার মতন হাতও লাগিয়েছে, কিস্যু হয়নি।"

"ও! মহিলার বয়েস কত?"

"ষাটের ওপর নিশ্চয়।...একটা কথা তোমায় বললাম না! জ্যাকির মা যখন বর্মা মুলুক ছেড়ে পালিয়ে আসে তখন সেকেন্ড ওয়ার্লড ওয়ার চলছে। অনেক লোকই পালিয়ে আসছিল, ইন্ডিয়ানরা তো বটেই, অন্যরাও। প্রচণ্ড কষ্ট করে এসেছিল তারা, কত যে হাঁটতে হয়েছে বনজঙ্গল পাহাড় পেরিয়ে। নানান রোগ হয়েছে পথে, ইনজুরি হয়েছে, বিষাক্ত পোকামাকড়ের কামড়, ঘা, রক্তপাত...। তা সে সময় শিরদাঁড়ার তলার দিকে জোর চোট পেয়েছিল। জ্যাকির মাকে আমি যখন দেখেছি, মহিলা সামান্য খোঁড়াত। এখন বয়েস হয়েছে। পুরনো জখমের জের কিনা বলতে পারব না। দু'-একজন সেরকমই বলে।...আমার সঙ্গে জ্যাকির বাবার আলাপ হয় বছর বারো-চোদ্দ আগে। পরে খাতির। ওর মুখেই সব শুনেছি।"

তারাপদ অন্য কথা ভাবছিল। বলল, "যাক গে, অনেক হিস্ট্রি শোনালেন। এবার আসল কথা বলুন তো?"

"আসল, মানে তুমি বলতে চাইছ—"

"হ্যাঁ সার! আমি বলতে চাইছি—কালো বড় ট্রাঙ্ক, খালি কফিনের বাক্স, নস্যির ডিবে...মিস্ট্রিটা কী?"

"ভয়ঙ্কর মিস্ট্রি, অতীব রহস্যময় ঘটনা..." কিকিরা বললেন, চোখ বড় বড় করে। আবার হাঁচি। বার পাঁচেক কম করেও। গলা ধরে এসেছে তাঁর।

বগলা যেন সময় বুঝে চা এনে দিল।

কিকিরার হাতে চায়ের মগ এগিয়ে দিয়ে বগলা বলল, "আদার রস দেওয়া আছে।"

"বেশি করে দিয়েছ?"

"দিয়েছি।" জবাবটা এমনভাবে দেওয়া, যেন কিকিরার অযথা মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই, যেমন দেওয়ার বগলা দিয়েছে।

তারাপদ চায়ে চুমুক দিল।

কিকিরা বললেন, "বুঝলে তারাবাবু, আমার টোটকা হল, চায়ের লিকার, উইথ জিনজার রস, স্লাইট নুন, পারলে দু'টুকরো বচ ফেলে দাও, সর্দি গন। বচ অবশ্য পায়নি বগলা, লবঙ্গ ফেলে দিয়েছে।" বলে গরম চায়ে চুমুক দিলেন তিনি।

"ভাল টোটকা," তারাপদ বলল, "বৃষ্টিতে ভিজেছেন নাকি?"

"রানিগঞ্জে ভিজেছিলাম। তার ওপর কাল জ্যাকির পাল্লায় পড়ে ওর কেনা বাড়িটা দেখতে গিয়ে একরাশ ধুলো নোংরা নাকে ঢুকল। সে কী বাড়ি হে, আমার মনে হয়, পাঁচ-দশ বছরেও সেখানে মানুষের পা পড়েনি। হাঁটু ডুবে যায় ধুলোয় ময়লায়, মাকড়সার জাল, ধেড়ে ইঁদুর, ছুঁচো, আরশোলা, পায়রার নোংরা—হোয়াট নট?"

তারাপদ একটা আন্দাজ করল। "জ্যাকির বাড়ি দেখে আসার পর আপনি আমায় ফোন করেছিলেন?"

"রাইট।"

"আপনার অতীব রহস্যময় ঘটনাটা তা হলে জ্যাকির বাড়িতে দেখেছেন?"

"বিলকুল ঠিক। ধরেছ ঠিকই। তবে পদার্থগুলো এখনও চোখে দেখা হয়নি। শুনেছি।"

তারাপদ শব্দ শুনতে পেল। বৃষ্টি নামল। বাইরের দিকে জানলার শার্সি বন্ধ। জলের ছাট আসবে না। চা খেতে খেতে দু' পলক জানলাটা দেখে নিল সে।

হঠাৎ বলল, "আপনি বলছেন, জ্যাকির কেনা বাড়ি। আবার বলছেন, সে বাড়িতে মানুষের পা পড়েনি অনেককাল। একটু ধরিয়ে দিন, সার ; মাথায় ঢুকছে না। তা ছাড়া আপনার মক্কেলের নাম জ্যাকি হল কেন? লি, সিন, ফু... এই রকম একটা কিছু হওয়া উচিত ছিল। নয় কী? চিনে নাম...!"

কিকিরা দু' চুমুক চা নিয়ে যেন গলায় গরমটা লাগিয়ে নিচ্ছিলেন। ঢোঁক গিললেন। তারপর বললেন, "আরে ওরা দু'-তিন পুরুষ কলকাতায়, নাম নিয়ে অত ধরাকাটা করেনি। তোমরা করো? বাঙালি ছেলের ডাকনাম ডন, টিটো, যিশু হয় না? মেয়েদের নাম আইভি, লিলি, রুবি শোনোনি। নামে কী আসে যায়।... তবে জ্যাকিরা চিনে হলেও অ্যাংলো পাড়ার গায়ে মানুষ তো, ওই নামটা নিয়ে নিয়েছে। মাইন্ড দ্যাট ওর মা বার্মিজ, বার্মিজ খ্রিশ্চান।"

তারাপদ চায়ের কাপ নামিয়ে পকেটে হাত ডোবাল, একটা সিগারেট খাবে।

সিগারেট ধরিয়ে চায়ের কাপ আবার উঠিয়ে নিল। "জ্যাকিরা নতুন বাড়ি কিনেছে?"

"ইয়েস। হায়দার লেনে। জায়গাটা তোমার ম্যাপে নেই। কর্পোরেশানের খাতায় কী নাম আছে জানি না। ওটা তোমার ওয়েলেসলি পাড়ার মধ্যে পড়ত একসময়। ওখানে তুমি অ্যাংলো ইন্ডিয়ান, চাইনিজ, দু'-চার ঘর গুজরাটি মুসলিম, মায় সাউথ ইন্ডিয়ানও পেয়ে যেতে পারো—কেরেলিয়ান। পাঁচমেশালি পাড়া হলেও অ্যাংলো ঘরানা, মেইনলি ; আর চাইনিজ।"

"এখন কোথায় থাকে জ্যাকিরা?"

"জ্যোতি সিনেমার পেছন দিকে...!"

"নতুন বাড়ি হালে কিনেছে?"

"জাস্ট এ মান্থ! এখনও পুরোপুরি কেনা হয়নি, কাগজপত্র তৈরি হয়নি বিক্রিবাটার, কাজ এগুচ্ছে। এর মধ্যে অনেক টাকা অ্যাডভান্স করেছে জ্যাকি..."

"কত টাকা?"

"লাখখানেক।"

"লা-খ!"

"চমকাবার কিছু নেই তারাবাবু। লাখ দু' লাখ আজকের বাজারে কিছুই নয়। কলকাতায় লাখ টাকায় ফুটপাথের দু' হাত জায়গা পাওয়া যায় না।" কিকিরার আবার হাঁচি হল। জোরেই। সামলে নিতে সময় লাগল সামান্য। চা খেয়ে গলা ভিজিয়ে— টাগরায় শব্দ করলেন। বললেন, "জ্যাকি যে বাড়িটা কিনেছে সেটা মান্ধাতা আমলের হলেও, ওই বাড়ির দাম কম করেও এখন আট-দশ হতে পারত। হয়নি, কারণ বাড়িটা নিয়ে টানা মামলা-মোকদ্দমার পরও তার মালিকানা নিয়ে একটা গণ্ডগোল আছে। মর্টগেজ করা প্রপার্টি ছিল। শরিকও। যাই হোক, ঝামেলার সম্পত্তি বলে কম দামে হাতে পেয়ে গিয়েছিল জ্যাকি।"

"ঝামেলার প্রপার্টি কিনল কেন?"

"বললাম যে, কম দামে পাচ্ছে...। তা ছাড়া এসব প্রপার্টি মামলা-দেওয়ানি মামলা ক' পুরুষ ধরে চলে কেউ বলতে পারে না। এমন লোক বহু আছে এ শহরে, যারা ডিসপিউটেড প্রপার্টি কেনার জন্যে তক্কে তক্কে থাকে। মানে সস্তায় কিনে রাখে, তারপর দশ বিশ বছর মামলা লড়ে দশগুণ দামে সেটা বেচে দেয়।" কিকিরা তারিয়ে তারিয়ে চা খেতে লাগলেন।

তারাপদ বলল, "জ্যাকি দাঁও মারার জন্যে কিনেছে বাড়িটা?"

"খানিকটা তো বটেই। জলের দরে হাতে পেলে কে ছাড়ে। তবে সস্তা বলে শুধু নয়, জ্যাকি ভাবছিল, বাড়িটা সারিয়েসুরিয়ে নতুন করে নিয়ে ওই বাড়িতে মা আর ভাইকে নিয়ে থাকবে। ভবিষ্যতে চেম্বারও করতে পারে। কাছাকাছি।"

"আপনি তো বাড়িটা দেখেছেন বললেন? কেমন বাড়ি?"

"কাল দেখতে গিয়েছিলাম। অনেক পুরনো বাড়ি। মাথার ছাদ ধসে পড়তে

পারে, দেওয়াল হেলে পড়ার অবস্থা, চুন বালি খসে গিয়েছে, কাঠের সিঁড়িতে ধপধপ শব্দ হয়। বাড়ির ধাঁচটা হল সিঁড়িভাঙা অঙ্কের মতন। না দেখলে বুঝতে পারবে না।"

"তো এই বাড়িতে মিস্ট্রিটা কোথায় দেখলেন?"

"দেখার সুযোগ হয়নি; শুনেছি। দোতলা থেকে তেতলার ছাদে যাওয়ার সময় ডান দিকের একটা ঘরে। ঘরটা নাকি বাইরে থেকে বন্ধ ছিল। দরজার কড়ায় তালা তো ঝুলছিলই, তা ছাড়া দুটো কাঠের তক্তা দরজার মাথা থেকে তলা পর্যন্ত ক্রস-এর মতন করে বসিয়ে বাইরে থেকে লম্বা লম্বা পেরেক ঠুকে আটকানো ছিল।"

"বাইরে থেকে ক্রস...?"

"হ্যাঁ। শুনেছি, এককালে বিদেশে যখন প্লেগ এপিডেমিক হয়ে দেখা দিত, লোকে ঘরবাড়ি ছেড়ে পালাত, এইভাবে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করা থাকত। দেখলেই ধরে নিতে হত, ওই বাড়িতে প্লেগ হানা দিয়ে দু'-একটাকে সাবাড় করে গিয়েছে।"

তারাপদ অবাক হয়ে বলল, "ওই ঘরের দরজা আপনি খুলেছিলেন?"

"আমি কেন খুলব! জ্যাকি নিজেই বাড়িতে ঢোকার পর ব্যাপারটা দেখে মিস্ত্রি-মজুর এনে ঘর খুলিয়েছিল। খুলে ওই দৃশ্য দেখে, কালো ট্রাঙ্ক, কফিনের বাক্স, আর একটা নস্যির ডিবে— দেখেই মাথায় চক্কর মেরে যায়।"

তারাপদ এবার রীতিমতন কৌতূহল বোধ করল। তার চা শেষ হয়েছে। কাপটা নামিয়ে রাখল। "তারপর?"

"জ্যাকি বিপদে পড়ে গেল। এসব আবার কী! তার মাকে বলল, ভাইকে। মা ভয় পেয়ে বলল, ও বাড়ি ছেড়ে দাও। ওখানে পা দিলে কী অমঙ্গল ঘটবে কে জানে! বুড়ি মানুষ, কম দুঃখশোক পায়নি। ভয় পাওয়া স্বাভাবিক।"

"আর ভাই?"

"ভাইটা ছোকরা। ট্যানারিতে কাজ করে, আর বক্সিং লড়ে বেড়ায়, চক্কর মারে স্কুটার নিয়ে। ভাই বলল, টান মেরে সব বাইরে ফেলে দেবে। কিন্তু জ্যাকির কাকা— বুড়ো মানুষ। তার জুতোর দোকান বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটে। হুন বলে ডাকে লোকে। সে বলল— ওসব কাজ কোরো না বাছা। শয়তানের সঙ্গে লড়া যায় না।"

মাথা চুলকে তারাপদ বলল, "ইভিল?"

"হ্যাঁ।"

"তা আপনি হঠাৎ জ্যাকিকে পেলেন কোথায়?"

"আরে, আমি আর কোথায় পাব! জ্যাকি নিজেই এল। আমি তখন রানিগঞ্জ যাচ্ছি, মুকুন্দর কাজ। আমি বললাম, এখন তো আমি কলকাতার বাইরে যাচ্ছি। ফিরতে ফিরতে দিন চার-পাঁচ। চার দিন পরে তুমি এসো, ভাল করে শুনব। এখন তুমি যতটা পারো ঘরদোর সাফ করাও।"

"ও! জ্যাকি আবার এল কবে?"

"কাল সকালেই। বগলা বলল, আগের দিন মানে সকালে এসেও খোঁজ নিয়ে গিয়েছে।"

"কালই আপনি গেলেন জ্যাকির সঙ্গে?"

"গেলাম। বাড়িটা দেখলাম বাইরে বাইরে।"

"কী মনে হল?"

"ঝট করে বলতে পারছি না। তবে ব্যাপারটা মিস্টিরিয়াস, ঘোরতর রহস্য রয়েছে। আমি যেটুকু শুনেছি জ্যাকির মুখে— ও-রকম বড় সাইজের— হাত তিন-সাড়ে তিনের কালো ট্রাঙ্ক আজকাল বাজারে ঝট করে পাওয়া যায় না। অর্ডার দিতে হয় বোধ হয়। আগে এ ধরনের ট্র্যাভেলিং ট্রাঙ্ক আমি দেখেছি। তবে এমন ট্রাঙ্ক হয় এখনও ; স্পেশ্যাল কাজে লাগে। খবর নিয়ে বলতে হবে। জ্যাকি বলল, ট্রাঙ্কের রং বোঝাই মুশকিল। চার পুরু ধুলো জমেছে। কফিনের বাক্সটা মামুলি নয়, মাঝারি, তবে কাঠে ঘুণ ধরেছে। আর নস্যির ডিবে! অদ্ভুত।"

তারাপদ সামান্য চুপ করে থেকে বলল, "জ্যাকি যার কাছ থেকে বাড়ি কিনেছে— সে কী বলে?"

"সে বলে, বন্ধ ঘরের মধ্যে কী ছিল সে জানে না। ঘরটাই সে খোলেনি কোনওদিন।"

তারাপদ চুপ করে গেল।

॥ ৩ ॥

দিন দুই পরের কথা। কিকিরার সঙ্গে বাড়িটা দেখতে এসেছিল তারাপদরা। আসার আগেই তারাপদ ঠাট্টা করে চন্দনকে বলেছিল, কিকিরার মাথায় আবার ভূত ভর করেছে রে!

চন্দন আজ সঙ্গেই ছিল। দুপুরে আরাম করে ঘুম দিচ্ছিল নিজের কোয়ার্টারে। আজ সে ছুটি নিয়েছে আগে আগে। তারাপদ এসে ঠেলা মেরে তুলল। বলল, "কিকিরার তলব, তাঁর বাড়িতে যেতে হবে, সেখান থেকে হায়দার লেন, মানে কিকিরার নতুন মক্কেলের বাড়িতে।"

চন্দন আরও খানিকক্ষণ ঘুমোবার তালে ছিল। কিকিরার বাড়িতে সে যেত, তবে তার ইচ্ছে ছিল সন্ধে নাগাদ যাবে।

তারাপদ বলল, বিকেল বিকেল না গেলে বাড়ি দেখা যাবে না। ও বাড়ির ইলেকট্রিক লাইন অকেজো। তার কাটা, কানেকশান নেই। অন্ধকার হয়ে গেলে সিঁড়িতে পা ফেলাও যাবে না, তার ওপর যদি বৃষ্টি এসে যায় সবই বৃথা যাবে।

অগত্যা চন্দনকে উঠতে হল।

কিকিরার বাড়ি আসার পথে তারাপদ মোটামুটি জ্যাকি-কাহিনী শুনিয়ে

দিয়েছিল চন্দনকে।

চন্দন বলল, "বোগাস। ফালতু কেস। বাড়ি কেনা নিয়ে কে কাকে ঠকাচ্ছে, কার মাথায় কীসের ফন্দি রয়েছে তা জেনে আমাদের লাভ কী! এসব কোর্টকাছারির ব্যাপার, আমাদের নাচবার মানে হয় না। কিকিরার ব্যাপারটা হল, নেই কাজ তো খই ভাজ। যত্ত বাজে ব্যাপার।"

"কিকিরাকে বলিস।"

বৃষ্টি হল না। আকাশ মেঘলাই। বাদলা বাতাসের দমকাও নেই। মোটামুটি আরামই লাগছিল।

কিকিরা তৈরি ছিলেন।

ঘড়িতে সোয়া চার। চন্দনের সঙ্গে দু'-চারটে কথা বলেই বেরিয়ে পড়লেন। কাঁচা সর্দির ভাবটা আজ কম। গলা অবশ্য ভারী। মাঝে মাঝে কাশি আসছিল।

চন্দন বলল, "ওষুধ খেয়েছেন?"

"টোটকা। রাত্রে ফুটবাথও নিয়েছি।"

"আপনার উচিত ছিল হেড বাথ নেওয়া।"

"ঠাট্টা করছ! কেন আমার হেডটা কি ফেলনা।"

"না, কে বলল! আপনার হেড হাজারে এক।"

"শাস্ত্র পড়েছ! পড়োনি! কোত্থেকে পড়বে। আজকের ছেলেছোকরা, বাপ ঠাকুরদার কথাবার্তাই কানে তুলতে চায় না তো শাস্ত্র! আমাদের শাস্ত্রে মাথাকে বলেছে গুণসমন্বিতম্ অঙ্গ।"

"আপনার শাস্ত্র থাক, সার। শাস্ত্রই আপনার মাথার বারোটা বাজাবে। নিন যেখানে নিয়ে যাচ্ছেন সেখানেই চলুন।"

হায়দার লেনের আগে ট্রাম থেকে নেমে পড়লেন কিকিরা। চন্দনরাও নামল। এইসব অঞ্চলে চন্দন তারাপদর ঘোরাফেরা প্রায় নেই বললেও চলে। মাঝ কলকাতার বাঙালি পাড়ার ছাঁদছিরি চোখে পড়ে না এখানে, তবে পুরনো এলাকা নিশ্চয়ই। বাড়িগুলো বিবর্ণ। বৃষ্টিতে জলে স্যাঁতসেঁতে। কোনওটার চেহারা খাঁচার মতন, কোনওটার বা সামনে গাড়িবারান্দার মতন ছাদ আছে। দোতলায় কাঠের জাফরি-করা সান-শেড, ভেঙেচুরে গিয়েছে। বারান্দায় লোহার শিক আঁটা রেলিং। সেকেলে নকশা করা রেলিংও আছে দু'-একটা বাড়িতে, তবে ভাঙাচোরা। বারান্দায় জানলায় কাপড়-জামা ঝুলছে, শুকোতে দেওয়া, প্যান্ট শার্ট ফ্রক থেকে শুরু করে লুঙ্গি পর্যন্ত। বাড়িগুলো বেশিরভাগই দোতলা বা তেতলা। গায়ে গায়ে ঠেস দেওয়া। চাপাচাপির একটা গন্ধ রয়েছে বাতাসে। পাখির খাঁচাও চোখে পড়ল চন্দনের। রাস্তাও অপরিষ্কার।

তারাপদ বলল, "যা বাব্বা, এখানে বোরখাও ঝুলছে?"

চন্দন বলল, "শুঁটকি মাছের গন্ধ পাচ্ছিস না?"

তারাপদ নাক টানল। বলল, "এতরকম গন্ধ পাচ্ছি। কোনটা শুটকির আর কোনটা পচা ডিমভাজার, বুঝতে পারছি না।"

রাস্তার গায়ে দু'-একটা দোকান। মামুলি। খদ্দের চোখে পড়ছে না তেমন।

বড় রাস্তার পাশ দিয়ে একটা গলিতে ঢুকলেন কিকিরা।

সরু গলি। দুটো লোক পাশাপাশি হেঁটে গেলে তৃতীয়জনের জায়গা থাকে না।

গলিতে এখন ছায়া। মেঘলার দরুন আরও ঘন হয়েছে ছায়া।

"এই আপনার হায়দার লেন?" চন্দন বলল কিকিরাকে।

"হ্যাঁ। এই গলির এটা পেছনের দিক। ওপাশ দিয়ে ঢুকলে এত সরু মনে হয় না।"

"মানে, এটা বাই লেন?"

"না। কলকাতার অনেক পুরনো গলির মুখ বড়, লেজ ছোট। এটা লেজের দিক।"

"ও! তা আপনার মক্কেল এই লেজের দিকে বাড়ি কিনল কেন?"

"পেয়ে গেল। দাম কম।"

"বাড়ির পজেশান নেয়নি।"

"না, এখনও নয়। পজেশান নেওয়ার আগে লেখাপড়া আছে কাগজে, আইনের ব্যাপার। সেটা শেষ হলে তবে। তার আগেই ফ্যাকড়া বেঁধে গেল!"

"কালো ট্রাঙ্ক, কফিনের বাক্স..."

"মার্ডার—!" কিকিরা আচমকা বললেন। কিন্তু স্বাভাবিক গলায়।

চন্দন আর তারাপদ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। "মার্ডার!"

"বেশি নয়। মাত্র দুটো..."

কিকিরার গলার স্বর ঠাণ্ডা, মোটেই উত্তেজিত নয়। তারাপদদের সন্দেহ হল। কিকিরা তামাশা করছেন।

তারাপদ বলল, "মজা করছেন?"

"উঁহুঁ! নো মজা। ফ্যাক্ট।"

"ফ্যাক্ট! কই আগে তো বলেননি!"

"তখন শুনিনি। কাল সকালে একবার টহলে বেরুলাম। জ্যাকির কাকার জুতোর দোকান বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটে বলেছিলাম না! কাল রবিবার বলে দোকান বন্ধ ছিল। কাকা হেয়ার স্ট্রিট থানার পেছন দিকে থাকত জানতাম। পুরনো জায়গাতেই। খোঁজ করে করে পেয়ে গেলাম বুড়োকে।"

"চিনতেন কাকাকে?"

"বাঃ, চিনব না। আগে দু'-এক জোড়া জুতোও কিনেছি। তা ছাড়া জ্যাকির বাবার সঙ্গেও গিয়েছি হুন-এর কাছে। আজকাল কালেভদ্রে দেখা হয় ওদিকে গেলে দোকানে।"

"কী বলল সে?"

"বলল, ভাইপোর বাড়ি কেনার কথা সে জানে। জ্যাকিই বলেছে। প্রথমে ও অতটা বোঝেনি। খেয়ালও করেনি। পরে কার সঙ্গে হায়দার লেনের বাড়ির কথা বলতেই সে বলল, আরে তেরো নম্বর বাড়ি ; সেখানে যে দুটো মার্ডার হয়েছে। ওটাকে লোকে গুম বাড়ি বলে! ওই বাড়ি তো কেউ কেনে না। অনেক চেষ্টা করেও বিক্রি করা যায়নি। জ্যাকি ওই বাড়ি কিনেছে! ও মরবে।"

চন্দন বলল, "কবে হয়েছে মার্ডার।"

"হালে নয়। একটা হয়েছে বছর দুই আগে। আর-একটা আরও আগে।"

"পাড়ার লোক জানে নিশ্চয়।"

"না-জানবে কেন? অন্তত কিছু লোক। দুটো মার্ডারই শ্বাস বন্ধ করে, যাকে বলে গলায় ফাঁস দিয়ে, স্ট্র্যাংগুলেশান..."

"পুলিশ।"

"পুলিশ রিপোর্টেই বলেছে স্ট্র্যাংগুলেশান।"

"কেউ ধরা পড়েনি?"

"না।"

চন্দন সন্দেহের গলায় বলে, "তা ইয়ে—এই মার্ডারের ব্যাপারটা আপনার জ্যাকি জানে না? বলেনি আপনাকে?"

"বলেছে একবার। তবে সেভাবে নয়। পাড়ায় দু'-একটা খুন জখমের গল্প শোনা যায়—বলেছিল। ব্যাপারটাকে ও তেমন পাত্তা দেয়নি। আমার তো তাই মনে হচ্ছে।"

"পাত্তা দেয়নি কেন?"

"বলতে পারব না। আমার ধারণা, জ্যাকি ভেবেছে, এসব পাড়ার লোকের গল্প। কতটা সত্যি কতটা বানানো বলা মুশকিল। তা ছাড়া দুটো ঘটনাই পুরনো। এখন আর তার গুরুত্ব কী!"

কথা বলতে বলতে একটা বাড়ির কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়ে পড়লেন কিকিরা। তারপর চোখের ইশারায় যে বাড়িটা দেখালেন তাকে ইটকাঠের স্তূপ বললেও বলা যায়। ভাঙাচোরা বাড়ি, নোনাধরা দেওয়াল, ইট বেরিয়ে আছে, ফাটল, চারাগাছ বেরিয়েছে ফাটল থেকে ; বাড়িটার ধাঁচ বোঝার উপায় নেই বাইরে থেকে, তবু আন্দাজ হয় ওটা যেন সত্যিই সিঁড়িভাঙা অঙ্কের মতন দেখতে, কিকিরা যা বলেছিলেন। জমির মাপ বোধ হয় বেশি নয়, তারই মধ্যে সামনের দিক একরকম, পেছনের দিক অন্যরকম। সরু বারান্দা, এখানে-সেখানে বাঁক, দু'-দশ হাত বারান্দার পরই সিঁড়ি, গায়ে গায়ে ঘর, আবার সিঁড়ি, কাঠের ঝুলবারান্দা, দেড়তলা, দোতলা... না, কিছুই ধরা যায় না এখান থেকে।

তারাপদ বলল, "ওই বাড়ি?"

"হ্যাঁ।"

"এ তো সার হরিপালের কাউশেড!"

"হরিপালটা কে হে?"

"আপনি চিনবেন না। শেওড়াফুলি দিয়ে যেতে হয়..."

কিকিরা ঠাট্টাটা বুঝলেন, বললেন না কিছুই।

চন্দন বলল, "লেবাররা কাজ করছে দেখছি।"

"হ্যাঁ, জঞ্জাল সাফ করছে। মাত্র ক'দিন হল হাত লাগিয়েছে। আমি জ্যাকিকে বলেছি, আগে রাবিশ সরিয়ে ফেলো সমস্ত, হাত যখন দিয়েছ, শেষ করো, তারপর দেখা যাবে।"

মজুরের সংখ্যা বেশি নয়। জনা চারেক। সর্দার টাইপের কাউকে দেখা গেল না। মজুররা ধীরেসুস্থে গা এলিয়ে জঞ্জাল পরিষ্কার করছে। কাজের বেলাও ফুরিয়ে এল। আর আধ ঘণ্টা বড় জোর, তারপর আজকের মতন ছুটি।

বাড়ির মুখেই রাবিশ জমানো ঢিবি। কয়েকটা নয়নতারা গাছের ঝোপ, ফণিমনসা।

পাড়ার কুকুর শুয়ে আছে ঢিবির পাশে।

অনেক কষ্টে, ভাঙা ইটকাঠ, জমা করা ময়লার স্তূপ সরিয়ে কিকিরা তাঁর শাগরেদদের নিয়ে সেই ঘরটার সামনে এসে দাঁড়ালেন।

তারাপদ বলল, "বাইরে যে তালা ঝোলানো, সার!"

"হ্যাঁ, জ্যাকি ঝুলিয়েছে।"

চন্দন বলল, "সেই তক্তাগুলো, যা দিয়ে ঘরটা নো-এন্ট্রি করে রেখেছিল?"

"সেসব আগেই খুলে নিয়েছে জ্যাকি। তক্তা উঠিয়ে নিয়েছে, পুরনো তালা ভেঙে ফেলেছে। এটা নতুন তালা।"

তালা যে নতুন আর শক্তপোক্ত, বোঝাই যাচ্ছিল। চন্দন একবার দরজার কাছে গিয়ে ভাল করে পাল্লাগুলো দেখল দরজার, হাত বোলালো দু'-চার জায়গায়। বলল, "মনে হচ্ছে মস্ত মস্ত গজাল মারা ছিল তক্তায়। দরজায় ফুটোগুলো দেখেছেন?"

তারাপদও দেখল।

কিকিরা বললেন, "জ্যাকির আসার কথা, এখনও আসছে না কেন?"

চন্দন দু' পা সরে এসে আশপাশ দেখতে লাগল। এখানে গায়ে গায়ে বাড়ি। দু' বাড়ির বাইরের দেওয়াল অনেকসময় ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে গিয়েছে। এই বাড়িটার গায়ে লাগানো পুবের বাড়িটাও দোতলা। দু' বাড়ির মধ্যে একটা পেয়ারা গাছ। ও বাড়ির বারান্দা জাল দিয়ে ঢাকা। কয়েকটা প্যাকিং বাক্স গায়ে গায়ে দাঁড় করানো। বুড়ো এক কুকুর বারান্দায় শুয়ে আছে। দক্ষিণের বাড়িটা আড়াই কি তেতলা। জানলার খড়খড়িতে চিনে মেয়েদের পাজামা, গায়ের কুর্তা শুকোতে দেওয়া আছে। ছাদে টিভি অ্যান্টেনা, পাঁচিলের ওপর দু'-তিনটে ফুলের টব। ফুল নেই। গাছ চোখে পড়ছে। ওই বাড়িটায় বোধ হয় নানা পরিবারের বাস। একটা কোলাহল কানে

যাচ্ছিল।

চন্দন হঠাৎ বলল, "সার, আপনার হ্যামার আসবে তো?"

"হ্যামার—!"

"হাতুড়ে বদ্যি। মানে ডেন্টিস্ট—!"

"চাঁদু, এক সময় হাতুড়েরাই ধন্বন্তরি ছিল।"

"রাখুন ধন্বন্তরি। তখন লোকে বুঝত না দন্ত থেকে জীবনান্তও হতে পারে। এখন লোকে অনেক কন্‌সাস হয়েছে।"

"জ্যাকিকে তুমি অতটা তুচ্ছ কোরো না, চাঁদু! তোমার নামকরা ডেন্টিস্টও আমি দেখেছি। বড়ুয়া গিয়েছিল ধর্মতলায় দাঁত তোলাতে। ডাক্তার অনেক টানা-হেঁচড়া করে আধখানা দাঁত তুলল। বাকি অর্ধেকটা মাড়ির মধ্যে ডুবে থাকল। বড়ুয়া বলল, ছেড়ে দে বাবা তোর পায়ে পড়ি। ডাক্তার বলল, ঠিক আছে, তবে মশাই অর্ধেকটা যখন তুলেছি, আমার ফিজ-এর হাফ টাকা দিয়ে যান।"

তারাপদ হো হো করে হেসে উঠল।

চন্দনও হেসে ফেলেছিল।

এমন সময় স্কুটারের শব্দ শোনা গেল গলিতে।

সামান্য পরে জ্যাকি এসে হাজির।

চন্দন নতুন মানুষ, তারাপদকে আগের দিন দেখেছে জ্যাকি। নতুন মানুষটিকে ক' মুহূর্ত দেখল জ্যাকি ; তারপর কিকিরার দিকে তাকাল। "সরি অ্যাঙ্কল, আই অ্যাম লেট!"

কিকিরা মাথা নাড়লেন, "বেশি নয়। ঠিক আছে।" বলে চন্দনকে দেখালেন, পরিচয় করিয়ে দিলেন।

জ্যাকি হাত বাড়াল। "ডক্টর!"

চন্দন হাতে হাত মিলিয়ে একটু হাসল। ভদ্রতার হাসি।

কিকিরা বললেন, "জ্যাকি, তোমার লেবাররা বড় স্লো। এখনও ঠিকমতন সাফসুফ করতে পারল না। আর ক'দিন লাগবে?"

জ্যাকি বলল, "ওয়ান উইক মোর। লেবার কম অ্যাংকল, আমিও জলদি করছি না। হয়ে যাবে।"

"একটু জলদি করো।" বলে দু' পা বাড়ালেন। "ওই ঘরটার চাবি এনেছ?"

জ্যাকি মাথা নাড়ল। এনেছে।

"চলো তা হলে!"

এই ঘরটার সামনে আসার আগে— তারাপদরা একটা সরু প্যাসেজ পেরিয়ে চার ধাপ সিঁড়ি ভেঙেছিল। ভাঙাচোরা রেলিং। একটা বাঁক। বদখত সিঁড়ির ধাপ উঠতেই বন্ধ ঘর।

আলো অনেক কমে এসেছে, খানিকটা পড়ন্ত বেলা আর বাইরের মেঘলার জন্যে, বাকিটা আশপাশের ইটকাঠের বাধার জন্যে। মজুরগুলো বোধ হয় হাত

গুটিয়ে ফেলেছে, তাদের সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছিল না। তবে অন্য অন্য বাড়ির লোকজনের কথা, চেঁচামেচি, কুকুরের ডাক— সব মিলিয়ে মিশিয়ে একটা শব্দ ভেসে আসছিল।

কিকিরা জ্যাকিকে ঘরের তালা খুলতে বললেন।

জ্যাকি তালা খুলল।

ঘরে পা দিলে, কিছুই চোখে পড়ে না। অন্ধকার। কোথাও কোনও জানলা আছে কিনা বোঝা যায় না। থাকলেও বন্ধ। ধুলো আর পোড়ো ঘরের ঘন বাসি গন্ধ। টিকটিকি ডেকে উঠল কোথাও।

চোখ সইয়ে নিতে সময় লাগল খানিকটা। তারপর আবছাভাবে যখন ঘরটা দেখা যাচ্ছিল, কিকিরা টর্চ জ্বালালেন। তিনি টর্চ এনেছিলেন পকেটে করে। জানতেন, যে কোনও সময়ে অন্ধকার হয়ে যেতে পারে।

টর্চ জ্বেলে কিকিরা ঘরটার চারপাশে ফেললেন। খড়খড়ি-দেওয়া পুরনো আমলের একটা জানলা অবশ্য আছে। মাঝারি মাপের।

জানলাটা খুলে দিতে বললেন কিকিরা। জানলাটার একটা পাল্লা পুরোপুরি খোলা গেল না। পাট ভাঙা, ফ্রেমের সঙ্গে লোহার তার আর পেরেক মেরে আটকানো। অন্য পাল্লাটা খোলা যায়, তবে কবজা আলগা। আশ্চর্যের ব্যাপার জানলায় কোনও শিক নেই, গরাদহীন। মানে, একেবারে খোলামেলা জানলা।

এবার যেটুকু আলো এল আর কিকিরার টর্চের কল্যাণে মোটামুটি দেখা গেল ঘরটাকে। লম্বাটে ঘর। চওড়ায় কম। হাত দশ-বারো লম্বা হতে পারে। কড়িকাঠের ছাদ। ধসে পড়লেও পড়তে পারে। ফরফর করে আরশোলা উড়ে গেল। হয়তো ইঁদুরও আছে।

কিকিরা বললেন, "এই ঘরটাকে আগে সাফ করিয়ে নিতে বলেছিলাম তোমায়?"

জ্যাকি বলল, "অ্যাঙ্কল, লেবারদের এখন এই ঘরে ঢুকতে দিলে ওরা আর কাজ করবে না।"

"কেন?"

"কফিনের বাক্স! বেটারা ভেগে পড়বে।"

"ও! তা খানিকটা তো পরিষ্কার দেখছি।"

"আমরা করেছি নিজের হাতে। আমি আর আমার ভাই।"

"আচ্ছা! তুমি কি আজ সকালেও এসেছিলে এখানে?"

"ইয়েস অ্যাঙ্কল।"

তারাপদ আর চন্দন তখন অবাক চোখে কফিনের বাক্স, আর কালো বড় ট্রাঙ্ক দেখছিল। ট্রাঙ্কটা সত্যিই বড়। এত বড় বাক্স সচরাচর দেখা যায় না। তার গায়ের রং কালো না খয়েরি, না মরচে রঙের, বোঝা যায় না। কেন যেন বাক্সটা দেখলে অদ্ভুত লাগে। মনের কোথাও খোঁচা লাগে। সন্দেহ, না, ভয়! ওই ট্রাঙ্কের হাত দুই

দূরে কফিনের বাক্স। অনেক পুরনো। ভারীও হতে পারে। ডালা কেমন ফোলা, জায়গায় জায়গায় উঁচু হয়ে উঠেছে। রং বোঝা যায় না। কালোই হবে।

তারাপদ চন্দনের দিকে তাকাল। চন্দন অবাক হয়ে জিনিস দুটি দেখছিল। একটি লোহার বাক্স, বা একটা কফিনের বাক্স চোখে দেখা—আশ্চর্যের ব্যাপার নয়। স্বাভাবিক। দেখা যেতেই পারে। কিন্তু এই ঘরের মধ্যে, সত্য মিথ্যা যেমনই হোক, রহস্যময় কিছু কাহিনী শোনার পর—খানিকটা অন্যরকম লাগছিল বইকী!

কিকিরা জ্যাকিকে বললেন, "বাক্সটা তুমি এইভাবেই দেখেছ? তালা দেওয়া ছিল না! খোলা।"

জ্যাকি মাথা হেলিয়ে বলল, এই ভাবেই দেখেছে, তবে তালা ছিল বাক্সে।

"আর ওটা—কফিনের বাক্সটা?"

"ওইভাবেই।"

"নাড়াচাড়া করোনি?"

"ঘর সাফ করার সময় ট্রাঙ্ক, কফিনের বাক্স—দুইই সরিয়েছি।"

কিকিরা টর্চের আলো ফেলে ভাল করে দেখলেন আবার।

"জ্যাকি?"

"অ্যাঙ্কল!"

"আমি তোমার কাকার সঙ্গে কাল দেখা করেছিলাম। হুন বলল, এই বাড়িটা কিনতে ওরা সবাই তোমায় বারণ করেছিল। করেছিল না?"

"হ্যাঁ।"

"কেন?"

"মর্টগেজ প্রপার্টি ছিল বাড়ি। লাস্ট ওউনার মর্টগেজ দেয় বাড়ি। কিন্তু তার আগে কে কে মালিক হয়েছিল তার পেপার্স নেই ঠিকঠাক। লাস্ট ওউনার অবশ্য হ্যারিশ।"

"গোলমেলে সম্পত্তি আর কী! তা এখানে যে দুটো মার্ডার হয়েছিল ......"

"নেবাররা বলে। আমি বলিনি অ্যাঙ্কল? আই টোল্‌ড ইউ।"

"বলেছ হয়তো। তবে পাত্তা দিতে চাওনি বলে আমার মনে হয়েছিল।"

"রাইট অ্যাঙ্কল। মার্ডার হয়েছিল নেবাররা বলে। কেউ দেখেনি। দ্যাট মে বি এ স্টোরি।" বলে জ্যাকি বিড়বিড় করে যা বলল তার অর্থ, প্রত্যেক বাড়িতেই মানুষ মারা যায়, দুর্ঘটনা ঘটে, লোকে আত্মহত্যাও করে কোনও কোনও বাড়িতে—তা বলে সেই বাড়িতে কি মানুষ থাকবে না! আর এসব অঞ্চলে কিছু হল্লা, ছোরাছুরি, পটকাবাজি চলে। জ্যাকি ও নিয়ে তেমন মাথা ঘামায়নি। এত কম টাকায় এই জায়গায় একটা বাড়ি পাচ্ছে—সেই লোভে সে হাত বাড়িয়েছিল।

কিন্তু বাড়িটার জন্য লাখখানেক টাকা দাদন দিয়ে পরে যখন একদিন ঘুরেফিরে দেখতে এল, সেদিনও সে জানত না এই বাড়ির ওপরতলার একপাশে ছাদে ওঠার সিঁড়ির মুখে এইরকম একটা ঘর আছে। প্রথমদিন ভাঙাচোরা বাড়ির ভেতর

দিকটা দেখার উপায়ও ছিল না। দিন কয়েক পরে ভাঙা ইট-কাঠ মোটামুটি সরিয়ে যখন বাড়ির ভেতরে ঢুকতে পারল তখনই নজরে পড়ল ছাদে ওঠার সিঁড়ির একপাশে একটা ঘরের বাইরের দরজা লম্বা লম্বা কাঠের তক্তা মেরে বন্ধ করা রয়েছে। দেখে অবাক হল। এভাবে ক্রস করে কাঠের তক্তা মারা কেন? কেনই বা ঘরের দরজায় বিশাল এক পুরনো তালা ঝুলছে?

তারাপদ আর চন্দন ঘরের চারপাশে তাকিয়ে দেখার মতন অন্য কিছু দেখতে পেল না। একটা মামুলি দেওয়াল-তাক একপাশে। ছোটই।

কিকিরা জ্যাকির সঙ্গে কথা বলছিলেন। "বাক্সটার তালা খুলতে পারলে?"

"ভাই খুলতে পেরেছে। মেহনত করল। তালা ভেঙে দিল।"

কিকিরা টর্চের আলো ফেললেন বাক্সর তালা-লাগানো আঙটার দিকে। বুঝতে পারলেন, তালা খুলতে গিয়ে আঙটা লাগাবার জায়গাটাই ভেঙেচুরে রেখেছে ওরা।

"কী ছিল বাক্সে?"

জ্যাকি বলল, একটা অ্যাপ্রন টাইপের ড্রেস। মোটা শক্ত কাপড়। ব্ল্যাক। ওয়ান গাউন টাইপের ড্রেস। সিল্কের। ব্ল্যাক। .... অ্যাঙ্কল, লেট মি ওপেন ইট!"

কিকিরা কিছু বলার আগেই জ্যাকি বাক্সটার ডালা উঠিয়ে ফেলল।

দু' পা এগিয়ে টর্চের আলো ফেললেন কিকিরা বাক্সর মধ্যে। ফেলে অবাক হয়ে গেলেন। বৃহৎ ট্রাঙ্ক, হাত দুয়েক, কি সোয়া দুই গভীর। বাক্সটার একপাশে দুটি মাত্র পোশাক পড়ে আছে। বাকিটা ফাঁকা নয় পুরোপুরি। কয়েকটা যন্ত্রপাতিও রয়েছে যেন।

তারাপদরাও এগিয়ে এসে ঝুঁকে পড়ল।

কোনও সন্দেহ নেই, বাক্সর মধ্যেটা সামান্য ঝাড়মোছ করা হয়েছে। কিন্তু স্পষ্ট বোঝা যায়, বন্ধ বাক্সর মধ্যেকার পোকামাকড় দুর্গন্ধ এখনও যায়নি। তেমন করে দেখলে হয়তো মরা আরশোলার দাগ টিকটিকির চ্যাপটানো গায়ের ছালও চোখে পড়তে পারে। আরও কী দেখা যাবে কে জানে! দিনের আলো ছাড়া বোঝা মুশকিল।

কিকিরা বললেন, "ওগুলো একবার বার করতে পারো? দেখি—!"

জ্যাকি হাত তুলে সামান্য অপেক্ষা করতে বলল। তারপর ঘরের বাইরে চলে গেল।

চন্দন বলল, "ব্যাপারটা কী, সার?"

"দেখছি।"

তারাপদ বার কয়েক কাশল খুকখুক করে। এই ঘরের অত্যন্ত ময়লা নোনাধরা দেওয়াল, ঘুণধরা কড়িকাঠের ছাদ থেকে কেমন এক দমবন্ধ করা বাতাস চুঁইয়ে পড়ছে। মুখে রুমাল চাপা দিল তারাপদ। কাশি সামলাচ্ছিল।

জ্যাকি ফিরে এল। হাতে এক সরু কাঠের টুকরো। লম্বা।

নিজে বাক্সের মধ্যে হাত দিল না জ্যাকি, যেন ঘেন্নাতেই, কাঠের টুকরো দিয়েই

বাক্সর মধ্যেকার জিনিসগুলো তুলল একটা একটা করে। প্রথমে অ্যাপ্রনটা ঝুলিয়ে ধরল কাঠের টুকরোর আগায়।

কিকিরা দেখলেন। তারাপদরাও। পোশাকটা ধুলো ময়লায় ন্যাতার মতন দেখাচ্ছে। কালো।

অ্যাপ্রনের সঙ্গে একটা স্কার্ফও উঠে এসেছিল। কালোই। তবে বেশ বড় স্কার্ফ। সিল্কের। মাঝে মাঝে পোকায়-কাটা, একটা দাগ একপাশে।

মাথা নাড়লেন কিকিরা। "ওটাও বার করো তো দেখি।"

জ্যাকি স্কার্ফ রেখে অন্য জিনিসটা বার করল। একই ভাবে।

কিকিরা টর্চের আলো ফেলে দেখলেন। তারাপদরাও দেখছিল।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে কিকিরা বললেন, "এটা গাউন নয়, আলখাল্লা। কাঁধ থেকে পা পর্যন্ত ঝুল। দরবেশ, ফকির-টকিরদের পরতে দেখেছি। তা এটারও অবস্থা তো ওই স্কার্ফের মতন ....। ঠিক আছে রেখে দাও।"

জ্যাকি আলখাল্লাটা বাক্সর মধ্যে রেখে দিল।

কিকিরা কী ভাবলেন। পরে বললেন, "এখনকার মতন বাক্সটা বন্ধ করেই দাও।" বলে কফিনের বাক্সর দিকে তাকালেন। "ওর মধ্যেটা দেখেছ?"

বাক্সর ডালা বন্ধ করে জ্যাকি বলল, "দেখেছি।"

"কী আছে?"

"একটা স্টিক। ওয়াকিং স্টিক। গুড কোয়ালিটি কেইন। বেত। মাথার দিকটা লোহা দিয়ে বাঁধানো। বাকি যা আছে," মাথা ফেরাল জ্যাকি। "ইদুর, বিছে, কক্‌রোচ, কাঠের পোকা। একটা বোর্ড ছিল। কাগজের।"

"আর কিছু নয়?"

"না।"

"বেতের ছড়ি ওনলি?"

"কফিনের বাক্সটা দেখবেন অ্যাঙ্কল?"

"পরে দেখব।" বলে কিকিরা একবার দেওয়াল-তাকটার দিকে আলো ফেললেন। "নস্যির কৌটোটা নাকি এখানেই ছিল—জ্যাকি বলেছে।" হঠাৎ মত পালটালেন কিকিরা। "আচ্ছা, দেখি তো ছড়িটা!"

কফিনের বাক্সে হাত ডোবাতে যেন সামান্য ইতস্তত করল জ্যাকি। তারপর ডালা খুলে ছড়িটা বার করল।

প্রথমে টর্চের আলোয় ছড়িটা দেখলেন কিকিরা। কী মনে করে হাত বাড়ালেন, "দেখি।" তারাপদরাও দেখছিল।

কিকিরা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখলেন ছড়িটা। ছড়ির মাথা লোহা-বাঁধানো। কোনওকালে হয়তো ঝকঝকে লোহার পাত বা জার্মান সিলভারের একটা আবরণ ছিল। এখন সবই কালচে। কিঞ্চিৎ কারিকুরিও ছিল আবরণের গায়ে। আপাতত বোঝা যায় না ময়লার জন্যে। কিকিরা ওজন অনুমান করার চেষ্টা করলেন।

বেতের জন্যে নয়, লোহার মুণ্ডুর জন্যে ছড়িটা বেশ ভারী লাগছিল। ছড়িটার মাঝামাঝি গোল দাগ। কালচে। অলঙ্করণ বলেই মনে হয়।

"রেখে দাও—" ছড়ি ফেরত দিলেন কিকিরা। দিয়ে দেওয়াল-তাকের দিকে তাকালেন। "ওটা একবার দেখি।"

কফিনের বাক্সর মধ্যে ছড়ি রেখে ডালা বন্ধ করল জ্যাকি।

দেওয়াল-তাক থেকে একটা কৌটো তুলে নিয়ে কিকিরার হাতে দেওয়ার সময় জ্যাকি বলল, "অ্যাঙ্কল, এটা স্নাফ বক্স বলে আমার মনে হয়। শেপটা পিকিউলিয়ার। মাঙ্কির মতন দেখতে।"

কিকিরা হাতে নিয়ে দেখলেন। হাড়ের তৈরি। দেড় ইঞ্চি কি দুই ইঞ্চি লম্বা। হ্যাঁ, বাঁদর বা ওই ধরনের জন্তুর মতন ছাঁদ করে কাটা। হাড়ের তৈরি ছোট্ট হাতি, বেড়াল, নৌকো, বুদ্ধমূর্তি—কত কী তো দেখা যায়। এই কৌটোটার ছাঁদ জন্তুর মতন। তবে বাঁদর, না পেঁচা, না অন্য কিছু বোঝা দায়। কৌটোর মাথায় প্যাঁচ আছে; খোলা যায়। ভেতরে কিছুই নেই। সাদাটে কি বাদামি গুঁড়ো।

তারাপদ বলল, "মোষের শিংয়ের তৈরি নাকি?"

কালোই দেখাচ্ছিল কৌটোটা। কিকিরা কিছু বললেন না। ফেরত দিয়ে দিলেন কৌটোটা। "চলো, ফেরা যাক।"

গলিতে এসে বোঝা গেল। বিকেল পড়ে গিয়েছে। মেঘের জন্যে হালকা অন্ধকারও হয়ে এসেছে চারপাশ।

কিকিরা বললেন, "জ্যাকি, তুমি কীসের ভয় পাচ্ছ?"

জ্যাকি বলল, "আমি ভয় পাইনি অ্যাঙ্কল। শুরু মে পাইনি। ওই ঘরটা দেখার পর মামিকে বললাম। মা ভয় পেল। হুন অ্যাঙ্কল নার্ভাস হয়ে গেল। মামি ...."

"তোমার মা আমার কাছে পাঠাল তোমাকে?"

জ্যাকি বলল, তার মা যে তাকে কিকিরা অ্যাঙ্কলের সঙ্গে দেখা করতে বলেছে তা ঠিকই। তবে যেদিন ও ওই বাড়ি থেকে ঘুরে এল প্রথম, তখন থেকে একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ করতে লাগল।

"কী লক্ষ করলে?" কিকিরা বললেন।

"আমি ইভনিংয়ে আমার চেম্বার থেকে বেরুনোর পর কেউ আমায় ফলো করে।"

"তুমি কখন চেম্বার থেকে ফেরো?"

"আট ; হাফ পাস্ট এইট।"

"তুমি স্কুটারে ফেরো?"

"হ্যাঁ, স্কুটারেই আমি ঘুরি।"

"যে ফলো করে তাকে তুমি দেখেছ?"

জ্যাকি বলল, প্রথমটায় সে খেয়াল করেনি। পরে তার চোখে পড়ল কেউ

তাকে ফলো করছে।

"তুমি স্কুটারে ফিরছ, লোকটা কেমন করে তোমায় ফলো করবে?"

"সেও স্কুটার নিয়ে ফলো করে।"

"ও। ..... চিনতে পারো লোকটাকে?"

"না। তফাতে থাকে।" বলে, জ্যাকি মাথা নাড়ল। আবার বলল, "অ্যাঙ্কল—, আমি বাড়িটার ভেতর দেখে যেদিন ফিরে এলাম, ওই হরিবল ঘরটা দেখলাম—তার এক দো দিন বাদ থেকে আমার চেম্বারে ঘোস্ট কল আসতে লাগল। কে ফোন করে বুঝতে পারি না। চেম্বার আওয়ার্সের শেষের দিকে কল আসে।"

কিকিরা তাকিয়ে থাকলেন জ্যাকির দিকে। অবাক গলায় বললেন, "কী বলে?"

"বেশি কথা বলে না। রাফ টোন। বলে, বি কেয়ারফুল, বাড়ি কেনার চেষ্টা কোরো না। বিপদ হবে।"

"আশ্চর্য! একই কথা বলে?"

"হ্যাঁ, অ্যাঙ্কল।"

"তোমার কী মনে হয় কথা শুনে? তোমাদের কমিউনিটির কেউ? কী ভাষায় কথা বলে?"

"হিন্দিতে। বাজারি হিন্দি।"

তারাপদ হঠাৎ বলল, "বাড়িটা যে বিক্রি করেছে সে এইসব ঘটনা জানে?"

"বলেছি।"

"লোকটা তোমার চেম্বারে ফোন করে—বাড়িতে করে না কেন?"

"বাড়িতে ফোন নেই। ..... চেম্বারের ফোন পুরনো, দরকারে লাগে।"

গলি দিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ালেন কিকিরা। চারপাশ দেখলেন। পাড়াটা এতক্ষণে যেন চঞ্চল হয়ে উঠেছে। লোকজন আসা-যাওয়া করছে। সামান্য তফাতে ট্রামলাইন। দেখা যাচ্ছে না। শব্দ পাওয়া যাচ্ছে ট্রামের। দশ বিশ পা এগিয়ে গেলেই বড় রাস্তা। ট্রামলাইন। কতকগুলো বাচ্চা বল নিয়ে দৌড়ঝাঁপ শুরু করেছে।

তারাপদ আর চন্দন যেন ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। সিগারেট ধরিয়ে নিল একপাশে দাঁড়িয়ে।

কিকিরা কিছু ভাবছিলেন। পরে জ্যাকিকে বললেন, "তুমি ঠিক কী করতে চাও? মানে বাড়িটা কিনবে, না, কিনবে না—সেটা স্থির করতে চাও? না কি, দেখতে চাও কে বা কারা—তোমায় বাড়িটা কিনতে দিতে চায় না বলে ভয় দেখাচ্ছে?"

জ্যাকি বলল, "অ্যাঙ্কল, বাড়ি আমি কিনতেই চাই। তার আগে চাই মিস্ট্রি সল্‌ভ করতে। ওই ঘরটা কবে থেকে বন্ধ আছে ওভাবে? কে বন্ধ করেছিল? কেন? রুমের মধ্যে কে অত বড় ট্রাঙ্ক রেখেছিল? কেন? ফাঁকা একটা কফিন বাক্স পড়ে আছে কেন এতদিন? কে রেখেছিল....? আর আমায় থ্রেট করার কারণ কী?

আমি সবই জানতে চাই।”

তারাপদ বলল, “ঘরের মধ্যে যে ট্রাঙ্ক আর কফিন বাক্স পড়ে আছে—আপনি পুলিশকে জানিয়েছিলেন?”

জ্যাকি বলল, “ঘরের মধ্যে বাক্স পড়ে থাকলে পুলিশ কী করবে? কফিন বাক্স ডেড বডি নয়।”

কিকিরা মাথা হেলিয়ে বললেন, “না, পুলিশকে ইনফর্ম করার কিছু নেই। পুরনো ভাঙা বাড়িতে কী পড়ে আছে জেনে পুলিশ কী করবে? সোনাদানা, ভ্যালুয়েবল কোনও জিনিস পেলে জানানো যেত। কিছুই তো পাওয়া যায়নি। থানায় গেলে তাড়িয়ে দেবে।”

চন্দন বলল, “থানা পুলিশ এখানে আসে না। আইনের কোনও ব্যাপার নেই। তবে বাড়ি-বিক্রির ব্যাপারটা হয়তো ....” কথা শেষ করল না সে। তার মাথাতেই এল না কী বলবে।

কিকিরা জ্যাকির দিকে তাকালেন। “এই কেসটা বড় গোলমেলে, জ্যাকি। আমরা যে তোমায় ভরসা দেব তাও দিতে পারছি না। তা একটা কথা তুমি কি আগে বলেছ? আমার মনে পড়ছে না। বাড়িটা তুমি কার কাছ থেকে কিনতে যাচ্ছ? সে কে?”

জ্যাকি বলল, “তালুকদার এস্টেট অ্যান্ড প্রপার্টিজ থেকে কিনতে যাচ্ছিলাম।”

“তারা কে?”

“তাদের হাতে এদিককার দু'-চারটে বাড়ির মালিকানা আছে। ফ্রি স্কুল স্ট্রিটেও আছে জানি। তালুকদারের কাছ থেকে কিনে নেব বলে টাকা অ্যাডভান্স করেছি।”

কিকিরা শুনলেন। পরে বললেন, “ঠিক আছে। আমি ভেবে দেখি। ঝামেলা অনেক। নাও এখন চলো।”

॥ ৪ ॥

সপ্তাহখানেক পরের কথা।

কিকিরার ঘরে বসে কথাবার্তা হচ্ছিল। চন্দন রাগ করে ছুটি নিয়েছে হাসপাতাল থেকে। বদলি আর আটকানো গেল না বেচারির। এখন মেজাজ ভাল নয়। বলছে চাকরি ছেড়ে প্রাইভেট প্র্যাকটিসে নেমে পড়বে। বাড়িতে আপত্তি আছে বাবার। কলকাতা শহরে অত সহজে প্র্যাকটিস জমানো যায় না। আর নিজের দেশবাড়িতে গিয়ে বসলেও চার-পাঁচ বছরের আগে সুবিধে হবে না। সেখানেও ভাল পসারের ডাক্তার আছে জনা কয়েক, বাকিরা চরে খাচ্ছে। বাবা বলেন, কাক যেভাবে ময়লা ঠুকরে বেড়ায়—এরাও সেইভাবে রোগী হাতে পেলে ঠুকরে বেড়াচ্ছে। আপাতত তাই চন্দন চাকরি ছাড়তে পারছে না, কিন্তু ভেতরে

ভেতরে বিরক্ত।

তারাপদ আর কিকিরাই কথাবার্তা বলছিল বেশি, চন্দন শুনছিল।

শেষে তারাপদ একবার বলল কিকিরাকে, "আপনি নিজের চোখে দেখেছেন—জ্যাকির কেনা ভাঙা বাড়ি সাফসুফ হয়ে গিয়েছে?"

"কালও একবার গিয়েছিলাম। হ্যাঁ, জঞ্জাল প্রায় পরিষ্কার, ভাঙা মালমশলা তুলে নিয়ে গিয়েছে, কাঠকুটোও বেশি পড়ে নেই ...."

"কে নিয়ে গেল?"

"এসব নেওয়ার লোক আছে। কিনে নিয়ে যায়। পুরনো ভাঙা বাড়ির ইট কাঠ সবই বিক্রি হয়ে যায় হে তারাবাবু! এ হল কলকাতা শহর, এখানের ধুলো মাটিও পড়ে থাকে না। তা ছাড়া, পুরনো আমলের বাড়ির কাঠকুটোও উঁচু ক্লাসের। তার দাম রয়েছে।"

তারাপদ শুনল। পরে বলল, "কাজের কাজ হল কিছু?"

"না, বলার মতন নয়। চেষ্টা করছি।"

চন্দন হঠাৎ বলল, "কিকিরা, একটা কথা আমায় বলুন তো? একজন হাতুড়ে চিনে দাঁতের ডাক্তার। বয়েসও বেশি নয়। সে লাখ টাকা পেল কোথায়? আরও একটা পয়েন্ট আছে, বাড়িটা কিনতে হলে তার আরও কয়েক লাখ টাকা লাগবে? এত টাকা তার আসে কেমন করে?"

কিকিরা বললেন, "তুমি যা ভাবছ তা নয়। জ্যাকির বাবা ভাল রোজগার করত। স্পেশ্যালি দাঁত বাঁধানোয় তার সুনাম ছিল খুব। অনেককে দেখেছি, নিজেরা দাঁত না বাঁধিয়ে ওর কাছে ছাঁচ ফেলে যেত। ও সেট তৈরি করত। আর সোনাদানার কাজ হলে জ্যাকির বাবা ছিল পয়লা নম্বরের। টাকা ওর বাবা ভালই করেছে।"

"কত করতে পারেন?"

"মোটামুটি মন্দ কী! আমার অনুমান। জ্যাকির মা, মাইন্ড দ্যাট, নিষ্কর্মা ছিল না। তারও রোজগার ছিল। আরও একটা কথা জেনে রাখবে। ওদের কমিউনিটির লাইফ স্টাইল আমাদের মতন নয়। পকেট ফাঁকা, কাপ্তেনি করছে—এ তুমি ওদের মধ্যে পাবে না।"

"আপনি জ্যাকিকে টাকার ব্যাপারে বোধ হয় কিছু বলেননি?"

"না। সরাসরি বলিনি। কেননা আমি ওদের অবস্থাটা আন্দাজ করতে পারি।...শোনো চাঁদু, এক বাঙালি ছাড়া, বাকি যারা কলকাতা শহরে টাকা কামায়—তারা সব সময় নিজের ভাই বেরদার বন্ধু—এমনকী আধ-চেনা জাতভাইদের সব সময় দাঁড় করানোর জন্যে হেল্প করে। কাজেই জ্যাকির কাছে টাকা জোগাড়ের ব্যবস্থা করা কঠিন হত না মনে হয়।"

তারাপদ বলল, "জ্যাকির ইনকাম কেমন?"

"এই তো বিপদে ফেললে। আমি কি ইনকাম ট্যাক্স অফিস?"

"তবু?"

"খারাপ নয়। জ্যাকিও দাঁত বাঁধানোর কাজ ভাল করে। বাপের কাছ্ থেকে শিখেছে।"

"যাক গে, আপনি ওর মায়ের কাছে গিয়েছিলেন?"

"না। যাব একদিন।"

"তা হলে এই ক'দিন...?"

কিকিরা নিজের মাথার চুল ঘাঁটতে ঘাঁটতে বললেন, "একেবারে হাত গুটিয়ে বসে নেই হে! কচ্ছপের স্টাইলে এগুচ্ছি।...রাতারাতি একটা কিছু করে ফেলা এখানে সম্ভব নয়।"

আজ বৃষ্টি নেই। মেঘও নয়। বরং অন্যদিনের তুলনায় গুমোট। সন্ধে হয়ে গিয়েছিল। কিকিরার কথামতন বগলা শরবত তৈরি করে দিয়ে গেল।

শরবতে চুমুক দিয়ে চন্দন হেসে বলল, "সার, আপনি কচ্ছপের মতন কতটা যাবেন? আমি জ্যাকির ব্যাপারে..."

চন্দনকে থামিয়ে দিয়ে কিকিরা বললেন, "তুমি বিশ্বাস করতে পারছ না জ্যাকিকে। না করতেই পারো। কিন্তু একেবারে অকারণে সে আমার কাছে আসেনি। ওর কাকার কথাই ধরো। বাড়ি কেনার কথা কাকা জানে। এটাও শুনেছে ওই তেরো নম্বর বাড়িটাকে লোকে গুমবাড়ি বলে।"

"জেনেশুনেও জ্যাকি এগিয়ে গিয়েছে।"

"কতটা আগে শুনেছে—কতটা পরে—তা তুমি জানছ কেমন করে! জ্যাকির নিজের কথায় আগেভাগে সব জানত না। যেমন ওই বন্ধ ঘরটার কথা। জানত না, ঘরে কী আছে, কী দেখতে পারে!...হ্যাঁ, বাড়িটাকে গুমবাড়ি বলে সে শুনেছে। তাতে কী! কলকাতার কত পুরনো ধসে পড়া বাড়িকে লোকে ভূতের বাড়ি বলে। তা বলে সেই বাড়িতে কি দু'-চারজন মাথা গুঁজে থাকে না? না তোমার ওই বাড়ির বেচাকেনা নিয়ে কথা চলে না?"

তারাপদ বুঝতে পারল, চন্দনের মনোভাব গোড়া থেকেই যে জ্যাকির বিরুদ্ধে—এটা কিকিরা বুঝতে পেরেছেন। তিনি হয়তো খুশিও হচ্ছেন না। হওয়ার কথা নয়। জ্যাকিদের পরিবার ও জ্যাকিকে তিনি যতটা চেনেন, চন্দন তার কতটুকু জানতে পারে! কিছুই নয়।

কথা ঘুরিয়ে নিল তারাপদ। হেসে বলল, "ছাড়ুন ওসব কথা। এবার বলুন তো আপনার কচ্ছপ গতিতে কতটা এগুতে পারলেন?"

কিকিরা শরবত খেতে খেতে বললেন, "তালুকদারদের অফিসে গিয়েছিলাম।"

"অফিস?"

"আছে বাবা, অফিস আছে। রাসমণির বাড়ির খানিকটা আগে। জায়গাটা হাট বললেও চলে, একটা বাড়ির দোতলায় তালুকদারদের অফিস। আগের দিনের নায়েব গোমস্তার কাছারিবাড়ি টাইপের। দেখলে তোমার অভক্তি হবে। তা

সেখানে ভাবসাব জমিয়ে দশ-বিশটা বাজে কথার পর তালুকদারদের ঘুঘু ম্যানেজারটিকে পটালাম। রুপোর আংটি সোনার আংটি হল, দশের নোট হল বিশ। হাত সাফাইকা খেল। নজরানা দিলাম। ম্যানেজার আমায় ওদের ছোটবাবুর কাছে নিয়ে গেল।"

চন্দন খানিকটা শান্ত। হাতের গ্লাস নামিয়ে রাখল মাটিতে। মুখ মুছে নিল।

কিকিরা বললেন, "কথাবার্তায় বুঝলাম—তালুকদাররা দু'-তিন পুরুষ ধরে প্রপার্টি বিজনেসে আছে। বাজার বসানো, দোকান ভাড়া, পুরনো বাড়ি সম্পত্তি কেনাবেচা থেকে শুরু করে আরও কিছু ব্যবসা। ওদের একটা সলিসিটার ফার্মও আছে পার্টনারশিপের।"

"মানে ধনী লোক!"

"তা তো বটেই।"

"বাড়িটার কথা কী বলল?"

"বললেন, ছোটবাবুই বললেন, মর্টগেজ প্রপার্টি ছিল বাড়িটা। ছোটবাবুর বাবা টাকা ধার দিয়েছিলেন বাড়ি বন্ধক নিয়ে।"

"কাকে?"

"হ্যারিশ বলে এক অ্যাংলো ইন্ডিয়ানকে। সে আর টাকা শোধ করতে পারেনি। মূল টাকা আর সুদ মিলে যখন টাকার অঙ্কটা বিরাট হয়ে দাঁড়াল, হ্যারিশ পাগল হয়ে একদিন বেপাত্তা হয়ে গেল। মারাও গেল।"

"মারা গেল কেমন করে বুঝল তালুকদাররা? হ্যারিশ তো বেপাত্তা ছিল।"

"মরার আগে হ্যারিশ রাস্তার ভিখিরির মতন চেহারা আর পেটে আলসার নিয়ে চ্যারিটেবল হাসপাতালে ভর্তি হয়। দিন কয়েক বেঁচে ছিল। মারা যাওয়ার আগে নিজের নাম ঠিকানার সঙ্গে তালুকদারদের ঠিকানা দিয়ে যায়।"

"আইডেন্টিফিকেশান হয়েছিল তবে?"

"হ্যাঁ।"

"সেই বাড়ি জ্যাকি কিনেছে। হ্যারিশের কেউ ছিল না?"

"না। স্ত্রী আগেই মারা গিয়েছিল। ছেলেমেয়ে ছিল না।"

চন্দন বলল, "কতকাল বাড়িটা খালি থাকার পর জ্যাকি ওই প্রপার্টি কিনেছে?"

"বাড়ি তো খালিই পড়ে ছিল অনেক বছর! কম করেও বছর দশেক।"

তারাপদ যেন কিছু ভাবছিল। চন্দনের কাছ থেকে সিগারেট নিয়ে ধরাল। শেষে বলল, "জ্যাকি খবর পেল কেমন করে যে মর্টগেজে পাওয়া বাড়িটা তালুকদাররা বিক্রি করবে।"

"দালাল। তা ছাড়া তালুকদাররা যে কোনও প্রপার্টি আর রাখবে না—বেচে দেবে—তা কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে তারা জানিয়েছিল।"

তারাপদ মাথা দোলাল, যেন বুঝতে পেরেছে ব্যাপারটা।

চন্দন বলল, "সার, একটা কথা বলুন। বাড়ি বিক্রির ব্যাপারটা এখানে ক্লিয়ার।

আইনত। তা হলে জ্যাকি কেন বলছে, লাখ টাকা দাদন দেওয়ার পরও সে শুনছে বাড়ি নিয়ে গোলমাল আছে। মানে মালিকানা নিয়ে।”

“আছে খানিকটা। তালুকদারদের বড় মেজো ছোট ছেলের মধ্যে শরিকি গোলমাল। ওটা ওদের নিজেদের মধ্যে। আমার মনে হয়, নিজেদের পাওনাগণ্ডার মিটমাট হলে সমস্যাটা থাকবে না।”

“আচ্ছা!...তা কিকিরা জ্যাকিকে যে বাড়ির মধ্যেটা দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল—সে কে? তালুকদারদের কোন লোক?”

“ম্যানেজারের লোক। নাম তার উপেন। সেও তালুকদার। তবে মালিকদের কেউ নয়। চাকরি করে ম্যানেজারের অফিসে।”

চন্দন ঝট করে বলল, “বেশ, উপেনই হল। কিন্তু ওই বাড়ির একটা বন্ধ ঘরে যে ওই কফিনের বাক্সটাক্স পড়ে ছিল, আপনার ছোট তালুকদার জানত না? কী বলল ছোটকর্তা।”

কিকিরা মাথা নাড়লেন। “বললেন, জানতেন না। বললেন, আমরা কি মশাই, ওসব খবর রাখি! ভেতরে কী আছে জানব কেমন করে। পরে শুনেছি। তবে ও নিয়ে আমরা মাথা ঘামাই না। রাবিশগুলোকে ফেলে দিলেই পারে।”

তারাপদ বলল, “টাকা ছাড়া অন্য কিছু বোঝে না ওরা। বাজে লোক।”

॥ ৫ ॥

দুপুরেই বৃষ্টি নেমেছিল।

আকাশভাঙা বৃষ্টি নয়। দু' পশলা মাঝারি চালের বারিবর্ষণ। রাস্তাঘাট ভিজে থাকল, জল দাঁড়াল না। ‘বারিবর্ষণ’ কথাটা কিকিরাই বলেন, মজা করে। মাঝেসাঝে সংস্কৃত শব্দটব্দর ওপর তাঁর ঝোঁক আগেও দেখা যেত, এখন যেন আরও বেশি হয়েছে। ওঁর ইংলিশ যেমন থাকার তেমনই আছে, কম-বেশি হয়নি, ‘ফিশ ক্যাচিং’ থেকে ‘লেগিং কোয়ারল’। এসব বোঝা যায় কিকিরার, কিন্তু হালফিল চাণক্য শ্লোকের মতন কোত্থেকে এক ছেঁড়াখোঁড়া হলুদপাতার রত্নদেব পন্ডিতের শ্লোকের বই উদ্ধার করেছেন তিনি, আর হুটহাট পাঁজির পাতায় ছাপা দেবদেবীর স্তোত্রপাঠের সংস্কৃতের মতন স্যানসক্রিট আওড়ে যাচ্ছেন। অদ্ভুত মানুষ। কিকিরা যে এতে মজা পান, তারাপদরা জানে। মজা অবশ্য তারাও পায়, তবে সব সময়ে নয়।

কিকিরা বদখত এক কাজের ভার চাপিয়ে দিয়েছিলেন তারাপদদের ওপর। বলেছিলেন, “জ্যাকির চেম্বার বন্ধ হয় আট থেকে সাড়ে আটটার মধ্যে। তোমরা ওই সময়টায় ওর চেম্বারের আশেপাশে হাজির থাকবে। আর দেখবে কে তাকে ফলো করছে। কতদূর পর্যন্ত।”

চন্দন বলেছিল, “জ্যাকি তো নিজেই বলেছে ওকে কেউ ফলো করে। তবে?”

"তবু করবে। নিজের চোখে দেখবে।"

"আমরা কি বুঝতে পারব?"

"খুব পারবে। তোমার আজকাল চোখ পেকে উঠেছে।"

"ফলো করতে গিয়ে যদি ধরা পড়ি! বেপাড়া সার। ধোলাই হয়ে যাব। ওদিকটায় আমাদের শেল্টার নেই।"

"শোন চাঁদু, আমি জ্যাকির কথা অবিশ্বাস করি না। তবু শিওর হতে চাই। জ্যাকি যা বলে তাতে মনে হয়, একজন কেউ রুটিন করে তাকে ফলো করে না। হয়তো ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়ে। বা একই লোক হলে আইডেন্টিফাই করার সুবিধে। আমার মনে হয় কাজটা রোটেশানে হয়। দেখতে হবে বইকী!"

"সার, এই বৃষ্টির দিন, রাত আটটায় আমরা কোথায় গিয়ে মাথা গুঁজে থাকব! দোকানপাট বন্ধ হয়ে যাবে। তেড়ে বৃষ্টি নামলে ভিজে একেবারে নেতিয়ে যাব।"

কিকিরা কান করলেন না কথায়। "নো এক্সকিউজ সার। মনসা চিন্তিতং...."

"প্লিজ......! ঠিক আছে ; বৃষ্টি হলে নো গোয়িং, না হলে গোয়িং।"

কপাল মন্দ চন্দনদের। বৃষ্টি হল, তবে ঝাঁপিয়ে হল না। বিকেলের পর মেঘ সরতে লাগল। আবার জমতে লাগল ছেঁড়া ছেঁড়া ভাবে। টিপটিপ বৃষ্টিও এল, গেল।

তারাপদ আর চন্দন বুদ্ধি খাটিয়ে একটা কাজ করেছিল। চেনা একটি ছেলে আজকাল অটো চালায়, চন্দনের চেষ্টায় তার ভাঙা হাত জোড়া লেগেছিল—পাড়ায় থাকে, চন্দন তাকে বলে রেখেছিল, "এই ভব, আমার একটা কাজ করবি?"

"কী দাদা?"

"একদিন তোর অটো নিয়ে—ধর সাড়ে সাতটা থেকে ঘন্টা দেড়েক আমার হয়ে খাটবি?"

"কী যে বলেন দাদা! এটা কোনও কাজ? কবে চাই অটো?"

"বলব!"

ভব—বা ভবানীর অটো নিয়ে চন্দন আর তারাপদ আজ রাত আটটার আগে আগে জ্যাকির চেম্বারের কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

চন্দন চারপাশ দেখে নিয়ে একটা গলির পাশে বড় রাস্তায় অটো দাঁড় করাল!

"তারা, এই জায়গাটা ভাল। কাছাকাছি দোকানপত্র প্রায় বন্ধ। ওপাশে একটা মিল্ক বুথ। বন্ধ। এপাশে ময়লা-জমানো ভ্যাট। এখানেই....."

তারাপদ বলল, "এখানেই ওয়েট করা যাক। জ্যাকির চেম্বারও সামনে।"

চন্দন আগেই নজর করে দেখেছে, একটা পুরনো বাড়ির দোতলায় জ্যাকির চেম্বার। অনুমান করে নিয়েছে। কিকিরার বর্ণনা মতন মিলে যাচ্ছে বাড়িটা। হাতের ঘড়ি দেখে নিল চন্দন। অটোর ছেলেটাকে বলল, "এই ভব, তুই একটু খুটখাট

করবি। বাই চান্স কেউ যদি ভাড়ার জন্যে আসে বলবি, দেখছেন না গাড়িতে যে প্যাসেঞ্জার আছে তাদেরই বসিয়ে রেখেছি, গাড়ি গন্ডগোল করছে। অন্য গাড়ি দেখুন।"

ভবানী বলল, "দাদা, আপনারা বসে থাকুন। ভাববেন না। কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে..."

"তুই বুঝবি না। আমরা এক বেটাকে ধরব। ছ'মাস আগে ধাপ্পা মেরে হাজারখানেক টাকা ধার নিয়ে পালিয়ে এসেছে। আর ও-মুখো হচ্ছে না। শুনেছি এদিকেই কোথাও আসে রোজ।"

ভবানী বিশ্বাস করল কিনা কে জানে। তবে অটোটাকে নিয়ে ঝামেলায় পড়েছে, এমন ভাব করে বসে থাকল।

তারাপদ নজর করে জায়গাটা দেখছিল। হাতে সিগারেট। রাস্তাঘাট একেবারে ফাঁকা নয়। বৃষ্টির দরুন মানুষজনের চলাচল কম। দোকানপত্র বন্ধ হয়ে যাওয়ায় অন্ধকার জমেছে মাঝে মাঝে! রাস্তার আলো যেমন থাকে ততটাই রয়েছে। শাটার-টানা দোকানগুলো হরেক রকমের, সাইনবোর্ড নজর করলে মনে হয়— এখানে রেডিয়ো স্টোর্স, ফোম গদি, চশমা ঘড়ি থেকে পোশাকআশাক ওষুধপত্র মায় স্টেশনারি— সবরকম দোকানই আছে। গাড়িঘোড়া আপাতত কম।

দেখতে দেখতে আটটা বাজল। সোয়া আট.....। দু' পাশের দোতলা তেতলা পুরনো বাড়িগুলো যেন চুপচাপ হয়ে গিয়েছে। বোধ হয় এসব বাড়িতে পরিবার নিয়ে লোকজন কমই থাকে, বেশিরভাগই হয় অফিস-খুপরি, না হয় দোকানের মালপত্র রাখার গুদাম।

চন্দন হঠাৎ ঠেলা মারল তারাপদকে। "ওই যে—!"

তারাপদ দেখল।

জ্যাকি নীচে নেমে এসেছে। বাড়িটার নীচে ফুটপাথ ঘেঁষে পান সিগারেট ঠাণ্ডি পানির দোকান। জ্যাকির স্কুটার ফুটপাথের ওপর থাকে। পানের দোকানের সামনে। পানঅলার সঙ্গে কথা বলে জ্যাকি কী কিনে পকেটে রাখল। তারপর হেলমেট মাথায় চাপাল।

চন্দন ভবানীকে খোঁচা মারল। "বি রেডি। তৈরি হ'।"

ভবানী তৈরি।

"একটু দাঁড়া, ওই স্কুটারটা এগিয়ে যাক খানিক, তারপর তোকে বলব...."

জ্যাকি স্কুটারে স্টার্ট দিয়ে পঞ্চাশ গজ মতন এগুতে না এগুতেই কোন গলির অন্ধকার থেকে আরও একটা স্কুটার বেরিয়ে এল। লোকটাকে বোঝা যাচ্ছে না। গায়ে পলিথিন রেনকোট, মাথায় হেলমেট পরেনি, ফেল্ট হ্যাটের মতন সস্তা বর্ষাতি টুপি। মুখ মাথা দেখা যায় না। এমন টুপি হরদম দেখা যায় চাঁদনির ফুটপাথে। বর্ষাকালেই বেশি।

লোকটা জ্যাকির পিছু পিছু এগুতে লাগল। সামান্য দূরত্ব রেখে।

চন্দন ভবানীকে বলল, "নে, ওদের পেছন পেছন চল। ফলো করবি। এগিয়ে যাবি না।"

ভবানী প্রথমটায় অবাক হয়েছিল, পরে অটোতে স্টার্ট দিল।

সোজা রাস্তা। একটা মোড় বাঁদিকে। পরে ছোট রাস্তা। বৃষ্টি পড়ছে ঝিরঝির করে। মেঘও ডাকল।

"জ্যাকি বুঝতে পেরেছে," তারাপদ বলল, "একবার ঘাড় ঘোরাল। ও জানে ওকে কেউ ফলো করছে।"

"হ্যাঁ। স্পিড বাড়িয়ে দিয়েছে গাড়ির।"

"লোকটাও বাড়াবে—।"

ভবানী বলল, "দাদা আর একটু কাছাকাছি যাব?"

"না।"

বলতে না বলতেই জ্যাকি চট করে একটা গলির মধ্যে ঢুকে গেল। অদৃশ্য। লোকটাও চতুর। কয়েক মুহূর্ত থতমত খেয়ে সেও গলির মধ্যে ঢুকে পড়ল।

চন্দনদের অটো গলির মুখে এসে দাঁড়াল।

হঠাৎ শব্দ। এত আচমকা, অপ্রত্যাশিত যে চন্দনরা চমকে গেল। এ তো গুলির আওয়াজ। কলকাতা শহরে আজকাল কে আর বোমা পটকা গুলির আওয়াজ না শোনে কানে।

তারাপদ ঘাবড়ে গেল।

ভবানীও থতমত খেয়ে গিয়েছে। ভয়ও পেয়েছে।

চন্দন এক মুহূর্ত ভাবল, তারপর ভবানীকে বলল, "গলির মধ্যে ঢুকিস না।"

ভবানী বলল, "দাদা, আর এগুলেই বিপদে পড়ব। এদিকে অন্য কোনও গাড়ি নেই। পুলিশ ঢুকে পড়লে আমাদের ধরবে।"

চন্দন জানে। গলির মধ্যে কে কাকে গুলি করেছে—সেটা পরের কথা, কিন্তু কেউ যদি অটোটাকে ঢুকতে দেখে ধরে নেবে অটো থেকেই.....। ব্যস্ত হয়ে চন্দন বলল, "না, যাবি না। ঘুরিয়ে নে মুখ। পালা....।"

ভবানী আগেই অটোর মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে।

পালিয়ে এসে ভীত গলায় তারাপদ বলল, "কী হল, বল তো?"

"জানি না।"

"গুলি চালিয়ে দিল? জ্যাকিকে মারতে চেয়েছে। জ্যাকির কী হল—? আমার ভয় করছে চাঁদু।"

চন্দন বলল, "বুঝতে পারছি না। জ্যাকিই যদি গুলি চালায়।"

"জ্যাকি?"

"ওকে রোজ ফলো করছে দেখে আজ নিজেই ফাঁদ পেতে লোকটাকে যদি গলিঘুঁজি ঘুরিয়ে বেজায়গায় নিয়ে গিয়ে গুলি করে।....আমরা ওদিককার কিছুই

জানি না।”

তারাপদ ধাঁধার মধ্যে থাকল ; বুঝতে পারছিল না, কী হল, কী হতে পারে।

নিজেদের এলাকায় এসে চন্দন অটোর ছেলেটাকে ছেড়ে দিল। সে বেচারি রীতিমতন ঘাবড়ে গিয়েছিল। চন্দনের কথা মতন সে একটা স্কুটারের পিছু পিছু যাচ্ছিল। লোকটা কে সে জানে না। তা জানুক বা না-জানুক, গুলি চলাচলির সময় গলিটার মধ্যে ঢুকে পড়লে বিপদ হত। পুলিশ এসে ধরবার আগেই যদি পাড়ার লোক এসে পড়ত গলিতে, ভবানীদের আর বেঁচে ফিরতে হত না, পিটিয়ে শেষ করে দিত।

ভবানীকে ছেড়ে দিয়ে চন্দন বলল, “কিছু মনে করিস না, আমি নিজেও জানতাম না এমন হবে! তোকে বিপদে পড়তে হবে জানলে কি ডাকতাম তোকে! যাক, শেষ পর্যন্ত কিছু হয়নি। বাড়ি যা এবার। আজকের কথা কাউকে বলিস না।”

“আপনারা জ্যাকি জ্যাকি বলছিলেন, কে সে?”

চন্দন একবার তারাপদকে দেখল। নামটা ভবানীর কানে গিয়েছে। কথা লুকিয়ে লাভ নেই। চন্দন বলল, “যে-লোকটার স্কুটার আগে ছিল সে জ্যাকি।”

“পরের লোকটা?”

“জানি না। তাকেই ফলো করছিলাম।...যা তুই বাড়ি চলে যা। আমরা পরে যাব।”

ভবানী চলে গেল।

তারাপদ আর চন্দন ঝিরঝিরে বৃষ্টির মধ্যে বসার মতন জায়গা খুঁজছিল। মামুলি একটা চায়ের দোকান তখনও খোলা। একটু পরেই বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

দোকানে এসে বসল দু'জনে। “দু' কাপ চা।”

তারাপদ সিগারেট খুঁজল।

“তারা?”

“উঁ!”

“কী হল বল তো? কে কাকে গুলি করল? যদি ওই লোকটাই জ্যাকিকে গুলি করে থাকে! হতেও তো পারে।” চন্দন নিচু গলায় বলল, যেন কারও কানে না যায় কথাটা।

তারাপদ সিগারেট ধরিয়েছিল। ধোঁয়া গিলে বলল, “হতেই পারে। হয় এ, না হয় ও!”

“জ্যাকি যদি ইনজিওরড হয়...! বেজায়গায় লাগলে সর্বনাশ...!”

“আমরা কোনও চিৎকার শুনিনি।”

“গলির বাইরে ছিলাম। শুনতে পাইনি হয়তো। পালিয়েও এলাম সঙ্গে সঙ্গে। তবু তুই যা বলছিস— ঠিকই। চিৎকার শুনিনি।”

তারাপদ কথা বলল না। চুপচাপ।

চা এল।

চায়ে চুমুক দিয়ে চন্দন বলল, "তুই কাল সকালেই একবার কিকিরার কাছে যা। ব্যাপারটা জানিয়ে আয়।"

"আমার অফিস।"

"সকাল সকাল যাবি। ফিরে এসে চান-খাওয়া করবি। .....ও হয়ে যাবে।"

"তুই?"

"আমি বিকেলে কিকিরার বাড়িতে হাজির থাকব।"

তারপদ মাথা হেলিয়ে জানাল, কাল সকালেই সে কিকিরার বাড়ি যাবে।

"নে, চা শেষ কর তাড়াতাড়ি। আজ রাতে আমার ঘুম গেল! জ্যাকি যদি ফট্ হয়ে যায়... কী জানি, বুলেট ইনজুরি হল অনেকটা লাক, হাতে পায়ে কাঁধে লাগলে রক্ষে, মাথায় আর বুকে লাগলে..."

"জ্যাকির মাথায় হেলমেট ছিল..."

"মে গড সেভ হিম।"

চা শেষ করে উঠে পড়ল দু'জনে।

সাত সকালে তারাপদ কিকিরার বাড়িতে হাজির।

কিকিরা অবাক হয়ে বললেন, "এ কী! তুমি! কী ব্যাপার তারাচাঁদবাবু!"

ঠাট্টার সময় এখন নয়। তারাপদ গম্ভীর হয়ে বলল, "আপনার ভাইপো বেঁচে আছে , না, হাসপাতালে— খোঁজ নিন আগে।"

"কেন, কেন?"

তারাপদ গতকালের ঘটনা বলল বিস্তারিত ভাবে।

কিকিরা হকচকিয়ে গেলেন। "বলো কী! এতদিন তো গুলিবন্দুক আমদানি হয়নি। এবার তাও হল...।"

"আগে আপনি খোঁজ নিন।"

"নিচ্ছি।"

"চাঁদু ও-বেলা আসবে। আমার আসতে আসতে ছ'টা। তার আগে পারব না। অফিসে আজ অনেক কাজ...।" তারাপদ বেশিক্ষণ বসল না। চা খেয়েই চলে গেল।

॥ ৬ ॥

কিকিরার ঘরে বসেই আলোচনা হচ্ছিল।

জ্যাকির খোঁজ সকালেই নিয়েছেন কিকিরা। না, জ্যাকির কিছু হয়নি; সে ঠিকই আছে।

তা হলে গুলি?

গুলির রহস্যটা অদ্ভুতই বলতে হবে। কিকিরা যেমনটি শুনেছেন জ্যাকির

কাছে, তারাপদদের বললেন।

আসলে যে-বাড়িতে জ্যাকির চেম্বার, সেই বাড়ির অন্য খুপরিগুলোয় আরও চার-পাঁচজনের ছোট ছোট অফিস আছে। কারও এজেন্সি অফিস, কারও বা এক্সপোর্ট সার্ভিস অফিস। ইনকাম ট্যাক্সের দুই উকিলও একটা ঘরে ভাগাভাগি করে বসে বিকেলবেলায়। এ ছাড়া হালে এক ফিনান্স কর্পোরেশানের কোনও কর্তা একটা ঘর দখল করে বসে আছেন। সেখানে প্রায়ই লোকজন আসে, তারা নাকি ফিল্ড ওয়ার্কার। জ্যাকির এই চেম্বার তার বাবার আমলের। বাড়িটার নীচে যার পানের দোকান সে বেশ চালাক চতুর। নাম রামশঙ্কর, বছর চল্লিশ বয়েস। জ্যাকির সঙ্গে রামশঙ্করের বরাবরই খাতির। দোকানের গায়ে একপাশে ফুটপাথে স্কুটার রাখে জ্যাকি। পানওলা রাম নজরদারি করে স্কুটারের। ইদানীং সে জ্যাকির কথামতন আরও একটা জিনিসের ওপর লক্ষ রাখছে।

তারাপদ বলল, "বুঝেছি। সে ওয়াচ করছে জ্যাকি চেম্বার ছেড়ে বেরনোর পর অন্য কেউ তাকে ফলো করছে কিনা!"

"ধরেছ ঠিক।" কিকিরা বললেন, "পানঅলার পজিশানটা ভাল, এ-পাশ ও-পাশ নজর রাখতে পারে। যে-কোনও গলি থেকে ফট করে বেরিয়ে এল— দেখতে তার অসুবিধে হয় না।"

"ভাল ব্যবস্থা, সার।"

"কাল যখন জ্যাকি চেম্বার ছেড়ে চলে আসছে, তখন রামশঙ্করকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারল, রুটিন পালটে গিয়েছে। অন্য দিন একজন কেউ পিছু নেয়, আজ আরও একটা দল আছে।"

"মানে?"

"একটা অটো অনেকক্ষণ থেকে তফাতে— মিল্ক বুথের কাছে দাঁড়িয়ে আছে।"

তারাপদ চন্দন মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। থমকে গিয়ে বলল, "বলেন কী? আমাদেরও দেখেছিল!"

কিকিরা বললেন, "জ্যাকি জেনেশুনেই কাল খানিকটা ঘুরপথে এ-গলি ও-গলিতে ঢুকে পিছু-নেওয়া লোকগুলোকে মিসলিড করেছিল।"

চন্দন বলল, "যা বাব্বা! আমরাও সাসপেক্ট হয়ে গেলাম।"

"তা ওর দোষ কী! ও কেমন করে জানবে— তোমরা অটোয় চেপে বসে আছ?"

তারাপদ বলল, "রাম সে রাম! কেচ্ছা! ... কিন্তু গুলি।"

"গুলির শব্দ সেও শুনেছে। শুনে তার ধাঁধা লেগে গিয়েছিল। আগে এরকম হয়নি। ভয় পেয়ে কাছাকাছি গলিতে ঢুকে পড়ে পালিয়ে এসেছে।"

চন্দন হাঁ করে কিকিরার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল কয়েক পলক। তারপর বলল, "গুলিটা কে করল, সার?"

"সিম্‌পিল ব্যাপার হে। ভেরি ইজি কোশ্চেন। তোমরা গুলি চালাওনি, জানোই না গুলি চালাতে ; জ্যাকি নিজের খুলি নিজে ওড়াবে না ; তা হলে রইল ওই থার্ড পার্টি— মানে, দ্য আদার ম্যান— যে স্কুটারে চড়ে জ্যাকিকে ফলো করছিল। সহজ বুদ্ধি তো তাই বলে।"

তারাপদ অনেকটা যেন স্বস্তি পেয়েছে ; বলল, "আমরা জোর বেঁচে গিয়েছি।"

চন্দন বলল, "লোকটা জ্যাকিকে ঘায়েল করার চেষ্টা করেছিল। এ তো কিলিং, সার। খুনের চেষ্টা।"

মাথা হেলিয়ে কিকিরা বললেন, "তাই মনে হয়। হওয়া স্বাভাবিক। তবে যদি এমন হয়, লোকটা বুঝতে পেরেছিল তোমরা অটো নিয়ে তাকে ফলো করছ— বুঝে তোমাদের তাড়াবার জন্যে, ঘাবড়ে দেওয়ার জন্যে ফাঁকা গুলি চালিয়েছিল— তা হলে সার কী বলবে। বে-আন্দাজ গুলি।"

চন্দন আর তারাপদ চুপ। কী বলবে! কিকিরা যা বলছেন— তাও হতে পারে। আবার নাও পারে।

"জ্যাকিকে আপনি বলেছেন— অটোতে আমরা ছিলাম।"

"বলেছি।... সে বলল, এভাবে ওদের পাঠাবেন না, অ্যাঙ্কল! আমার লাইফের রিস্ক আমার, ওরা কেন বিপদে পড়বে!"

তারাপদ সঙ্গে সঙ্গে বলল, "কিকিরা, আমরা নবিশ লোক। গুলি গোলার মধ্যে নেই। আর ও-পথ মাড়াচ্ছি না।"

কিকিরা হাসলেন।

আজ বৃষ্টি নেই। সকাল থেকেই খটখটে দিন। চড়া রোদ উঠেছিল ও-বেলায়, স্যাঁতসেঁতে বাড়িঘর খানিকটা শুকিয়ে গেছে এক বেলার রোদে। এখন শুক্লপক্ষ।

সবে শুরু। বাইরে চাঁদের আলো বোঝা যায় না। এরই মধ্যে একটা কিছু ঘটল রাস্তায়। চেঁচামেচি হইরই। নীচে রাস্তায় এমন হট্টগোল প্রায়ই হয় এখানে। চন্দন একবার দেখে নেওয়ার চেষ্টা করল। ট্যাক্সি ভার্সেস প্রাইভেট গাড়ি। ধাক্কাধাক্কির ব্যাপার।

বগলা একবার ঘরে এসেছিল। এঁটো প্লেট কাপ ডিশ তুলে নিয়ে চলে গিয়েছে।

তারাপদই কথা বলল খানিকটা সময় চুপচাপ থাকার পর। বলল, "কিকিরা, আপনার জ্যাকিকে বলুন না এসব ঝুট-ঝামেলা থেকে সরে দাঁড়াতে। যে-টাকা সে দিয়ে ফেলেছে দাদন হিসেবে— সেটা বরং ফেরত নেওয়ার চেষ্টা করুক।"

কিকিরার গলার অবস্থা এখন ভাল। সর্দি কাশি ফ্লুয়ের ভাব কবেই কেটে গিয়েছে। নিজের মনে কী ভাবছিলেন। অন্যমনস্কভাবেই নিজস্ব চুরুট ধরালেন একটা, সরু আঙুলের মতন চুরুট। "কী বললে?"

"বললাম, জ্যাকিকে ব্যাক করতে বলুন।"

"নতুন কথা কী বললে তারা! এ-কথা তো প্রথম থেকেই তার মা কাকা বলছে। কিন্তু সে ব্যাক করবে না।"

"কেন?"

"খানিকটা জেদ। কেনই বা করবে! কেউ যদি বলে পোড়োবাড়ি মানেই ভূতের বাড়ি, হানাবাড়ি— তাই শুনে কি সবাই হাত গুটিয়ে নেয়!"

"এটা অন্যরকম কেস! জ্যাকির লাইফ রিস্ক হয়ে যাচ্ছে।"

"তা হচ্ছে।"

"তা হলে?"

কিকিরা কোনও জবাব দেওয়ার আগে চন্দন বলল, "কিকিরা, আপনি আমি— আমরা সবাই বুঝতে পারছি, বাড়িটা পোড়োই হোক আর যাই হোক, এমন কেউ বা কারা আছে যারা জ্যাকিকে বাড়িটার মালিক হতে দিতে চায় না। তাদের মোটিভ ক্লিয়ার, ওই বাড়ি তুমি কিনতে পারবে না...! ঠিক কি না!"

কিকিরা বললেন, "কোনও ভুল নেই কথায়। দুয়ে দুয়ে চার, সহজ অঙ্ক।"

"তবে কেন—?"

বাধা দিলেন কিকিরা। বললেন, "এটা কি মগের মুলুক। আমি টাকা দিয়ে বাড়ি কিনব, তুমি কিনতে দেবে না! হু আর ইউ? তোমার লিগাল অথারিটি কী আছে মশাই! ... আর তোমার নিজেরই যদি কেনার ইচ্ছে থাকত— আগে কেন কিনলে না? বাড়ি তো পড়েই ছিল। তখন কেন নাকে তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছিলে! আর আজ আমি যখন কিনতে যাচ্ছি, তুমি আমায় শাসাতে ভয় দেখাতে শুরু করেছ! ..."

কথাটা ঠিকই। তুমি কেন ভয় দেখাবে।

সামান্য উত্তেজিত হয়ে উঠলেন কিকিরা। "না, চাঁদু— ব্যাপারটা অত সোজা অঙ্ক সত্যিই নয়। হ্যাঁ, জ্যাকি যেন বাড়িটার মালিকানা না পায় এটা তার বিপক্ষের লোকদের মোটিভ অবশ্যই। কিন্তু কেন? কী আছে ওই বাড়িতে? ভাঙা ইট সুরকি কাঠ কড়ি বরগার জন্যে ঘুম হবে না তাদের— তা হতে পারে না। কলকাতায় ভাঙা বাড়ির অভাব নেই, সেখানে গিয়ে ইট কাঠ কিনতেই পারে তারা। এ-বাড়িতে তার অনেক বেশি— অ-নেক বেশি কিছু থাকতে পারে। সেটা কী?"

চন্দন কিকিরার মুখ দেখছিল। ওঁরও যেন জেদ ধরেছে। তারাপদর দিকে মুখ ফেরাল চন্দন।

তারাপদ বলল, "কী সেটা, আমরা কেমন করে জানব, সার! আপনিই বলুন।"

কিকিরা মাথা নাড়ালেন। "এখন বলতে পারছি না। খোঁজখবর নিচ্ছি। তবে একটা কথা মাথায় রাখবে—, তেরো নম্বর বাড়ির ওই ঘরটা— কালো বাক্স আর কফিন... ওরই সঙ্গে রহস্যটা জড়িয়ে আছে। তবে কালো বাক্সটা দেখে আমার মনে হল হ্যারিশ ওর মধ্যে কাজের জিনিসপত্র রেখেছিল।

চন্দন রুমাল বার করে মুখ মুছল। চকচকে চোখ। বলল, "আপনি জানতে পারলেন কিছু?"

কিকিরা প্রথমে চুপচাপ থাকলেন। পরে বললেন, "আমি আপ্রাণ চেষ্টা করছি। মুশকিল হল, পাড়াটা আমার অজানা, মানে ওদিকে আমার চেনাজানা লোক কেউ

নেই। চেলাও নেই। শেষে খুঁজে খুঁজে একজনকে পেলাম— পাড়ার কাছাকাছি লাগোয়া পাড়ায় থাকে। ছেনু গুণ্ডা...”

“ছেনু গুণ্ডা!”

“ভাল নাম শ্রীদাম বা ছিদাম। ওরফে কালু, ওরফে টিকিয়া, ওরফে হাতকাটা ছেনু। ছেনুর কেরিয়ার বলো আর বায়োডাটা বলো— খারাপ নয়। তিনবার জেল, মার্ডার কেসের আসামি হয়নি একবারও, তবে দাঙ্গা মারামারি, লুঠ, চোরাই পিস্তল বিক্রি, বোমাবাজি— এসব তার কোয়ালিফিকেশনের মধ্যে আছে...”

তারাপদ হাততালি দিয়ে বলল, “বাঃ—বাঃ, আপনি তবে ছেনু গুণ্ডার গডফাদার?”

“গ্র্যান্ডফাদারও বলতে পারো,” কিকিরা ঠাট্টার গলায় বললেন, “এটা অবশ্য সে গ্র্যান্ড নয়, গ্র্যান্ড হোটেলের গ্র্যান্ডের মতন...”

চন্দন হেসে ফেলল।

কিকিরা বললেন, “তোমরা ছোটখাটো চোর ছ্যাঁচড় গুন্ডাদের যতটা ঘেন্নাপিত্তি করো, বিগদের বেলায় তা করো না—! বিগদের বেলায় মিস্টার, রেসপেক্টেড সার...! তা সে যাই হোক, ছেনো বা ছেনু এখন জেন্টলম্যান। রেস্তরাঁ লাগিয়ে দিয়েছে। প্লাস এন্টালি বাজারে মাছের একটা স্টল। ছেনুর গোঁফ পেকে সাদা, মাথার চুলও টুয়েলভ আনা হোয়াইট। ধবধবে সাদা জামা পরে বসে থাকে তার রেস্তরাঁয়। পরনে ধুতি। দেখলে তোমাদের মনে হবে ধর্মপুত্তুর। বেচারির বাঁ-হাতের আধখানা কাটা।... ইয়ে— মানে এরা হল আগের জেনারেশানের হিরো। এখন লস্ট। ওরা গজরাত বেশি, বর্ষণ তত হত না।”

চন্দন বলল, “জোক রাখুন! কী বলল ছেনু?”

“ছেনু কিছু বলেনি। সে দিন দুয়েক সময় চাইল। তারপর আমাকে এক বুড়োর কাছে নিয়ে গেল। বুড়ো একসময় কলকাতা কর্পোরেশানে কাজ করতেন। নেপালচন্দ্র সাধুখাঁ। নেপালবাবুর বয়েস এখন সত্তরের কাছাকাছি। থিন এরারুট বিস্কুটের মতন গায়ের রং এবং পাতলা চেহারা। উনি ঠিক হায়দার লেনের বাসিন্দে নন ; এলাকাটা নাগালের মধ্যে। তার চেয়েও বড় কথা— কর্পোরেশানে অ্যাসেসমেন্ট ডিপার্টমেন্টে কাজ করার সময় ওঁর নজরদারিতে ছিল জায়গাটা...”

“মানে?”

“মানে নেপালবাবুর এক্তিয়ারের মধ্যে ছিল পাড়াটা। তিনি খোঁজখবর রাখতেন ওদিককার। তা ছাড়া ভদ্রলোকের জ্ঞানচর্চায় মতি আছে শুনলাম, একটু ন্যাক।”

চন্দন, তারাপদ প্রায় একই সঙ্গে বলল, “তেরো নম্বর বাড়িটা চিনতেন উনি?”

চুরুট টানতে টানতে কিকিরা বললেন, “চেনারই কথা। অসুবিধে কী জানো হে, ভদ্রলোকের একে বয়েস হয়েছে, তাতে পেটরোগা মানুষ। কে যে তাঁকে এক গুলি আফিং খাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিল পেটের জন্যে, ফলে বুড়ো সন্ধেবেলায় একটু মৌতাতে থাকেন।”

“তা থাকুন, আসল কথা কী বললেন?”

“বললেন, ওই বাড়িটা নিয়ে একটা গপ্প চালু আছে। এমন গপ্প কত বাড়ি নিয়েই থাকে। শ’ সোয়া শ’ বছর আগে ওই এলাকা ছিল প্রায় অস্পৃশ্য। লোকজন ঘেঁষত না। পরে দু’-চারটে করে ঘরবাড়ি হতে হতে রাজা পঞ্চম জর্জের আমল নাগাদ ফ্যান্সি পাড়া হয়ে উঠল। অ্যাংলো সাহেবদেরই আস্তানা। তারপর বিশ-পঁচিশ বছর পরে জমে উঠল জায়গাটা। আর যুদ্ধের পর তো রথের মেলা। হালের তিরিশ-চল্লিশ বছরে ওখানে যত্রতত্র যার যেমন খুশি পায়রার খুপরি করে হরেকরকম লোক থাকে...”

“তেরো নম্বর বাড়ির কী হল?” তারাপদ বলল।

কিকিরা বললেন, “নেপালবাবুর কথা যদি মানতে হয় তবে বলতে হবে— এক পর্তুগিজ সাহেব একদা ওই বাড়িতে সংসার পেতেছিলেন। স্ত্রী, মেয়ে আর তিনি। উনি নাকি আফ্রিকা থেকে এ-দেশের কালিকট পর্যন্ত জাহাজি কাজ করেছেন। পরে এখানে। সাহেব কলকাতা শহরে একটা বেকারি চালু করেন। নিজেই মালিক। সাহেবি বাড়িতে তাঁর বেকারির পাঁউরুটি কেকটেকের বিক্রিবাটা ছিল ভালই।”

চন্দন বলল, “তার মানে বেকারি করে ফেঁপে উঠেছিলেন!”

“হতে পারে দুটো পয়সা হয়েছিল। কিন্তু কপাল মন্দ সাহেবের। কলকাতায় বেরিবেরি ধরনের কী-এক রোগ লাগল। তাতেই মারা গেল স্ত্রী আর মেয়ে।”

“আর সাহেব?”

“ক’ বছরের মধ্যে তিনিও কবরের মধ্যে।... এই দেখো একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছি। সাহেব রীতিমতন গোঁড়া খ্রিস্টভক্ত ছিলেন।”

“কলকাতায় একটা পর্তুগিজ চার্চ আছে না?”

“তা থাকুক। ওর হিস্ট্রি আমি বাবা জানি নে। কলকাতায় কী না আছে! আর্মেনি গির্জাও আছে। কত সাহেবসুবো এল গেল বাপু! তা পর্তুগিজ সাহেবরা এখানে কী ব্যবসা বাণিজ্য করত, কতই বা নিজেদের লোক ছিল— তাও বলতে পারব না। সহজ কথাটা হল এই যে, ওই সাহেবের কাছে নাকি বিখ্যাত পাদরি পেইজ-এর (Paiz) একটা ক্রশ ছিল। অমূল্য সম্পদ।”

“ক্রশ?”

“নেপালবাবু বললেন, তিনি তাই শুনেছেন। আধ হাতটাক লম্বা। সোনা দিয়ে তৈরি। ক্রসের ওপর হিরে পান্না চুনির কাজ...। রকমারি দামি পাথরের।”

“সাহেব ওটি পেলেন কেমন করে?”

“কেউ বলে আফ্রিকা থেকে চুরি করেছিলেন। অ্যাবিসিনিয়ার চার্চ থেকে। কেউ বলে লিসবনের কোনও চার্চ থেকে।... তা এ তো সব গল্প হে। সত্যিমিথ্যে কেউ জানে না। জোর করে বলতে পারবে না।”

“গল্পটা আপনি নেপালবাবুর মুখে শুনলেন?”

"তা ছাড়া কার কাছ থেকে শুনব! আমার চৌদ্দপুরুষও জানে না এমনি সাহেব আর পর্তুগিজ সাহেবদের মধ্যে তফাতটা কোথায়! আমাদের চোখে সব সাহেবই সাহেব। ভাগ্যিস ছেলেবেলায় ইতিহাস বইয়ে ভাস্কো দ্যা গামার নাম পড়েছিলাম, নয়তো পর্তুগিজ যে কারা তাও জানতাম না।"

তারাপদ বলল, "সেই ক্রশের কী হল? যদি সত্যিই সেটা থেকে থাকে!"

কিকিরা এবার রহস্য করে বললেন, "শোনা যায়, মানে নেপালবাবু শুনেছেন— সেটি ওই তেরো নম্বর বাড়ির মাটির তলায় কোথাও পোঁতা আছে।"

তারাপদরা যেন খানিকটা চমকে উঠল। চন্দনের চোখে চোখ রাখল সে। যেন বলতে চাইল, কী বুঝছিস রে! চন্দনও ইতস্তত করছিল।

"সার, এটা কি আফিংখোরের গপ্প?" চন্দনই বলল শেষে।

মাথা নাড়লেন কিকিরা। "পরমেশ্বরই জানেন।"

"আবার পরমেশ্বর কেন! ...আপনি আর কী জানেন? মানে নেপাল সমাচার?"

"এই তো তোমাদের দোষ! বিশ্বাসও করবে না, আবার জোক করবে?"

"বাড়িটার কী হল তারপর? পর্তুগিজ সাহেব মারা যাওয়ার পর?"

"হাত বদল আর জাত বদল! সবই ওদের জাতভাইদের মধ্যে। তবে ওরা আর পর্তুগিজ নয়। দু'-তিন দফা হাত বদলের পর এল পাগলা হ্যারিশের হাতে।"

"হোয়াই পাগলা হ্যারিশ?"

"লোকে তাই বলত।"

"কী করত পাগলা হ্যারিশ?"

"কফিন মেকার। কফিন তৈরি করত।"

"কী?"

"কফিনের বাক্স তৈরি করত। অর্ডিনারি কফিন বাক্স থেকে দামি কফিন বাক্স পর্যন্ত। ওহে তারাবাবু, আমাদের যেমন তিলকাঞ্চন থেকে বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ পর্যন্ত রয়েছে, গরিব বড়লোক মানুষ যে যেমনটি চায় করে, ওনারাও তেমন বারোয়ারি থেকে মনোহারি— যার যেমনটি ইচ্ছে কফিন বাক্সটি পছন্দ করে নেন।"

"বাঃ! কোন সিনেমায় যেন দেখেছিলাম... রাজকীয় এক বাক্স তৈরি হচ্ছে।"

"দেখতে পারো। আমার বেলায় হিন্দু সৎকার সমিতির ব্যবস্থা করবে! জলের দরে ভাড়া পাবে—!"

"আপনার তামাশা রাখুন! আর কোনও কিছু শুনলেন না?"

"শুনলাম," কিকিরা বললেন, "পাগলা হ্যারিশ নাকি নিজের জন্যে একটা কফিন বাক্স তৈরি করেছিল। অ্যাডভান্স ব্যবস্থা...!"

চন্দন অবাক! কিকিরাকে দেখছিল। বলল, "মানে?... আমরা যে কফিন বাক্সটা দেখেছি ঘরে, সেটা কি তবে পাগলা হ্যারিশের?"

"খুব সম্ভব।"

"কিন্তু সেটা তো ঘরেই পড়ে আছে, কবরখানায় যায়নি।"

"না। যায়নি, কেননা যারা তার কবরের ব্যবস্থা করেছিল তখন— তারা হয়তো জানত না যে হ্যারিশের বাড়িতেই তার নিজের হাতে তৈরি করা কফিন বাক্স পড়ে আছে!... তোমরা ভুলে যাচ্ছ পাগলা হ্যারিশ দাতব্য হাসপাতালে মারা যাওয়ার পর— যারা তার শেষকৃত্য করেছে তারা ওদেরই একটা ছোটখাটো প্রতিষ্ঠান। দয়াধর্ম করাই তাদের কাজ। ওদের কি এসব জানার কথা!"

তারাপদ বলল, "আপনি আবার কথা বলছেন, সার! যে-লোক মারা যাওয়ার আগে নিজের নাম ঠিকানা পরিচয় জানিয়ে যেতে পারল, সে তার মনের শেষ ইচ্ছেটা জানিয়ে যাবে না?"

চন্দন মাথা নাড়ল। "ঠিক কথা। তালুকদার আপনাকে এ-ব্যাপারে কিছু জানায়নি? সে তো হ্যারিশকে আইডেনটিফাই করতে গিয়েছিল!"

কিকিরা একটা শব্দ করলেন। যেন হতাশ হয়েছেন চন্দনদের কথা শুনে। বললেন, "তোমরা বেলাইনে যাচ্ছ। প্রথম কথা, হ্যারিশ মর্টগেজ মামলায় বাড়িটা খুইয়েছিল। তারপর পালিয়ে যায়, বা খেপাটে হয়ে যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়ায়। কেউ তার খোঁজ পায়নি। পরে ওদেরই একটা চ্যারিটেবল হাসপাতালে এসে আশ্রয় নেয়। সব কথা বলার মতন অবস্থা ওর হয়তো ছিল না। তা ছাড়া তালুকদাররা নিজেরা হাসপাতালে যাবেন কেন ডেডবডি শনাক্ত করতে, তাঁদের লোক গিয়েছিল।... আর বাপু, মানুষের আয়ুর কথা, হ্যারিশ শেষ সময়ে কতটা বলতে পেরেছে, তার সাধ্য ছিল— কে বলবে! হতে পারে তার ক্ষমতায় কুলোয়নি।"

আপত্তি করা যাক বা না যাক তারাপদরা চুপ করে থাকল।

নিজেই একসময় বললেন কিকিরা, "তবে এসব তো গল্প! শোনা কথা। পাগলা হ্যারিশ সাহেবকে নিয়ে ওদের মহল্লায় গল্পটা চাউর হয়ে থাকতে পারে। নিজেই হয়তো কাউকে ঠাট্টা করে বলেছিল সাহেব।"

তারাপদ বাধা দিয়ে বলল, "সে যাই হোক, ওই বাড়ির একটা ঘরে সত্যিই তো কফিন বাক্স আছে একটা।"

"হ্যাঁ।"

"এর কী উত্তর হতে পারে?"

"ভাবছি!"

"একটা কালো ট্রাঙ্কও ছিল, আছে এখনও—। আপনার কথায় হ্যারিশের কাজের বাক্স।"

"কে অস্বীকার করবে হে! আমরা স্বচক্ষে দেখলাম..."

"আপনার জ্যাকি কি হ্যারিশ সাহেবের সব কথা জানে?"

"কিছু জানে নিশ্চয়ই, তবে ওই যে ফাদার পেইজ, কিংবা সোনার ক্রশ, গায়ে মণিমুক্তো বসানো— এসব গল্প বোধ হয় জানে না। জানার কথাও নয়। আমি আফিংখোর বুড়ো নেপালবাবুর মুখে শুনেছি। গল্পটা তাঁরও শোনা।"

"আপনি বলছেন নেপালবাবুর বয়েস সত্তরের মতন ; তিনি সেই আদ্যিকালের কলকাতার কথা জানবেন কেমন করে? কোনও চালু কাহিনী শুনেছেন বোধ হয়।"

চুরুট ফেলে রেখে মাথার চুল ঘাঁটতে ঘাঁটতে কিকিরা দ্বিধার গলায় বললেন, "সে তো আগেই বলেছি। এই কলকাতা শহরের কত কিছু নিয়েই বানানো গপ্প চালু আছে। আবার আসল-ভেজাল মেশানো গপ্পও আছে। নেপালবাবুর স্টোরিটাকে তুমি আমি না মানতে পারি। কিন্তু একটা কথা মানতেই হবে ভদ্রলোক যে শুধু কর্পোরেশানের অ্যাসেস ডিপার্টমেন্টে এককালে কাজ করতেন— শুধু তা নয়— ওঁর আবার পুরনো কাগজপত্র ঘাঁটা বইপত্র পড়ার শখ ছিল। পাদরি পেইজ নামটা বইয়ে পাওয়া যায়। আফ্রিকায় ছিলেন পাদরি সাহেব। আর উনি বললেন, আজ আমরা সোনা সোনা করে কেঁদে মরি, কিন্তু তিন-চারশো বছর আগে ওইসব পর্তুগিজ স্প্যানিয়ার্ড ডাচরা বাইরে বেরিয়েছে জাহাজ নিয়ে নতুন নতুন দেশ খুঁজতে, ব্যবসা বাণিজ্যের ব্যবস্থা দেখতে— আর এরা যেমন মরেছে জলে ডাঙায়, তেমনই আবার কোথাও পা রাখতে পারলে মাটি গেড়ে বসার চেষ্টা করছে, খুনোখুনি রক্তপাত করেছে— সেইভাবে তাল তাল সোনা মুঠো মুঠো মণিমুক্তো নিয়ে নিজেদের দেশে পালিয়ে গিয়েছে..."

তারাপদ জোরে হেসে উঠল। ঠাট্টার গলায় বলল, "কিকিরা সার, আপনি কি মাস্টারি করতেন একসময়?"

কিকিরাও হেসে ফেললেন। বললেন, "না বাপু, পৃথিবীতে দুটো জিনিসকে আমি ভীষণ ভয় পাই। নাম্বার ওয়ান, মাস্টারি ; নাম্বার টু স্নেক প্লেয়িং—!"

"স্নেক প্লেয়িং—!" চন্দন অবাক ; বুঝল না।

কিকিরা ঘাড় দুলিয়ে বললেন, রসিকতার গলায়, "সাপ খেলানো। সাপুড়েদের আমার ভীষণ ভয়। ওরা যেভাবে খেলা দেখায়— গা আমার শিউরে ওঠে।"

রাত হচ্ছিল। তারাপদরা উঠি-উঠি ভাব করল।

"তা হলে শেষ পর্যন্ত— জ্যাকির কেসটা...?"

"কেসটা গিঁট পড়ে যাওয়া। খোলা মুশকিল। জবর গিঁট। তবে একটা ব্যাপারে আমার কোনও সন্দেহ নেই।"

"কী ব্যাপারে?"

"ওই বাড়িতে একটা কিছু লুকনো রহস্য আছে। জ্যাকি কেন, কাউকেই ও-বাড়ি ওরা কিনতে দেবে না। ...আর আমি বলছি, ওই ঘরটা যেখানে কফিন বাক্স আর ট্রাঙ্ক পড়ে আছে, ওই ঘরই হল রহস্য। মিস্ট্রি।... আর ক'দিন দেখি— তারপর একটা প্যাঁচ কষব। হয় জিতব, না হয় হারব।"

শ্রাবণ মাসের মাঝামাঝি কলকাতা শহর জলে ডুবে থাকল দিন দুই। ঘটনাটা নতুন নয় ; প্রতি বর্ষাতেই বার কয়েক এমন হয়। জলে তলিয়ে থাকে এমন জায়গা কলকাতায় কম নেই। উনিশ বিশের কথা বাদ দিলে ষাট সত্তর আশি বছর আগেও যেখানে যেখানে জলে ভেলা ভাসিয়ে ছেলের দল মজা করত, আজও সেখানে জল থইথই করে বর্ষার মরশুমে। মাঝে মাঝে।

চন্দন ঠাট্টা করে বলে, চিরস্থির এই নীর, বুঝলি তারা! এর আর হেরফের হবে না।

সেই চন্দনই অনেক কষ্ট করে জল সাঁতরে তার নতুন হাসপাতালে গেল চাকরি বজায় রাখতে। একদিন গেল, অন্যদিন পারল না।

চারদিনের মাথায় প্রায় স্বাভাবিক হয়ে এসেছিল শহর। মাঝে মাঝে মেঘলা থাকলেও রোদ উঠছিল। কটকটে রোদও নয়। বাতাসও ছিল বাদলার ঠাণ্ডা মেশানো।

নিজের পুরনো কোয়ার্টার এখনও ছাড়েনি চন্দন। দেরি হবে এক-দু'মাস।

সেদিন হাসপাতালে বেরুবার সময় ভবানী এসে হাজির। তার অটো নিয়েই।

"কী রে, তুই! আমি হাসপাতালে বেরুচ্ছি।"

"চলুন আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।"

"চল, ভালই হল।"

অটোয় উঠল চন্দন। ভবানী প্রথমটায় কিছু বলল না। সামান্য পরে বলল, "দাদা, একটা কথা।"

"কী?"

সামান্য ইতস্তত করে ভবানী বলল, "বদুয়ার নাম শুনেছেন? শোনেননি!"

"ব-দু-য়া! কে বদুয়া?"

"রাজা শের, তার দলের লোক। মস্তান। রাজাকে লোকে 'শের' বলে। হেভি গুন্ডা!"

চন্দন অবাক! রাজা শের, বদুয়া এসব নাম জীবনে সে শোনেনি। শোনার কারণও নেই। বলল, "তোর কাছে গুন্ডা?"

"দাদা, আমাদের লাইনে কমসম খোঁজখবর রাখতে হয়। গাড়ি নিয়ে রাস্তায় বেরোই। বাঁধা রুট ছাড়াও এদিক-ওদিক যেতে হয়। সব জায়গাতেই এক-আধজন চেনা থাকে।"

"কী নাম বললি গুন্ডাটার! তা নাম যাই হোক, তোর কাছে কেন?"

"ওদের ফড়ে আছে। বদুয়া খোঁজ করে করে আমার কাছে এসেছিল। জানতে চাইছিল সেদিন আমি অটোতে দু'জনকে তুলে নিয়ে তাদের এরিয়ায় গিয়েছিলাম কেন? লোক দুটো কে?"

ভবানী বা ভব আজ অটো চালায়। চন্দন জানে, ছেলেটা একসময় স্কুলে পড়ত। নাইন শেষ করেছে কি তার বাবা মারা গেল। আচমকা। ট্রামের ধাক্কা খেয়েছিল। কায়কষ্টে দুটো দিন বাঁচিয়ে রাখা গিয়েছিল লোকটিকে। ভব বাপের জন্যে হাসপাতালে আসত, ছোটাছুটি করত, হাতেপায়ে ধরত ডাক্তারবাবুদের। তখন থেকেই ছেলেটার সঙ্গে চেনা চন্দনের। বাপ মারা যাওয়ার পর ভবানী মা ভাই বোন নিয়ে পথে বসে গেল। পেট চালাবে কেমন করে। মাঝে ছেলেটা বিগড়েও গিয়েছিল। পরে আবার শুধরে নিল। এই অটো তার নয়, শম্ভু বড়াল বলে একজনের। কারবারি লোক। ভবদের পাড়ার বড়ালবাবু। তা সে যাই হোক অটোটা ভবই চালায়। না চালালে পেট চলত না।

চন্দন বলল, “তোর পাত্তা পেল কেমন করে?”

“ওসব ওদের লোক আছে দাদা। নজর রাখতে। অটোর নম্বর তো আছেই, আমাদের গাড়ি নিয়ে ঘুরতেও দেখে। সেন্ট্রালে ঘুরি। সাউথ হলে ধরতে কষ্ট হত।”

চন্দন অনুমান করে নিল কথাটার অর্থ। মাঝ কলকাতার অটো ভবানীর, ঘোরাফেরাও ধর্মতলা, ওয়েলিংটন, মৌলালি থেকে এপাশে হ্যারিসন রোড, কখনও এলাকার বাইরেও যেতে হয়, কাজেই বদুয়াদের চোখে পড়ে যাওয়া স্বাভাবিক। সাউথের অটো হলে খোঁজখবর করতে অসুবিধে হত।

ভবানী নিজেই বলল, “দাদা, আমরা হরদম ঘুরি, রাস্তাঘাটে পুলিশ পাবলিক— কত হ্যাপা আছে। নিজেদের দু'-চারটে ঘাঁটি না রাখলে চলে না। বদুয়া খবর জোগাড় করে নিয়েছে।”

“তুই কী বললি?”

“বললাম, গাড়িতে সেদিন ডাক্তারবাবু ছিলেন। আমার চেনা। আর তাঁর এক বন্ধু। আমি চিনি না।”

“কী বলল তোদের বাবুয়া!”

“বদুয়া।” ভবানী নামটা শুধরে দিল। বলল, “বদুয়া জিজ্ঞেস করল কেন গিয়েছিলি ওদিকে? আমি বললাম, ডাক্তারবাবু নিয়ে গিয়েছিলেন। আমি জানি না। বলল, গাড়ি দাঁড় করিয়ে রেখেছিলি কেন? বললাম, এঞ্জিন বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। দেখছিলাম কোথায় বিগড়ে গেল।”

“তারপর?”

“বদুয়া বিশ্বাস করল না। শাসিয়ে গেল। বলল, আর যাবি না ওদিকে। কেস রাজার। ফালতু ভোগে চলে যাবি। তোর ডাক্তারবাবুকে বলে দিস রাজা শেরকে থানা পুলিশও সমঝে চলে।”

চন্দন সামান্য উত্তেজিত হয়ে পড়ল। “রাজা কি খুনখারাবি করে?”

“টাকা পেলে সব করে।”

“ভাড়াটে গুন্ডা! কিলার?”

ভবানী বলল, "দাদা, আপনি সাবধানে থাকবেন।"

"দেখি!... এখানে আমাকে ছেড়ে দে। হাসপাতাল সামনে।"

ভবানী অটো থামাল।

দুপুরবেলা কাজের ফাঁকে চন্দন ক্যান্টিন থেকে চা খেয়ে ফিরছিল, হঠাৎ অবনীশের সঙ্গে দেখা।

"এ কী রে তুই?" চন্দন অবাক! অবনীশ তার বন্ধু। ছেলেবেলায় স্কুলে পড়েছে একসঙ্গে। কতকাল পরে দেখা। অবনীশের পরনে পুলিশের উর্দি।

অবনীশ বলল, "তুই ডাক্তার হয়েছিস শুনেছি। এখানে আছিস— কই জানতাম না তো!"

"বদলি হয়ে এসেছি সবে। তুই গাধা পুলিশের চাকরি করছিস?"

"কপাল ভাই। যার ভাগ্যে যা লেখা থাকে!"

"আমি তো ভাবতাম তুই সিনেমা থিয়েটারে নেমে যাবি!"

অবনীশের চেহারা সত্যিই সুন্দর। মুখের ছাঁদও নরম। পুলিশ হওয়া যেন তাকে একেবারেই মানায় না। সে হেসে বলল, "বড্ড ভিড়। জায়গা পেলাম না। শেষে এই উর্দি।"

"ক' বছর হল?"

"বছর সাত-আট।"

"বড়বাবু, না, মেজোবাবু?"

"চরকি বাবু!" অবনীশ হো হো করে হাসল। "নে, সিগারেট খা।"

সিগারেট ধরানো হয়ে গেল। দু'-একটা পারিবারিক কথা। শেষে চন্দন বলল, "তুই এখন কোন থানায়?"

"লালবাজারে।"

"অ্যাঁ বলিস কী! লালবাজারে! ভয় দেখাচ্ছিস?"

"ভয় তো তোরা দেখাস। এই যে, আজকের কেসটা ধর। আমার এক ডিসটান্ট রিলেটিভ পরশু এখানে ভরতি হয়েছে। ডাক্তাররা প্রথমে সন্দেহ করল, হার্ট, এখন বলছে ব্রঙ্কাইটাল অ্যাজমা। সকালে সময় হয়নি। এখন একবার খবর নিতে এসেছিলাম। ভাল আছে।"

চন্দন বলল, "গুড নিউজ। ...তুই লালবাজারে কোথায় আছিস?"

অবনীশ এবার হেসে ফেলল। "রাস্তায়।"

"তুই গাধা ট্রাফিক লাইনে নাকি? লাল মোটরবাইক? ...ইস্, গুন্ডা পেটাবার চাকরি পেলি না?"

"তোর দরকার! বলিস, পিটিয়ে দেব।" হাসতে হাসতে অবনীশ বলল, "একদিন বাড়ি আয়। জমিয়ে গল্প হবে। এভাবে আড্ডা হয়!"

"তুই থাকিস কোথায়?"

"বেকবাগান।" অবনীশ ঠিকানা বলল। "চলে আসিস একদিন। একটু খবর দিয়ে আসবি। ফোন নম্বর..."

চন্দন মাথা নাড়ল। যাবে।

চলে যাচ্ছিল অবনীশ, হঠাৎ কী মনে করে চন্দন বলল, "এই শোন, তোর ট্রাফিক তো জুতসই হল না। ধর, কোনও ব্যাপারে হেল্প দরকার হল। পারবি না?"

"কেমন হেল্প?"

"আরে না না, এমন কিছু নয় ; জেনে রাখছি...। ভবিষ্যতে যদি কাজে লাগে।"

"ভবিষ্যৎ! ...সে তখন দেখা যাবে। চলি—।" চলে গেল অবনীশ। খানিকটা তফাতে গাছতলায় তার মোটরবাইক রাখা ছিল।

হাসপাতাল শেষ করে বাড়ি ফিরল চন্দন। বিশ্রাম করল খানিক। বিকেল ফুরিয়ে এল। কেমন একটা অস্বস্তি লাগছে। কী যেন খচখচ করছে মনে। স্নান সেরে পাজামা পাঞ্জাবি পরে বেরিয়ে পড়ল। কিকিরার কাছে যাবে।

কিকিরা বাড়িতেই ছিলেন। বসে বসে তাসের খেলা প্র্যাকটিস করছিলেন। আসলে, চন্দনরা দেখেছে, কিকিরার একটা অভ্যেস হল— গভীরভাবে যখন কিছু ভাবেন— তখন স্থির থাকতে পারেন না। বাইরে কেমন চঞ্চল হয়ে ওঠেন।

"এসো চাঁদু!"

চন্দন এগিয়ে গিয়ে বসল। "তারা আসেনি?"

"ক'দিন ওর মুখ দেখিনি। আজ যদি বাবু আসেন! সামান্য কাজ বলেছি করতে, তাতেই কাবু হয়ে পড়েছেন।"

চন্দন বলল, "সার, আজ একটা ব্যাপার হয়েছে।

তাকালেন কিকিরা।

চন্দন সকালের ঘটনার কথা বলল, ভবানীর কাছে যা যা শুনেছে। কোনও কথাই বাদ দিল না।

কিকিরা মন দিয়ে শুনলেন সব। কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর বললেন, "ওই ছেলেটাকে আর ওদিকে যেতে দিয়ো না। বারণ করো।"

"বলে দেব। তবে ও নিজেই আর ওদিকে ভিড়বে না।"

"তুমি..."

"আমার ব্যাপারটা ভাল লাগেনি।" চন্দন বিরক্ত হয়ে বলল, "একটা গুণ্ডা আমাকে শাসাবে!"

"মুখোমুখি তো শাসাতে আসেনি।"

"না হোক। তবু এটা তার থ্রেট।"

"কলকাতা শহরে আজকাল গুণ্ডা বদমাইশ এত বেড়ে গিয়েছে যে, পুঁটিমাছের সাইজ যারা, মানে তুচ্ছ গুণ্ডা, তারাও শাসায়। কী করবে বলো! ওদের ইউনিয়ন আছে কিনা জানি না, তবে ছোরা ভোজালি সঙ্গেই থাকে। ঝুপ করে একটা চাকু

যদি চালিয়েই দেয়...”

“আপনি আমায় ভয় দেখাচ্ছেন! সার, আমি তারাপদ নই। রাজা না বদু সে বেটা আমার কী করবে?”

কিকিরা হাসলেন। “কী করবে জানি না। তোমার মাথা গরম করারও দরকার নেই। রাস্তার কুকুরও কামড়ায়। যেচে তার লেজ ধরে টানতে যাবে কেন! একটু সাবধান হওয়া ভাল।”

চন্দন মাথা নাড়ল। “সাবধান হওয়া মানে ঘরে লুকিয়ে বসে থাকা! ও কি হয় নাকি!”

“ঘরে বসে থাকবে কেন! যেমন আছ থাকবে।.....তা একটা কথা তোমার ছেলেটি ঠিকই বলেছে। ওরা—মানে জ্যাকিকে যারা বাড়িটা কিনতে দিতে চায় না—তারা কিন্তু তেমন তেমন হলে কেনা গুণ্ডা—বা ভাড়াটে খুনেকে দিয়ে একে খুন পর্যন্ত করতে পারে। করবে। আমিও সেটা জেনেছি।”

“পারচেজর কিলার তবে ওই রাজা...”

“রাজা গজা যেই হোক, নামে যায় আসে না। সোজা কথা ওদের হাতে কেনা খুনে আছে।”

কিকিরার কথা শেষ হওয়ার আগেই তারাপদর গলা শোনা গেল।

ঘরে এসে চন্দনকে দেখল তারাপদ। “আমার মনে হচ্ছিল তুই আসবি।”

“তোর মনের বাহাদুরি আছে।” চন্দন ঠাট্টা করে বলল, “আমি অনেকক্ষণ এসেছি। তুই বরং দেরি করলি!”

তারপদ হাতের ঘড়ি দেখল। বলল না কিছু। ঘরের বাতির দিকে তাকাল। জোর নেই আলোয়। পাখাটাও গোরুর গাড়ির চাকার মতন ঘুরছে। ভোল্টেজ কম নিশ্চয়। ঝপ করে একসময় বেড়ে যাবে।

তারাপদ বলল, “আজ ওয়েদারটা ভাল। ফাইন। ক'দিন একেবারে নেতিয়ে রেখেছিল।”

বগলা জল এনে তারাপদকে দিল। আসবার সময়েই জল চেয়েছিল সে। তেষ্টা পেয়েছিল খুব। শ্যামলালের দোকানের কচুরির এফেক্ট। খাব না খাব না করেও খেয়ে ফেলেছিল অফিস থেকে বেরিয়ে।

কিকিরা বললেন, “ চাঁদুর কথা শুনেছ? শোনো।”

তাকাল তারাপদ। “কী রে?”

চন্দন ছোট্ট করে ভবানী-বৃত্তান্ত বলল।

শুনল তারাপদ। চুপ করে থাকল ক'মুহূর্ত। শেষে বলল, “আরে রাখ। অত সস্তা নাকি! রাজা মহারাজার মরজিতে বেঁচে আছি! আমাদের কানুকে বললে অমন গুণ্ডা পাড়াতেই পাওয়া যাবে।”

তারাপদ যেন নিতান্তই বন্ধুকে ভরসা দেওয়ার জন্যে বলল কথাগুলো, যদিও সে জানে চন্দন যথেষ্ট সাহসী, গায়ে খানিকটা ক্ষমতাও রাখে। ভেতরে ভেতরে

তার সামান্য অস্বস্তিও হচ্ছিল।

কিকিরা অন্য কথায় চলে গেলেন। যেন রাজা-গজার চিন্তাটা আপাতত করার কোনও কারণ দেখছেন না উনি। তারাপদকে বললেন, "তোমায় যে-কাজটা করতে বলেছিলাম করেছ?"

তারাপদ মাথা নাড়ল। "যা বৃষ্টি গেল, বেরুতেই পারলাম না। তবু ফরটি পার্সেন্ট করেছি। আমাদের অফিসের চণ্ডীদা জানবাজারের অনেক খোঁজখবর রাখে। তার মামার বাড়ি ওদিকেই। বলল, তালুকদারদের নাম জানে অনেকে। ওরা বাড়ি জমি কেনাবেচা থেকে সুদে টাকা খাটানো, সব ব্যবসাই করে। মামলা মোকদ্দমার লাইনে ফেমাস। ওরা দোকান বাজারেরও মালিকানা করে। একবার কি দু'বার ফিল্ম লাইনেও টাকা ঢেলে মার খেয়েছিল। তারপর থেকে হাত গুটিয়ে নিয়েছে।"

কিকিরা মাথা নাড়তে লাগলেন ধীরে ধীরে। শেষে বললেন, "আমি কাল-পরশু একবার ছোট তালুকদারের সঙ্গে দেখা করব।"

"কেন? আগেও তো একবার করেছেন।"

"সেবার ভদ্রলোক তেমন পাত্তা দিতে চাননি। তাঁদের গদির—মানে দপ্তরের ম্যানেজারের কাছে ঠেলে দিয়েছিলেন।"

চন্দন বলল, "ছোট তালুকদারের বয়েস কত?"

"পঞ্চাশের মধ্যেই।"

"টাকার গরম দেখেছেন? তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে নাকি পাঁচজনকে..."

"না, অতটা নয়। তবে আসুন-বসুনও করেন না। মনে হল, অহঙ্কারী ভাব আছে, তবে চাপা। বোধ হয় মূর্খ!"

তারাপদ বলল, "দেখা করে কী করবেন?"

"পাগল হ্যারিশ সম্পর্কে ভাল করে খোঁজখবর করব।"

বগলা চা নিয়ে এল। সামান্য খোঁড়াচ্ছে। গত পরশু পড়ে গিয়েছিল সিঁড়ির মুখে। লেগেছিল হাঁটুতে। মারাত্মক চোট পায়নি।

চা ধরিয়ে দিয়ে বগলা চলে গেল।

তারাপদ বলল, "পাগলা হ্যারিশ তো মারা গিয়েছে। ওর সম্পর্কে নতুন কী খোঁজ নেবেন?"

চায়ে চুমুক দিয়ে কিকিরা বললেন, "পাগলা হ্যারিশের মারা যাওয়া নিয়ে একটা গোলমাল থাকতে পারে। সে কোনও সরকারি হাসপাতালে মারা যায়নি। নেহাতই এক মিশনারি চ্যারিটেবল সিক হোম-এ মারা যায়। এসেও ছিল বেহালার দিকে কোথায় এক পুওর ওল্ড হোম থেকে। যে লোকটা একদিন নিজে থেকেই বেপাত্তা হয়ে যায়, কোথায় কেউ জানে না, সে মরার আগে কেমন ভাবে সেখানে গিয়ে পড়ল, আর কখনই বা চ্যারিটেবল সিক হোম-এ এল? আর কেনই বা মারা যাওয়ার আগে তালুকদারদের নাম-ঠিকানা দিয়ে গেল, আন্দাজ করতে পারছি না

যে।”

“বডি আইডেন্টিফিকেশানের জন্যে।”

“শনাক্তকরণ! হ্যাঁ, তা তো ঠিকই। কিন্তু আরও তো লোক ছিল। তার বাড়ির আশেপাশের লোক, পাড়ার লোক।”

“আপনি তো বলেছিলেন তেমন প্রতিবেশীও এসেছিল।”

“আমাকে তালুকদারের ম্যানেজার যা বলেছিল—তাই বলেছি। কিন্তু কোন প্রতিবেশী? কেমন প্রতিবেশী? তারা যদি জাল সাক্ষীর মতন হয়! তালুকদারদের কথায় এসেছে। তবে—?”

তারাপদ থতমত খেয়ে বলল, “কী বলছেন, সার! আসলের জায়গায় নকলের কবর হয়ে গেল!”

কিকিরা চুপ করে থাকলেন।

॥ ৮ ॥

দিন দুইয়ের জায়গায় চারদিন হয়ে গেল। উপায় ছিল না কিকিরার ; দরকারি অন্য কাজগুলো না মিটিয়ে তালুকদারের দপ্তরে গিয়ে লাভ হত না।

তারাপদকেই সঙ্গে নিয়েছিলেন কিকিরা। শিখিয়ে পড়িয়ে রেখেছিলেন কখন কী বলতে হবে, চোখ কান খোলা রাখতে হবে কেমন করে!

তালুকদারদের অফিস না গদি দেখে তারাপদ নিচু গলায় বলল, “সার, এটা কি অফিস! এ তো সেরেস্তা টাইপের জমিদারি দপ্তর।”

কিকিরা বললেন, “ওরা তো জমিদারই ছিল একসময়। ধানচালের কারবারও করত শুনেছি আগে। এমন সেরেস্তা তুমি চিৎপুরের দিকে এখনও দু'একটা পাবে। সময়ের হাওয়া গায়ে লাগেনি তেমন, পুরনো ফরাসে বসে আছে।”

কথা না বাড়িয়ে তারাপদ বলল, “বৃহস্পতিবারের বারবেলায় দেখা করতে এলেন, কাজের কাজ হবে তো?”

“চলো না, দেখি।”

যেমন বাড়ি তেমনই সিঁড়ি। বেখাপ্পা চেহারা। চুনের সাদাটে ভাব আর খুঁজে পাওয়া যায় না, হলুদ হয়ে গিয়েছে। খোলা চাতালে শ্যাওলা বসেছে। সিঁড়ির ধাপের ইট নড়বড়ে। একরাশ পায়রা ভেতর দালানের খাঁজে খোঁদলে। একটানা শব্দ করে চলেছে। স্যাঁতানির গন্ধ চারপাশে।

কিকিরা ম্যানেজারের কাছে গিয়ে নমস্কার করে হাসলেন।

মুখ তুললেন ম্যানেজার। ষাটের কাছাকাছি বয়েস। মুখের গড়নটা গোল। তারাপদর মনে হল, শিকারি বেড়ালের মতনই যেন দেখতে। গোল গোল চোখ। গোঁফের অর্ধেক সাদাটে হয়ে গিয়েছে। মাথার চুলও বারো আনা পাকা।

“কী চাই?” চিনেও না-চেনার ভাব, কিংবা ম্যানেজারি মুদ্রাদোষ।

কিকিরা বিনীত ভঙ্গি করে হাসলেন। "আমায় চিনতে পারলেন না! আগে একদিন এসেছিলাম।"

"ও!" মুখটা দেখলেন ভদ্রলোক কিকিরার। চিনতে পেরেছেন যেন, তবু গম্ভীর। "কী দরকার?"

"ছোটবাবুর সঙ্গে একবার দেখা করব!"

"ছোটবাবু! তিনি এখন ব্যস্ত আছেন।"

"দশ বিশ মিনিটের জন্যে দেখা হয় না?"

"বললাম তো?"

"একবার দেখুন না দয়া করে। কাজের কথা। আপনি চাইলে সবই হয়—" বলতে বলতে কিকিরা অদ্ভুত কায়দায় দুটো একশো টাকার নোট ম্যানেজারের হাতে গুঁজে দিলেন।

ম্যানেজার প্রথমটায় হকচকিয়ে গিয়েছিলেন। "এ কী?" বলেই তারাপদর দিকে তাকালেন। অন্যের সামনে টাকা নেওয়ার ইতস্তত ভাব।

অবশ্য নিতেও বাধল না।

ম্যানেজার তাঁর পানের চৌকো ডিবের মধ্যে টাকাটা রেখে দিলেন। পান নিয়ে মুখে দিলেন একটা। বাড়ির সাজা পান। শুকিয়ে গিয়েছে। পানের পর জরদা। গন্ধ পাওয়া গেল। "আমাকে বললে হত না?"

"আজ্ঞে, কথাটা ছোটবাবুকে না বলে আপনাকে আগে বলি কেমন করে। আপনিও শুনবেন বইকী! আগে ছোটবাবু—"

"ও! দাঁড়ান দেখি।"

ম্যানেজার উঠে গেলেন। চৌকো ঘর। তফাতে বসে জনা চারেক কর্মচারী। টেবিল চেয়ারের বালাই নেই। তক্তপোশ, চিট চাদর, ডেস্ক, খাতাপত্র, কাগজ। দুটো পুরনো পাখা ঘুরছে মাথার ওপর।

তারাপদ চাপা গলায় বলল, "টাকাটা কেমন করে নিল দেখলেন!"

"তুমিই দেখো। ...এসব হল দস্তুর। আগের বারে ম্যাজিক দেখিয়েছি, এবার ভেলকি।"

"ছোটবাবু...?"

"দরজার ছিটকিনি খুলে গিয়েছে হে, দেখা হবে।"

সামান্য পরেই ম্যানেজার ফিরে এলেন। "যান। বেশি বিরক্ত করবেন না। ওঁর এখন বিশ্রামের সময়। ... আচ্ছা মশাই। এর আগে আপনি একদিন হায়দার লেনের তেরো নম্বর বাড়ির খোঁজ করতে এসেছিলেন না?"

"আপনার মনে আছে? ভাবছিলাম—"

"এবার আবার কোন দরকারে?"

"ঘুরে এসে বলব।" বলে তারাপদকে উঠতে বললেন ইশারায়।

"তাড়াতাড়ি করবেন। ছোটবাবু আধঘুমে ছিলেন। তাঁকে বিরক্ত করবেন না

বেশি।"

"না না—তাই কি করি! কাজের কথা বলেই চলে আসব।"

তারাপদকে নিয়ে কিকিরা ছোটবাবুর ঘরের দিকে পা বাড়ালেন। ফিসফিস করে বললেন, "যা যা শিখিয়েছি তার বাইরে একটাও কথা বলবে না। ধরা পড়লেই মুশকিল।"

মাথা নাড়ল তারাপদ।

ম্যানেজারমশাইয়ের দফতরখানার বাইরে এসে ঢাকা বারান্দা দিয়ে ডাইনে হাঁটলে কোনাকুনি একটা বাঁক, তার গায়েই ছোটবাবুর ঘর। কিকিরা আগে একবার এসেছেন। ঘরটা চেনেন।

তালুকদারদের ছোটবাবুর ঘরের দরজা খোলাই ছিল। গরমকালে একটা পরদা ঝুলত খসের। এখন সেটা গুটোনো।

কিকিরা তারাপদকে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন ছোটবাবুর। ঢুকেই হাত জোড় করে নমস্কার করলেন। তারাপদ খেয়াল করেনি প্রথমে, পরে আধাআধি একটা নমস্কার সেরে ফেলল।

ছোটবাবুর ঘরে ফরাস পাতা। আবার একপাশে লম্বাটে সোফাও। তিন-চারটি চেয়ার। টেবিলও আছে একটা। দেওয়ালের সঙ্গে গেঁথে-রাখা ছোট সিন্দুক—বা আয়রন চেস্ট। পাখা ঘুরছিল। সস্তা এক ম্যাপ টাঙানো কলকাতা শহরের। দেওয়াল ঘড়ি, ক্যালেন্ডার।

ছোটবাবুর চেহারা দেখে বোঝা যায় ভদ্রলোক একসময় রীতিমতন স্বাস্থ্যবান ছিলেন। এখন স্বাস্থ্য নেই, কাঠামোটা রয়েছে। গায়ের রং কালো। ধারালো ধাঁচ মুখের। চকচকে চোখ। চশমা পরেন। মাথার চুল ছোট ছোট। বয়েস পঞ্চাশের গায়ে গায়ে।

ফরাসের ওপরেই তাকিয়ায় হেলান দিয়ে আধ-শোয়া অবস্থায় ছিলেন ছোটবাবু। কিকিরাদের দেখলেন।

"আপনি ক'দিন আগে একবার এসেছিলেন না?" ছোটবাবু বললেন।

"আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনার মনে আছে—"

"তেরো নম্বর বাড়িটার খোঁজখবর করছিলেন?"

"যথার্থ।"

"আজ আবার কেন?"

কিকিরা তারাপদকে দেখালেন। "এটি আমার মক্কেল বলতে পারেন। বাইরের দিকে প্রমোটারি শুরু করেছে, চুঁচড়ো বাঁশবেড়ে...! বেশিদিন হয়নি। বছর দুই তিন। তাতেই দু' পয়সা এসেছে। না, সেরকম কিছু নয়। তবে হালে ও কলকাতায় কাজকর্ম করতে চায় অল্পস্বল্প। ধরুন লাখ আট-দশ..."

ছোটবাবু তারাপদকে দেখলেন। চেহারা দেখে দু' লাখের কারবারিও মনে হয় না। তবে আজকাল যা অবস্থা হয়েছে, কার পকেটে কালো তাসের ক'টা টেক্কা

সাহেব বিবি, বোঝা যায় না। "তা আমি কী করব?"

"আজ্ঞে, আমি একটা কথা ভাবছিলাম। আপনি একটু বিবেচনা করুন। ... বলছিলাম যে ওই তেরো নম্বর বাড়ির জন্যে আপনি লাখখানেক টাকা দাদন নিয়েছেন। কিন্তু বাড়িটা শেষ পর্যন্ত কি বিক্রি হবে?"

"কেন?"

"দাঁতের ওই চিনে ডাক্তার বোধ হয় ও-বাড়ি আর কিনবে না।"

"কে বলল?"

"আমার সেরকমই মনে হচ্ছে। আপনি তো জানেন, আগের বারই বলেছি, ওর সঙ্গে আমার জানাশোনা আছে খানিকটা। ওর মায়ের সঙ্গেও। বাপের সঙ্গেও ছিল—কিন্তু বাপ তো আর নেই। গতবার আমি ওর জন্যেই এসেছিলাম। কিন্তু এখন দেখছি, ডাক্তারের হাতে টাকা নেই তেমন। ধারধোরের চেষ্টা করছে। তা ছাড়া ওই বাড়িতে পা দেওয়ার আগেই ওকে ঝঞ্ঝাট ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে হচ্ছে মশাই। লোকে ভয় দেখাচ্ছে, শাসাচ্ছে। চিনে ডাক্তারের মা একেবারেই রাজি নয় এখন।"

"সে ওদের ব্যাপার। দাদনের টাকা আমি ফেরত দেব না তা বলে!"

"আমি বলছিলাম, হাত বদল হয়ে যাক না—" কিকিরা তারাপদকে দেখালেন। "ধরুন, এ যদি আপনাকে লাখ চারেক দাদন দেয়—আপনি আগের পার্টিকে তার টাকা ফেরত দিয়ে ওকে কাটিয়ে দিলেন।"

ছোটবাবু সোজা হয়ে বসলেন। সামান্য চুপ করে থেকে সিগারেটের প্যাকেট তুলে নিয়ে দেশলাই খুঁজতে খুঁজতে বললেন, "আপনি আশ্চর্য লোক মশাই, ক'দিন আগে একজনের হয়ে দালালি করতে এসেছিলেন, আজ আবার অন্য একজনকে সঙ্গে নিয়েই এসেছেন দালালি করতে! দালালদেরও একটা নীতি থাকে। আপনার সেটাও নেই।"

কিকিরা হাসলেন। মুচকি হাসি। বললেন, "জ্যাকি পারবে না বলে আমি একে এনেছি। নীতির কথা তুলছেন কেন! ... তা ছাড়া আপনি তো জ্যাকিকে বাড়িটা বেচে দেননি এখনও। দেব বলেছেন। আপনাদের নিজেদের মধ্যেই গোলমাল। শরিকি বিবাদ। কে কত পাবে ..."

"চুপ করুন।" ছোটবাবু ধমকে উঠলেন, "আমাদের গোলমাল আমাদের ব্যাপার। সেটা মিটে যাবে। সেটেল হয়ে যাবে। বাড়ি আমি ওই দাঁতের ডাক্তারকেই দেব—যদি দি।"

কিকিরা তারাপদর দিকে তাকালেন একবার। তারপর কখন যেন পকেট থেকে নাইলনের এক দড়ি বার করে নিলেন। ফাঁস লাগাতে লাগাতে বললেন, "তা হলে তো আপনার চোখের সামনে আমায় গলায় দড়ি দিতে হয়। বাবু আমি যে এর সঙ্গে পঁচিশ হাজার টাকার রফা করেছি। ছি ছি!"

ছোটবাবু সিগারেট ধরিয়ে নিয়েছেন ততক্ষণে।

নাইলনের দড়ির গোল বড় ফাঁসটা কিকিরা নিজের গলায় গলিয়ে তারাপদর হাতে বাকি প্রান্তটা তুলে দিলেন।

"কী করছেন কী?" ছোটবাবু ভয় পেয়ে গেলেন। "আমি চেঁচিয়ে লোক ডাকব।"

"ডাকুন। তারাও সবাই দেখবে।" বলে কিকিরা চোখের ইশারায় তারাপদকে দড়ির প্রান্ত টানতে বললেন। এ বড় অদ্ভুত দৃশ্য। কিকিরার গলায় দড়ির ফাঁস লাগানো গোল করে, আর তারাপদ সেই দড়ির একটা প্রান্ত ধরে টানছে।

ছোটবাবুর মুখ থেকে জ্বলন্ত সিগারেটটা পড়ে গেল কোলের ওপর। লাফিয়ে উঠে তাড়াতাড়ি আগুন নেভালেন।

তারাপদ এমন ভাব করল যেন দড়িটা টানছে। ফাঁসটাও কিকিরার গলায়। কিন্তু কী অবাক ব্যাপার, দমবন্ধ হওয়ার কোনও লক্ষণ নেই কিকিরার। ফাঁস যেন গলা জড়িয়ে আটকেই থাকল, শক্ত হল না, চাপও লাগল না। আর তারাপদর হাতে ধরা দড়ির অংশটা দু'-তিনটে টুকরো হয়ে মাটিতে পড়ে গেল।

ছোটবাবু ঘামতে লাগলেন। তারপর হাত জোড় করে বললেন,"মশাই, প্লিজ—এসব বন্ধ করুন।"

কিকিরা তারাপদকে ইশারা করলেন। দড়ি ছেড়ে দিল তারাপদ।

গলার ফাঁস খুলতে খুলতে কিকিরা বললেন, "এতেই আপনি ঘাবড়ে গেলেন। এটা কিছু নয়। ভ্যান্‌সি বলে এক ম্যাজিশিয়ান ছিল। বত্রিশ রকম 'নট' মানে ওই গিঁট আর রোপ ট্রিকস— সাফাইয়ের খেলা দেখাত। একে বলে 'জিরো নট'— মানে যে ভাবে গিঁট বেঁধে দেব, তার চেয়ে এক সুতোও আর আগু-পিছু নড়বে না।"

কপাল চোখমুখের ঘাম মুছতে মুছতে বললেন, "চুলোয় যাক আপনার ভ্যান্‌সি ফ্যান্‌সি। এবার দয়া করুন, আসুন।"

"যাব ঠিকই। কিন্তু কথাটা শেষ হল না যে!"

"আবার কী কথা!"

"বাড়িটার হাত বদল?"

তারাপদ কিকিরাকে বলল, "আমি বেশিদিন বসে থাকতে পারব না।" শেখানো কথা ছাড়া কিছু নয়।

ছোটবাবু বললেন, "এখন আপনারা যান, পরে ভেবে দেখব।"

কিকিরা বললেন, "শুনুন তালুকদারবাবু! আপনি হয়তো ঘাবড়ে যাবেন—তবু বলি, আমরা খোঁজখবর করে জেনেছি, পাগলা হ্যারিশ বলে যাকে আপনার লোক শনাক্ত করে এসেছিল সে একটা জিনিস লুকিয়েছে।"

ছোটবাবু ভয়ে কেমন আঁতকে উঠলেন, "কী বলছেন আপনি!"

"আমি ঠিক বলছি। পাগলা হ্যারিশ বেহালার যে চ্যারিটেবল মিশনারি সিক হোমে ছিল সেখানে আমরা দু'দিন আগে গিয়েছিলাম। হ্যারিশের শরীরের অবস্থা

এত খারাপ হয়ে গিয়েছিল যে, তার কোনও প্রতিরোধ ক্ষমতা ছিল না। ওষুধবিষুধ কাজ করছিল না আর। নিউমোনিয়া হয়ে সে মারা যায়।"

তালুকদার অস্বীকার করলেন না।

"আপনার কাছে বলতে আপত্তি নেই, আমি একা বেহালায় যাইনি, সঙ্গে আমার একজন ডাক্তার ছিল।" কিকিরা আর চন্দনের নাম বললেন না। "ঠিক কীভাবে হ্যারিশ মারা গেল, তা নিয়ে সে কথাবার্তাও বলল।"

"তা আমি কী করব! আমি কি তাকে মেরেছি?"

"না! আপনি মারেননি। কিন্তু হ্যারিশ মারা যাওয়ার আগে একটা ডাইরি বইয়ের মধ্যে পেনসিলে কয়েকটা কথা লিখে রেখেছিল। লিখে একটা খামে ঢুকিয়ে রেখেছিল। আপনার লোক সেটা নিয়ে আসে।"

তালুকদার যেন আকাশ থেকে পড়ছেন। "কী বলছেন?"

"আমি ঠিক বলছি। সেই ডাইরিটা কোথায়?"

"কী মুশকিল—" ছোটবাবু যেন ধৈর্য হারিয়ে চিৎকার করে উঠলেন, "মশাই একটা পাগলার দু'-চার ছত্র লেখা নিয়ে আমি কী করব! ও যদি আমাদের কথা নিজে না জানিয়ে যেত, আমরা ওর মারা যাওয়ার কথাও জানতাম না। নেহাত একসময়ের চেনা লোক বলে খবর পেয়ে আমার এখান থেকে একজন গিয়েছিল। নয়তো কেউ যেত না। এ দেখছি, রাস্তার আপদ ঘরে টেনে আনা!"

"আপনি সত্যি কথা বলছেন?"

"কেন! কী দুঃখে মিথ্যে বলব!"

"বেশ। কে গিয়েছিল আপনার এখান থেকে?"

"ম্যানেজার জানে! ডাকব তাকে?"

ডাকাডাকির পর ম্যানেজার হাজির।

ছোটবাবু তিরিক্ষে মেজাজে বললেন, "নাগমশাই, ওই পাগলা হ্যারিশকে শনাক্ত করতে কে গিয়েছিল এখান থেকে?"

ম্যানেজার ঘরের অবস্থাটা অনুমান করতে পেরেছিলেন। অল্প সময় চুপ করে থেকে বললেন, "ঘটক গিয়েছিল, সুশীল। কেন বাবু?"

"ও কি একটা খাতাটাতা এনে জমা দিয়েছিল আপনার কাছে?"

"না।"

"ঘটক কোথায়?"

"এ আপনি কী বলছেন বাবু? ঘটক তো কবেই চাকরি ছেড়ে চলে গিয়েছে।"

উত্তেজনার মাথায় কথাটা প্রথমে খেয়াল হয়নি। পরে খেয়াল করতে পারলেন। তিনি কী বলতে কী বলে ফেললেন! ঘটক তো কবেই চলে গিয়েছে। নিজেই। বিব্রতভাবে একবার কিকিরা আরেকবার ম্যানেজারের দিকে তাকালেন, "আমারই মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে।"

কিকিরা ম্যানেজারকে বললেন, "ঘটকের বাড়ি কোথায়?"

"শিবপুর। তবে তাকে কি আর আপনি দেখতে পাবেন?"

"কেন?"

"শুনেছি একদিন বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল কালীঘাটে পুজো দিতে যাচ্ছি বলে, আর সে বাড়ি ফেরেনি।"

তারাপদ চুপচাপই ছিল। তার অস্বস্তি হচ্ছে। ঘামছিল। হঠাৎ বলল, "কবে ঘটেছে এটা?"

"ক-বে! হিসেব করে বললে মোটামুটি বছর তিন-চার আগে!"

কিকিরার দিকে তাকালেন ছোটবাবু। "সুশীল ঘটকের এক ভাই আমাদের সলিসিটার অফিসে টাইপিস্টের কাজ করে। জেঠতুতো খুড়তুতো ভাই। সে বলতে পারে ঠিকঠাক।"

কিকিরা আর কিছু বললেন না।

খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে ম্যানেজার বললেন, "বাবু আমি যাই?"

ছোটবাবু হাত নাড়ার আগেই কিকিরা বললেন, "আসুন আপনি।"

ম্যানেজার চলে যাওয়ার পর কিকিরা কিছুক্ষণ চুপচাপ ভাবলেন কী যেন; শেষে ছোটবাবুকে বললেন, "আপনি এখানে কতদিন বসছেন? কিছু মনে করবেন না!"

"বছর দশেক।"

"দাদারা কোথায় বসেন?"

"বড়দা আমাদের বৈমাত্রভাই। উনি চা বাগানের ব্যবসা দেখতেন। ডুয়ার্সেই ছিলেন। হার্টের অসুখের পর শিলিগুড়ি।"

"মেজোদাদা?"

"আমরা কলকাতাতেই থাকি। তবে আলাদা বাড়িতে। মেজদা অন্য ব্যবসা অফিস দেখে। সে খানিকটা বেআক্কেলে, টাকাপয়সা নয়ছয় করে, বড় মেজাজি..."

কিকিরা আর কথা বাড়ালেন না। বললেন, "তালুকদারমশাই, আপনি—মানে আমার মনে হচ্ছে—অনেক কিছুর খোঁজ রাখেন না। তা কিছুদিনের মধ্যে হয়তো শুনবেন আপনাদের হায়দার লেনের তেরো নম্বর বাড়ি নিয়ে হইচই পড়ে গিয়েছে। অবাক হবেন না। আজ আমরা চলি। পরে আবার দেখা হতে পারে। ভাল কথা, দাঁতের ডাক্তার জ্যাকিকে ঠকাবেন না। অবশ্য সব যদি ভালয় ভালয় মিটে যায়। চলি।"

॥ ৯ ॥

তাড়াহুড়ো করার উপায় ছিল না। দিন কয়েক সময় গেল অন্য ক'টা কাজ সারতে।

পরে সদলবলে কিকিরা তেরো নম্বর বাড়িতে এসে হাজির। দুপুর তখন ফুরিয়ে আসছে। আগের দিন বৃষ্টি হয়েছিল। আজ শুকনো।

জ্যাকি পকেট থেকে চাবি বার করতে করতে বলল, " অ্যাঙ্কল, আমিও এই ঘরে আর ঢুকিনি।"

কিকিরা মাথা হেলালেন, "তালাটা খোলো।"

বাড়িটার চারপাশে জমানো ইটকাঠের প্লাস্টারের চাঙড়ের আবর্জনা এখন মোটামুটি পরিষ্কার। কুলিমজুর আর কাজ করছে না। বন্ধ করে রেখেছে জ্যাকি এখনকার মতন। বাইরে থেকে বাড়িটাকে ভাঙাচোরা খাঁচার মতন দেখাচ্ছিল প্রায়।

জ্যাকি দরজার তালা খুলল।

ঘরে আলো নেই। জানলাটা খুলে দিল জ্যাকি। সময় লাগল খুলতে।

চন্দন ঘরটা দেখল। তারপর তারাপদকে নিয়ে জানলার কাছে সরে গেল।

প্রথম থেকেই চন্দনের চোখে পড়েছে—জানলাটা খড়খড়ি-করা, অথচ না আছে কাচ, না লোহার শিক বা গরাদ। মানে একেবারে ফাঁকা জানলা। তার ওপর একটা পাল্লার সঙ্গে জানলার ফ্রেমের ভাঙা মরচে ধরা কবজা থাকলেও অন্য পাল্লার কবজা নেই। মামুলি তার জড়িয়ে যেন আলগা করে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। জানলার গায়ে পেয়ারা গাছ।

চন্দন গাছটা দেখছিল। বর্ষায় তেজি হয়ে উঠেছে।

কিকিরা হঠাৎ বললেন, "জ্যাকি, ওটা কী? কাদার ছাপ?"

জ্যাকি ঝুঁকে পড়ে মেঝে দেখল। দু'-তিন জায়গায় দাগ। বলল, "ফুট প্রিন্ট! ছাপ অ্যাঙ্কল?"

"এই ঘরে কেউ এসেছে। আসে। আগে কি পায়ের ছাপ দেখছ?"

জ্যাকি ভাবল কিছুক্ষণ। আগে এই ঘর এত ময়লা আবর্জনায় ভরা ছিল যে, দাগ চোখে পড়ার কথা নয়। পরে সে আর তার ভাই মিলে ঘরটা পরিষ্কার করেছে ঠিকই, তবু কালচে মেঝেতে দু'-চারটে দাগ তারা খেয়াল করে লক্ষ করেনি।

জ্যাকি বলল, "বলতে পারব না অ্যাঙ্কল!"

"তুমি বলছ, পায়ের দাগ দেখছ এখন?"

"হ্যাঁ।"

চন্দন জানলার কাছ থেকে বলল, "কিকিরা, আমি একবার নীচে থেকে ঘুরে আসছি।" বলতে বলতে সে পাল্লা-খোলা জানলা দিয়ে গলে গিয়ে পেয়ারা গাছের ডাল ধরল। পুরো ডালটা বেঁকে গেল, শব্দ হল পাতার। তারাপদ আঁতকে উঠল। "পড়বি!"

চন্দন ঝুলতে ঝুলতেই কায়দা করে বড় শক্ত ডাল ধরে ফেলল। তারপর নেমে গেল গাছ বেয়ে।

কিকিরা জানলার কাছে সরে এসেছিলেন তারাপদর আচমকা চিৎকার শুনে। নীচে তাকিয়ে দেখলেন। চন্দন শহুরে ছেলে নয়, গাছে চড়া, সাঁতার কাটা— এসব সে ছেলেবেলা থেকে শিখেছে। কোন গাছের কোন ডালটা বেশি পলকা সে

আন্দাজ করতে পারে।

চন্দন মাটিতে নেমে গিয়ে কী দেখতে লাগল।

কিকিরা জ্যাকিকে বললেন, "ঘরটা ভাল করে দেখো, আর কী পাওয়া যায়?"

জ্যাকি প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে ঘরের চারপাশ দেখতে লাগল।

তারাপদ বলল, "কিকিরা এই ঘরের বাইরে তালা থাকলে কী হবে, জানলা দিয়েই তো আসা-যাওয়া করা যায়।"

কিকিরা বললেন, "যায় দেখছি।" বলেই চন্দনকে কী যেন বললেন জানলা দিয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে, তারপর তারাপদর দিকে ঘাড় ঘোরালেন। "ব্যাপারটা বুঝতে পারছ?"

"কী?"

"এই ঘরের বাইরের দিকে দরজায় যে কাঠের তক্তা মারা ছিল— সেটা স্রেফ ব্লাফ। মানে, তুমি যেন ওই বেয়াড়া তক্তামারা ক্রশ দেখে ভেতরে আসতে না চাও। ভাবো, ঘরে ঢোকা নিষেধ। কিংবা ভয়ের। বা ধরো কোনও আপদ-বিপদ..."

"সার," চন্দন নীচে নেমে ডাকল।

কিকিরা মাথা ঝোঁকালেন, "কী হল?"

"সার, গাছতলার মাটিতে জুতোর বড় বড় দাগ। বৃষ্টিতে কাদাটে হয়ে রয়েছে জায়গাটা।"

"বুঝেছি। তুমি চলে এসো।"

জ্যাকি সারা ঘর খুঁজে কয়েকটা জিনিস পেল, দেশলাইয়ের কাঠি, সিগারেটের পোড়া টুকরো, একটা তাস। হরতনের গোলাম।

কিকিরাকে জিনিসগুলো দেখাল জ্যাকি।

"বাঃ, বাঃ, এই ঘরে একটা আসর বসে তবে?" ঠাট্টার গলায় বললেন কিকিরা। "মোমবাতি-টাতির টুকরো পেলে না?"

"না।" জ্যাকি মাথা নাড়ল।

তারাপদ বলল, "মোমবাতির কারবার এখন উঠে যাওয়ার মতন। আজকাল অনেকরকম হালকা আলোর ল্যাম্প পাওয়া যায়। ফ্যান্সি ল্যাম্প, ব্যাটারিতে জ্বলে। মিঠে আলো হয়।"

কিকিরা তাসটা দেখতে দেখতে বললেন, "ঠিক বলেছ! মোমবাতির আলো বাইরে থেকে চোখে পড়ে। মানে উলটো দিকের বাড়ি থেকে আলো চোখে পড়তে পারে। হালকা আলোর বেলায় সেটা হয় না। অতটা ছড়াতে পারে না।"

জ্যাকি বলল, "কারা আসে এখানে অ্যাঙ্কল?"

"ধর্মপুত্তুররা আসে না। ...গুন্ডা বদমাশদের ভাল আখড়া হয়েছে এখানে। নো ডাউট অ্যাবাউট ইট। কিন্তু তারা কোথাকার? এই পাড়ার?"

চন্দন ফিরে এল। জানলা গলেই।

"সার, নীচে জুতোর দাগ দেখলাম। স্পষ্ট।"

"এগুলোও দেখো।"

চন্দনকে তাস, সিগারেটের টুকরো, দেশলাইকাঠিও দেখানো হল। দেখল চন্দন। বলল, "এ ঘরে যারা লুকিয়ে আসে—"

বাধা দিয়ে কিকিরা বললেন, "আমার মনে হয় অনেক আগে থেকেই আসে। এটা তাদের মিটিং প্লেস। ভাঙা পুরনো বাড়ি, একটেরে একটা ঘর ছাদে ওঠার মুখে। এমন সুবিধের জায়গা আর হয় নাকি! জ্যাকি বাড়ি কেনার পর আসা-যাওয়া করছে দেখে হালে হয়তো সাবধান হয়েছে। তারাই বোধ হয় এই ঘরের দরজার বাইরে তক্তা মেরে বন্ধ করে দিয়েছিল, যাতে অন্য কেউ না এসে পড়ে।"

"কেন?"

"কে—ন! খানিকটা বুঝতে পারছি, পুরোটা পারছি না। এটা গুমঘর। ঘরের মধ্যে হোক বা না হোক— এই বাড়িতে দুটো খুন হয়েছে। এই ঘরে পাগলা হ্যারিশের কফিন বাক্স এখনও পড়ে আছে। লোককে ভয় পাওয়ানোর পক্ষে যথেষ্ট ভাল পাবলিসিটি।

"কালো ট্রাঙ্কটাও।"

"চাঁদু, আমার বিশ্বাস দুষ্কর্মের জায়গা তো বটেই, ঘরটার মধ্যে কিছু খোঁজটোজও চলতে পারে।"

"কী খুঁজবে সার? এতদিনেও খুঁজে পেল না?"

"পায়নি। ভাবছে পাবে। মাঝে মাঝেই বোধ হয় তল্লাসি চালায়। কিন্তু কী পাবে! হ্যারিশ এখানে কোন গুপ্তধন লুকিয়ে রেখে গিয়েছে? কোথায়?"

তারাপদ বলল, "কিকিরা যে-লোক বাড়ি মর্টগেজ দিয়ে আর ছাড়াতে পারেনি, হাতছাড়া হয়ে গিয়েছে তার ভিটে, পাগলা আর ভিখিরি হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে— মারা গিয়েছে চ্যারিটেবল হাসপাতালে, তার আর কী গুপ্তধন থাকবে! থাকলে এমন অবস্থা তার হয়!"

জ্যাকি বলল, "ইট ইজ ট্রু, অ্যাঙ্কল। টাকা থাকলে কেউ ভিখ মাগে!"

কিকিরা বললেন, "তোমরা হয়তো ঠিকই বলছ। কিন্তু এমন জিনিস যদি হয়— যা বাজারে বিক্রি করা যাবে না। কিংবা বিক্রি করতে রাজি হয়নি হ্যারিশ।"

"তা হলে সেটা সে এ বাড়িতে ফেলে যাবে কেন? সঙ্গে করে নিয়ে যাবে।"

"তাতে বিপদ হত। ...আচ্ছা, এ বাড়িতে সে তো তার নিজের কফিন বাক্সও রেখে গিয়েছিল। সে কোথায় মারা যাবে, কবে মারা যাবে— নিজে কি জানত সে! তবু কফিন বাক্সটা রেখে গেল কেন? কেন এই ঘরে বসে বসে নিজের কফিন বাক্স বানাল! তার কি মনে হয়নি— হ্যারিশ মারা যাওয়ার পর কার দায় পড়েছে তার কফিন বাক্স খোঁজ করার!"

কোনও জবাব পাওয়া গেল না।

তারাপদ হঠাৎ বলল, "কিকিরা, তা হলে কি হ্যারিশ মারা যাওয়ার আগে কিছু লিখে গিয়েছিল কাগজে?"

"আমার তো তাই মনে হয়। শিবপুরের ঘটক— তালুকদারদের লোক— সেটা হাতে পেয়ে যায়। তার বাবুদের কাছে আর দেয়নি কাগজটা। নিজেই খুঁজে দেখতে গিয়েছিল ব্যাপারটা কী! দেখতে গিয়ে ও মরেছে।"

"মরেছে।"

"আমার আন্দাজ। এ বাড়িতে প্রথম খুন হয় বছর চারেক আগে। তালুকদারদের কথামতন হিসেবটা মিলে যাচ্ছে না, তারাপদ?"

"হ্যাঁ, সেদিক দিয়ে দেখলে মিলছে একরকম।"

"দ্বিতীয় খুন?" চন্দন জিজ্ঞেস করল।

"বলতে পারছি না। তবে ঘটকের মতন কেউ নাও হতে পারে। গ্যাং কেস।"

"কে সে?" তারাপদ বলল, "অযথা—"

কিকিরা যেন কথাটায় কান দিলেন না। ঘরের চারপাশে ঘুরতে ঘুরতে বললেন, আপন মনে, "আমি দুটো ব্যাপারে প্রায় নিশ্চিত। এক, এই বাড়ি বলো ঘর বলো কতকগুলো মিসক্রিয়েন্টের— গুন্ডা খুনি ক্লাসের লোকের মিটিং প্লেস। তারা এখানে এমন অনেক কাজ করে, যা চোখের আড়ালে করা সুবিধের। এটা তাদের জমিদারি, কাউকে হাত বাড়াতে দেবে না। সাধারণ মানুষের সাধ্য নয় তেরো নম্বর কিনে তার পজেশান নিতে পারে। জ্যাকির মতন অবস্থা হবে। ঠিক এইজন্যেই খদ্দের জোটে না বাড়িটার।"

তারাপদ ঠাট্টার গলায় বলল, "আমাদের এখানে এটা নতুন কিছু নয়, সার। কত বাড়ি শুনি বেওয়ারিশ সম্পত্তির মতন পাড়ার মাস্‌লম্যানরা অকোপাই করে নিয়েছে। তাদের পেছনে আবার সাপোর্ট থাকে...।"

চন্দন অনর্থক কথা থামিয়ে দিয়ে কিকিরাকে বলল, "কিকিরা, এই বাড়ি, ঘর— একটা 'ডেন অব মিসক্রিয়েন্টস'— সেটা ধরেই নিচ্ছি। আপনার আরও একটা কথা আছে বলবার। সেটা কী?"

"সেটা এই যে, এখানে অত্যন্ত মূল্যবান একটা কিছু রয়েছে লুকোনো।"

"কী?"

"নেপালবাবুর কথা যদি সত্যি হয় তবে বিশ্বাস করতে হয় পর্তুগিজ সাহেব যে ক্রুশটি চুরি করেছিলেন পাদরি পেইজ-এর সেই জিনিসটি..."

"অসম্ভব।"

"কেন! কোথাকার পাদরি পেইজ..."

"নেপালবাবু বলেন, আফ্রিকার।... ওটা নাকি গল্প নয়। বিখ্যাত পাদরি। পর্তুগিজ। নিজের দেশ থেকে আফ্রিকায় গিয়েছিলেন।

"আমি বিশ্বাস করি না। ক' শো বছর আগেকার এক গল্প..."

"তিন-চারশো বছর আগেকার ধরে নাও। পাদরির ক্রুশটা তো তার গলায় তখন ঝুলত না। চার্চে ছিল। হয় অ্যাবেসেনিয়ার, না হয় লিসবনের কোনও চার্চে। কেউ চুরি করেছিল। আমাদের পর্তুগিজ সাহেবের হাতে আসে জিনিসটা। লোকটি

আদতে ছিল সেলার। পরে এ দেশে এসে ঠিক কোথায় উঠেছিল, কালিকট না কোচিন বলা মুশকিল। শেষে কবে থেকে গুছিয়ে বসে কলকাতায় এসে...”

জ্যাকিও মাথা নাড়ল। বলল, সে এরকম কোনও কথা আগে শোনেনি, পর্তুগিজ সাহেবের।

তারাপদ বলল, “আপনি এখনও সেই ক্রশের কথা ভাবছেন! যদি সেটা থেকেও থাকে, পাগলা হ্যারিশের হাতে যাবে কেমন করে?”

কিকিরা মাথা নাড়লেন। “যাওয়ার কথা নয়। তবে ঘটনাচক্রে অনেক অঘটনই ঘটে যায়। দু’-চারশো বছরের আগেকার জিনিস হামেশাই হাতে এসে যায় আচমকা। ...বেশ তো, তোমরা বিশ্বাস কোরো না। তবে আমি একবার চেষ্টা করব। মনে হয় না, জিনিসটা যদি থাকেও, অবিকল সেইভাবে পাব। তবে পর্তুগিজ সাহেব যদি দয়া করে থাকেন একটা আঁচ পেতে পারি।”

চন্দন বলল, “ঠিক আছে। এখন চলুন। বিকেল পড়ে আসছে।”

॥ ১০ ॥

বাইরের ঝিরঝিরে বৃষ্টি পড়ছে। সন্ধেও হয়ে এল।

ছেনুর রেস্তরাঁয় ছোট একটা খুপরি আছে পেছন দিকে। ওই খুপরিতে বসে ছেনু মাঝে মাঝে জিরিয়ে নেয়, হিসেবের খাতাপত্র দেখে কখনও। আবার গল্পগুজবও করে পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে।

কিকিরাকে সেই খুপরিতে বসিয়ে ছেনু কথা বলছিল। কিকিরার সামনে চায়ের কাপ। দুধে একেবারে সাদা। চিনিরও মাত্রা নেই।

কিকিরার কথা শুনে ছেনু তার গোঁফ একটু চুলকে নিল। তারপর বলল, “মামু, আমি নিজে আর কোথাও হাত লাগাই না আপনি জানেন। দীক্ষাটিক্ষাও নিয়ে নিয়েছি। পুজো আর্চা করি না করি, বাড়িতে মা কালীর মূর্তির পায়ে দুটো জবাফুল না দিলে শান্তি পাই না। ও-কথা যাক, আপনার দরকারে দু’-চারটে সোলজার আমি জুটিয়ে দিতে পারব।”

কিকিরা বললেন, “শোনো, খুনোখুনির কাজ এটা নয়। সেরেফ গার্ড। ওই তেরো নম্বর বাড়িটা আমি একদিন ঘেরাও করতে চাই।”

“থানায় বলুন না।”

“না। থানায় বললে কাজ হবে না। ...আর থানা যদি নজর রাখত ওই বাড়িতে কি গুন্ডাবদমাশদের আখড়া হত! আমি তোমায় বলছি— ওখানে একটা ঘাঁটি আছে। জুয়া নেশাভাঙ...”

“আরে এ তো আজকাল শহরের রীতি হয়ে গেছে, মামু! এরা হল পাতি গুন্ডা। নোংরা কাজ করে পেট ভরায়। আমাদের টাইমে ছুঁচোগিরি ছিল না। হ্যাঁ— হাত পা চালাবার আগে হাঁক মারতাম। তাতেই সব ভড়কে যেত।”

"তুমি তা হলে লোক দিচ্ছ?"

"হয়ে যাবে।"

"আমরাও ক'জন আছি।"

"আমার তরফে ক'জন সোলজার লাগবে?"

"দু'-তিনজন।"

"ভাববেন না। ...সোলজাররা মেশিন তৈরি রাখবে?"

"মেশিন—!"

ছেনু যেন মুখ আলো করে হাসল, তারপর হাত আর আঙুলের ইশারায় পিস্তলের ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিল।

কিকিরা সভয়ে মাথা নাড়লেন। "না না, ওসব একেবারেই নয়। অন্যরকম কিছু হলে বিপদে পড়ে যাব।"

ছেনু মাথা নাড়ল। "মামু, ভয় দেখাবার জন্যে বলছিলাম। চালাবে না।"

"না। দরকার নেই।" কিকিরা উঠে পড়বার জন্যে তৈরি। "আমি তোমায় কাল-পরশুর মধ্যে দিনটা জানিয়ে দেব। ধরে নাও, এই হপ্তার শেষে। তুমি কথা বলে রাখবে।"

ছেনু মাথা হেলিয়ে সায় দিল।

উঠে পড়ে কিকিরা বললেন, "ছেনু, একটা কথা বলতে পারো? অবশ্য তুমি জানবে কেমন করে! ওই যে ভদ্রলোক নেপালবাবুর কাছে আমায় নিয়ে গিয়েছিলে— উনি কি গল্পগাছা করতেই ওস্তাদ, না, সত্যিই খোঁজখবর রাখেন...?"

ছেনু বলল, "উনি বুড়ো মানুষ। কর্পোরেশনে চরে বেড়িয়েছেন অনেককাল। এমনিতেও শুনেছি পেটে বিদ্যে আছে। এর বেশি কিছু জানি না, মামু!"

কিকিরা ছাতাটা উঠিয়ে নিলেন। ছেনুর ঠিক যা বলা উচিত তার বেশি কিছু বলেনি। সে এর বেশি কী বা জানবে!

"চলি ছেনু। যা বললাম মনে রেখো।"

কিকিরা রাস্তায় নেমে বুঝলেন, বৃষ্টির জোর সামান্য বেড়েছে।

দু'-দশ পা এগিয়ে একটা ট্যাক্সিই ধরেছিলেন কিকিরা। ঘড়ি দেখার দরকার নেই। আন্দাজেই বোঝা যায় আটটা বাজেনি এখনও।

জ্যাকির চেম্বারের বাড়িটার সামনে এসে ট্যাক্সি ছেড়ে দিলেন। একহাতে ছাতা ধরে আছেন, অন্য হাতে রুমাল। মুখের একপাশ রুমালে চাপা।

জ্যাকির রোগী দেখা প্রায় শেষ। কার যেন দাঁত ফিলিং করছিল। চেম্বারের ভেতর থেকে অস্পষ্ট কথা ভেসে আসছিল এক-আধবার।

সামান্য পরেই লোকটা বেরিয়ে এল। চিনে। মাঝ বয়েসি।

জ্যাকির চেম্বারে একটা ছোকরা থাকে, হিন্দি সিনেমার ফাইটারদের মতন

মাথার চুল, ছোট ছোট, এক কানে একটা তামার আঙটা ঝোলানো।

কিকিরা চেম্বারে ঢুকে পড়লেন।

"অ্যাঙ্কল—?"

"চলে এলাম। ...আজ তুমি কোনও ফোন পেয়েছ?"

মাথা নাড়ল জ্যাকি। এখনও পায়নি।

জ্যাকির অফিস-টেবিলটা দেওয়াল ঘেঁষে। জানলার দিকে দাঁত-তোলার হেলানো চেয়ার। হাত কয়েক তফাতে কাচের শেলফের মধ্যে নানা ধরনের যন্ত্রপাতি। একটা র‍্যাকে গোটা কয়েক ছাঁচ পড়ে রয়েছে দাঁতের।

কিকিরা বললেন, "ক'টা বাজল?"

"এইট ফিফটিন।"

"আর দশ-পনেরো মিনিট দেখো। যদি ফোন আসে ভাল কথা—" বলতে বলতে টেবিলের পাশে রাখা চেয়ারে গিয়ে বসলেন। চুরুট ধরালেন অন্যমনস্কভাবে। বললেন, "যদি আজ ফোন আসে, আমায় একবার গলাটা শুনতে দিয়ো। তবে কথা বলার সময় তোমায় একটা চালাকি করতে হবে। ঘাবড়াবে না, ভয় পাবে না। শুধু বলবে... কী বার যেন আজ, মঙ্গলবার, এগারো তারিখ, ...বলবে আসছে রবিবার— সান্‌ডে সন্ধের পর তোমায় তেরো নম্বরে মিট করতে।"

"আমায় মিট করতে বলব?" জ্যাকি কিছুই বুঝল না।

"বলবে। বলবে, তুমি একটা মিটমাট করতে চাও। সেটেলমেন্ট। এভাবে চলতে দিয়ে লাভ নেই। তা ছাড়া, তুমি যদি তার সামনাসামনি বসে কথা বলতে পারো— তারও লাভ হবে। তোমার হাতে এমন একটা ইনফরমেশান আছে— যাতে সে হাত লাগালে অনায়াসে কয়েক লাখ টাকা বানাতে পারে। মানে— দু' জনে ভাগাভাগি হলেও— ফিফটি ফিফটি— সে লাখ কয়েক হাতে পেয়ে যেতে পারে।"

জ্যাকি কথা বলতে পারছিল না। মাথায় ঢুকছিল না, কী বলছেন কিকিরা। বোকার মতন তাকিয়ে থাকল। "অ্যাঙ্কল, লাখ টাকা— লাখ লাখ টাকা— হোয়ার ফ্রম! আর ইউ ম্যাড?"

কিকিরা বললেন, "কী করব হে বাপু! আর কিছু মাথায় আসছে না। এটা আমার বাজি ধরা। প্লেয়িং লাস্ট কার্ড! লাগলে লাগবে, না লাগলে— তোমায় বলব, তেরো নম্বর বাড়ির আশা ছেড়ে দেওয়াই ভাল। দাদনের টাকা তুমি ফেরত পাবে কি পাবে না আমি জানি না। একটা কাঁচা লেখাপড়া কী করেছ তালুকদারদের সঙ্গে, আমি বাপু জানব কেমন করে!"

জ্যাকি বলল, "আজ যদি ফোন না আসে? রোজ তো আসে না।"

"কাল আসবে, পরশু আসবে...! এলেই যেমনটি শিখিয়ে দিলাম বলবে লোকটাকে। তারপর আমায় খবর দিয়ে আসবে। হাতে আমার অন্তত দু'-একটা

দিন থাকা দরকার। ...মাঝে চারটে দিন রইল। দেখো কী হয়।"

সাড়ে আটটা বেজে গেল।

জ্যাকি বলল, "আর ওয়েট করবেন?"

"না, চলো।"

"আমি সঙ্গে যাই।"

"না। আমি পেশেন্টের মতন এসেছি। পেশেন্টের মতন চলে যাব।"

"অ্যাঙ্কল ওদের ওয়াচ-ম্যান আছে..."

"আমার কিছু হবে না। এখানে ট্যাক্সি পেয়ে যাব।"

"নীচে পানওয়ালা আছে। আপনি ওয়েট করবেন। ট্যাক্সি পেলে তবে—"

"ঠিক আছে।"

কিকিরা ছাতা তুলে নিয়ে চলে যাওয়ার আগে আরও একবার মনে করিয়ে দিলেন জ্যাকিকে কী কী বলতে হবে ফোন পেলে।

জ্যাকি মাথা নাড়ল। বলল, "অ্যাঙ্কল, ফোন যদি না আসে। এই উইকে এল না?"

"পরের হপ্তায় আসবে। জ্যাকি, সোজা ব্যাপারটা ভেবে দেখো। ওরা তোমায় নজরে রেখেছে দিনের পর দিন। রেখেছে কিনা!"

"আমি ওই তেরো নম্বর বাড়িতে যাওয়ার পর থেকেই।"

"মোর দ্যান এ মান্থ!"

"হ্যাঁ।"

"তুমি আজকাল একা তোমার ভাইকে নিয়ে কতবার গিয়েছ আমি জানি না। আমাদের নিয়ে ক'বারই গিয়েছ। ওরা সেটা দেখেছে।"

"আপনি পাঁচবার গিয়েছেন। আপনারা সবাই তিন-চারবার।"

"ফোন তুমি পাবে।"

জ্যাকি আর কিছু বলল না।

কিকিরাও আর দাঁড়ালেন না চেম্বারে।

নীচে নেমে পানের দোকানের সামনে দাঁড়ালেন কিকিরা। বৃষ্টি থামেনি। জোরেও পড়ছে না। ছাতা মাথায় কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকলেন। রাস্তার আলো বৃষ্টির জলে ঝাপসা হয়ে রয়েছে।

ট্যাক্সি চোখে পড়ছিল না কিকিরার।

হাঁটতে লাগলেন।

আন্দাজে ঢিল ছোড়ার মতন একটা ঢিল তিনি ছুড়ে দিয়েছেন, সেটা লাগবে কি লাগবে না তিনি জানেন না । তবে কথায় আছে, ক্রিমিন্যালদের মনের পাল্লা লোভের দিকেই ঝুঁকে থাকে বেশিটা। দেখা যাক, কথাটা এখানে কতদূর খাটে!

ঘুটঘুটে অন্ধকারে কে যেন হাত রাখল কাঁধে। লোকটি চমকে উঠল। "কে?"

লোকটির গায়ে গায়ে দু'-এক পা পিছনে তার সঙ্গী ছিল। সাবধানে আসছিল সে। চোখ কান সতর্ক। তবু সে বুঝতে পারেনি, অন্য কেউ অন্ধকারে লুকিয়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গে পকেটে হাত দিল সে। দিয়েই বুঝতে পারল, তার ঠিক পিঠের কাছে কেউ দাঁড়িয়ে আছে।

"আসুন!"

"কে আপনি? এভাবে গায়ে হাত দিলেন?"

"গলার স্বর থেকেই আপনি বুঝেছেন আমি কে? তা ছাড়া আপনার মতন বুদ্ধিমান মানুষ নিশ্চয় আন্দাজ করেছিলেন আমি এখানে হাজির থাকতে পারি। আসুন আপনারা...!"

সেই ঘর। প্রথমে টর্চ, পরে দুটো বড় মোমবাতি জ্বেলে দিল জ্যাকি।

কিকিরার গায়ে কালো আলখাল্লা গোছের জামা, প্যান্টটাও কালো। মাথায় কালচে রুমালের ফেট্টি। লোকটির দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলেন কিকিরা। বললেন, "ম্যানেজারবাবু, আমি আদতে ম্যাজিশিয়ান। আমরা কখন কীভাবে কোন খেলা দেখাব সেইভাবে সাজতে পারি। রাজাগজা থেকে সন্ন্যাসী—সবই। ওগুলো চমক। পার্ট অব দ্য গেম! আমাদের যা মানায় আপনাকে মানাবে কেন, মশাই! আপনি তালুকদারদের গদির—সেরেস্তাই ধরুন, গদির ধুতি পাঞ্জাবিপরা ম্যানেজার। চাঁদনির প্যান্ট শার্ট আপনাদের মানাবে কেন? মাথার চুল এতটা কালো নয় আপনার। ওটাও চালে ভুল...।"

ম্যানেজার চুপ করে থাকলেন। ঘরের মধ্যে কালো বাক্সটা দেখতে পাচ্ছিলেন না। কোথায় গেল? কফিন বাক্সই বা কোথায়? তার বদলে এক লম্বাটে সরু বেঞ্চির ওপর যেন চাদর পাতা। মাটি পর্যন্ত ঝুলে রয়েছে! ওটাই কি কফিন বাক্স! কিকিরার ঠাট্টা হজম করছিলেন মুখ বুজে।

কিকিরা ম্যানেজারের সঙ্গীর দিকে তাচ্ছিল্যের চোখে তাকালেন। "আপনার বডিগার্ড? এ পাড়ার? রাজা না কী নাম! শের বলে লোকে!"

রাজা যেন খাঁচায় ধরা পড়েছে। রাগে তার চোখ জ্বলছিল, কিন্তু একেবারে অসহায়। জ্যাকির বক্সিংলড়া ভাই, ট্যানারিতে কাজ করতে করতে যেন নিজের গায়ের চামড়াই পালটে ফেলেছে, রাজার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে। চাদর ঢাকা লম্বা বস্তুটার মাথার দিকে তারাপদরা।

কিকিরা ম্যানেজারকে বললেন, "আমি আমার মক্কেল জ্যাকির হয়ে কথা বলছি। আপনি তো সেটা বিলক্ষণ বোঝেন। এটা আদালত নয়। তবু একটা বোঝাপড়ার কথা ছিল বলে আপনার সঙ্গে কয়েকটা বাতচিত...আলাপ আর কি করতে হচ্ছে। কী নাম আপনার? আমরা জানি নামটা, তবু একবার নিজের মুখে

বলুন?”

ম্যানেজার দু' মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললেন, “নরেশ মজুমদার।”

“নরেশচন্দ্র মজুমদার,” কিকিরা বললেন মজার গলায়, “মাঝেরটা বাদ দেবেন না, মশাই, মাঝ হল স্যাকরার জোড়। আপনি তো পদ্মপুকুরে থাকেন?”

“হ্যাঁ। তাতে কী?”

“তালুকদারদের কাছে কাজ করেছেন ক' বছর?”

“ষোলো বছর।”

“ষোলো।... নরেশবাবু, আপনি একটু গোলমাল করছেন। দু' বছর বড়বাবুর কাছে চা বাগানে ছিলেন। উনি বোধ হয় আপনাকে তাড়িয়ে দেন। তারপর...”

“তাড়িয়ে দেননি। বনিবনা হয়নি।”

“এখন আপনার বয়েস বোধ হয় বাহান্ন-চুয়ান্ন! তা মশাই, আপনি ছোটবাবুর মাথায় কাঁঠাল ভাঙছিলেন—ভালই ছিলেন। হঠাৎ ঘটককে নিয়ে খেলতে গেলেন কেন? আপনি তাকে খুন করিয়েছেন।”

ম্যানেজার নরেশের মুখ ভয়ে আতঙ্কে কেমন যেন হয়ে গেল। চোখ স্থির। পাতা পড়ছিল না।

কিকিরা অপেক্ষা করতে লাগলেন।

নরেশ হঠাৎ চিৎকার করে বলল, “আপনি কে? পুলিশের মতন কথা বলছেন! ঘটককে আমি খুন করিয়েছি? কেন? কে বলেছে এ-কথা? ঘটকের ফ্যামিলি?”

কিকিরা মাথা নাড়লেন। “না, তার ফ্যামিলির লোক আজও জানে না সে কোথায় হারিয়ে গিয়েছে! থানা পুলিশ ভবানী ভবন কম করেনি। নো ট্রেস—! তবে আপনি জানেন ঘটক কেন খুন হয়েছিল।”

“আমি জানি?”

“জানেন। পাগলা হ্যারিশের হাতে লেখা একটা কাগজ আর কিছু লেখার কথা ঘটক দেখেছিল। চুরি করেছিল। আপনি তার কাছে দেখেছিলেন মাত্র ; হাতাতে পারেননি। ঠিক সেইজন্যে এই বাড়িতে ঘটককে আপনারা খুন করেন।”

“মিথ্যে কথা। বানানো কথা।”

“মিথ্যে কথা!” কিকিরা রাজার দিকে তাকালেন। “রাজা! এ-বাড়িতে প্রায় চার বছর আগে খুন হয়েছিলেন একজন। তুমি জানো কে খুন করেছিল।”

রাজা বলবে কি বলবে না করে বলল, “আমি করিনি সার, আমাদের গুরু মায়ারাম করেছিল। সে গত বছর ব্যাঙ্ক ডাকাতি করতে গিয়ে পুলিশের গুলিতে মারা গেছে।”

“যাক, ল্যাঠা চুকেছে,” কিকিরা বললেন। “তুমি তবে একটা কথা স্বীকার করছ, ঘটকের প্রাণটা তোমার গুরুর হাতেই গিয়েছে! শুধু আর-একটা কথা বলো, এই ম্যানেজারবাবুই টাকা খাইয়ে খুন-খারাবির কাজটা করিয়েছে কি না?”

রাজা একেবারে অসহায়। কথা লুকোবার চেষ্টা করে লাভ নেই। মাথা হেঁট

করে স্বীকার করে নিল।

নরেশ মজুমদার কর্কশ গলায় বললেন, "এটা কোনও প্রমাণ নয়। আইন আদালত করে বুড়ো হয়ে গেলাম মশাই। রাম বলল, শ্যামের কথায় যদু খুন হয়েছে আর আইন তা মেনে নেবে! মামার বাড়ি!"

ম্যানেজারের কথার কোনও জবাব না দিয়ে কিকিরা রাজাকেই বললেন, "তোমরা এ-বাড়িতে আসো! জানলা টপকে। তোমরাই এই ঘরের দরজা বাইরে থেকে কাঠের তক্তা মেরে বন্ধ করে রেখেছিলে, যাতে কেউ ঘরে আসতে না পারে?"

রাজা চুপ। তার গলায় পাতলা সোনার হার। হারের সঙ্গে একটা লকেট। কার লকেট কে জানে!

"এখানে কেন আসতে?" কিকিরা বললেন। "তুমি না বললেও আমরা জানি। এই ঘর থেকে তোমাদের ব্যবসা হত। চোরাই নেশা—গাঁজা চরস কোকেন—ওই যে কীসব বলে এখানে লুকিয়ে রাখতে আমদানি হলে, পরে বাইরে গিয়ে পার্টির কাছে বিক্রি করতে। নস্যির কৌটোয় কী থাকত হে? নেশা? পাউডার। তেরো নম্বরের ভাঙা পুরনো বাড়ি, ছাদের দিকের ঘর—তোমাদের আড্ডা হয়ে উঠেছিল। জায়গাটা পছন্দসই, তাই না!"

রাজা একবার আড়চোখে ম্যানেজারের দিকে তাকাল, "মজুমদারবাবু আমাদের একটা মাসখরচা দিতেন। বলেছিলেন, বাড়িটা নজরে রাখতে। আমরা সার—"

কিকিরা কথা শেষ করতে দিলেন না রাজাকে, বললেন, "জানি, মানে পরে বুঝতে পারলাম।" বলে ম্যানেজারের দিকে তাকালেন, "ঘটকের সেই কাগজটা তো আপনার কাছে নেই। নকলটা আছে। আপনি ঘটককে ধোঁকা দিয়ে কাগজটার নকল করিয়ে নিজের কাছে রেখেছেন। তাই না?"

"কী করেছি সেটা আমার ব্যাপার—"

"ব্যাপার আপনারই কিনা বলতে পারব না। তবে কাগজটা যদি দেখান—"

ম্যানেজার বুঝতে পারলেন, গায়ের জোর দেখিয়ে লাভ হবে না। তিনি একা। খানিকটা ইতস্তত করে পকেট থেকে একটা কাগজ বার করে দিলেন। ময়লা চিট হয়ে গিয়েছে কাগজটা। চার ভাঁজে ভাঁজ করা।

কাগজটা নিলেন কিকিরা। মন দিয়ে দেখলেন। দেখালেন জ্যাকিকে। তারাপদ আর চন্দনও দেখল।

অনেকক্ষণ পরে কিকিরা বললেন, "মশাই, এই বাগানের একপাশে একটা জাহাজি কম্পাসের ছবি। অন্য একপাশে একটা হাওয়া-মোরগ বা ওয়েদার কক-এর ছবি। তলায় একটা অঙ্কের মতন কী লেখা আছে। আপনি এরই ভরসায় বসে আছেন কবে লাখ লাখ টাকা কামাবেন!"

"আপনি বেশি পণ্ডিত!"

"না, আমি পণ্ডিত নয়। মুখ্যুসুখ্যু মানুষ। তবে একটা কথা আপনাকে বলতে পারি। পর্তুগিজ পাদরি ফাদার পেইজ-এর গলায় পাথরের মালার সঙ্গে যে ক্রশ-লকেটটা ঝুলত, সোনা আর দামি পাথর দিয়ে তৈরি—সেটা চুরি গিয়েছিল ঠিকই—লিসবনের এক গির্জা থেকে। পরে ধরা পড়ে ওটা আসল নয়, নকল।"

"নকল?"

"হ্যারিশও এই ভুল করেছিল।..। অত কথায় দরকার কীসের, এখানকার গঞ্জেলাস কোম্পানিতে গিয়ে খোঁজ করলেই পারেন।"

নরেশ মজুমদার বিশ্বাস করতে পারছিলেন না।

কিকিরা তারাপদদের কী ইশারা করলেন চোখে চোখে।

লম্বাটে টেবিল—মানে কফিন বাক্সটার ওপরে একটা মোটা চাদর পাতা ছিল। ঢাকা দেওয়া ছিল। তারাপদরা চাদরটা সরিয়ে নিল।

কিকিরা যেন কোনও ম্যাজিক দেখাচ্ছেন। বাক্সর মাঝামাঝি জায়গায় দাঁড়িয়ে জ্যাকিদের বললেন, ওপরের ডালাটা খুলে ফেলতে।

ডালা খোলা হল।

"ম্যানেজারবাবু—না মজুমদারমশাই, কী বলে ডাকব আপনাকে। তা সে যাই হোক, আপনি এবার এই কফিন বাক্সের মধ্যে এসে শুয়ে পড়ুন। আমরা ডালাটা বন্ধ করে দেব। ভাববেন না দরজা জানলা খোলা থাকবে। সব বন্ধ করে দিয়ে চলে যাব আমরা।...আসুন!"

মজুমদার ভয় পেয়ে পালাতে গেল, পারল না।

কিকিরার কাছে তাঁকে ধরে আনল জ্যাকি আর চন্দন।

কফিনের ভেতরের দিকটা দেখালেন কিকিরা। একটা লোক শুয়ে আছে। বাক্সর মাথার দিকের মানে—পাশের কাঠ খুলে ফেলা হয়েছে, যাতে যে শুয়ে আছে তার শ্বাসপ্রশ্বাসের অসুবিধে না হয়।

কিকিরা লোকটিকে উঠতে বললেন। সে উঠে পড়ল।

মজুমদার ঘামছিল।

কিকিরা বললেন, "আপনি ভাববেন না বেঁচে গেলেন। এতক্ষণ যে শুয়ে ছিল সে আমাদের বন্ধু। কিন্তু পুলিশের লোক। ওর নাম অবনীশ। চন্দনের বন্ধু। পুলিশেই আছে। তবে অন্য লাইনে। তবু পুলিশ পুলিশই। আপনার বিরুদ্ধে সাক্ষী হয়ে রইল ও। বাকিটা কী হয় দেখা যাক।"

রাজা আচমকা মজুমদারের ওপর ঝাঁপ দিয়ে পড়ল।

কিকিরা যেন দেখেও দেখলেন না। চন্দনদের বললেন, "চলো হে! চলো।" বলে অবনীশের দিকে চোখ টিপে হেসে বললেন, "কথায় আছে শিশুরা মাতৃক্রোড়ে সুন্দর! তাই না! কফিন বাক্সের মধ্যে পুলিশের শুয়ে থাকাটাও খারাপ দেখাচ্ছিল না! কী বলো, চাঁদু?"

ওরা হেসে উঠল।

নীল বানরের হাড়

নীল বানরের হাড়

মুখোমুখি দেখা।

"আরে, রায়বাবু যে!"

কিকিরা হাসলেন। পরিচিতজনকে দেখলে কিকিরা ডান হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে অন্যজনের হাত ধরে ফেলেন। এটা তাঁর অভ্যেস। বরাবরের। "নন্দবাবু! অনেকদিন পরে দেখা। কেমন আছেন?" নন্দবাবুর হাত আলগাভাবে চেপে ধরে কিকিরা বললেন।

"টিঁকে আছি। আপনি কেমন আছেন? সেই কবে কানাই দত্তর মেয়ের বিয়েতে আপনাকে দেখেছিলাম। বছর চার-পাঁচ হয়ে গেল। তারপর আর দেখাসাক্ষাৎ নেই। এদিকে আসেন না?"

কিকিরা হালকা গলায় বললেন, "কমই আসা হয়। এক-আধবার ভেবেছি আপনার সঙ্গে দেখা করে যাই। হয়ে ওঠেনি।"

"আজ তা হলে ছাড়ছি না। আসুন। দোকানে বসে একটু চা খাবেন ; গল্পগুজব হবে।"

সামান্য তফাতেই নন্দবাবুর দোকান। এখান থেকেই সাইনবোর্ড দেখা যাচ্ছে : 'দাশ অ্যান্ড কোং'। তলায় ছোট হরফে লেখা, ডিলার্স ইন ওল্ড ফার্নিচারস। তার তলায়, ইএসটিডি ; নাইনটিন টুয়েন্টি এইট। মানে, উনিশশো আঠাশ সালে প্রতিষ্ঠা হয়েছিল দোকানটির।

কিকিরা নন্দবাবুর দোকান সম্পর্কে অল্পবিস্তর জানেন। এককালে চেনাজানা, বন্ধুত্ব ছিল। দোকানে বসে আড্ডাও মেরেছেন। দোকান দিয়েছিলেন নন্দবাবুর বাবা। ভদ্রলোক সেকালের বিখ্যাত এক সাহেব-কোম্পানির আসবাবপত্রের দোকানে কাজ করতেন, হরেকরকম নকশা বুঝতেন, কাজ জানতেন, কাঠ চিনতেন। সেই কোম্পানি অন্য হাতে চলে যাওয়ার পর নন্দবাবুর বাবা নিজেই দাশ কোম্পানির দোকান খোলেন। অবশ্য, সাবেকি আসবাবপত্র কেনা, নিলাম থেকে তুলে আনা, ছোটখাটো মেরামতির কাজ, নতুন করে রং পালিশ—এর বাইরে অন্য কিছুতে হাত দেননি। পুরনো আসবাবপত্র নিয়েই ছিল তাঁর ব্যবসা। ভালই চলত।

তখনকার দিনে সাবেকি আর সাহেববাড়ির টেবিল চেয়ার আলমারি দেরাজ সাজ-আয়নার ওপর মানুষের ঝোঁক ছিল। পছন্দও করত। শখের জিনিস সস্তাও পড়ত তুলনায়।

নন্দবাবুর বাবা মারা যান প্রৌঢ় বয়েসেই। বাবা বেঁচে থাকতেই উনি দোকানে গিয়ে বসতেন। বছর পঁচিশ বয়েস থেকে মোটামুটি দশ-বারো বছর বাবার সঙ্গে দোকানে কাটানোর পর নন্দবাবু একা হয়ে গেলেন। তখন তাঁর বয়েস পঞ্চাশের এপারে। পঞ্চান্নর মতন।

দোকানের দিকে হাঁটতে হাঁটতে কিকিরা নন্দবাবুকে বললেন, "দোকান ছেড়ে এই শেষ দুপুরে আপনি কোথায় গিয়েছিলেন, মশাই?"

নন্দবাবু ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালেন। "থানায়।"

"থানায়?" কিকিরা অবাক।

নন্দবাবু বললেন, "রাগের মাথায় থানা পর্যন্ত গেলাম। থানার একজনকে চিনি। ধীরেন মজুমদার। ... তা থানার সামনে গিয়েও কেমন মনে হল, ঝট করে একটা কিছু করে ফেলা কি ভাল হবে! থানা-পুলিশের ঝঞ্ঝাটও অনেক। পরে ঠেলা সামলাতে প্রাণ বেরিয়ে যাবে হয়তো।"

কিকিরা কিছুই বুঝলেন না। নন্দবাবুকে দেখছিলেন।

নন্দবাবুর পুরো নাম, নন্দদুলাল দাশ। বছর পঞ্চান্ন বয়েস হলেও বয়েসের তুলনায় আরও সামান্য বেশি মনে হয়। সেটা তাঁর চেহারার জন্যে। মাঝারি মাপের গড়ন হলেও মাথায় প্রায় চুল নেই। যা আছে তারও অর্ধেক সাদা। চৌকোনো মুখ। গালের হাড় স্পষ্ট। তামাটে রং গায়ের। চোখে আপাতত খানিকটা বিরক্তি। নন্দবাবুকে রুক্ষ না হোক শুকনো দেখাচ্ছিল। গায়ে শার্ট। পরনে ধুতি। উনি বেশিরভাগ সময়ে সাদা শার্টই পরেন। পরনের ধুতি মিলের।

দোকানের সিঁড়িতে পা দিয়ে নন্দবাবু বললেন, "আসুন।"

কিকিরা মাথা নাড়লেন, "চলুন।"

ফুটপাথ-ঘেঁষে দোকান। বিশাল নয়, আবার ছোটও নয়। এই দোকানের কোনও বাহার নেই। লম্বাটে দোকান-ঘর। চারপাশে পুরনো আসবাবপত্র। টেবিল, দেরাজ, ড্রেসিংটেবিল, আর্মচেয়ার, কাঠের দোলনা-ঘোড়া, আলমারি, খাট, বুককেস—এইসব। অনেক জিনিস আলগা করে খুলে রাখা, যেমন খাটের মাথা আর পায়ের দিক, পাশের লম্বা কাঠ, ড্রেসিং টেবিলের আয়না, টেবিলের মাথা বা টপ। খুলে না রাখলে জায়গা হওয়ার উপায় নেই। প্রায় গুদোম মতন এই দোকানেরই একপাশে বসে জনা দুই কারিগর কাজ করছে। ছোটোখাটো সারাই, পালিশের কাজ। কম বয়েসের একটা ছোকরা ফরমাশ খাটছিল। দোকানের মধ্যে রং পালিশ টারপিন তেলের গন্ধ। ঠাসাঠাসি কাঠকুটোর চাপা গন্ধ তো আছেই।

ওরই মধ্যে দোকানের সামনের দিকে নন্দবাবুর বসার চেয়ার টেবিল। টেবিলে বিশেষ কিছু নেই। খাতাপত্র দু'-চারটে, স্কেল, মেজারমেন্ট টেপ, একটা ডেস্ক

ক্যালেন্ডার, টেলিফোন, পেপারওয়েট। মাথার ওপর দেয়াল কুলুঙ্গিতে তামার গণেশ, লক্ষ্মীর পটও ঝুলছে একপাশে। শুকনো ফুল, ধূপের কাঠি—সবই নজরে পড়ে।

নন্দবাবু বললেন, "বসুন রায়বাবু। পাখাটা চালিয়ে দিই।" বলে টেবিলের মাথার ওপর ঝুলন্ত পাখাটা চালিয়ে দিলেন। "বেশ গরম পড়ে গেল কী বলুন।"

নন্দবাবুর টেবিলের উলটো দিকে দুটিমাত্র কাঠের চেয়ার। কিকিরা চেয়ার টেনে বসলেন। বললেন, "ফাল্গুন মাস শেষ হয়ে গেল ; গরম তো পড়বেই।"

"চা আনতে বলি। তার আগে একটু ঠাণ্ডা কিছু খাবেন?"

"না না। চা হলেই চলবে!"

"শুধু চা! কতদিন পরে দোকানে এলেন, একটু কিছু তো মুখে দেবেন। দুটো সন্দেশ অন্তত।" বলে নন্দবাবু আর অপেক্ষা করলেন না জবাবের, ছোকরা গোছের লোকটিকে ডাকলেন। "গণেশ, ভাল করে দু'কাপ চা, স্পেশ্যাল ; আর এঁর জন্যে শ্যামের দোকান থেকে ভাল সন্দেশ আনবে। টাকা নিয়ে যাও।"

গণেশ চলে গেল।

কিকিরা দোকানের চারপাশে তাকাতে তাকাতে বললেন, "কেমন চলছে ব্যবসাপত্র নন্দবাবু?" মুখে বললেন, কিন্তু মনে মনে তাঁর ধারণা হল, আগে যতটা সাফসুফ তকতকে দেখেছেন দোকানটা এখন আর ততটা নয়। এককালের মোটামুটি চলতি দোকান পড়তির অবস্থা হলে যেমন দেখায়—সেইরকমই দেখাচ্ছে।

নন্দবাবু বললেন, "ওই যে বললাম, টিঁকে আছি—, তাই। কোনওভাবে বেঁচে আছি। সেসব আগের দিনের কাস্টমার কোথায়! কে আর পুরনো জিনিসের কদর বুঝবে! চোখেও দেখেনি, ভালমন্দ বোঝার ক্ষমতাও নেই। কাঠ তো চেনেই না, খানদানি জিনিসের মর্যাদাও বোঝে না। আজকাল যতসব ফিনফিনে ওপর চকমকির দিন।" গলায় ক্ষোভ ও হতাশা লুকোবার চেষ্টা করলেন না নন্দবাবু। একটু থেমে আবার বললেন, "ফার্নিচারের দোকান তো কম নেই কলকাতায়। শয়ে শয়ে। সবই মডার্ন। মানে, সস্তায় কিস্তিমাত করে খদ্দেরের গলা কাটা। আমার মশাই, ওদিকে হাতেখড়ি হল না। বাবা যেখানে বসিয়ে গেলেন সেখানেই থেকে গেলাম।" বলতে বলতে নন্দবাবু পকেট থেকে সস্তা সিগারেটের প্যাকেট আর মামুলি লাইটার বার করে এগিয়ে দিলেন কিকিরাকে।

কিকিরা সিগারেট নিলেন। ধরালেন। অন্যমনস্ক ভাবে রাস্তার দিকে তাকালেন। ফুটপাথের এপাশে ছায়া পড়েছে। ওপারে এখনও ফাল্গুন শেষের রোদ। তেজ হয়তো সামান্য কমে এসেছে। বিকেল প্রায় চারটে। গরম পড়ে আসছে। হাওয়ায় দক্ষিণের ছোঁয়া আছে সামান্য। এলোমেলো। এপার থেকে ওপারে তাকালে—অন্যদিকের ফুটপাথ-ঘেঁষা দোকানগুলো দেখা যায় : একটা দোকান জুয়েলারির, পাশে চশমার দোকান, তার গায়ে গায়ে হোসিয়ারি স্টোর্স, একচিলতে পান-

সিগারেটের খুপরি। কোল্ড ড্রিংকসও সাজানো আছে। দুই ফুটপাথের মাঝখানে ট্রামলাইন।

কলকাতা শহরের উত্তর-ঘেঁষে এই দোকানটাকে যেন একটেরে দেখায়। অবশ্য কিকিরা জানেন, নন্দবাবুদের পৈতৃক বাড়ি এই পাড়াতেই। ওঁর বাবা যখন দোকান করেন, নিজের সুবিধে অসুবিধে বুঝেই করেছিলেন ; আর তখন—বছর সত্তর আগে—এসব অঞ্চল ছিল অন্যরকম। ভিড়ভাড়াক্কা নেই। অনেক নিরিবিলি।

নন্দবাবু কী যেন বললেন।

অন্যমনস্ক থাকায় কিকিরা খেয়াল করেননি। তাঁর চোখ ছিল ফুটপাথের অন্যদিকে। একটা আধমরা হেলেপড়া গাছ থেকে পাতা ঝরে পড়ছিল, শুকনো পাতা। ট্রাম চলে যাচ্ছিল।

"কিছু বললেন?" কিকিরা বললেন।

"আপনি এখন আছেন কোথায়?"

কিকিরা নিজের আস্তানা জানালেন। হেসে বললেন, "এবার ভাবছি ঠিকানা পালটাব। ওখানে ক'বছর কেটে গেল। বদল দরকার।"

নন্দবাবু হেসে বললেন, "আপনি তো বরাবরই ঠাঁই পালটান। তা এখন করছেন কী? আগেই তো ম্যাজিক ছেড়েছিলেন!"

"বেকারই বসে আছি বলতে পারেন। হাতে টুকটাক কাজ পেলে করি। আমারও চলে যাচ্ছে কোনওরকমে, আপনার চেয়ে খারাপ ছাড়া ভাল নয়।"

নন্দবাবুও সিগারেট ধরিয়েছিলেন। একমুখ ধোঁয়া গিলে বললেন, "এই দোকান আমি যে ক'দিন আছি, তারপর উঠে যাবে। আমার ছেলের মতিগতি আলাদা। সে-বেটা চাকরি-বাকরির দিকে ঝুঁকছে। পরীক্ষা দেয়, আর হাঁ করে বসে থাকে কবে গাছের ফল তার মুখে এসে পড়বে—এই আশায়। এমনিতে নিরীহ গোবেচারি গোছের। ব্যবসা তার লাইন নয়। পারবেও না।"

"যা পারে সেটা করাই ভাল। ... তা আপনি হঠাৎ থানায় যাচ্ছিলেন কেন—তা তো বললেন না!"

গণেশ মিষ্টি নিয়ে এল। এনে একটা কাচের প্লেট ধুয়েমুছে সন্দেশ আর জল এনে টেবিলের সামনে রাখল।

কিকিরা বললেন, "আপনি—?"

"না না, আমার টিফিন হয়ে গিয়েছে। মিষ্টি আমার বারণ। ব্লাড সুগার ধরব-ধরব করছে। মার্জিন লাইন। সামলে থাকতে হয়। বাড়ি থেকে টিফিন আনি, ময়দার দুটো রুটি, সবজি, শশার কুচি। নিন আপনি।" বলে কয়েক মুহূর্ত থামলেন ; তারপর বললেন, "দোকান সামলাতে এমনিতেই মেজাজ ভাল থাকে না, তার ওপর একটা ছোকরা—জানি না চিনি না—আমার দোকানে ঢুকে হম্বিতম্বি করে গেল। কী চোটপাট রাস্কেলের।"

কিকিরা অবাক হয়ে বললেন, "সে কী! হঠাৎ দোকানে ঢুকে—?"

"জানি না মশাই," নন্দবাবু বিরক্তির সঙ্গে বললেন ; রেগে উঠছিলেন ভদ্রলোক। "আমি করি ব্যবসা ; চুরিও নয়, ডাকাতিও নয়। কোন সেকেলে বনেদি বাড়ির অবস্থা একেবারে পড়ে গিয়েছে, শরিকি ঝগড়ায় ভাগ বাঁটোয়ারায় ছিটকে-ছটকে টুকরো-টুকরো ; কে কোথায় তার দু'তিন পুরুষের আগলানো জিনিসপত্র বেচে দিচ্ছে একটা একটা করে—এসব খোঁজপত্তর আমায় রাখতে হয়। আমার অবশ্য ফার্নিচারের ব্যাপার ; খাট আলমারি দেরাজ ড্রেসিংটেবিল—এসব নিয়ে কারবার। তেমন কিছু পেলে কিনে নিই। দু'-তিনটে কোম্পানি আছে, হপ্তায় হপ্তায় নিলাম ডাকে, তার বেশিরভাগই সাহেববাড়ির ফার্নিচার। তাও কেনার চেষ্টা করি। তারপর দোকানে এনে মেরামত রং পালিশ করে এখান থেকে বেচবার চেষ্টা করি। এই তো আমার ব্যবসা ...।"

কিকিরা জানেন সবই। একটুকরো সন্দেশ মুখে দিয়ে বললেন, "ছোকরা এসেছিল কেন?"

"কেন এসেছিল! এসেছিল তার ছোটদাদুর বাড়ি থেকে আমি যে আলমারিটা কিনে এনেছি সেটা ফেরত নিতে।"

"কেন? আপনি তো কিনে এনেছিলেন।"

"আলবাত। নগদ আড়াই হাজার টাকা দিয়ে রসিদ লিখিয়ে কিনে এনেছি।"

"কবে?"

"এই তো হালে। দিন আষ্টেক আগে।"

"ছোকরা জানে না?"

"বলছে তো আগে জানত না। সবে জেনেছে।"

"তার মানে? আগে জানত না, এখন জেনেছে—ব্যাপারটা কী?"

"বলল, সে তখন বাড়িতে—মানে কলকাতায় ছিল না। থাকলে আলমারি বেচতে দিত না দাদুকে।"

"কোথায় ছিল?"

"দিঘা।"

"বেড়াতে গিয়েছিল বুঝি!"

"কে জানে—!" তিরিক্ষে মেজাজে নন্দবাবু বললেন। "বারফট্টাই অনেক। বলল, দিঘায় একটা হোটেলের কাজ নিয়ে ব্যস্ত, কলকাতায় থাকতে পারছে না। ও যদি বাড়িতে থাকত আমি নাকি ধাপ্পা মেরে ভুলিয়ে ভালিয়ে বুড়োমানুষের কাছ থেকে ওই আলমারি কিনতে পারতাম না।"

চায়ের দোকান থেকে চা দিয়ে গেল। ধোয়ামোছা পরিষ্কার কাপ, প্লেটও দিয়েছে। বোঝাই যায়, নন্দবাবুর কথামতন স্পেশ্যাল করে বানানো। ওঁর চা আলাদা করে সামনে রাখল। মানে ভদ্রলোকের বোধ হয় চিনির বরাদ্দ নেই, বা নামমাত্র।

কিকিরা চায়ের কাপ টেনে নিলেন। তাঁর নাক গলাবার কথা নয়, তবু কেমন

কৌতূহল বোধ করছিলেন। চুরিচামারি ঠগজোচ্ছুরি নয়, দাম মিটিয়ে একটা জিনিস কিনে এনেছেন নন্দবাবু, তা হলে দোকানে এসে অন্যায়ভাবে তাঁকে শাসানোর মানে কী? কেন শাসাবে?

"ছোকরা ঠিক কী বলল আপনাকে?" কিকিরা জিজ্ঞেস করলেন।

"বলল, সাতদিনের মধ্যে আলমারি ফেরত দিয়ে আসতে। নয়তো এই দোকান ছাই হয়ে যাবে!"

"বাঃ, মগের মুলুক নাকি!"

"মশাই, আমিও তো তাই বললাম। রাস্কেল কী বলল জানেন, বলল, হ্যাঁ মগের মুলুকই। দোকানই শুধু জ্বালিয়ে দেব না, আপনার অন্য ক্ষতিও হতে পারে।"

"তার মানে মারধোর—?"

"হবে।" বলে ভেতরদিকটা দেখালেন, "ওই তো আমার কর্মচারীরাও ছোকরার হল্লা শুনেছে।"

কিকিরা বুঝতে পারলেন, ব্যাপারটা একেবারে তুচ্ছ হলে নন্দবাবু রাগের মাথায় থানার দিকে পা বাড়াতে যেতেন না। রাগই হোক, অথবা ভয়, কিংবা উত্তেজনা— তাঁকে বিচলিত করেছিল। শেষ পর্যন্ত অবশ্য তিনি থানায় যাননি।

চায়ের কাপে বার দুই চুমুক দিলেন কিকিরা। ট্রাম রাস্তার দিকে দেখলেন কয়েক মুহূর্ত। পরে মুখ ফিরিয়ে নন্দবাবুর দিকে তাকালেন। "আর আপনার টাকা, আড়াই হাজার—?"

"ফেরত দিয়ে দেবে।"

"আচ্ছা! ... আলমারিটা আপনি কাদের বাড়ি থেকে কিনেছিলেন?"

"হাতিবাগানের বিশ্বাসবাড়ি থেকে। বনেদি বাড়ি। দু'-পুরুষ হেসেখেলে কাটিয়েছে। ইংরেজ আমলে বাড়বাড়ন্ত হয়েছিল খুব। পাঁচরকম কারবারে কামিয়েছিল অনেক। যাতেই হাত দেয় তাতেই সোনা উঠে আসে। তিনপুরুষে এসে ভাঙন। শরিকি ঝগড়া, কোর্টকাছারি, ঘরবাড়ি ভাগাভাগি, দেখতে দেখতে ওই বাড়ির এমন দৈন্যদশা হল যে, আর চেনা যায় না।"

কিকিরা অনুমান করতে পারছিলেন, এমন বাড়ি তিনিও দু'-দশটা দেখেছেন বইকি এই কলকাতা শহরে। ভাঙাচোরা, পলেস্তরা-খসা, চুনবালি ঝরে পড়া, বিবর্ণ, আধো অন্ধকার বাড়ি। ধুলোয় ময়লায় ভরা। দরজা জানলা হয় হেলে পড়ছে, না হয় তার আর অস্তিত্ব নেই। কেউ যদি মনে করে এগুলো ইটকাঠের ভগ্নস্তূপ, তবে তাকে তেমন দোষ দেওয়া যায় না।

চা খেতে খেতে কিকিরা বললেন, "আলমারিটার খবর পেলেন কেমন করে?"

"খবর! খবর আমাদের রাখতে হয়। কানে আসে। সব ব্যবসারই নিজের একটা ধরন থাকে রায়বাবু, বিজনেস করব ওল্ড ফার্নিচারের আর খোঁজখবর রাখব না কোথায় কী বেচাকেনা চলছে, কোথায় কী পাব—তাই কি হয়!"

মাথা হেলালেন কিকিরা, ঠিক কথা। বললেন, "বিশ্বাসবাড়ির কোন তরফ—

মানে শরিকের বাড়ি থেকে পেলেন ওটা?”

“ছোট। সুবর্ণকান্তি বিশ্বাস।”

“সুবর্ণকান্তি! নামটি তো বেশ,” কিকিরা হাসলেন।

“ওদের সবই কান্তি ..., সজলকান্তি শুভ্রকান্তি সুবর্ণকান্তি ... নামের সঙ্গে কান্তি-টা যোগ করে নেয়। ট্রাডিশান।”

“বয়েস কত ভদ্রলোকের?”

“মোটামুটি সত্তর। সোনা না হোক এখনও যা রং গায়ের—পাকা আমের মতন। একসময় যে খুবই সুপুরুষ ছিলেন, বোঝা যায়।”

“তা এখন বোধ হয় কিছু করেন না। চলে কেমন করে?”

“এই বয়েসে আর কী করবেন! আগে একটা দোকান ছিল যতীন্দ্রমোহন অ্যাভিনুয়েতে। গ্রামোফোন রেকর্ড রেডিও বিক্রি হত। সাজানো গোছানো দোকান। বিক্রিবাটা মন্দ ছিল না। তবে সে দোকান কবেই উঠে গিয়েছে। পড়তি অবস্থায় মানুষের যেমন করে চলছে— সেইভাবেই চলছে, কুড়িয়ে বাড়িয়ে, এটা-ওটা বেচে দিয়ে। উনি আর বাইরে বড় একটা যান না। আর্থারাইটিসে একেবারে কাবু। তার ওপর চোখ নিয়ে ভুগতে ভুগতে এখন প্রায় অন্ধ হয়ে পড়েছেন। মেয়েই ভরসা।”

চা শেষ করলেন কিকিরা। “যে ছোকরা আপনার দোকানে এসেছিল সে কেমন নাতি? মানে ছেলের তরফে, না, মেয়ের ...”

“ওঁর ছেলে নেই। দুটি মেয়ে শুনেছি। ... এটি কোন মেয়ের ছেলে আমি জিজ্ঞেস করিনি। কথায়বার্তায় মনে হল, বড় মেয়ের ছেলে। মেয়ে বাবার কাছেই থাকে। বিধবা।”

কিকিরা মনে মনে যেন ব্যাপারটা গুছিয়ে নিলেন। “তা হলে ছোটদাদু কেন! শুধু দাদু বললেই তো হত।”

“ও ওদের ব্যাপার। বড়দাদু এখনও বেঁচে, সেজো মারা গিয়েছেন। হয়তো ছোট বলে, ছোটদাদু বলে।”

কিকিরা দোকানের ভেতরটা দেখলেন একবার। কর্মচারীরা কাজ করছিল। কথাও বলছিল নিজেদের মধ্যে।

“নন্দবাবু, আড়াই হাজার টাকা দিয়ে আপনি যে আলমারিটা কিনেছেন, সেটা আপনি মোটামুটি কী দামে বেচতে পারবেন বলে মনে করেন?”

নন্দবাবু একটু ভাবলেন। বললেন, “মেরামতির কাজ আছে সামান্য। তার ওপর রং-পালিশ। তা তেমন খদ্দের পেলে সাত-আট হাজার। আসলে কী জানেন রায়বাবু, এসব জিনিসের খদ্দের আজকাল টপ করে পাওয়া যায় না। ছ'মাস এক বছর হয়তো পড়েই থাকল দোকানে। গাঁট থেকে যে টাকাটা আগাম গেল, মেরামতির খরচ—সব মিলিয়ে যা দাঁড়ায়—তার ওপর হাজার দুই তিন না রাখলে আমার চলে কেমন করে! আপনাকে মিথ্যে বলব না, আগের দিন হলে যখন শখ

শৌখিনতা ভালমন্দ লোকে বুঝত, তখনকার বাজার হলে আমি দশ-বারো হাজার কামিয়ে নিতে পারতাম।”

কিকিরা বোধ হয় সামান্য অবাক হলেন। “দশ হাজার!”

“অবাক হওয়ার কী আছে মশাই, কাঠ তো স্টিল নয়, কারখানায় তৈরি হয় না। ভাল কাঠের দাম সোনার মতন। দশ হাজার কেন, বারো-চোদ্দও হতে পারত। কিন্তু আজকাল আর তেমন খদ্দের পাব কোথায়?”

“দামি আসবাব বলুন!”

“বলতে! ও কি এখনকার জিনিস! ল্যাজেরাস কোম্পানির নাম শুনেছেন? ফার্নিচারের কারবারে পয়লা নম্বর ছিল তখন। তারপরেই লিসা কোম্পানি। ওদের ঘরের জিনিস। কাঠ বাইরের, টিক; ডিজাইন বিলেতি। আলমারির একটা পাল্লায় ফুল সাইজ আয়না। ওই আয়না এখন পাওয়া যাবে! ইটালিয়ান গ্লাস, বেলজিয়ান নয়। আয়নার চারপাশে ফ্রেমিং। লতাপাতার কাজ করা। যেমন সুন্দর তেমনই সূক্ষ্ম! জিনিসটা বড় ভাল রায়বাবু!”

“আছে এখানে? দেখতে পাব?”

“নেবেন নাকি?” নন্দবাবু হালকাভাবে বললেন।

“কী যে বলেন! আমার কি দশ হাজারের পুঁজি আছে? এই একটু চোখের দেখা দেখতাম।”

“আরে, ঠাট্টা করছিলাম।” বলে হাত তুলে দোকানের ভেতর দিকের একটা জায়গা দেখালেন আঙুল দিয়ে, “ওই যে, পলিথিন দিয়ে ঢাকা দেওয়া আছে। চলুন, দেখবেন।” উঠে পড়লেন চেয়ার সরিয়ে।

নন্দবাবু কিকিরাকে নিয়ে কয়েক পা এগিয়ে গেলেন। “শ্রীকুমার, পলিথিনটা নামিয়ে দাও তো!”

শ্রীকুমার পালিশের কাজ করছিল। উঠে এসে পলিথিনের ‘শিট’-টা সরিয়ে দিল।

কিকিরা দেখলেন আলমারিটা। দেখার মতনই। পুরনো বলে বাইরের ঝকঝকে ভাবটা নেই, কাঠেও ময়লা ধরে, তবে একনজরেই বোঝা যায়—মামুলি আসবাব এটা নয়। সত্যিই সুন্দর। হিসেব করে গড়ন, নকশা, হাতের কাজ দেখে বোঝা যায়, পাকা মিস্ত্রিদের হাতে তৈরি আসবাব। বনেদিয়ানার একটা চেহারা রয়েছে আলমারিটার গায়ে। কিকিরার মনে হল, মাথার দিকে ওটা ছ’ ফুটের মতন, চওড়ায় তিনের কাছাকাছি, ভেতরের দিকটা—যাকে ডেপ্‌থ বলে, মন্দ হবে না। আপাতত মরা-মরা রং দেখেও অনুমান করা যায়, ওটা মেহগনি রঙেরই ছিল।

আলমারির আয়নায় নিজেদের চেহারা দেখতে দেখতে কিকিরা বললেন, “খাঁটি জিনিসই বটে নন্দবাবু, কিন্তু আয়নার তলার দিকে কাচটা ফেটে গিয়েছে না?”

“হ্যাঁ। ওই কাচ তো আর পালটানো যাবে না, দেখি কীভাবে ম্যানেজ করতে

পারি।”

“ভেতরটা একবার দেখা যায় না?”

“কেন যাবে না!” বলে নন্দবাবু গণেশকে ডাকলেন, “গণেশ, আমার টেবিলের তলার ড্রয়ার থেকে চাবিটা এনে দাও। অন্য চাবি নয়, দেখবে টোয়াইন সুতোয় বাঁধা গোটা চারেক বড়-ছোট চাবি রয়েছে। সুতোয় একটু লাল রং লাগানো।”

গণেশ ড্রয়ার হাতড়ে চাবি এনে দিল।

নন্দবাবু আলমারির পাল্লা খুলতে খুলতে বললেন, “এর আবার ডবল লক সিস্টেম। একটায় খুলবে না। প্রথমে একটা, ওপরের দিকের গর্তে, পরে নীচের দিকে। আলাদা আলাদা চাবি। আগেকার দিনে এরকম অনেক আলমারিতেই থাকত।”

পাল্লা খুলতে সামান্য সময় লাগল নন্দবাবুর। চাবির গোলমাল হচ্ছিল।

“দেখুন!” নন্দবাবু বললেন, “ভেতরটা দেখুন, মশাই! কত স্পেস। এক-একটা তাকে বিশ-পঁচিশটা শাড়ি জামা ঢুকে যায় অনায়াসে। ওপরের তাকটা দেখছেন?”

কিকিরা একদৃষ্টে দেখছিলেন। চারটে তাক। যথেষ্ট জায়গা। ওপরের তাকে তিনটি ভাগ। পাশের দুটোয় ড্রয়ার, মাঝখানেরটা ফাঁকা। ওর মধ্যে ছোট বড় লম্বাটে চৌকোনো কয়েকটা খুপরি, মানে ‘পকেট’। ড্রয়ার দুটোর গায়ে হালকা হাতল, পেতলের। চাবির গর্তও রয়েছে।

কিকিরা মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, “বাঃ! দেখার মতন। আপনার নজর আছে নন্দবাবু! আড়াই হাজারে এ-জিনিস পেয়ে গিয়েছেন, বরাত ভাল আপনার।”

নন্দবাবু হাসলেন সামান্য। “আরও একটা জিনিস আছে তলার দিকে। আপনি বুঝতে পারবেন না। বোর্ড ড্রয়ার। মানে কাঠের তক্তা ড্রয়ার। হালকা, পাতলা।”

কথা বলতে বলতে নন্দবাবু আলমারির পাল্লা বন্ধ করে দিলেন।

টেবিলে ফোন বাজছিল।

নিজেই এগিয়ে গিয়ে ফোন ধরলেন নন্দবাবু। কথা বললেন। কেউ বোধ হয় ফার্নিচার ভাড়া নেওয়ার কথা বলছিল। ভুল জায়গায় ফোন করেছে হয়তো। নন্দবাবু বললেন, না—এখানে ফার্নিচার ভাড়া দেওয়া হয় না। পার্ক সার্কাসের দিকে দেখুন।

কিকিরা এবার উঠবেন। বললেন, “আমি তা হলে আজ চলি, নন্দবাবু।”

“যাবেন! ... আচ্ছা কী করি বলুন তো! ছোকরাকে আমার একদম পছন্দ হয়নি।”

কিকিরা ভাবলেন কয়েক মুহূর্ত। বললেন, “আমার মনে হয়—আপনি একবার হাতিবাগানে যান। যাঁর কাছ থেকে আলমারি কিনেছেন—তাঁকেই বলুন। তাঁরই তো নাতি। যা ঘটেছে বলবেন ভদ্রলোককে। দেখুন না উনি কী বলেন।”

নন্দবাবু মন দিয়ে শুনলেন। “আমিও তাই ভাবছি।”

"আজ না হয় কাল—একবার চলে যান। ঘাবড়াবেন না। আমি আজ চলি। দিন কয়েক পরে আমাকে এদিকে আসতে হবে একটা কাজে, তখন বরং খোঁজ নিয়ে যাব।"

"আসুন তবে। দাঁড়ান, আপনার ঠিকানাটা লিখে রাখি, মশাই। আপনি তো আবার চোর-জোচ্চোর ধরতে জানেন। কখন কী দরকার পড়ে।" বলে নন্দবাবু একটা খাতায় কিকিরার ঠিকানা লিখে নিতে লাগলেন।

॥ ২ ॥

কোনও একটা কথায় হাসির হল্লা উঠেছিল। চন্দন তারাপদ কিকিরা—সকলেই হাসছে।

শেষে হাসি থামিয়ে কিকিরা বললেন, "পুরনো কথা শুনলে তোমরা এত হাসো কেন বলো তো? আমি কি বানিয়ে বলছি, না, বাজে কথা বলছি?"

চন্দন বলল, হাসতে হাসতেই, "তা বলে আপনি বিশ্বাস করতে বলেন, আগেকার দিনে এই কলকাতা শহরে থিয়েটার হলের সামনে হুঁকোর দোকান থাকত? তামাক কলকে ফিট করা। বাবুরা মাঝে মাঝে হল থেকে বেরিয়ে এসে হুঁকো টেনে যেতেন?"

"আমি বলছি না চাঁদুবাবু, বইয়ে বলছে। আমি তখন কোথায়, আমার পিতৃপুরুষও জন্মাননি মনে হয়। সে কি এখনকার কথা! শ'খানেক বছর পিছিয়ে যাও। তারও বেশি। ভুবন মুখুজ্যের বইয়ে পড়েছি। তখন থিয়েটার পাড়ায় প্ল্যাকার্ডকে বলত 'পেলাকাঠ', অবশ্য যারা মুখ্যুসুখ্যু মানুষ, থিয়েটারে সাধারণ কাজকর্ম করত—তারা। পানের দোকানের ছোঁড়ারা থালায় বরফজলের গ্লাস সাজিয়ে হেঁকে হেঁকে বিক্রি করত, বিলিতি জল—ওয়ান পেয়ালা ওয়ান পাইস, খেয়ে নিন বাবুরা— বুক ঠাণ্ডা প্রাণ ঠাণ্ডা ...।"

তারাপদ মুখ মুছতে মুছতে বলল, "তখন সিগারেট বিড়ি সোডা লেমোনেড ছিল না?"

"সিগারেট তো সেদিনের বাচ্চা! ছিলিম-সাজা হুঁকোর দোকানেও জাত গোত্র ছিল, বামুন হুঁকো, কায়েত হুঁকো—যার যেটি দরকার টেনে নিত। সিগারেট ক'জন চোখে দেখেছে—! আর লেমোনেড জন্মেছে ..." বলতে বলতে থেমে গেলেন কিকিরা ; কে যেন এসেছে, বগলা দরজা খুলে কথা বলছিল।

কিকিরা ঘরের দরজার দিকে তাকালেন।

বগলা এল। "একজন দেখা করতে এসেছে।"

"কে? নিয়ে এসো।"

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে যে-লোকটি এল কিকিরা তাকে দেখে অবাক। ভাবতেই পারেননি এমন কাউকে দেখবেন! "তুমি নন্দবাবুর দোকানের লোক না! কী নাম

যেন—, শ্রীকুমার?”

“আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি শ্রীকুমার।”

“তা হঠাৎ এখানে?”

“বাবু পাঠিয়েছেন।”

“নন্দবাবু! কী ব্যাপার?”

শ্রীকুমার খানিকটা আড়ষ্ট, চোখেমুখে উদ্বেগও রয়েছে। বলল, “আমাদের বাবু ভীষণ জখম হয়ে পড়ে আছেন।”

“সে কী!” কিকিরা যেন চমকে উঠে সোজা হয়ে বসলেন চেয়ারে। “জখম! নন্দবাবু জখম হয়ে পড়ে আছেন! কোথায়? হাসপাতালে?”

“না, বাড়িতেই আছেন। হাসপাতালে পাঠাবার অবস্থাই হয়েছিল। ভাগ্য ভাল হাসপাতালে পাঠাতে হয়নি, বাড়িতেই বিছানায় পড়ে আছেন।”

কিকিরা একবার তারাপদদের মুখের দিকে তাকালেন। তারপর চোখ সরিয়ে শ্রীকুমারকে দেখতে দেখতে বললেন, “তুমি বোসো। ওই টুলটা টেনে নাও। কী হয়েছে বলো তো?”

শ্রীকুমার বসল না। মাথায় লম্বা, রোগাটে গড়ন তার। নাক লম্বা, চোখ গর্তে ঢোকা। গালে অল্প দাড়ি। পরনে ধুতি, গায়ে খয়েরি রঙের পাঞ্জাবি। মাথার চুল পাতলা। বয়েস চল্লিশের ওপর।

শ্রীকুমার বলল, “আপনি আমাদের দোকানে গিয়েছিলেন—আট-দশ দিন আগে—!”

হিসেব করে কিকিরা বললেন, “হ্যাঁ, এই তো কাল শুক্রবারের আগের শুক্রবার, আজ শনিবার। ন'-দশদিনই হল।”

“আপনি যেদিন গেলেন, তার পরের দিন বাবু হাতিবাগানে ওই বিশ্বাসবাবুদের বাড়িতে বুড়োকর্তার সঙ্গে দেখা করতে যান। তাঁকে সব জানাতে গিয়েছিলেন। ফিরে এসে বললেন, বুড়োকর্তা তেমনভাবে কানই দিলেন না কথাটায়। বললেন, তাঁর আলমারি তিনি বেচে দিয়েছেন নিজের মরজিতে ; কারও কিছু বলার থাকতে পারে না। ... আমাদের বাবু তবু বললেন, কিন্তু আপনার নাতি যে আমায় শাসিয়ে এসেছে। বিশ্বাসবাড়ির বুড়োকর্তা বাবুকে বললেন, এখন তো ও নেই, দিঘা থেকে ফিরে আসুক—আমি বলব। ছেলেটা যে জেদি আমি জানি ; তবে গুণ্ডা বদমাশ ধরনের নয়। কেন যে ও আপনার দোকানে গিয়ে শাসিয়ে এল—তাও বুঝতে পারছি না। আসুক ও, জিজ্ঞেস করব।” বলে শ্রীকুমার চুপ করে গেল।

কিকিরা একটু ভাবলেন। “নন্দবাবুর ঠিক হয়েছে কী? কবে? কোথায়?”

“আজ্ঞে পরশুদিন। সন্ধেবেলায়, সাড়ে সাতটা নাগাদ বাবু একটা কাজ সেরে বাড়ি ফিরছিলেন। পাড়ার কাছাকাছি, মল্লিক লেনের মুখে একটা লোক আচমকা পাশের গলি থেকে মোটরবাইক নিয়ে বেরিয়ে এসে বাবুকে পাশ থেকে ধাক্কা মারে। মেরেই পালিয়ে যায়।”

"ধাক্কা মারে! ইচ্ছে করে, না, অ্যাক্সিডেন্ট?"

"বাবু বলছেন, ইচ্ছে করে, মতলব নিয়ে।"

"লোকটাকে দেখেছেন নন্দবাবু?"

"ওখানে রাস্তার বাতি ছিল না কাছাকাছি। দু'-এক পলক যা দেখেছেন তাতে সেই ছেলেটার মুখ বলেই তাঁর মনে হল। উনি তখন রাস্তায় ছিটকে পড়েছেন। কোমরে লেগেছে, হাতে-মাথায় চোট, মুখ থুবড়ে পড়ায় গালে নাকে লেগেছে, রক্ত পড়ছিল। ...আপনি নিজে গেলেই সব দেখতে পাবেন— শুনবেন। আমি আর কী বলব!"

"নন্দবাবু আমায় তবে যেতে বলেছেন—।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, সে-জন্যেই আমায় আপনার ঠিকানা দিয়ে পাঠিয়েছেন। অনেক করে বলেছেন—আপনি যেন একবার যান। তাঁর বাড়িতে। তিনি তো আর দোকানে আসতে পারছেন না।"

কিকিরা চোখ বুজে মাথা নাড়লেন। তারপর তাকালেন। "বাড়িটা কোথায় যেন। অনেক আগে এক-দু'বার গিয়েছি, ঠিক মনে নেই। ঠিকানাটা বলে যাও, আর একটু বুঝিয়ে দাও আমাকে।"

শ্রীকুমার ঠিকানা বলল, নন্দবাবুর বাড়িটা কোথায় হবে—বুঝিয়েও দিল।

কিকিরা বার কয়েক ঠিকানাটা আওড়ালেন। বললেন, "ঠিক আছে। আমি কাল বিকেলে যাব, নন্দবাবুকে বোলো। এমনিতেই কথা ছিল, পরে একদিন তাঁর কাছে যাব। তুমি বরং এখন এসো। সাবধানে থাকতে বলবে নন্দবাবুকে। এই বয়েসে চোট-জখম বড় ভোগায়।"

শ্রীকুমার চলে গেল।

অল্পসময় চুপচাপ। কিকিরা অন্যমনস্ক ; তারাপদ আর চন্দনও কথা বলল না। ঘরে বাতি জ্বলছে, পাখাও চলছিল। লাফ মেরে মেরে গরম যেন এগিয়ে এসেছে। চৈত্রমাস একেবারে দোরগোড়ায়।

শেষপর্যন্ত কিকিরাই কথা বললেন। অনেকটা অবিশ্বাসের গলায়, "আমি এতটা ভাবিনি।"

তারাপদ বলল, "কী ভাবেননি?"

"ভাবিনি সত্যি সত্যি নন্দবাবুর ওপর হামলা হতে পারে এভাবে। এত তাড়াতাড়ি।"

চন্দন বলল, "এটা সার, অ্যাকসিডেন্ট কেস হতে পারে। কোনও আনাড়ি হয়তো ধাক্কা মেরে পালিয়েছে।"

"অসম্ভব নয়। কিন্তু নন্দবাবু যে বলছেন, ওই ছোকরাটাকেই উনি দেখেছেন।"

"সত্যিই কি দেখেছেন, না, চোখের ভুল? উনি হয়তো উদ্বেগ আতঙ্ক নিয়ে রয়েছেন বলে ভুল দেখেছেন। কিংবা ভাবছেন।"

"এখন কিছু বুঝতে পারছি না। দেখি, কাল ওঁর বাড়ি যাই—কথা বলি—!"

তারাপদ দেশলাইয়ের বাক্স বার করে একটা কাঠি নিল। তারপর কান চুলকোতে চুলকোতে বলল, "আপনার কাছে আলমারির গল্প আমরা শুনেছি। হতে পারে ওটা মূল্যবান আসবাব। কিন্তু একটা কাঠের পুরনো আলমারির জন্যে এত কাণ্ড হয় কেমন করে। একজন বিক্রি করবে, পরে নাতি এসে শাসাবে। তারপরও ধরুন, যিনি কিনলেন তিনি আবার ওই বুড়ো ভদ্রলোককে গিয়ে জানিয়েও এলেন শাসানোর কথাটা। বুড়ো কোনও কানই করলেন না। এর পর আবার হামলা! কীসের এমন মহামূল্যবান আলমারি, সার! আপনি যাই বলুন, ব্যাপারটা বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে! আমি কোনও মানে খুঁজে পাচ্ছি না।"

চন্দন বলল, "আসলে নন্দবাবু বোধ হয় কোনও কারণে প্যানিক হয়ে রয়েছেন।"

কিকিরা বললেন, "তারও তো একটা কারণ থাকবে, চাঁদু। নন্দবাবু কচি ছেলে নন। প্রবীণ মানুষ। ব্যবসাও করছেন কতকাল। পুরনো ফার্নিচার কেনা আর বেচা তাঁর কাছে নতুন জিনিস নয়। এতকাল কোনও ঝামেলা হয়েছে বলে শুনিনি। বলেনওনি সেদিন। হঠাৎ এই বিশ্বাসবাড়ির আলমারি নিয়ে কেন তিনি ঝামেলায় পড়বেন! ভয় পাবেন! তোমরা ভুলে যেও না, নন্দবাবুর দোকান যথেষ্ট পুরনো। ওই এলাকাটা তাঁর নিজের এলাকা। ওখানে সবাই তাঁর চেনা, হাঁকডাক করলে দশজন বেরিয়ে পড়বে। তবু একটা ছোকরা কোন সাহসে গিয়ে তাঁকে শাসিয়ে আসতে পারে।" বলে কিকিরা থামলেন কয়েক মুহূর্ত। আবার বললেন, "নন্দবাবুর পাড়ার কাছাকাছি গিয়ে তাঁকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে পালিয়ে যাওয়ার ধক তার হল কেমন করে?"

"আপনি নন্দবাবুর ধারণার কথা ভাবছেন। ওটা সিম্পল অ্যাক্সিডেন্ট কেস হতে পারে। অন্য কেউ ধাক্কা মেরেছে হয়তো।"

"দেখি। কাল একবার নন্দবাবুর কাছে যাই। দেখে আসি ভদ্রলোককে। তখন জানতে পারব।"

তারাপদ বলল, "আপনি যান, দয়া করে আমাদের লেজুড় করবেন না, সার। আপনার বন্ধু, আপনি..."

তারাপদকে থামিয়ে দিয়ে কিকিরা বললেন, "লেজুড় কাকে বলে তুমি তাই জানো না। আমার লেজের সঙ্গে তোমায় জুড়ব কেন! তোমরা হলে আমার শাগরেদ। অ্যান্ড পার্টনার।...আরে বাবা, বিকেলে একটু যাবে তাতে আপত্তি কীসের।...শোনো, তারাবাবু—এই সংসার বড় বিচিত্র জায়গা, মিস্টিরিয়াস প্লেস ; লোকজনের সঙ্গে যত মিশবে, চোখ খুলে দেখবে, ততই তোমার জ্ঞানচক্ষু..."

"থাক সার, আর লেকচার শোনাবেন না আপনার।" তারাপদ বলল কিকিরাকে বাধা দিয়ে, "আপনার পাল্লায় পড়ে এরই মধ্যে আমাদের জ্ঞানচক্ষু যথেষ্ট ফুটেছে। আরও বেশি ফুটলে জ্ঞানী বুদ্ধ হয়ে যাব।"

কিকিরা হাসলেন। "বুদ্ধ তো একটাই হয় হে, তবে বুদ্ধু হয় হাজারে হাজারে।

শোনো বাবা, আমার সার কথা হল—নন্দবাবুই হোক, বিশ্বাসবাড়ির ছোটকর্তা সুবর্ণকান্তি হোক কিংবা তাঁর নাতি সেই ছোকরাই হোক—কে যে কাকে বুদ্ধু বানাতে চাইছে—একবার দেখতে চাই। বুঝলে?"

চন্দন ঠাট্টার গলায় বলল, "এবার তা হলে আপনার কেসটা হবে আলমারি রহস্য।"

"কোন রহস্য বলতে পারছি না। আলমারিটা অবশ্যই রহস্যের লিস্টিতে পয়লা নম্বরে জায়গা পাবে।"

"পাবে বলছেন—কিন্তু কেন পাবে, সার? পুরনো একটা কাঠের ফার্নিচার, তার মধ্যে এমন কী রহস্য থাকতে পারে!"

কিকিরা মাথার চুল ঘাঁটতে ঘাঁটতে বললেন, "কথাটা ঠিকই। তবে একবার ভেবে দেখো, এক ভদ্রলোক স্বেচ্ছায়, টাকা নিয়ে, তাঁদের বাড়ির একটা আলমারি বেচে দিয়েছেন। সেটা কিনেছেন নন্দবাবু—যাঁর ব্যবসাই হল পুরনো আসবাব কেনা। এই পর্যন্ত ঠিক আছে। নো প্রবলেম, নো রহস্য! অথচ তারপরই এক রাফ-টাইপের ছোকরা, যিনি আলমারি বেচেছেন তাঁর নাতি এসে নন্দবাবুকে শাসিয়ে গেল, আলমারিটা ফেরত দিয়ে আসতে। না দিলে নন্দবাবু বিপদে পড়বেন। কেন? তার এমন ব্যবহার করার কারণটা কী?"

তারাপদ বলল, "সার, নাতির হয়তো মনে হয়েছে, নিজেদের ঘরের জিনিস ওইভাবে বেচে দেওয়াটা উচিত হয়নি। ওদের আভিজাত্যে লাগে। সেন্টিমেন্ট...।"

"বেশ তো। সেন্টিমেন্টে লাগতেই পারে। তা বলে সে নন্দবাবুর দোকানে এসে বয়স্ক এক ভদ্রলোককে শাসিয়ে যাবে? কী বলছ তুমি? বলার আর ধরন ছিল না! ভদ্রজনের মতন বুঝিয়ে বললেই পারত।"

তারাপদ চুপ। জবাব দিতে পারল না।

কিকিরা বললেন, "তা সে যাই হোক, নন্দবাবু আবার যখন বিশ্বাসবাড়ির ছোটকর্তার কাছে সবকিছু জানাতে গেলেন, তখন ছোটকর্তা কানেই তুললেন না কথাটা। শ্রীকুমার কী বলে গেল, নিজেরাই শুনলে। উনি নাকি বলেছেন, নিজের জিনিস আপন মরজিতে বেচেছেন, কারও কিছু বলার থাকতে পারে না।...এবার বলো নন্দবাবুর দোষটা কোথায়?"

চন্দন মাথা নাড়ল। না, নন্দবাবুর দোষ নেই কোথাও।

"তা হলে সেই ছোকরা আবার কেন নন্দবাবুকে ওভাবে জখম করার চেষ্টা করবে?"

"হ্যাঁ, যদি অবশ্য ওই ছোকরাই ধাক্কা মেরে থাকে?" চন্দন বলল।

"সেটা কাল বুঝতে পারব ; নন্দবাবুর সঙ্গে দেখা হলে।"

তারাপদ মুখ মুছে নিল। পাখা চলছে ঠিকই, তবে গুমোট লাগছে। ঘাম হচ্ছিল। জলতেষ্টা পাচ্ছিল তার। উঠে পড়ল। ভেতরে গিয়ে সে খেয়ে আসবে।

যেতে যেতে বলল, "আলমারিটা আপনি দেখেছেন কিকিরা। দেখে কি মনে হয়, ওর মধ্যে কোনও রহস্য থাকতে পারে?"

"বাইরে থেকে দেখেছি। খুবই সুন্দর। ভেতরে—মানে আলমারির ভেতরে, কিংবা জিনিসটাকে জড়িয়ে কী রহস্য আছে—কেমন করে বলব!"

তারাপদ ভেতরে চলে গেল।

চন্দন বোধ হয়, ব্যাপারটার জটিলতা বুঝতে পারছিল খানিক। বলল, "ছোকরার নাম কী? কী করে?"

"নামটাম জানি না। কী করে বলতে পারব না। নন্দবাবু যা বলেছেন তার থেকে মনে হল, ছোকরা দিঘায় কারও সঙ্গে মিলেমিশে বা একলা একটা হোটেল খোলার চেষ্টায় আছে। আজকাল প্রায়ই দিঘায় গিয়ে থাকে, কাজকর্ম দেখে।"

"বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক কেমন?"

"জানি না। দাদুকে চিনি না, নাতিকেও নয়। কেমন করে বলব সম্পর্ক কেমন!"

চন্দন একবার নিজের হাতঘড়ি দেখল। আটটা বাজে প্রায়। এবার উঠে পড়তে হবে। "আপনি তা হলে কাল নন্দবাবুর বাড়ি যাচ্ছেন?"

"যাই। নিজের চোখে দেখে আসি একবার। ঠিক কী ঘটেছে উনি ছাড়া আর কে বলতে পারবে! তার মানে আমি কী বলতে চাইছি বুঝতে পারছ? আমি বলতে চাইছি, নন্দবাবু বিশ্বাসবাড়ির ছোটকর্তার সঙ্গে দেখা করার পর কী কথাবার্তা হয়েছে, তারপর কী ঘটেছে, কেনই বা তাঁকে মোটর সাইকেলের ধাক্কা খেতে হল, সত্যি সত্যি সেই ছোকরা তাঁকে ধাক্কা মেরেছে কি না—জানা দরকার।"

তারাপদ ফিরে এল। বলল, "সার, আপনি একটা ফ্রিজ কিনতে পারেন না?"

"কেন?"

"কেন আবার কি! ঠাণ্ডা জল খেতে পারতাম।"

"আমার আদ্যিকালের আইস বক্সে রাখা জলের বোতল ঠাণ্ডা হয় না?"

"হয়, তবে ফ্রিজ বলে কথা..."

"তোমাদের দেখছি পুরনো জিনিসে মন ওঠে না। আরে ফ্রিজ তো হালের জিনিস, আগে সাহেবসুবো থেকে শুরু করে বড়লোকের বাড়িতেও ওই আইস বক্সই থাকত। বুঝলে! এখনও তুমি চাঁদনিতে গেলে আইস বক্স কিনতে পাবে। আমার বাপু ওই বরফ বাক্সেই চলে যায়। ফ্রিজ নিয়ে আমি কী করব! দিব্যি আমার চলে যাচ্ছে।"

"চলুক তা হলে! আমরা আজ উঠি।"

"এসো। কাল তা হলে তুমি যাচ্ছ আমার সঙ্গে?"

তারাপদ তেমন উৎসাহ দেখাল না। "আপনি বললে যেতেই হয়। তবে আলমারির ব্যাপারটায় আমি ইন্টারেস্ট পাচ্ছি না।"

"দেখাই যাক না নন্দবাবু কী বলেন!"

চন্দনরা উঠে পড়ল।

নন্দবাবু বিছানায় শুয়ে ছিলেন। গায়ে ফতুয়া, সামনের দিকটা শার্ট-পাঞ্জাবি মতন বোতাম লাগানো। পরনে ধুতি, দু'-পাট করে লুঙ্গির মতন জড়ানো রয়েছে কোমরে। বাঁ হাতে প্লাস্টার, টাটকা। পায়ের দিকেও মোটা ব্যান্ডেজ, কপালে একপাশে কালশিটে পড়েছে, তার ওপর কোনও ওযুধ লাগানো। গালেও কালচে দাগ। ভদ্রলোককে বেশ কাতর দেখাচ্ছিল। যন্ত্রণায় চোখমুখ শুকনো।

কিকিরাকে দেখে যেন আশ্বস্ত হলেন। "আসুন রায়বাবু।" বলে তারাপদর দিকে তাকালেন। "এঁকে তো চিনি না।"

কিকিরা পরিচয় করিয়ে দিলেন। "তারাপদ। আমার শাগরেদ, চেলাও বলতে পারেন।"

"বসুন আপনারা।"

বিছানার কাছাকাছি চেয়ার ছিল। টেনে নিয়ে বসলেন কিকিরা, ইশারায় বসতে বললেন তারাপদকে।

"এই অবস্থা হল কবে?" কিকিরা বললেন।

"পরশুর আগের দিন। সন্ধেবেলায়। একটা দিন ডাক্তার বদ্যি করে কাটল। কাল সকালে এক্সরে করেছি। বিকেলে প্লাস্টার। হাতের হাড় দু'-টুকরো হয়ে গিয়েছে। এই রিস্টের ওপরে। পায়ের হাড় ভাঙেনি, তবে মচকে গিয়েছে। মাথায় বেশ লেগেছে মশাই, রক্ষে যে মারাত্মক কিছু হয়নি। সারা পিঠ কোমরে যা ব্যথা... ।"

"তা তো হবেই। বয়েস হচ্ছে এখন, অল্প লাগলেও তার জের সহজে ছাড়তে চায় না।"

নন্দবাবু কাকে যেন ডাকলেন। ঘরের ব্যবস্থা দেখে বোঝা যায়, কিকিরা আসবেন জেনে আগেভাগেই সব গোছগাছ করে রাখা হয়েছিল।

বাড়ির কোনও কাজের লোক মুখ বাড়াল। নন্দবাবু চা জল দিতে বললেন।

কিকিরা বললেন, "ব্যাপারটা আগে সব শুনে নিই।...আপনি যা যা ঘটেছে আমায় বলুন।"

নন্দবাবু বালিশে হেলান দিয়ে যতটা পারেন গুছিয়ে বসলেন।

তারাপদ ঘরটা দেখছিল। পুরনো বাড়ির ঘর যেমন হয়, মাঝারি মাপের, মাথার ছাদে কড়িবরগা, দেয়ালের রং সাদা, জানলায় কাঠের পাল্লা, লোহার গরাদ। ঘরের মধ্যে আসবাবপত্র সবই পুরনো ধাঁচের, কিন্তু দামি এবং সুন্দর। দেখে মনে হল, এই ঘরেই নন্দবাবু থাকেন।

নন্দবাবু বললেন কিকিরার দিকে তাকিয়ে, "আপনার কথামতন আমি পরের দিনই সুবর্ণবাবুর কাছে গেলাম। বললাম তাঁকে সব কথা। শুনে উনি ভীষণ অবাক হলেন। বললেন, আমি তো কিছু জানি না। রাজা আমায় একটা কথাও বলেনি।"

"রাজা কে?"

"ওঁর নাতি। ডাকনাম রাজা। ভাল নাম রাজীব। রাজীব নন্দী।"

"ও! সুবর্ণবাবুরা না বিশ্বাস?"

"মেয়ের ছেলে। গোত্র বদল হয়েছে।"

"হ্যাঁ, তা তো হবেই। আর কী বললেন উনি?"

"বললেন, আলমারি ফেরত দিতে হবে না। ও-বাড়িতে যা জিনিসপত্র আছে সবেরই মালিকানা তাঁর। তিনি নিজেই বেচে দিয়েছেন আলমারি। অন্যের তা নিয়ে কথা বলার অধিকার নেই। আগেও তিনি এটা-ওটা বেচে দিয়েছেন। কই তা নিয়ে তো কোনও ঝঞ্ঝাট হয়নি। হঠাৎ এটা নিয়ে কেন হবে—তিনি বুঝতে পারছেন না।"

কিকিরা কী ভেবে বললেন, "উনি কি বললেন, নাতির সঙ্গে এ নিয়ে কথা বলবেন।"

"হ্যাঁ, বললেন—রাজা এখন দিঘায়, চার-পাঁচদিন পরে ফিরবে, তখন কথা বলবেন।"

"তার মানে নাতি ফিরে এলে তিনি নিশ্চয় বলেছেন কথাটা।"

"বলার কথা।"

"রাজা দিঘায় কী করে—শুনেছেন।"

"শুনেছি। এক বন্ধুর সঙ্গে হোটেলের ব্যবসা করবে বলে আদাজল খেয়ে লেগেছে। এখনও হোটেল চালু হয়নি। কাজকর্ম চলছে। মাস দুই আরও হয়তো লাগবে।"

তারাপদ চুপচাপ শুনছিল। দেখছিল নন্দবাবুকে। ভদ্রলোককে একেবারে সাদামাটা নিরীহ বলেই মনে হয়। তবে ব্যবসাদার মানুষ, চোখেমুখে এক ধরনের বুদ্ধির ছাপ তো থাকবেই।

কিকিরা বললেন, "তারপর এই ঘটনা...! আপনি বাইকের ধাক্কা খেলেন?"

"হ্যাঁ। আমি দোকান বন্ধের পর একটা কাজে গিয়েছিলাম। সেখান থেকে ফিরতে ফিরতে সন্ধে। একটু আগে হালকা একটা ঝড় উঠেছিল। কালবৈশাখী নয়, ধুলোর ঝড়। থেমেও গেল। আমি বাড়ি ফিরছি। আমাদের পাড়ার কর্পোরেশনের প্রাইমারি স্কুলটার আগে একটা আধমরা পাকুড়গাছ আছে। পাশেই মিল্কবুথ। জায়গাটা নিরিবিলি, আলোও কম। হঠাৎ একটা মোটরসাইকেল এসে আমায় পাশ থেকে ধাক্কা মারল। আমি টাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেলাম রাস্তায়।"

"যে আপনাকে ধাক্কা মারল তাকে আপনি দেখেছেন?"

"ওই দু'পলকের জন্যে।"

"লোকটা যে রাজীব আপনি চিনলেন কেমন করে?"

"আমি তার মুখ দেখেছি।"

তারাপদ বলল, "মাথায় হেলমেট ছিল না?"

"ছিল।"

"হেলমেট দু'ধরনের হয়। কোনও কোনও হেলমেটের মুখের সামনে আড়াল থাকে—ফাইবার গ্লাসের। আলো যেখানে কম, সেখানে আপনি কেমন করে মুখ দেখবেন ড্রাইভারের?"

"মুখের সামনে আড়াল ছিল না। আমি স্পষ্ট দেখেছি—সেই ছোকরা। ধাক্কা মারার পর আমার দিকে তাকাল, কী একটা বলল—তারপর চলে গেল।"

"কাছাকাছি তখন কেউ ছিল না গলিতে, ধরতে পারল না?"

"না। ফাঁকা ছিল। একটু পরে সত্যবাবুকে দেখলাম। তিনি আমায় রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এলেন। আমি যতবার উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছিলাম, পারছিলাম না। মনে হল, পায়ে জোরই পাচ্ছি না। সত্যবাবুই তখন লোকজন ডেকে ধরাধরি করে আমায় বাড়ি পৌঁছে দিলেন।"

কিকিরা মন দিয়ে নন্দবাবুর কথা শুনছিলেন। সামান্য সময় চুপচাপ থাকার পর বললেন, "আপনার চোখের ভুল হয়নি তো?"

"মনে তো হয় না। ওই ছোকরার মুখ ভুল হওয়ার কথা নয়।"

"কেমন দেখতে?"

"ধবধবে ফরসা। মুখের আদল লম্বাটে। খাড়া নাক। চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে। থুতনির কাছে দাড়ি। গোঁফও রেখেছে। গাল পরিষ্কার। স্টাইলের দাড়ি, মশাই।"

কিকিরা কী বলতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই ভেতর থেকে চা মিষ্টি এল।

"এত কেন? শুধু চা হলেই হত," কিকিরা বললেন।

"বাড়িতে এসেছেন শুধু চা খাবেন! তা ছাড়া এই ব্যবস্থা আমার গিন্নির।"

"ছেলে কোথায়?"

"কী একটা পড়তে গিয়েছে। আমি ওসব বুঝি না। পরীক্ষা দেবে চাকরির—"

"ও! ... তা নন্দবাবু, বিশ্বাসবাড়িতে গিয়ে সুবর্ণকান্তিবাবুর সঙ্গে যখন কথাবার্তা বলছিলেন তখন আপনার কী মনে হল? মানে নাতি সম্পর্কে দাদুর মনোভাব কেমন দেখলেন? বৃদ্ধ ভদ্রলোক কি নাতির ওপর বিরক্ত? পছন্দ করেন না তাকে? না কি মনে হল, নাতিকে প্রশ্রয় দেন?"

নন্দবাবু বালিশটা কোনওক্রমে টেনে নিলেন ভর দেওয়ার জন্যে। বললেন, "দেখুন, আমি ঠিক বুঝলাম না। বিরক্ত হয়েছেন যে তাও বোঝা গেল না। তবে ওর ওইভাবে দোকানে এসে শাসানো তাঁর পছন্দ হয়নি। বললেন, ও ফিরে এলে কথা বলবেন।"

"দিঘার হোটেল তৈরি কতদিন ধরে চলছে?"

"আমি সেভাবে জানতে চাইনি। কথায় কথায় মনে হল, দু'-তিন মাস তো হবেই।"

"হোটেলের নাম ঠিক হয়েছে?"

"জানি না।"

চা মিষ্টি খেতে খেতে তারাপদ বলল, "আপনার দোকান এখন দেখছে কে?"

"আমার কর্মচারীরা। ছেলে মাঝে একদিন গিয়েছিল।"

"দোকানে আর ওই ছোকরা যায়নি।"

"না।"

কিকিরা হঠাৎ বললেন, "নন্দবাবু, আপনার কী মনে হয়? রাজা ওই আলমারি ফেরত পাওয়ার জন্যে এত ব্যস্ত কেন? কী আছে ওর মধ্যে?"

"আমিও তো তাই ভাবি! কী আছে? পুরনো কাঠের আলমারি, দেখতে সুন্দর— সবই ঠিক। তা এভাবে কত পুরনো বনেদি জিনিস একসময় বাজারে বিক্রি হয়ে যায়। দু'-এক পুরুষের জিনিস তার বংশধররা বিক্রি করে দেয়। বেশিরভাগই টাকার অভাবে বেচে দেয়। কাঠ তো সামান্য জিনিস মশাই, কত মণিমুক্তো, রুপোর বাসন, বিদেশি কাচের বাহারি জিনিস, মায় মার্বেলের মূর্তি— বিক্রির কি শেষ আছে! আমি একবার একটা লাল পাথরের প্যাঁচা কিনেছিলাম। রেয়ার জিনিস।"

"লাল প্যাঁচা?" তারাপদ অবাক হয়ে বলল।

"লাল কেন, সাদা, কালো, মেটে রঙের প্যাঁচাও পাওয়া যায়। এক এক দেশের কারিগরের তৈরি। শখের ব্যাপার হয়তো, তবে শুনেছি কোনও কোনও দেশে প্যাঁচা নাকি বড় পয়মন্ত জিনিস। আমাদের দেশেই তো আমরা প্যাঁচাকে লক্ষ্মীর বাহন মনে করি।"

কিকিরা বললেন, "প্যাঁচা বিক্রি করে দিয়েছেন?"

"কবে! সে কি আজকের কথা! এক সাহেব তিন হাজার টাকায় কিনে নিয়েছিলেন।"

কিকিরা কী যেন ভাবলেন। চায়ে চুমুক দিয়ে অন্যমনস্কভাবে ঘরের চারদিকে তাকালেন একবার। জানলার দিকে দেয়ালে শ্রীচৈতন্যের পট, অন্যপাশে দেয়াল ঘড়ি। নন্দবাবুর মা-বাবার ফোটোও রয়েছে, বাঁধানো।

"আলমারিটা কেনার পর আপনি ভেতরটা ভাল করে দেখেছিলেন?" কিকিরা বললেন হঠাৎ।

নন্দবাবু সামান্য অবাক হলেন। "কী দেখব! আমি মশাই যখন আলমারিটা কিনি, তখন তো ওটা ফাঁকা! দোকানে নিয়ে আসার পর আলাদাভাবে কিছু দেখিনি। ওই একবার ওপরের ড্রয়ার দুটো টেনে দেখেছিলাম। ফাঁকা। ড্রয়ার দুটোর মাঝখানে যে ছোট ছোট খোপগুলো আপনি সেদিন দেখলেন, সেগুলোও ফাঁকা। ধুলো আর দু-চারটে নেপথলিনের শুকনো গুলি ছাড়া কিছুই দেখিনি। তা ছাড়া দোকানে এনে রাখার পর তো ও নিয়ে মাথা ঘামাইনি। দোকানের কর্মচারীরা অন্য কাজ নিয়ে ব্যস্ত। আলমারিটা পড়েই ছিল। মাত্র ক'দিন আগে কেনা। পরে যখন সময় পাওয়া যাবে— তখন ওতে হাত পড়বে। আগেভাগে আর কত খুঁটিয়ে

দেখব, বলুন?”

কিকিরা মাথা নাড়লেন। কথাটা ঠিকই। একটা পুরনো আসবাব দোকানে তুলে এনে কে আর সঙ্গে সঙ্গে সেটা নিয়ে মাথা ঘামাতে বসে! এমন তো নয় যে, আজ যা এনেছি— কাল পরশুই তা বিক্রি হয়ে যাবে বলে তাড়া থাকবে সারাইসুরাই রং-পালিশের। একটা খদ্দের জুটতে কত মাস লাগবে কে জানে, কাজেই হুড়োহুড়ি করার দরকার কোথায়?

“আলমারিটা এখনও দোকানেই আছে?” কিকিরা জিজ্ঞেস করলেন।

“হ্যাঁ। এই বাড়ির নীচের তলায় আমার একটা গোডাউন আছে। জায়গা যে বেশি তা নয়, সেখানে ভাঙাচোরা জিনিস পড়ে আছে ক'টা। ভাবছিলাম আলমারিটা সরিয়ে আনব কি না!”

“আনতে পারেন। তবে তাতে কি লাভ হবে?”

“না, লাভ আর কী হবে! বরং বাইরের বিপদ ঘরে টেনে আনা হতে পারে।”

“আপনার কাঠকুটো ফার্নিচারের দোকান! হঠাৎ যদি কোনওভাবে আগুন লেগে যায়, দোকান পুড়ে ছাই হয়ে যেতে পারে। ইনসিওর করানো নেই?”

আচমকা এই প্রশ্নে নন্দবাবু যেন থতমত খেয়ে গেলেন। পরে বললেন, “আছে। আজকাল কে আর ইনসিওর না করায়! তবে কী জানেন, যা যায় তা তো আর ফিরে আসে না। ব্যবসা দোকান— তাও দু' পুরুষের, পুড়ে ছাই হয়ে গেল, বদলে কিছু টাকা পেলাম, তাতে কি আর মনে শান্তি আসে!”

কিকিরা প্রায় মুখ ফসকে বলতে যাচ্ছিলেন, ‘ইনসিওর থেকে কী রকম টাকা পাওয়া যাবে!’ বললেন না কথাটা।

ঘড়ির দিকে একবার তাকিয়ে কিকিরা বললেন, “আজ তো উঠতে হয়, নন্দবাবু। পরে আবার খোঁজ করে যাব।”

“রায়মশাই একটা কথা।”

“বলুন।”

“আপনাকে আমি একবার দেখা করতে অনুরোধ করেছিলাম দু' একটা কারণে।”

“সঙ্কোচের কী আছে, বলুন!”

“আপনি আমায় পরামর্শ দিন কী করব। সেদিন আপনার সঙ্গে ওই ভাবে আচমকা দেখা না হলে— আমি কি আপনাকে খুঁজে পেতাম? না, আমার মাথায় আসত! ভাগ্য ভাল সেদিন আপনাকে পেয়ে গিয়েছিলাম। ... আমি এখন কী করব বলুন তো?”

“কী করতে চান?”

“আমার উকিলকে বলে ছেলেকে সঙ্গে দিয়ে থানায় পাঠাব? একটা ডায়েরি করে আসবে?”

“না করাই ভাল আপাতত। সেদিন আপনি থানা পর্যন্ত গিয়ে ফিরে

এসেছিলেন। আবার এখন আপনি সন্দেহ করছেন সেই একই ছোকরা আপনাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে মারবার চেষ্টা করেছে। সন্দেহ তো প্রমাণ নয়। অযথা খুঁচিয়ে ঘা করবেন কেন! আরও একটু দেখুন।”

“তা হলে আপনি দয়া করে যদি আমার তরফে একটু খোঁজখবর করেন—!”

কিকিরা হাসলেন। “আচ্ছা দেখি। আমার বিদ্যে আর কতটুকু! তবু দেখব, আপনি যখন বলছেন।” বলে উঠে দাঁড়ালেন। তারাপদও উঠে পড়ল।

॥ ৪ ॥

চন্দনের ইচ্ছে ছিল না, গরজও নয় ; তবে কিকিরার পাল্লায় পড়ে তাকে আসতে হল। তারাপদর অবশ্য অতটা অনিচ্ছে ছিল না। দিঘায় তারা আগেও এসেছে, সে আর চন্দন, সঙ্গে চন্দনের এক বন্ধু পবিত্র। কিকিরা সঙ্গে ছিলেন না তখন। আগেরবার তারা এসেছিল শীতকালে। বড়দিনের ছুটির পর। দিঘায় তখন ভিড় নেই, অনেকটাই ফাঁকা। নয়তো আজকাল ছুটিছাটার সময় দিঘা মানেই রথের মেলা।

এবার গরমের সময়, চৈত্র মাসে দিঘায় এসে তারাপদরা দেখল, লোকজন কম। কারণ কাছাকাছি কোনও ছুটি নেই। তার ওপর মাত্র দিন দুই আগে প্রচণ্ড এক কালবৈশাখীতে ইলেকট্রিক লাইনের ক্ষতি হয়েছে খুব। আলো-পাখা, মায় হোটেলে জলের ব্যবস্থা ঠিকমতন করা যাচ্ছে না। যারা বেড়াতে আসে হুটহাট তারা হয়তো এসব খবর রাখে। ফলে আপাতত লোক কম। ঝড় জল থেমে যাওয়ার পর দিঘা এখন শান্ত। ইলেকট্রিক লাইনের মেরামতিও প্রায় শেষ।

কিকিরারা এসেছিলেন সরকারি বাসে। সকালের বাস। দিঘা পৌঁছতে বেলা গড়িয়ে প্রায় দুপুর। রোদে তাপে, গরম দমকা হাওয়ায় কষ্ট হওয়ারই কথা। তবে বিকেলের পর আরামই লাগছিল।

চন্দন দিঘার সমুদ্রকে কোনওদিনই পাত্তা দেয় না। বলে, ‘ধ্যুত এই কি সমুদ্র! পুরী অনেক ভাল। জলের চেহারাই আলাদা। দিঘার সমুদ্রের জল দেখলে খালের জল মনে হয়।’

চন্দন যাই বলুক, খানিকটা পড়ন্ত বিকেলে কিকিরারা তিনজনে টহল দিতে বেরোলেন। সমুদ্রের ধার ঘেঁষে বালির ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কিকিরা হঠাৎ বললেন, “চাঁদু ডাক্তার, তুমি কপালকুণ্ডলা পড়েছ?”

চন্দন অবাক হয়ে বলল, “মানে! আপনি আমাকে গবেট মনে করেন নাকি? আশ্চর্য!”

“আরে না, তুমি যদি গবেট হবে তবে ডাক্তারি বিদ্যেটা শিখলে কেমন করে! এমনি বললাম। বঙ্কিম এদিকে থাকার সময় কপালকুণ্ডলা লিখেছিলেন বলে শুনেছি। কাপালিককে মনে আছে?”

"আছে। আপনি কি কাপালিক খুঁজতে এসেছেন?"

"নো সার, আমরা এসেছি শ্রীমান রাজা—ওরফে রাজীবচন্দ্রকে খুঁজতে।"

"ও কি এখানে আছে?" তারাপদ বলল।

"নন্দবাবু খোঁজখবর নিয়ে বলেছেন, কলকাতায় ছোকরা নেই, দিঘায় চলে এসেছে।"

"পাত্তা করতে পারবেন?"

"তোমাদের তো আগেই বলেছি, এদিকে কোথায় হোটেল তৈরি হচ্ছে খোঁজ করো, আর নন্দবাবুর বর্ণনা মতন একটি ছেলের চেহারা খুঁজে পেলে—কাজটা অসাধ্য নয়।"

চন্দন বলল, "তা হলে সমুদ্রের ধারে ঘুরে বেড়াচ্ছেন কেন! হোটেল ঘরবাড়ি যেদিকে, সেদিকে হেঁটে বেড়ালেই হত।"

কিকিরা হেসে বললেন, "একটু হাওয়া খেয়ে নিচ্ছি। বিশুদ্ধ বাতাস। তাতে মগজ সাফ হবে। তা ছাড়া উদ্যম বাড়বে।"

"উদ্যম!" চন্দন ঠাট্টা করে বলল।

কিকিরা একই ভাবে হেসে বললেন, "মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণ বারবার পাণ্ডবদের বলেছেন, উদ্যম আর ধৈর্য না থাকলে শত্রুকে জয় করা যায় না। আরে বাবা, আমাদের সাদা বাংলায় কী বলে? উদ্যম বিনে কার পুরে মনোরথ।"

চন্দন বিরক্ত হয়ে বলল, "মহাভারত রাখুন।"

"কেন! মহাভারতে কতরকম কৌশল-শিক্ষা আছে জানো? বড় বড় বীর মহাবীরকে কেমন ছলচাতুরি করে ফিনিশ করছে দ্যাখোনি!" বলেই কিকিরা গম্ভীর গলায় বললেন, "বলং বলো, কৌশলঃ মহাবলং ...!"

তারাপদ জোরে হেসে উঠল। "দারুণ স্যাংস্কৃট, সার।"

"মাই স্যাংস্কৃট, সার। আমি পরোয়া করে স্যাংস্কৃট বলি না, আমাদের সময়ে স্কুলে সংস্কৃত পড়ানো হত। পরীক্ষায় আমি কোনওবার পনেরো কুড়ির বেশি নম্বর পাইনি। পণ্ডিতমশাই আমার নাম রেখেছিলেন 'ব্যাকরণ কৌতুকী', মানে 'ব্যাকরণ কৌমুদী'-র ধরনে আর কী!"

তারাপদ হো হো করে হেসে উঠল। চন্দনও হেসে ফেলল।

সমুদ্রের ধার ঘেঁষে এখনও কিছু লোক হাঁটাচলা করছে। বালির ওপর হাত-পা ছড়িয়ে অলসভাবে বসে আছে কেউ কেউ। দু'-তিনটি মহিলা গল্প করতে করতে হাঁটছিলেন। একটি ছেলে তার মেয়ে আর বউকে নিয়ে ফিরে আসছিল। সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় হয়ে এসেছে ; আকাশ লাল হয়ে আছে পশ্চিম প্রান্তে। সমুদ্রের গর্জন অনেক শান্ত। ঝাউবনের দিকে ছায়া ঘন হয়ে এল।

তারাপদ বলল, "আর কতটা যাবেন, সার?"

"বেশি নয়। এবার ফিরব। ফিরে ওই কাফেটারিয়া, চায়ের দোকান, কাছের হোটেলগুলোয় একবার উঁকি দেব। বাসস্ট্যান্ড, বাজার ঘুরে আমাদের হোটেলে।"

"রাজার খোঁজটা তা হলে ...?"

"ঘোরাঘুরির মধ্যেই করতে হবে। হয়তো আশেপাশেই তাকে পেয়ে যাব।"

"কেমন করে?"

"আরে একটা ইয়াং ম্যান কি এই সন্ধে হওয়ার সময় তার ঘরে বসে থাকবে! এদিকেই কোথাও ঘুরছে ফিরছে। এখন কি আর তার হোটেলের কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকার সময়! ঘোরাফেরা করবে না। আর করলে এইদিকেই করবে। দিঘায় লোকজনের মুখ দেখতে হলে অন্য কোথাও গিয়ে লাভ!"

চন্দন বলল, "আর যদি দেখতে না পাই? তা ছাড়া তাকে তো আমরা চিনি না।"

"না চিনলেও আন্দাজ করতে পারব। নন্দবাবু ছেলেটির যে বর্ণনা দিয়েছেন চেহারার—গায়ের রং, মুখের ছাঁদ, থুতনির তলায় দাড়ি, মাথার কোঁকড়ানো চুল ...!"

তারাপদ বলল, "সার, অমন দাড়ি আজকাল অনেকেই রাখে।"

"রাখতেই পারে। তবু, শুধু দাড়ি নয়, গায়ের রং, মাথার চুল, চোখ—। শোনো হে তারাবাবু, চোখে দেখা এক জিনিস আর ঠিকমতন লক্ষ করা অন্য জিনিস। শার্লক হোমস তাঁর শাগরেদকে বলেছিলেন, ওহে বন্ধু—তুমি দেখো সবই কিন্তু মন দিয়ে লক্ষ করো না।"

"আপনি সার শার্লক হোমস হবেন নাকি?" ঠাট্টা করে তারাপদ বলল।

"কী যে বলো, উনি হলেন মহারাজ আর আমরা হলাম কলাগাছ!"

চন্দন হেসে ফেলল। "বললেন ভাল। ... তা ধরুন আমরা ওই ছেলেটিকে দেখতে পেলাম না।"

"না পেলাম। তখন এখানে ওখানে, হোটেলে বাজারে, ইতিউতি খোঁজ করব, কাছাকাছি কোথায় নতুন হোটেল তৈরির কাজ হচ্ছে। দিঘায় তো একসঙ্গে গণ্ডায় গণ্ডায় হোটেল বাড়ি তৈরি হচ্ছে না। একটু হাতড়ালেই পেয়ে যাব ছোকরাকে।"

"দেখুন যদি পান। আমি কিন্তু সার, পরশু রবিবার দিনই পালাব। হাসপাতাল ফেলে এভাবে থাকতে পারব না এখানে।"

"কাল তো আছ! তার মধ্যেই রাজামশাইকে ধরে ফেলব।"

"ভাল কথা।"

কিকিরারা এবার ফিরতে শুরু করলেন। সূর্য অস্ত গিয়েছে। ছায়া ঘন হয়ে অন্ধকার নেমে এসেছিল। সমুদ্র যেন মনোরম এক বাতাস বয়ে আনছিল, সামান্য এলোমেলো কিন্তু স্নিগ্ধ।

ভালই লাগছিল তারাপদর। কলকাতা শহর থেকে দু'-একদিনের জন্যে বাইরে এলে চমৎকার লাগে যে, তাতে সন্দেহ নেই।

"সার?"

"বলো।"

"ওই রাজা ছেলেটির সঙ্গে যদি আপনার দেখা হয়ে যায়, কী বলবেন তাকে?

আপনি ওকে চেনেন না, জানেন না।”

কিকিরা আকাশের দিকে তাকালেন। তারা ফুটে উঠছে। আসন্ন সন্ধ্যায় কয়েকটি বক উড়ে যাচ্ছিল ঝাউবনের দিকে। কিকিরা বললেন, “আলাপ করব। আলাপ না জমলে সুর ধরা যায় না,” বলে হাসলেন।

॥ ৫ ॥

কিকিরা ঠিকই বলেছিলেন। বাসস্ট্যান্ডের কাছে দোকানে বাজারে খোঁজ করতেই রাজা—বা রাজীবদের খবর পাওয়া গেল। নিজেদের হোটেলেও খবর নিলেন, শুনলেন, হ্যাঁ—একটা নতুন হোটেল খুলেছে, জায়গাটা কাছেই। দিঘায় এখন হোটেল ব্যবসার রমরমা, সে যেমনই হোক। ‘আরে দাদা, এক-একটা বড় ছুটি থাকলে এখানে মেলার মতন ভিড় জমে যায়, তখন মাথা গোঁজার জায়গা পায় না মানুষ। কলকাতার এত কাছে, বাসে মাত্র পাঁচ-ছ’ ঘণ্টার জার্নি। লোকে আসবে না কেন! ক’ বছরেই দিঘা কত পালটে গেল, ছড়িয়ে গেল। আরও যাবে।’

পরের দিন সকালবেলায় চায়ের পাট মিটিয়ে কিকিরারা বেরিয়ে পড়লেন।

বিশ পঁচিশ মিনিটও হাঁটতে হল না, জায়গাটা পাওয়া গেল। কিছু গাছপালা, সরু রাস্তা, তারপরই টিলার মতন উঁচু একটা স্তূপ—অনেকটা বালিয়াড়ির মতন দেখতে রাজীবদের হোটেলবাড়ি দেখতে পেলেন কিকিরা।

তারাপদ বলল, “সার, ওইটে বলে মনে হচ্ছে।”

কিকিরা মাথা নাড়লেন।

সামান্য এগিয়ে আরও স্পষ্ট হল দৃশ্যটা।

চন্দন বলল, “বাড়ি তো নতুন নয়।”

“সেরকমই মনে হচ্ছে। চলো দেখি।”

কাছাকাছি আসতেই বোঝা গেল, কোনও পুরনো বাড়ি যেন হাত বদলে রাজীবদের দখলে এসেছে। একতলা বাড়ি। বড়জোর মাঝারি মাপের। আশেপাশে বাগান। এক প্রান্তে ছোট আউট হাউস।

বাড়িটায় কাজকর্ম হচ্ছে বোঝা যায়। ইট, বাঁশের খুঁটি, বালি, লোহার ছড়—মালমশলা চোখে পড়ে।

কিকিরা হালকাভাবে বললেন, “তারা, আমরা বেড়াতে বেরিয়েছি বুঝলে! কলকাতা পার্টি ...। এই একটু ঘুরেফিরে দেখছি। আন্ডারস্ট্যান্ড। নো এন্‌কোয়ারি, নাথিং।”

“বুঝলাম।”

সামান্য চড়াই। বেড়ানোর ভঙ্গিতে তিনজনে বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়ালেন। দাঁড়িয়ে অবাক। উঁচু এই জায়গাটা যেন সত্যিই বালিয়াড়ি, বিশ পঁচিশ গজ তফাতেই উতরাই, তারপর বালি, গোটা দুয়েক ঝাউগাছ, মাটি তেমন চোখে পড়ে

না। আর সামনেই সমুদ্র। যেন এখান থেকে হাত বাড়িয়েই সমুদ্র ছোঁয়া যায়। অবশ্য ওটা চোখের ভ্রম। সমুদ্রতট অন্তত শ'খানেক গজ তফাতে। জায়গাটা সত্যিই সুন্দর। তারিফ করতে হয়।

আড়াল থেকে কে যেন বেরিয়ে এল। বাড়িটার বারান্দার দিকে তাকালেন কিকিরা।

রাজা, মানে রাজীব নন্দী।

চিনতে অসুবিধে হল না। টকটকে ফরসা গায়ের রং। ছিপছিপে গড়ন। কাটা কাটা মুখ। থুতনির তলায় দাড়ি। ঘন জুলফি। কুচকুচে কালো মাথার চুল। কোঁকড়ানো। চোখের মণি ধূসর রঙের।

রাজীবের পরনে জিন্স-এর প্যান্ট, গায়ে ঢিলে ঢলঢলে রঙিন গেঞ্জি, সুতোর, পায়ে চটি। হাতে সিগারেট।

নিজেই এগিয়ে এল রাজীব। দেখল কিকিরাদের। "আপনারা?"

"বেড়াতে বেড়াতে এদিকে চলে এসেছিলাম," কিকিরা বললেন, "দেখতে বড় ভাল লাগছিল। তাই উঠে এলাম ওপরে।" নরম করে হাসলেন কিকিরা।

"বেড়াতে এসেছেন? দিঘায় প্রথম নাকি?"

"অনেক আগে একবার..."

"কোথায় থাকেন?"

"কলকাতা।"

"ও!"

"এটা আপনার বাড়ি। বাঃ, বড় সুন্দর। কতটা উঁচুতে বাড়ি—সামনে সমুদ্র। অসাধারণ।"

"আমার বাড়ি নয়। একটা হোটেল তৈরির কাজ হচ্ছে।"

"তাই বলুন। আমরা ভাবছিলাম, বাড়িটার মেরামতির কাজ চলছে। হোটেল মানে তো বড় ব্যাপার। অনেক ঘরটর, খাওয়া-বসা, অফিস—!"

মাথা নাড়ল রাজীব। "না, এখনই অত বড় করার ইচ্ছে নেই। এখানে এখন বড় মাঝারি, ভাল মন্দ অনেক হোটেল। আমরা এটাকে গেস্ট হাউস মতন করব। চার-পাঁচটা ঘর, অ্যাটাচড় বাথ, বারান্দার দিকে বসার লাউঞ্জ। যে আসবে, থাকবে দু'-চারদিন। খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করছি না। সকালে ব্রেকফাস্ট দেওয়া হবে শুধু। বাকি খাওয়া বাইরে।"

"আচ্ছা! তাতে লোকের অসুবিধে হবে না?"

"হওয়ার কথা নয়। এখানে যারা বেড়াতে আসে তারা সকলেই একই হোটেলে খায় না। যার যেমন মরজি, মুখ বদল, মিল চার্ট বুঝে খেয়ে বেড়ায়। তবে কেউ বললে, আমরা বাইরে থেকে মিল আনিয়ে দেব।"

কিকিরা কথা বলতে বলতে রাজীব সম্পর্কে একটা ধারণা গড়ে নেওয়ার চেষ্টা করছিলেন। ছেলেটিকে উদ্ধত, রাগী, রুক্ষ বলে তো মনে হচ্ছে না। নন্দবাবুর

কথার সঙ্গে যেন মিলছে না ঠিক।

রাজীবই বলল, "আপনারা একটু ওপাশে সরে দাঁড়ান। রোদ লাগছে মাথায়। এরই মধ্যে রোদ চড়ে উঠেছে। ... আপনারা ছাতাটাতা নিয়ে বেরুলেই পারতেন।"

কিকিরা মৃদু হাসলেন। "আবার ছাতা! সামান্য ঘোরাফেরা করে আমরা হোটেলে ফিরে যাব। বিকেলে আরও ঘোরা যাবে, যতটা পারা যায়।" বলেই কী যেন মনে পড়ল। তাড়াতাড়ি বললেন, "ভাই, আপনার নামটি জানা হল না। পরে কখনও এলে এখানে যদি উঠি—!"

"আমার নাম রাজীব নন্দী।"

"আমি কিঙ্করকিশোর রায়, লোকে ছোট করে বলে কিকিরা। এরা আমার ইয়ং ফ্রেন্ডস, চন্দন আর তারাপদ।" কিকিরা পরিচয় করিয়ে দিলেন, বিস্তারিত বললেন না।

মিস্ত্রিমজুররা আসতে শুরু করেছিল। তাদের গলা পাওয়া যাচ্ছে, সঙ্গে ধুতি শার্ট পরা মাঝবয়েসি এক সর্দার, হাতে মাপজোকের ফিতে, একটা চটি মতন খাতা।

রাজীব চেঁচিয়ে কী যেন বলল লোকটিকে।

কিকিরা বুঝলেন, এবার তাদের ফিরে যাওয়ার কথা। কিন্তু এভাবে কেমন করে ফিরে যাওয়া যায়! আরও খানিকটা দেখা দরকার। মাথায় একটা বুদ্ধি এল। বললেন, "এক গ্লাস জল পাওয়া যেতে পারে, ভাই? বড় তেষ্টা পেয়েছে।"

"জল খাবেন! আসুন—, " বলে রাজীব ডানদিকে পা বাড়াল।

মেঠো জমি, বাগান, করবী ঝোপ, গন্ধরাজ ফুলের গাছ। দশ-বিশ পা ডাইনে বাড়িটার পিছন দিকে আসতেই আউট হাউসটা স্পষ্ট নজরে পড়ল। কোনাকুনি একটেরে গোটা দুই ঘর, তারই গা লাগিয়ে কোনাকুনি অন্য এক খুপরি। অ্যাসবেসটাসের ছাদ দেওয়া। আউট হাউসের ঘর দুটি কিন্তু পাকা, সামনে বারান্দা। বেতের চেয়ার পাতা ছিল এক জোড়া।

বারান্দার নীচে কলকেফুলের গাছের ছায়ায় একটা মোটরবাইক।

কিকিরা চন্দনের দিকে আড়চোখে তাকালেন।

চন্দনরা এখন পর্যন্ত একটাও কথা বলেনি। তারাপদ শুধু একবার তুচ্ছ একটা কথা বলেছিল।

হাঁটতে হাঁটতে কিকিরা বললেন, "এই গেস্ট হাউসের নাম কী হবে?"

"নাম এখনও ভাবিনি।"

"আমাদের চেনাশোনা বন্ধুবান্ধব এলে রেফার করতে পারতাম।"

"নাম একটা দেওয়া যাবে।"

"সাগরসঙ্গম। নামটা মুখে এসে গেল।" কিকিরা হাসলেন।

রাজীবও হাসল। "মন্দ নয়।"

আউট হাউসে পৌঁছে বারান্দায় উঠলেন কিকিরারা। রাজীব কাকে যেন ডাকল, "ভোলা, জল দিয়ে যাও।" কিকিরাদের দিকে তাকাল, "বসুন আপনারা। ওই কাঠের চেয়ারটাও টেনে নিন।"

পকেট থেকে রুমাল বার করে মুখ গলা মুছলেন কিকিরা। "এখানেই কি আপনি থাকেন?"

"হ্যাঁ, আমরা এখন আউট হাউসেই থাকি। ও-বাড়ির কাজ চলছে, থাকার উপায় নেই।"

ভোলা জল নিয়ে এল। কলাইকরা জলের জগ। কাচের গ্লাস। ও বোধ হয় নজর করেছিল, দু'-তিনজন বারান্দায় এসে উঠেছেন।

জল খাওয়া হয়ে গেলে কিকিরা বললেন, "আমরা তবে আসি?"

"আসবেন! দাঁড়ান, ভোলা বোধ হয় চা খাওয়াবার ব্যবস্থা করছে। ভোলা কি চা হবে?"

"আনছি।"

ভোলা চলে গেল।

চন্দন হঠাৎ বলল, রাজীবের দিকে তাকিয়ে। "আপনার বাঁ হাত কি ভাঙা?"

রাজীব নিজের বাঁ হাত দেখল। হাসল। "ছেলেবেলার দুরন্তপনার চিহ্ন। ঘুড়ি ওড়াতে ওড়াতে ছাদ থেকে পড়েছিলাম। মাটিতে পড়লে আর বেঁচে থাকতে হত না। গাড়িবারান্দার ছাদে পড়েছিলাম।...আপনার তো নজর আছে।"

"ভাল সেট হয়নি, চোখে পড়ে...।"

"ও ডাক্তার ," কিকিরা বললেন।

"আচ্ছা! তাই বলুন।" বলে কী মনে করে মজার মতন মুখ করে হাসল রাজীব। "আমার বাবা ডাক্তার ছিলেন। শুনেছি তাঁর সাধ ছিল আমায় ডাক্তারি পড়াবেন। সাধ মেটেনি। আমার বছর দশেক বয়েসে বাবা মারা যান। অদ্ভুত ভাবে। ওঁর শখ ছিল বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াবার। শিকার করারও নেশা ছিল। জঙ্গলে বেড়াতে গিয়েই মারা যান।"

"ইস—স্যাড" কিকিরা বললেন, "জন্তু-জানোয়ার অ্যাটাক করেছিল?"

"না। একটা পাথরের চাঁই ওপর থেকে খসে গড়িয়ে পড়ে মাথার পেছন দিকে এসে লেগেছিল।"

কিকিরা আফসোসের শব্দ করলেন। "দুর্ভাগ্য! মানুষ যে কীভাবে মারা যায়!...তা ভাই, আপনি সেই ছেলেবেলা থেকে—"

"আমার দাদুর কাছে মানুষ।"

"কলকাতায় কোথায় বাড়ি?"

"হাতিবাগান।" রাজীব বাড়ির একটা বর্ণনা দিল, নাম বলল রাস্তার, "ওটা আমার দাদু—মানে মায়ের বাপের বাড়ি। ওই বাড়িতেই আমি মানুষ, বাবা চলে যাওয়ার পর থেকে। আমাদের নিজেদের বাড়ি সুরি লেন, বাবার ভাই

জ্ঞাতিগোষ্ঠীরা সেখানে থাকে। আমরা থাকি না।"

কিকিরারা চুপ করে থাকলেন। রোদ ঝলসে উঠছে, দমকা বাতাসও এল। মিস্ত্রিমজুরের গলা। এখান থেকে সমুদ্র দেখা যাচ্ছে না, আড়াল পড়ে গিয়েছে, শব্দ শোনা যাচ্ছিল, ঢেউ যেন এখন অনেক শান্ত।

তারাপদ হঠাৎ বলল, "এই বাড়িটা আপনারা কিনেছেন?"

"হ্যাঁ," রাজীব মাথা নাড়ল। "পনেরো-বিশ বছরের পুরনো বাড়ি। কাঁথির এক ভদ্রলোকের বাড়ি। উনি মারা যাওয়ার পর ওঁর স্ত্রী ভাগলপুরে চলে যান। ছেলেমেয়ে ছিল না। এই বাড়িটা ফাঁকাই পড়ে থাকত। তখন দিঘায় লোকজনও বেশি আসত না। আমার পার্টনার যোগাযোগ করে বাড়িটা কিনে নেয়।"

"তাঁকে তো দেখছি না?"

"না, এখন আমি আছি বলে সে অন্য কাজে ব্যস্ত, খড়্গপুরে তার বাড়িতে গিয়েছে। আমরা দু'জনে একসঙ্গে এখানে কমই থাকি। ও যখন থাকে, কাজকর্ম দেখাশোনা করে এদিককার, আমি কলকাতায় চলে যাই। আবার আমি ফিরে এলে ও চলে যায়।"

"অল্টারনেট ব্যবস্থা।"

রাজীব হাসল।

ততক্ষণে চা এসে গিয়েছে। হাতে হাতে চায়ের কাপ ধরিয়ে দিল ভোলা। বেতের গোল একটা টেবিলও পড়ে ছিল সামনে।

চায়ে চুমুক দিয়ে কিকিরা তারিফ করলেন চায়ের। পরে বললেন, "আপনাদের এই সাগরসঙ্গম চালু হবে কবে?" বলে হাসলেন।

রাজীব বলল, "আশা করছি জুনের আগেই। আর মাস দুই লাগবে বড়জোর।"

"বর্ষার আগেই তবে। তা ভাল। শুভস্য শীঘ্রম।" হাসলেন কিকিরা। "আমরাও চলে আসতে পারি।...আজ তা হলে চলি, ভাই। আপনার সঙ্গে আলাপ করে বড় ভাল লাগল।"

চা শেষ করে তিনজনে উঠে পড়লেন।

বারান্দা দিয়ে নামার সময় চন্দনের আবার নজর পড়ল মোটরবাইকের দিকে। কিকিরাদের কাছে সে নন্দবাবুর কথা শুনেছে, বাইকের ধাক্কা খেয়েছেন ভদ্রলোক। তাঁর ধারণা ওটা দুর্ঘটনা নয়, তাঁকে জখম করার চেষ্টা।

চন্দন চোখের ইশারায় বাইকটা দেখাল রাজীবকে। "আপনি কি মোটরসাইকেল নিয়ে কলকাতা যান? এতটা রাস্তা—!"

"না। আমার যাওয়ার ঠিক নেই। কখনও বাসে যাই, কখনও খড়্গপুর পর্যন্ত গিয়ে লোকাল ধরি, আবার চেনাশোনা কন্ট্রাক্টারদের জিপ-টিপ যাচ্ছে দেখলে তাতেও চলে যাই। কেন বলুন তো?"

"এমনি বললাম," চন্দন বলল, "এই রাস্তাটায় মাঝে মাঝেই শুনি অ্যাক্সিডেন্ট হয়। এই তো ক'দিন আগেই কাগজে দেখছিলাম এক ভদ্রলোকের স্ত্রী মেয়ে সবাই

হেড অন কলিশনে মারা গিয়েছেন। ভদ্রলোক নিজেই গাড়ি ড্রাইভ করছিলেন।”

রাজীব বলল, “পড়েছি কাগজে, শুনেছি। বেশিরভাগ অ্যাক্সিডেন্টই হয় কেয়ারলেস ড্রাইভিংয়ের জন্যে। ভদ্রলোক শুনলাম নতুন গাড়ি কিনে বেশি বেশি বেপরোয়া হয়ে উঠেছিলেন। ব্যাড লাক।”

কিকিরারা আর দাঁড়ালেন না। মাথার ওপর সূর্য গনগনে হয়ে উঠেছে, বালি তেতে যাচ্ছে ভীষণ।

রাস্তায় এসে তারাপদ বলল, “কী সার? কেমন মনে হল?”

কিকিরা বললেন, “মনে হওয়ার মতন এখন কিছু হয়নি। ছেলেটি হয় সরল সাদামাটা ভদ্র; না হয় অত্যন্ত চতুর ধূর্ত। ওপর থেকে কিছু বোঝা যায় না।”

চন্দন বলল, “রাজীবকে আমার কিন্তু খারাপ লাগেনি। ওকে ক্রিমিন্যাল ভাবা যায় না।”

“বোধ হয়। তবু দেখা যাক শেষ পর্যন্ত কী হয়,” কিকিরা বললেন।

॥ ৬ ॥

কলকাতায় ফিরে কিকিরা নন্দবাবুর সঙ্গে দেখা করলেন না। করার কোনও প্রয়োজনও আপাতত আছে বলে তাঁর মনে হয়নি। নন্দবাবু জানেনও না, কিকিরা এর মধ্যে রাজীবের খোঁজে দিঘা গিয়েছিলেন।

কিকিরা চাইছিলেন, একবার হাতিবাগানের বিশ্বাসবাড়ির ছোটকর্তা—বৃদ্ধ সুবর্ণকান্তির সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু সেটা কেমন করে সম্ভব? কিকিরার পরিচিত এমন কেউ নেই যাকে সঙ্গে নিয়ে, বা যার সুপারিশে ছোটবাবুর সঙ্গে দেখা করতে পারেন।

তারাপদ আর চন্দনকেও তিনি বলে রেখেছিলেন, একটু খোঁজে থাকো, যদি কাউকে পেয়ে যাও—ও পাড়ার লোক, বিশ্বাস ফ্যামিলিকে চেনে, আমাদের একবার ও-বাড়ির সদরে ঢুকিয়ে দেবে।

তারাপদরাও এরকম কোনও বন্ধুবান্ধব, চেনাজানা লোক পাচ্ছিল না। দিন চারেক এইভাবেই কেটে গেল, কাজের কাজ কিছুই হল না।

সেদিন কিকিরার বাড়িতে বসে কথা বলতে বলতে তারাপদ বলল, “সার, নন্দবাবুর মামলা নিয়ে আর মাথা ঘামাবেন না। ছেড়ে দিন। তুচ্ছ ব্যাপার ওটা ; আপনার মতন বুদ্ধিমান লোকের ওখানে নাক গলানো পোষাচ্ছে না।”

কিকিরা একটা পুরনো ডায়েরি-বুকের পাতা ওলটাচ্ছিলেন। মুখ না তুলেই বললেন, “না হয় দিলাম ; কিন্তু কেন বলবে তো?”

“সত্যি কথা বলতে কি সার, আমি আর চাঁদু মনে করি না—রাজা বা রাজীব

গুণ্ডা মস্তান গোছের ছেলে। তাকে দেখলে কেউ একথা বলবে না। নন্দবাবু কেন যে তার সম্পর্কে অত বাজে কথা বলছেন—আমরা বুঝতে পারছি না।"

চন্দন বলল, "নন্দবাবুর সঙ্গে রাজীবের তো সরাসরি কোনও শত্রুতা নেই। তবে কেন সে ভদ্রলোককে শাসাতে যাবে, আর কেনই বা মোটরবাইক চাপা দিয়ে জখম করতে যাবে?"

কিকিরা অল্পক্ষণ চুপচাপ থাকার পর বললেন, "মুখ দেখে মানুষ চিনতে অনেক সময় ভুল হয় হে! ...তা এত তাড়াতাড়ি রাজীবকে জামিন দেওয়ার কারণ নেই। আর একটু দেখা যাক। ...আচ্ছা শোনো, আমার এই পুরনো ডায়েরিতে হরেনবাবু বলে একজনের নাম দেখেছি। গ্রে স্ট্রিটের দিকে থাকতেন, রাধাকান্ত দেব লেন—বা ওইরকম একটা কিছু হবে। খোঁজ নিতে পারো?"

তারাপদ বলল, "অবাক কথা বলছেন তো আপনি! আপনার ডায়েরিতে নাম ; আর খোঁজ নেব আমরা!"

"হরেনবাবু ভদ্রলোকটি কে?" চন্দন জিজ্ঞেস করল।

"মিউজিক হ্যান্ড। বাঁশি বাজাতেন ; তবলা হারমোনিয়ামেও দখল ছিল। থিয়েটারে, রেকর্ড কোম্পানিতে কাজকর্ম করতেন। আমার সঙ্গে আলাপও হয়েছিল তাঁর। লোকটি খেপাটে, মুখে সবসময় পান, না হলে আড়বাঁশি। তবে হ্যাঁ—বাঁশিতে পয়লা নম্বর।"

"যা বাবা, বাঁশিঅলা আপনার কী করবে?"

"কী করবে বলতে পারি না, নট নাউ! বিশ্বাসবাড়ির ছোটকর্তা সুবর্ণকান্তির একসময় দোকান ছিল গ্রামোফোন রেকর্ড বিক্রি করার। সেখানে গাইয়ে বাজিয়ের আড্ডা বসত প্রায়ই। নন্দবাবুই বলেছেন। হরেনবাবু ছোটকর্তাকে চিনতে পারেন।"

তারাপদ বিরক্ত হয়ে বলল, "আপনি যে কী বলছেন আমি মাথামুণ্ডু বুঝতে পারছি না। সুবর্ণবাবুর দোকান ছিল তাঁর যৌবনকালে, এখন তিনি বুড়ো, হরেন তাঁকে কেমন করে চিনবেন!"

কিকিরা ডায়েরি বন্ধ করে মুখ তুললেন। মানে ভাল করে দেখলেন তারাপদদের। পরে বললেন, "তোমাদের ব্রেন দিন দিন কমজোরি হয়ে যাচ্ছে। ঘিলু শুকিয়ে গেলে গোবর-গণেশ হয়ে যাবে।" বলে কিকিরা হাসলেন। তারপর দাঁড়িয়ে পড়ে হাত মাথার ওপর তুললেন। আলস্য ভাঙলেন। ঘরের মধ্যে জায়গা কম। দু'পা হাঁটলেন। শেষে বললেন, "সুবর্ণবাবু যৌবন বয়েসে দোকান সাজিয়ে বসেছিলেন—মানেটা কী! যৌবন বলতে তুমি কি তাঁর বিশ-পঁচিশ বছর বয়েস বোঝো? সেটা তিরিশ-চল্লিশ হতে আপত্তি কোথায়? পঁয়তাল্লিশও হবে না কেন! ওভাবে হিসেব হয় না। আমি ধরে নিচ্ছি সুবর্ণবাবুর বয়েস এখন যদি সত্তর হয়—তবে বছর কুড়ি-বাইশ আগেও তাঁর গ্রামোফোনের দোকানটা ছিল। তখন তাঁকে হরেনবাবুরা দেখলেও দেখতে পারেন। আলাপও থাকতে পারে।"

“হরেনবাবুর বয়েস কত হতে পারে?” চন্দন জিজ্ঞেস করল।

“ক-ত! সঠিক বলতে পারব না। যাটের গায়ে গায়ে হবে।”

“তিনি এখনও পুরনো ঠিকানায় আছেন?”

“ঠিকানা জানি না। গলির নাম লেখা আছে ডায়েরিতে। ওখানে গিয়ে খোঁজ করলে ভদ্রলোককে পাওয়া যেতে পারে। অবশ্য অনুমানে বলছি।”

তারাপদ বলল, “কিন্তু সার, উনি যে এখনও বাঁশি বাজান আপনি জানেন?”

“না। সেটা খোঁজ করলেই জানা যাবে। তবে আমি জানি হরেনবাবু ওই পাড়ার একটা রেকর্ড কোম্পানির রিহার্সাল অফিসে নিয়মিত যেতেন। হয় বাঁশি না হয় তবলা বাজাতেন। হারমোনিয়ামেও হাত লাগাতেন।”

“তা হলে তো সেই রেকর্ড কোম্পানির অফিসে গিয়ে খোঁজ করলেই হয়।”

“তাও হয়। ...মুশকিল হল, সেই অফিস এখনও আছে কিনা জানি না।”

বগলা চা দিয়ে গেল। গরমে সর্দিজ্বরে ভুগেছে সবে। মুখ শুকনো। কাহিল কাহিল লাগছিল।

চন্দনের ডাক্তারিতে বগলা আপাতত নিজেকে সামলে নিলেও গায়ে-গতরে খানিকটা নির্জীব হয়ে রয়েছে।

চা খেতে খেতে তারাপদ বলল, “আপনি তবে লেগে পড়ুন সার। দেখুন হরেনবাবুকে খুঁজে পান কিনা!”

“আমি রেকর্ডিং কোম্পানির অফিসে খোঁজখবরটা নেব। তোমরা বাড়ির খবরটা জোগাড় করার চেষ্টা করো। মনে হয় পেয়ে যাব।”

“ঠিক আছে, বলছেন যখন খোঁজ করব”, তারাপদ বলল। তার গলায় তেমন উৎসাহ নেই, যেন নিতান্তই কিকিরার কথা রাখতে সে খোঁজ করবে, আশা-ভরসা তার নেই।

কিকিরা বললেন, “কালকেই যাও একবার। আমিও কাল বেরোব।”

চন্দন বলল, “একটা কথা বলব, সার?”

“বলো।”

“ধরে নিলাম কোনওভাবে আপনি বিশ্বাসবাড়ির চৌকাঠ ডিঙোলেন, বৃদ্ধ ভদ্রলোকের সঙ্গে আপনার দেখাও হল। কিন্তু যদি দেখেন রাজীব সেখানে হাজির, কিংবা আপনার আসা-যাওয়ার পথে তার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তখন কী করবেন? ধরা পড়ে যাবেন না?”

কিকিরা অস্বীকার করলেন না কথাটা। বললেন, “আমি একটা হিসেব করেছি। ধরে নিচ্ছি, রাজীব আজ কাল পরশুর মধ্যে দিঘা থেকে ফিরবে না। তার পার্টনার দিঘায় না-যাওয়া পর্যন্ত সে কাজকর্ম ফেলে কলকাতায় আসছে না। সম্ভবত নয়।”

“আপনি একটা চান্স নিতে চান?”

“হ্যাঁ। ...তবু অন্যভাবে একবার জেনে নেওয়ার চেষ্টা করব, রাজীব কলকাতায় ফিরেছে কি না!”

"অন্যভাবে মানে?"

"নন্দবাবুর দোকানের শ্রীকুমারকে বলব, খোঁজ করে জেনে আসতে।"

"নন্দবাবুর সঙ্গে আপনি তো আর দেখাই করছেন না!"

"না। ইচ্ছে করেই। অযথা মুখ দেখিয়ে লাভ কী! তা ছাড়া সুবর্ণবাবুর সঙ্গে একবার দেখা না করে আমি নন্দবাবুর বাড়ি যেতে চাই না।"

চন্দন কিকিরাকে নজর করে দেখল। ওঁর গলার স্বর খানিকটা অন্য রকম। কানে লাগল। দ্বিধা হল চন্দনের, তবু বলল, "আপনার মনে যেন কোথাও খোঁচা লেগেছে?"

কিকিরা কথাটার জবাব দিলেন না। না দিয়ে হাত বাড়ালেন, "কই, একটা সিগারেট দাও দেখি। গরমে নেতিয়ে যাচ্ছি। পিক আপ দরকার।"

॥ ৭ ॥

পরনে চেককাটা লুঙ্গি, গায়ে ঢিলেঢালা ফতুয়া। মাথার কাঁচাপাকা চুল ফুলেফেঁপে ঝুঁটির মতন দেখায়। মনে হয় না ভদ্রলোক সেলুন বা নাপিতের পরোয়া করেন। মুখে অবশ্য দাড়ি নেই, পাতলা গোঁফ আছে, পাকা।

পুরনো কলকাতার গলি। মোটামুটি চওড়াই বলতে হবে, টেম্পো, ছোট ট্রাক ঢুকে পড়তে পারে অনায়াসেই। গায়ে গায়ে বাড়ি, খানিকটা স্যাঁতসেঁতে চেহারায় দাঁড়িয়ে আছে। এ-বাড়ি ও-বাড়ির সামনে রোয়াক। এক জায়গায় জনাকয়েক ছেলে বসে আড্ডা দিচ্ছিল। কিকিরা আর তারাপদ সদর পেরোতেই হরেনবাবুর গলা পেলেন।

বাঁদিকের ঘরের দরজা খুলেই বসে ছিলেন হরেনবাবু। "এই যে যদুমাস্টার আসুন। আমি ঘড়ি ধরে বসে আছি।"

কিকিরা ভেতরে এলেন ; পেছনে তারাপদ।

মজার গলায় কিকিরা বললেন, "আমার নামটা এখনও ভোলেননি দেখছি।" বলে তারাপদর দিকে তাকালেন, বললেন, "হরেনদা আমার জাদুকর পেশাটাকে যদুমাস্টারে পালটে দিয়েছিলেন। এখনও ওঁর সেটা মনে আছে ভাবিনি।"

হরেনবাবু হাসছিলেন। "বসুন বসুন। আগে বসা হোক, তারপর কথা।"

ঘরের মধ্যে একটা চওড়া তক্তপোশের ওপর ফরাস পাতা। চাদরটা ময়লা হয়ে গিয়েছে। জানলার দিকে একটামাত্র কাঠের চেয়ার। দেয়াল জুড়ে নানান ছবি। বাঁধানো ফোটোগ্রাফ, কোনওটা গ্রুপ ফোটো, কোনওটা একলা হরেনবাবু। একপাশে সরস্বতীর পট, দেয়াল-তাকে এটা-ওটা সাজানো, ফরাসের এককোণে একটা হারমোনিয়াম, পাশে ডুগি তবলা।

ঘরের মধ্যে গান চলছিল। আলো জ্বালানোর সময় হয়ে এসেছে দেখে আলোও জ্বালিয়ে দিলেন হরেনবাবু।

কিকিরারা ফরাসের ওপর বসলেন, "কেমন আছেন দাদা?"

"আছি। পুরনো হলে বাঁশেও ঘুন ধরে। আমারও ধরেছে।"

"অসুখবিসুখ?"

"তা ঠাকুরের দয়ায় হাঁপানিটা বারো মাসে তেরো পার্বণের মতন লেগেই আছে। ব্লাড প্রেশারটাও চড়া। কী আর করা যাবে ভাই! গিন্নি সটকান দিল। আমি বলতাম, 'ওগো তেজ দেখিয়ো না, ড্যাংড্যাঙিয়ে চলে যাব আগে আমি, তুমি থাকবে পড়ে।' তো সেই আগে চলে গেল। এখন আমি পড়ে আছি। সংসার বলতে ছেলে, বউমা আর এক নাতি। দিন কেটে যাচ্ছে।"

কিকিরার কষ্টই হল। হরেনদা বরাবরই রসিক মানুষ ছিলেন। মুখে হাসি লেগেই থাকত। সামান্য চুপ করে থেকে বললেন, "বাজনাটাজনা ছেড়ে দিয়েছেন নাকি?"

"চোদ্দ আনা। বাঁশি আর ছুঁই না, দম কোথায় কলজেতে, হাঁপানি রোগী। তবে একেবারে বসে থাকি কেমন করে! দু'-পাঁচটা ছাত্র আছে—তারা হপ্তায় দু'-তিনদিন আসে। এখানে বসে বাজায়টাজায়। শুধরে দিই।"

কিকিরা ফরাসের ওপর পড়ে থাকা হারমোনিয়াম ডুগিতবলার ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন।

"আমার কথা হল, আপনার কথাটা বলুন তো যদুমাস্টার। ওই ছেলেটি পরশুদিন আমার বাড়ি খুঁজতে খুঁজতে এখানে এসে হাজির," বলে তারাপদকে দেখালেন হরেনবাবু। "আপনার কথা বলল। প্রথমটায় থমকে গিয়েছিলাম। ধরতে পারলাম ঠিকই যখন বলল, আপনি ম্যাজিশিয়ান ছিলেন একসময়। তবে অবাক হলাম এই ভেবে যে, এতকাল পরে আপনি আমার খোঁজ করে দেখা করতে চান।"

কিকিরা বললেন, "আমি আপনাদের সেই রেকর্ড কোম্পানির অফিসের খোঁজেও গিয়েছিলাম। শুনলাম, উঠে গিয়েছে।"

"সে তো কবেই।"

"আমার পুরনো ডায়েরি খাতায় আপনার নাম পেলাম। গলির নাম। ঠিকানা—মানে বাড়ির নম্বরটা লেখা ছিল না। তারাপদকে খোঁজ করতে পাঠিয়েছিলাম।"

"আমরা আর কোথায় যাব, ভাই! দু'পুরুষের বাড়ি। ইটকাঠের চেহারা দেখেই বুঝতে পারছেন। ...যাক গে, এবার আসল কথাটা শুনি। আমায় হঠাৎ মনে পড়ল কেন? ...দাঁড়ান, আগে একটু চায়ের কথা বলে নিই।" বলে হরেনবাবু ভেতর-দরজার ওপারে গিয়ে হাঁক পাড়লেন, "বউমা, নীচে লোক এসেছেন, দু'-তিনজনের চা পাঠাও।"

ফিরে এসে বসলেন আবার। পানের ডিবে থেকে পান বার করে মুখে দিলেন। "বলুন?"

কিকিরা সরাসরি বললেন, "আপনি হাতিবাগানের বিশ্বাসবাড়ির ছোটকর্তা

সুবর্ণকান্তিকে চেনেন?”

“কে? সোনাবাবু! চিনব না কেন? বিলক্ষণ চিনি। ওঁকে আমরা সোনাবাবু বলতাম।”

“ভদ্রলোকের দোকান ছিল একসময় ; গ্রামোফোন রেকর্ড বিক্রি হত...।”

“আরে হ্যাঁ, ওই তো—যতীন্দ্রমোহন অ্যাভিনিউতে, বিশ্বাস মিউজিক্যাল হাউস। বাহারি দোকান ভায়া, অন্য পাঁচটা দোকানের মতন একেবারেই নয়। দিব্যি বড় ঘর, কাঠের ঠেলা-দরজা, দোকানের একপাশে রেকর্ড, গ্রামোফোন মেশিনটেশিন বিক্রি হত ; অন্য পাশে পার্টিশানের এপাশে সোফাসেটি চেয়ার গালচে। সেখানে জমাট আড্ডা বসত গাইয়ে বাজিয়ের, চা পান চুরুট চলত। মাঝে মাঝে খাবারদাবার আসত। হইচই হাসি তামাশা...”

“আড্ডার দোকান?”

“হুঁ, তা বলতে পারেন। সোনাবাবুর যে একটা রেকর্ড কোম্পানি ছিল। বেঙ্গল মিউজিক্যাল রেকর্ডস। বেশি না হলেও কিছু রেকর্ড বার করেছিলেন। গাইয়ে-বাজিয়েদের আসা-যাওয়া তো থাকবেই।”

“দোকান উঠে গেল কেন?”

হরেনবাবু হাসলেন, “ব্যবসা চালাবার মানুষ সোনাবাবু ছিলেন না। আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি, খরচার খাতা ভারী হতে হতে গণেশ উলটে গেল।”

“তারপর আর উনি কিছু করেননি?”

“আমার জানা নেই, ভায়া। করেছেন বললে বলতে হয়, শরিকি মামলা মোকদ্দমা আইন আদালত। আগেও করেছেন পরেও করেছেন। কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা উকিল ব্যারিস্টারের পকেটে ঢেলে এসেছেন। আর বোঝেনই তো, বড় বড় বাড়ির দেওয়ানি মামলা এক যুগেও শেষ হয় না। সোনাবাবুর জীবনটা এইভাবেই কেটে গেল। খেয়ালি মানুষ, আগুপিছু না ভেবে ঝাঁপিয়ে পড়েন, শেষে মাঝপুকুরে গিয়ে গলা ডুবে যায়, হাঁসফাঁস করেন। ...কিন্তু যদুমাস্টার আপনি হঠাৎ সোনাবাবুর খোঁজ নিচ্ছেন কেন?”

ওপর থেকে ততক্ষণে একটি কমবয়েসি মেয়ে এসে চা, মিষ্টি, কাটা ফল দিয়ে গিয়েছে। হরেনবাবু হাত বাড়িয়ে তুলে নিতে বললেন কিকিরাদের।

“খোঁজ নেওয়ার দরকার পড়েছে, দাদা। বলব আপনাকে—,” কিকিরা বললেন, “তার আগে আরও দু’-একটা কথা জেনে নিই। ...আপনি ওঁকে শেষ কবে দেখেছেন?”

“শেষ! শেষ দেখেছি বছর দুই আগে। আমি নিজেই আজকাল তেমন একটা বেরোই না বাইরে। উনি ডেকে পাঠিয়েছিলেন, গিয়েছিলাম।”

“ডেকে পাঠিয়েছিলেন কেন?”

“এই তো মুশকিলে ফেললেন, যদুমাস্টার। সব কথা কি বলা যায়? উচিতও নয়।”

"সিক্রেট! তা হলে বলবেন না।"

"বলেই ফেলি। অনেকদিন হয়ে গেল, ক্ষতি কিছু হবে না। আমার এক ভায়রাভাইয়ের জুয়েলারির ব্যবসা আছে। সোনাবাবুর জানা ছিল। ওঁর তখন টাকার দরকার। ভীষণ জরুরি। পেনেটির বাগান ক্রোক হয়ে যাচ্ছে। আদালতের খাঁড়া মাথার ওপর। সোনাবাবু একটা নেকলেস বিক্রি করবেন। জড়োয়ার নেকলেস, হিরে আছে এক জোড়া, মুক্তো, পান্না। বাজারে গিয়ে নেকলেস ফেলে দেবেন সোনাবাবু, তাই কি হয়! তার ওপর দাঁও মারার লোকের অভাব নেই। কেউ ঠেকায় পড়লে তাকে ঠকাবার লোকের অভাব হয় না। সোনাবাবু অতটা ঠকতে রাজি নন, আবার লোকের চোখের আড়ালে বেচতে হবে। আমায় তাই ডেকে পাঠিয়েছিলেন।"

কিকিরা একবার তারাপদর দিকে তাকালেন। তারাপদ ফলের টুকরো তুলে মুখে দিয়েছে ততক্ষণে।

"অবস্থা তা হলে খুবই খারাপ বলুন—" কিকিরা বললেন।

"অবস্থা—! ...কী বলব ভাই যদুমাস্টার, বাড়িতে ঢুকলে মনে হয় না, এই সেই বিশ্বাসবাড়ি যেখানে দেড়শো বছর ধরে দোল দুর্গোৎসব হয়েছে রমরম করে। বাড়ির তিনটে ভাগ তিন শরিকের ; সব শরিকেরই একই অবস্থা, উনিশ-বিশ তফাত। সোনাবাবুর বাড়িতে আগেও গিয়েছি, অমন দৈন্যদশা চোখে পড়েনি। ঘরদোর মেঝে ছাদ দরজা জানলা—সবদিকে তাকাও, ভূতের বাড়ির মতন পোড়ো আর ময়লায় ভরতি। দেখলে কষ্ট হয়।"

কিকিরা বললেন, "শুনলাম, ওঁর নাকি এখন এমন অবস্থা যে—বাড়ির যেখানে যা আছে বিক্রি করে দিয়ে সংসার চালান।"

"আমারও কানে গিয়েছে কথাটা। সোনাবাবু আজকাল চোখেও প্রায় অন্ধ হয়ে এসেছেন শুনেছি। মাথারও ঠিক থাকে না।"

কিকিরা চা খাচ্ছিলেন।

"আপনার দরকারটা তো বললেন না?" হরেনবাবু আবার জিজ্ঞেস করলেন।

"বলব বইকি, দাদা। আমাকে আর একটা কথা বলুন।"

"কী?"

"সুবর্ণবাবুর একটি নাতি আছে। রাজীব..."

"রাজু! হ্যাঁ, আছে। কেন?"

"চেনেন তাকে?"

"চিনি বইকি! ছোটবেলা থেকে দেখছি।"

"তার খবর রাখেন নাকি?"

"খবর? না। চিনি ; দেখেছি। কথাবার্তাও বলেছি দেখা হলে। কেন, সে কী করেছে?"

"ছেলেটি কেমন? মানে আপনার ধারণা?"

হরেনবাবু কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকলেন কিকিরার দিকে। পরে বললেন, "বাপ-মরা ছেলে, দাদুর কাছেই মানুষ ও। কম বয়েস থেকেই ওকে দেখেছি মাঝে মাঝে। সোনাবাবুর মুখে নাতির কথা যা শুনেছি কখনও-সখনও, তাতে তো মনে হয়নি রাজু ওঁকে জ্বালিয়ে মারে। বিরক্ত হয়েছেন বলেও জানি না। এখন সে বড় হয়েছে, দাদুর সঙ্গে কেমন সম্পর্ক বলব কেমন করে! আমি জানি না। ...আপনি এসব কথা জিজ্ঞেস করছেন কেন?"

কিকিরা শেষ কথাটা যেন শোনেননি। বললেন, "রাজীব যে দিঘায় একজনের সঙ্গে পার্টনারশিপে হোটেল খুলছে, জানেন?"

"না।"

"হালে তাকে দেখেননি?"

"না। কেন?"

"দাদুর হাতে টাকা নেই, নাতি হোটেলের ব্যবসায় নামছে, টাকা পাচ্ছে কেমন করে?"

হরেনবাবু এবার বিরক্ত হয়েই বললেন, "আরে ভায়া, এসব সাংসারিক কথা কি আমার জানার কথা! আপনারই বা তাতে কী! তবে রাজুর বাবার তরফে কানাকড়িও ছিল না—আপনি জানলেন কেমন করে? ওর মায়ের গয়নাগাটিও তো থাকতে পারে।...আপনি ঠিক কী জানতে চাইছেন বলুন তো?"

কিকিরা নিজেকে শুধরে নিয়ে মোলায়েম গলায় বললেন, "দাদা, আমি একটা ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছি বলেই কথাগুলো জানতে চাইছিলাম। আপনি কিছু মনে করবেন না।...আচ্ছা, আপনি আমাকে একবার সুবর্ণবাবুর কাছে নিয়ে যেতে পারেন?"

মাথা নাড়লেন হরেনবাবু, "না, ভাই। যাঁর সঙ্গে আমার দেখা-সাক্ষাৎ হয় না, খোঁজ রাখি না, তাঁর দুর্দিনে আমি আপনাকে কোন দরকারে নিয়ে যাব! না, আমি পারব না। আপনার দরকার থাকলে নিজে যান। কিছু কিনতে চান নাকি?"

কিকিরা বুঝলেন, আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই।

কথা ঘুরিয়ে অন্য প্রসঙ্গ তুলে খানিক গল্প করলেন কিকিরা। তারপর উঠে পড়লেন তারাপদকে নিয়ে।

॥ ৮ ॥

ছ'-সাতটা দিন তারাপদদের সঙ্গে কিকিরার দেখা-সাক্ষাৎই হল না। না হওয়ার কারণ মাঝে দু' দিন পর পর কলকাতায় সন্ধের গোড়ায় ঝড়বৃষ্টি হয়ে গেল। চৈত্রমাসের কালবৈশাখী। যেভাবে লাফে লাফে গরম পড়ছিল, এক-আধ পশলা বৃষ্টির জল না পেলে শহরটার আগুনে রুক্ষ চড়া-ভাব আর কমত না। বৃষ্টি হয়ে বাঁচিয়ে দিল মানুষগুলোকে।

তবু তারাপদরা একদিন এসেছিল কিকিরার কাছে। দেখা পায়নি। তিনি যে কোথায় গিয়েছেন বগলাও বলতে পারল না।

সাতদিনের মাথায় দেখা পাওয়া গেল কিকিরার।

চন্দন বলল, "আপনি কি উধাও হয়ে গিয়েছিলেন? আমরা এসে ফিরে গিয়েছি। বগলাদা বলেনি?"

কিকিরা মাথা নাড়লেন। "বলেছে। ঝড়বৃষ্টির দু'দিন বেরোতে পারিনি। তোমরা তার পরে এসেছ?"

"গিয়েছিলেন কোথায়?"

"নন্দবাবুর বাড়ি।"

"ও! কেমন আছেন ভদ্রলোক?"

"পায়ের ব্যথা কমেছে। হাঁটতে পারছেন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। হাতের প্লাস্টার কাটতে দেরি আছে।"

"কতদিন হল? ছ' সপ্তাহের আগে—"

"নন্দবাবু বললেন, আলমারিটা তিনি ফেরত পাঠিয়ে দেবেন।"

"সে কী! কেন?"

"বলছিলেন, তাঁর বাড়ির লোক ভয় পেয়ে গিয়েছে। স্ত্রী তো বটেই, ছেলেও বলছে ফেরত দিয়ে দিতে।"

তারাপদ সন্দেহের গলায় বলল, "আবার কিছু হয়েছে নাকি?"

"হ্যাঁ। বাড়িতে ফোন আসতে শুরু করেছে। দু'দিন ফোন এসেছিল। সেই একই গলা। শাসাচ্ছে নন্দবাবুকে।"

তারাপদ চন্দনের দিকে তাকাল একবার। বোধ হয় পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছিল না। কিকিরার দিকে মুখ ফেরাল আবার। "ঝামেলাটা তবে মিটে যাচ্ছে?"

কিকিরা মাথার চুল ঘাঁটতে ঘাঁটতে বললেন, "নন্দবাবু মেটাতে চাইছেন, আমি বললাম, এত সহজে মিটিয়ে দেবেন? আর-একটু দেখুন না!"

"মানে?"

"মানে, আলমারি ফেরত দেওয়া, আড়াই হাজার টাকা ফেরত আসা বড় কথা নয়। ধরে নিলাম, আপনি ব্যবসাদার মানুষ, একটা ডিল মনের মতন হল না, লাভও নয়, লোকসানও নয়—ছেড়েই দিলেন। কিন্তু আপনার কি মনে হয় না, কী আছে ওই আলমারির মধ্যে যার জন্যে আপনার কেনা জিনিস জোর করে ভয় দেখিয়ে আপনার কাছ থেকে ফেরত নেবে ওরা?"

চন্দন বলল, ইতস্তত করে, "কী বললেন নন্দবাবু?"

"বললেন, না মশাই—আর আমার সাহস হয় না। ছেলে তো একেবারে বেঁকে বসেছে। বলছে, জেদ করে বিপদ ডেকে আনার দরকার কী এই বয়েসে! নিজের প্রাণ বড়, না জেদ!"

"ছেলে ভয় পেয়েছে, সার।"

"হ্যাঁ। নিরীহ ছেলে, তা ছাড়া বাপের ব্যবসা নিয়ে তার মাথাব্যথা নেই। তা আমি নন্দবাবুকে বললাম, আলমারিটা ফেরত দেওয়ার আগে আপনি একটু চালাকি করুন।"

"চালাকি?"

"আবার যখন ফোন আসবে আপনি বলবেন, ওটা আপনি আমাকে বেচে দেবেন বলে আগাম টাকা নিয়েছেন। কথা ছিল, মাসখানেক পরে আলমারির খুচখাচ মেরামতি সেরে, রং পালিশ করে আমায় ডেলিভারি দেবেন। এখন কথার খেলাপ করে কেমন করে আলমারিটা ফেরত পাঠান। অন্তত আমার সঙ্গে কথা না বলে তা করা সম্ভব নয়।"

তারাপদ অবাক হয়ে বলল, "আপনি সার ওই আলমারিটা কিনছেন?"

"কিনছি না ; কেনার ভান করছি।"

"ফল্‌স দিচ্ছেন!"

"তাই দিচ্ছি," কিকিরা নির্বিকার গলায় বললেন, "আমি নন্দবাবুকে বলেছি, আপনার হাতে প্লাস্টার, পা নাড়াতে এখন আর অসুবিধে হয় না। কাল পরশু আপনি রিকশা চেপে দোকানে আসুন। আমিও থাকব। দোকানে গিয়ে আপনি কর্মচারীদের বলবেন, আলমারিটার কাজে হাত লাগাতে। অন্তত সাফসুফ করুক। মেরামতির কোথায় কী আছে খুঁজে বার করুক। আমিও দোকানে গিয়ে হাজির হব।"

"কাস্টমার হিসেবে?" চন্দন বলল।

"আগে গিয়েছি পুরনো বন্ধু হিসেবে। মাইন্ড দ্যাট, আমি সেদিনও আলমারি দেখেছি। কর্মচারীরা নিজের চোখে দেখেছে, আমি নন্দবাবুর সঙ্গে কথাও বলছি, আবার আলমারিও দেখছিলাম। এমন তো হতেই পারে, ওটা আমার পছন্দ হয়ে গিয়েছিল। পরে আমি কেনার কথা ভেবেছি।"

চন্দন বলল, "আপনি নন্দবাবুর বাড়িতেও গিয়েছেন, দোকানের কর্মচারী শ্রীকুমার এসে আপনাকে খবর দিয়ে গিয়েছে ও-বাড়ি যাওয়ার জন্যে।"

"তাতে ব্যাপারটা পোক্তই হয়েছে, চাঁদু। নন্দবাবু হাত-পা জখম করে বাড়িতে পড়ে আছেন, আমি তাঁকে দেখতে গিয়েছি—তার মানে এই নয় যে আমাদের মধ্যে কেনাকাটার কথা আগে হয়নি বা পরে হবে না। বরং উটকো অ্যাক্সিডেন্টে পড়ে তিনি হয়তো বলতে পারেন, আলমারিটা ডেলিভারি দিতে আরও কিছু সময় লাগবে।"

তারাপদ ধোঁকা খেয়ে প্রায় বোবা হয়ে ছিল এতক্ষণ। এবার বলল, "সার, আপনাদের দু'জনের মধ্যে আলমারিটা বেচাকেনার কথা হয়েছে অন্য কেউ জানবে না? দোকানের কর্মচারীরা নয়?"

"না জানতেও পারে। নন্দবাবু আর আমার মধ্যে আড়ালে কোন কথা হচ্ছে

কর্মচারীদের জানাবার দরকার কোথায়!”

তারাপদ চন্দনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল, যেন বলতে চাইছিল, ‘তুই কিছু বুঝছিস?’

চন্দন কী যেন ভাবছিল। অন্যমনস্ক। সিগারেট ধরাল। কিকিরার দিকে তাকিয়ে বলল, “আপনার উদ্দেশ্য কী? আপনি কি মনে করছেন, এইভাবে রাজীবকে আপনি সামনাসামনি দাঁড় করাতে পারবেন?”

“এ ছাড়া অন্য কোনও চাল আমার মাথায় এল না,” কিকিরা বললেন, “রাজীবকে আমরা দেখেছি। কিন্তু সে অন্যভাবে। তার খোঁজখবর করতে গিয়েছিলাম। নন্দবাবু বললেন, আর আমি মেনে নেব তাঁর কথা—তাই কি হয়! ওঁরও তো কোনও মতলব থাকতে পারে। রাজীব ব্যাপারটা যদি মনগড়া হয়, যদি দু'জনের মধ্যে এমন একটা চুক্তি হয়—রাজীব একদিন দোকানে ঢুকে যাত্রা-থিয়েটার করবে—তারপর হুট করে দোকানে আগুন লাগিয়ে দিলাম নিজেরাই, আর আগুনে পুড়ে দোকান ছাই হয়ে ইনসিওরেন্সের লাখ দুই তিন টাকা হাতে আসবে...

“বলেন কী, সার?”

“এসব আকছার হয়। ম্যানেজ করতে পারলে তুমি ধরা পড়বে না, তারাবাবু। লাখ দুই আড়াই টাকা এল ইনসিওর থেকে, তারপর ধরো—তুমি আর দোকান নিয়ে মাথা ঘামালে না। না ঘামিয়ে জায়গাটা অন্য পার্টিকে বেচে দিলে। ওসব জায়গায় দোকানঘর পেতে হলে এখন হাজার পঞ্চাশ গুঁজে দিতে হয় হাতে। ব্ল্যাক মানি। নন্দবাবু যে এমন দাঁও মারতে চাইছেন না বুঝব কেমন করে! দোকানের অবস্থা তো টিমটিমে। ছেলের কোনও আগ্রহ নেই দোকানে। এই অবস্থায়—”

কথা শেষ করতে পারলেন না কিকিরা, চন্দন অবাক গলায় বলল, “আপনি বলছেন কী! আপনার মাথায় এতরকম প্যাঁচ ঘোরে! অবাক করলেন, সার। ভেতরে ভেতরে আপনি অনেক এগিয়েছেন তো!”

কিকিরা হাসলেন। “প্যাঁচ নয়, প্যাঁচালো গিঁটের মুখ খোলার চেষ্টা। সবই যদি, যদি লেগে যায়—!”

তারাপদ বলল, “আচ্ছা, একটা কথা ভেবেছেন?”

“কী?”

“নন্দবাবু চালাকি করে আপনাকে মাঝখানে খাড়া করে দিলেন, আপনারই কথামতন। কিন্তু এমন কী গ্যারান্টি আছে যে, রাজীব তা বিশ্বাস করবে? আর যদি-বা করে সে বলতে পারে, নন্দবাবু কার কাছ থেকে অ্যাডভান্স টাকা নিয়েছেন—তা দেখার দরকার তার নেই ; সে শুধু চায় আলমারিটা তাদের বাড়িতে ফেরত দিয়ে আসা হোক।”

কিকিরা মাথা হেলিয়ে বললেন, “বলতেই পারে। তবে নন্দবাবু একটু শক্ত হয়ে

থাকলে রাজীব সুবিধে করতে পারবে না। যে-জিনিস আমায় বিক্রি করব বলে তুমি আগাম টাকা নিয়েছ, আমায় না জানিয়ে কথা না বলে সে-জিনিস তুমি অন্য কাউকে দিয়ে দিতে পারো না। আইনে আটকাবে। উকিল দিয়ে মামলা ঠুকে দেব। কার সাধ্য তুমি জিনিস সরাবে!"

চন্দন চমৎকৃত হয়ে তারিফ করার গলায় বলল, "দারুণ। চালটা ভালই চেলেছেন বলে মনে হচ্ছে। তবে সত্যি তো আপনি টাকা দিয়ে ওটা বুক করেননি।"

"আরে, টাকা দিয়েছি কি দিইনি সেটা আমি আর নন্দবাবু বুঝব। হাতেনাতে না দিলাম, মুখে দিয়েছি।"

সামান্য অপেক্ষা করে তারাপদ বলল, "সার, আপনি ভাবছেন, এর পর রাজীব আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইবে?"

"আশা করছি। অন্তত যোগাযোগ করতে পারে।"

"বেশ, যোগাযোগ করল। করলেই তো আপনাকে চিনে ফেলবে।"

"আমার উদ্দেশ্য তো সেইরকম। রাজীবকে নন্দবাবু আমার ঠিকানা দিয়ে দেবেন। তবে পুরো নাম দেবেন না—শর্ট করে বলবেন, কে কে রায়। ঠিকানা সঠিক দেবেন। রাজীব নাম-ঠিকানা পেয়ে সটান আমার সঙ্গে দেখা করতে আসতে পারে। যদি চায়, নন্দবাবু শ্রীকুমারকে সঙ্গে দিয়ে রাজীবকে আমার কাছে পাঠাতে পারেন।"

তারাপদ উঠে পড়ে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। গরমের তাত খানিকটা কমলেও গুমোট কাটছিল না। রুমালে মুখ ঘাড় মুছে নিল তারাপদ। সন্ধে পেরিয়ে রাত হয়ে এল।

তারাপদই হঠাৎ বলল, "শেষমেশ তা হলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে, আপনি এখন রাজীবের সঙ্গে দেখা হওয়ার ভরসায় রয়েছেন?"

কিকিরা গলা তুলে বগলাকে ডাকলেন। জল দিয়ে যেতে বললেন তাকে। হঠাৎ হাই তুললেন। ক্লান্তির জন্যেই সম্ভবত। ঘাড়ের আড়ষ্ট ভাবটা কাটাবার জন্যে নাড়াচাড়া করলেন মাথা-ঘাড়।

বগলা জল এনে দিল।

জল খেয়ে আরাম পেলেন। চুরুট ধরালেন। তারপর বললেন, "আমার যা যা মনে হয়, বলছি। মন দিয়ে শোনো। বিশ্বাসবাড়ির ছোটকর্তা সুবর্ণবাবুর সঙ্গে আমি দেখা করতে পারিনি। হরেনবাবু আমায় ও-বাড়িতে নিয়ে যেতে রাজি হননি। আমি তাঁর কোনও দোষ ধরছি না। সত্যি সত্যি এভাবে হুট করে কাউকে সেখানে নিয়ে যাওয়া যায় না। উচিতও নয়। বুড়ো মানুষটির দুর্দিনে তাঁর কাছে নিয়ে গেলে সেটা হয়তো খারাপ দেখাত। তবে তাতে আমার লোকসান হয়নি। হরেনবাবুর কাছ থেকে সুবর্ণবাবুর সম্পর্কে যা জানার আমি জেনেছি।"

"কী জেনেছেন?"

"ভদ্রলোকের এখন চরম দুরবস্থা। স্থাবর অস্থাবর যেখানে যা আছে বেচেবুচে দিন কাটাতে হচ্ছে। ওঁর এমন অবস্থা নেই যে, নাতিকে টাকা দেবেন হোটেল খোলার জন্যে। রাজীব হোটেলের ব্যবসায় নেমেছে দিঘায় গিয়ে—এটা তিনি জানেন কিন্তু তাকে আর্থিকভাবে সাহায্য তিনি করতে পারেননি। করা সম্ভবই নয়।"

"রাজীবের হাতে টাকা এল কেমন করে?"

"হরেনবাবুর ধারণাই বোধ হয় ঠিক। রাজীব নিশ্চয় তার বাবার গচ্ছিত কিছু পেয়েছে, মায়ের গয়নাগাটিও বেচে দিতে পারে টাকার জন্যে। না হয় কোথাও থেকে ধারকর্য করেছে। এ ছাড়া আর কী বলব! না হলে বলতে হয়, রাজীব টাকাপয়সা ঢালেনি, ওয়ার্কিং পার্টনার হিসেবে কাজ করছে।...তা সে যাই হোক ও নিয়ে মাথা ঘামিয়ে আমাদের লাভ নেই।"

"বেশ! তা হলে—"

"আলমারিটাই আসল তারাবাবু। দাদু বেচে দিল, নাতি সেটা বেচতে দেবে না। কেন? আগে কত কীই না দাদু বেচে দিয়েছেন, আসবাবপত্রও, রাজীব ফেরত পাওয়ার জন্যে হন্যে হয়ে উঠেছে! না, কিছুতেই নয়। যদি হত সুবর্ণবাবু বিনা দ্বিধায় আলমারি বেচতেন না।"

"এ তো এক পাজ্‌ল, সার। একটা কাঠের আলমারি, যত পুরনোই হোক, তার সঙ্গে এমন কী মিস্ট্রি জড়িয়ে থাকতে পারে যে, তা নিয়ে এত কাণ্ড হবে?"

কিকিরা চুরুটটা রেখে দিলেন। আগুন নিভে গিয়েছে। গলা পরিষ্কার করলেন, বললেন, "আমি নন্দবাবুকে বলেছি, আপনি আলমারির কাজে হাত লাগান। ভেতর-বাইরে দেখুন ভাল করে—যদি কিছু নজরে আসে..."

"কী আসবে?"

"কেমন করে বলব! ওই আলমারিটায়—আমি ওপর থেকে যা দেখেছি, একটা তাকে ড্রয়ার, খোপখাপ আছে। এখন যেমন আলমারিতে লকারের ব্যবস্থা থাকে। তা থাকবে বইকি, সেটা স্বাভাবিক। কিন্তু—!"

কিকিরা থেমে গেলেন। চুরুটটা আবার ধরাবার চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিলেন। রদ্দি চুরুট।

"কিন্তু কী—?" চন্দন বলল অধৈর্য হয়ে।

"ওর মধ্যে কোনও সিক্রেট পকেট—বা খোপের ব্যবস্থা আছে—যা বাইরে থেকে হাজার খুঁজলেও ধরা মুশকিল। পুরনো কালের আলমারিতে এসব থাকত, নন্দবাবু জানেন। এখনও থাকে, তবে রেয়ার। ব্যাঙ্ক-লকার হয়ে যাওয়ার পর বিশেষ বিশেষ দামি জিনিস, কাগজপত্র রাখার সুবিধে হয়ে গিয়েছে। ধরো হিরের নেকলেস, নীলার আংটি, চুনির গয়না থেকে কোনও অত্যন্ত জরুরি দলিল দস্তাবেজের কাগজ তো আলগোছে সকলের চোখের সামনে ফেলে রাখা যায় না, লুকিয়েই রাখতে হয়।"

"আপনি বলতে চাইছেন সেরকম কিছু লুকিয়ে রাখা আছে ওই আলমারির লুকনো কোনও 'পকেটে'—মানে খাপখোপরে?"

"আমার তাই ধারণা। আর সেটা রাজীবই শুধু জানে, সুবর্ণবাবু জানতেন না—জানেন না। রাজীবের কাছে আলমারিটার দাম নেই, ওই লুকনো জিনিসটাই আসল। সেটা তার চাই। কিন্তু যতক্ষণ না আলমারিটা ফেরত পাচ্ছে সে নিশ্চিন্ত হবে কেমন করে?"

চন্দন আর তারাপদ চুপ। পরস্পরকে দেখল বারকয়েক। তারা কিছু ভাবতেই পারছিল না।

॥ ৯ ॥

নন্দবাবু দোকানে আসছিলেন। নিয়মিত নয়। একদিন আসেন তো পরের দিন বাদ যায়। রিকশা করেই আসেন। প্লাস্টার করা ভাঙা হাত বুকের কাছে ঝোলানো থাকে। আসেন, বসেন। কর্মচারীরা আলমারি পরিষ্কারের কাজ শুরু করল। নন্দবাবু চোখ রাখেন। আবার মাঝে মাঝে অন্যমনস্কভাবে বাইরের দিকে তাকান। রাস্তার লোক দোকানের কাছাকাছি চলে এলেই তাঁর উদ্বেগ বেড়ে যায়।

কিকিরাও আসেন দোকানে। নন্দবাবুর সঙ্গে কথাবার্তা বলেন নিচু গলায়। কখনও কখনও আলমারির সামনে গিয়ে নজর করেন ভেতরের দিকটা। কিছুই বুঝতে পারেন না।

সাত-আটটা দিন এইভাবেই কেটে গেল।

"কী হল রায়বাবু? রাজীবের তো সাড়া পাচ্ছি না।"

"বাড়িতে ফোনও আসছে না?"

"না। হঠাৎ কী হল?"

"দেখুন আর ক'দিন।"

"আমি যে কী ধন্দে পড়ে গেলাম। বাড়িতে ওদের আর তর সইছে না ; বলছে, ফেরত দিয়ে দাও। বিদেয় করো আপদ। ক'টা টাকা যদি গচ্চা যায় যাক ; প্রাণ আগে..."

কিকিরা বললেন, "দেবেন বইকি! নিশ্চয় দেবেন। তবে সবুর করুন না আট-দশটা দিন। কথায় বলে, সবুরে মেওয়া ফলে।"

"ফলার নামগন্ধও দেখছি না। তবু দেখি—।"

মেওয়া ফলতে ফলতে আরও তিন-চারদিন কাটল। তারপর যা ঘটল সেটা নাটকীয় বললেও হয়।

কিকিরার বাড়িতে বসে গল্পগুজব হচ্ছিল। কিকিরা আর তারাপদ কথা বলছিলেন। সন্ধে হয়ে এসেছে। বাতি জ্বালা হল এইমাত্র। চন্দনের আসার কথা,

এসে পৌঁছয়নি এখনও। তারাপদ তাদের হোটেলের মজুমদার সাহেবের ঘরে বসে সেদিন একটা চমৎকার প্রোগ্রাম দেখেছে টিভিতে। তাও পুরো দেখা হয়নি, কারণ সে যখন মজুমদার সাহেবের ঘরে যায়—তখন প্রোগ্রামের অর্ধেকটা হয়ে গিয়েছে। বিবিসি থেকে দেখাচ্ছিল প্রোগ্রামটা। হিস্ট্রি অব ম্যাজিক। পার্ট টু।

"বুঝলেন কিকিরা, দারুণ একটা জিনিস দেখলাম," তারাপদ বলল। "স্টেজের ওপর একদিকে ম্যাজিশিয়ান। অদ্ভুত তার ড্রেস। মাথায় হেলমেট, কান গলা পর্যন্ত ঢাকা। চোখে গগল্‌স। পরনে কুস্তিগির টাইপের পোশাক। ম্যাজিশিয়ান দাঁড়িয়ে আছে, দু' হাত বুকের কাছে। স্টেজের অন্য সাইড থেকে একজন পিস্তল ধরনের ফায়ার আর্মস থেকে নিশানা করে ম্যাজিশিয়ানের মুখে গুলি ছুড়ল। তারপর দেখি, গুলিটা ম্যাজিশিয়ানের মুখে দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরা রয়েছে। কী থ্রিলিং। ভয় লাগে। এই খেলা অনেকেই দেখাত। সামান্য হেরফের করে। শেষে একজন চাইনিজ ম্যাজিশিয়ান—"

"জানি। খেলা দেখাতে গিয়ে মারা যায়। অনেকে বলে, ওটা সুইসাইড। খেলাটা তারপর থেকে আইন করে বন্ধ করে দেওয়ার কথা হয়েছিল। এখনও দেখানো হয় বলে শুনিনি।"

তারাপদ বলল, "যাই বলুন, খেলাটা দেখতে বেশ ভয় করে। তবু তো সামনাসামনি দেখছি না।"

এমন সময় বগলা এল। দেখা করতে এসেছেন একজন।

"নিয়ে এসো।"

মুহূর্ত কয়েক পরে যে এল তাকে দেখে কিকিরা অবাক! রাজীব। তারাপদ তাকিয়ে থাকল।

রাজীব কিছু বলার আগেই কিকিরা নিজের জায়গা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। খাতিরের গলা করা বললেন, "আরে বসুন! আপনি!"

রাজীব কোনও জবাব দিল না। প্রথমে কিকিরাকে দেখল লক্ষ করে, পরে তারাপদকে। শেষে ঘরটাও নজর করে দেখে নিল।

কিকিরা আবার বললেন, "দাঁড়িয়ে কেন! বসুন না!"

রাজীব বসল। তারাপদর পাশের চেয়ারে।

"আমার ঠিকানা খুঁজে পেতে অসুবিধে হয়নি তো? না, শ্রীকুমার পৌঁছে দিয়ে গেল?" কিকিরা বললেন স্বাভাবিক গলায়, যদিও চাপা মজার ভাব ছিল তাঁর কথায়।

রাজীব বলল, "শ্রীকুমার নয়, সুশীল।"

"সুশীল! মানে দোকানের সুশীল? সে..."

রাজীব ভণিতা করল না। "আমার লোক।"

"নন্দবাবুর দোকানে তোমার—" বলেই নিজেকে শুধরে নিলেন কিকিরা, "আপনার লোক!"

"আপনি আমাকে তুমি বলতে পারেন, আপত্তি নেই ; বয়েসে আপনি বড়।

বলছিলাম, নন্দবাবুর দোকানে আমার লোক থাকার মধ্যে অবাক হওয়ার কী আছে? দু'-একশো টাকা বাড়তি হাতে দিলে খবরাখবর দেওয়ার মতন লোক পাওয়া যায়।"

কিকিরা থমকে গেলেন। বুঝতে পারলেন, ছোকরা চতুর, বুদ্ধিমান। সহজে ওকে কবজা করা যাবে না। নিজেকে সঙ্গে সঙ্গে পালটে নিলেন কিকিরা। যেন সত্যিই তিনি অবাক হননি, সরল গলায় বললেন, "তা তো ঠিকই।...ইয়ে, আমার এখানে একটু শরবত, বা চা হতে আপত্তি নেই তো?"

"শরবত! না, চা খেতে পারি, যদি অসুবিধে না হয়!"

"তারাপদ, চা বলে দাও।"

তারাপদ উঠে গেল বগলাদাকে চায়ের কথা বলতে।

কিকিরাকে কথা বলার সময় দিল না রাজীব। নিজেই বলল, "আপনি কে, আপনারা কে কী করেন আমি জানি। শুনেছি। দিঘায় আপনারা তিনজনে কেন গিয়েছিলেন আন্দাজ করতে আমার কষ্ট হয়নি।"

"দিঘায় যাওয়ার আগে নন্দবাবুকে আমি কিছু জানাইনি।"

"না জানালেও আপনি তারাপদবাবুকে নিয়ে ভদ্রলোকের বাড়িতে গিয়েছিলেন। কথাবার্তা হয়েছিল। এসব কি চাপা থাকে? খবর আমি সময়মতন পেয়েছিলাম।"

"ও! তা হলে তখনই তুমি—আপনি বুঝে ফেলেছিলেন..."

"আমাকে তুমি বলুন। আমি কিছু মনে করব না।"

তারাপদ ফিরে এল। বসল নিজের জায়গায়।

কিকিরাও বসে পড়েছিলেন ততক্ষণে।

রাজীব হঠাৎ বলল, কিকিরাকেই, "আপনি কি সত্যিই আলমারিটা কেনার জন্যে টাকা আগাম দিয়েছেন? না, দেননি। মিথ্যে কথা। আমাকে আপনার সামনে হাজির করতে চাইছিলেন। তাই না?...এখন আমি আপনার বাড়িতে আপনার সামনে হাজির। বলুন, কী জানতে চান?"

চন্দনের গলা পাওয়া গেল ভেতরে। বগলার সঙ্গে কথা বলছে। তারপরই ঘরে এল। রাজীবকে দেখে যেন বিশ্বাস হল না প্রথমে। চোখের পলক পড়ল না কয়েক মুহূর্ত।

কিকিরা বললেন, "এসো চাঁদু! বসো। রাজীব শেষপর্যন্ত এসেছে—এসেছেন। না, এসেছে।"

চন্দন তারাপদর দিকে তাকাল। ইতস্তত করে সামান্য তফাতে গিয়ে বসল শেষে।

কিকিরা রাজীবকে বললেন, "তুমি বলছ, আমি কী জানতে চাই—তোমায় বলতে। বরং তুমিই বলো তোমার যা বলার। ধরো, নন্দবাবু যে তোমাদের বাড়ি থেকে আলমারিটা কিনেছেন সেটা তো ঠিকই। তুমি অস্বীকার করতে পারবে না।"

"হ্যাঁ, উনি ছোটদাদুর কাছ থেকে আলমারিটা কিনেছেন নগদ টাকা দিয়ে।"

"তা হলে তুমি কেন ওঁর দোকানে গিয়ে ভদ্রলোককে শাসিয়ে এসেছ?"

"আপনার বন্ধু আপনাকে পুরো সত্যি কথা বলেনি, অর্ধেক বলেছে।"

"মানে!"

"আমি ওঁর দোকানে গিয়েছিলাম। প্রথমে হইচই, রাগারাগি করিনি। বরং ওঁকে অনুরোধ করে বলেছিলাম, দাদু বিপাকে পড়ে বাড়ির ওই আলমারিটা বিক্রি করে দিয়েছেন। একে ওঁর আজকাল অর্ধেক কথা মনে থাকে না, তার ওপর চোখেও ভাল দেখেন না। আপনি দয়া করে ওটা ফেরত পাঠিয়ে দিন। আপনার টাকা আমি দিয়ে দেব। যদি বলেন, কালই টাকা ফেরত পাবেন। ... তা উনি তো রাজি হলেনই না, উলটে আমার সঙ্গে চড়া গলায় তর্ক করতে লাগলেন। নন্দবাবু ব্যবসাদার মানুষ। উনি বলতেই পারেন, কেনা জিনিস উনি কেন ফেরত দেবেন! কিন্তু আমি তো অনুরোধ করেছিলাম। নন্দবাবু ওভাবে রাগারাগি শুরু করায় আমি চটে উঠেছিলাম। তখন দু'জনের মধ্যে কথা কাটাকাটি, ঝগড়াঝাটি হয়।"

"তারপর তুমি নন্দবাবুকে শাসাও?"

"হ্যাঁ।"

"তুমি ওঁকে একদিন মোটরসাইকেল চাপা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলে?"

"না।"

"ধাক্কা দেওয়ার মতলব ছিল?"

"কী যে বলেন!"

"নন্দবাবু তোমায় দেখেছেন।"

"ওঁর মনগড়া কথা। ভুল দেখেছেন। আমি আমার বাইক দিঘায় রেখে এসেছি। আপনারা দেখেছেন।"

"তুমি তোমার কোনও বন্ধুর বাইক চেয়ে নিয়ে যে যাওনি— তার প্রমাণ কী?"

"প্রমাণ দেওয়ার দরকার নেই। আমি যা করিনি তা নিয়ে আমায় দোষ দেবেন না। বিশ্বাস করা না-করা আপনাদের ব্যাপার।"

বগলা চা এনেছিল। হাতে হাতে এগিয়ে দিল।

কিকিরা বললেন, "তুমি নন্দবাবুর বাড়িতে ফোন করে ওঁকে শাসাও?"

"হ্যাঁ।"

"কেন?"

"আলমারিটা আমাদের বাড়িতে ফেরত আসা দরকার।"

"কেন?"

"সে অনেক কথা। আপনি বুঝবেন না।"

চায়ে চুমুক দিয়ে কিকিরা সামান্য সময় চুপ করে থাকলেন। দেখলেন রাজীবকে। শেষে বললেন, "কী আছে আলমারির মধ্যে? সোনাদানা হিরে মুক্তো কত আর লুকিয়ে রাখতে পারো ওর চোরা-ফোকরে!"

রাজীব এবার কেমন করে যেন হাসল। শব্দ করে নয় ; ঠোঁট কামড়াল। বলল,

"একরত্তি সোনাও নেই। হিরে মুক্তোও নয়। ... অন্য কিছু।"

তারাপদ হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, "কিছু মনে করবেন না। একটা কথা জানতে ইচ্ছে করে। আপনি দিঘায় গিয়ে হোটেল খুলছেন। অবশ্য আপনার পার্টনার আছে। তবু ওই বাড়িটা কেনা, সেটাকে সারিয়েসুরিয়ে অদলবদল করতে তো যথেষ্ট টাকা খরচ হয়েছে, হচ্ছে। আপনি নিশ্চয় আপনার দাদুর কাছ থেকে টাকা পাননি। এত টাকা আপনি কোথা থেকে পেলেন?"

রাজীব তারাপদর দিকে তাকাল। জবাব দিল না।

অপেক্ষা করে কিকিরা বললেন, "বাবা কোথাও কিছু রেখে গিয়েছিলেন? মায়ের গয়নাগাটি ... ?"

রাজীব ছোট করে বলল, "জোগাড় করতে হয়েছে।"

"ধারকর্জ!"

রাজীব এমনভাবে মাথা নাড়ল, যা থেকে বোঝা মুশকিল সে ঠিক কী বলতে চাইল।

অল্প সময় চুপচাপ থাকার পর রাজীব নিজেই কিকিরাকে বলল, "আপনি নন্দবাবুকে বলুন, আলমারিটা ফেরত দিয়ে দিতে। তাতে ওঁর কোনও ক্ষতি হবে না। একথাও বলতে পারেন, আপাতত না হয় দিয়ে এলেন ফেরত, তার বদলে উনি অন্য কোনও আসবাব নিয়ে আসতে পারেন। বাড়ি একেবারে শূন্য হয়নি।"

কিকিরা শুনলেন মন দিয়ে। ভাবলেন। চন্দন আর তারাপদকে দেখলেন একবার। রাজীবের দিকে তাকালেন, "আমি বলতে পারি। ... কিন্তু ব্যাপার কী জানো? আলমারিটা এখন মিস্ত্রিদের হাতে, কাজকর্ম করছে। তারা যদি তোমার লুকনো জিনিসটা খুঁজে পায় আচমকা! কাজ করতে করতে সিক্রেট পকেটটা পেয়ে গেল! তখন—?"

রাজীব মাথা নাড়ল। "পাবে না। নন্দবাবুর ওই মামুলি মিস্ত্রিদের সে-ক্ষমতা আছে বলে আমার মনে হয় না। তা ছাড়া চোরা পকেট খোলার চাবি পাবে কোথায়? সেটা আমার কাছে। নন্দবাবু যে চাবিগুলো পেয়েছেন তার মধ্যে ওই চাবিটা নেই। ছোড়দাদু, মা— কেউই জানে না আমি কোন লুকনো খোপে ওটা লুকিয়ে রেখেছিলাম। চাবির কথাও জানে না।" চায়ের কাপ নামিয়ে রাখল রাজীব। অর্ধেকটা খেয়েছে মাত্র। নিজেই বলল, "তবে হ্যাঁ, কেউ যদি আলমারির সব কেটেকুটে ভেঙেচুরে তছনছ করে দেয় তবে অন্য কথা। নন্দবাবু নিশ্চয় তা করবেন না।"

কিকিরা হতাশ হয়ে পড়ছিলেন। ছেলেটির মধ্যে লুকোচুরি নেই। যা বলছে, স্পষ্ট। ওকে বশে আনা কঠিন।

কিকিরা বললেন, "তোমার সঙ্গে নন্দবাবুর দেখা কিংবা কথা হয়েছে?"

"দু'-চারদিনের মধ্যে হয়নি। আগে হয়েছে; ফোনে।"

"উনি আমার কথা বলেছেন তখন?"

"হ্যাঁ।"

"তুমি কি এখন কলকাতায় থাকবে?"

"এই হপ্তাটা থাকব।"

"শোনো ব্রাদার। আমি নন্দবাবুকে তোমার কথা বলব। চেষ্টা করব, আলমারিটা যেন তোমাদের বাড়িতে ফেরত যায়। নন্দবাবুর নিজেরই আর ওটা রাখার ইচ্ছে নেই। বাড়ির লোকও আপত্তি করছে।"

রাজীব এবার উঠে দাঁড়াল। "আমি তা হলে আসি।" বলেই কী মনে হল, আবার বলল, "আমি আপনাকে বিশ্বাস করি। আপনিও বিশ্বাস করতে পারেন, আমি গুণ্ডা বদমাশ নই। নন্দবাবু যা বলেছেন তার বারো আনাই সত্যি নয়।"

কিকিরাও উঠে দাঁড়ালেন। "তুমি আমায় বিশ্বাস করো, অথচ বললে না আলমারির মধ্যে কী আছে!"

রাজীব কী ভেবে বলল, "বলব। দু'-একটা দিন অপেক্ষা করুন। আলমারিটা ফেরত পাই।"

॥ ১০ ॥

পরিবেশ অন্যরকম। এই ঘরের চারদিকে তাকালে কালচে ছায়া, বিবর্ণ ময়লা দেয়াল, খসেপড়া পলেস্তরাই চোখে পড়ে। একটিমাত্র বাতি— তাও অনুজ্জ্বল। এতবড় ঘরে ওই আলোটুকু অন্ধকারকেই যেন আরও ছড়িয়ে দিচ্ছিল। ওপরের কড়িকাঠ চোখে পড়ে না। জানলাগুলো বড়, কিন্তু ভাঙাচোরা শার্সি, খড়খড়ি। কোনওরকমে একটি জানলা খুলে রাখা সম্ভব হয়েছে। বাইরে অন্ধকার। কোথাও থেকে জল চুঁয়ে পড়ছে। মৃদু শব্দ। দালানের ফাঁক-ফোকরে বুঝি দু'-পাঁচটা পায়রা বাসা বেঁধে থাকে ; আচমকা তাদের পাখা ঝাপটানির আওয়াজও কানে আসছিল।

কিকিরা স্বপ্নেও ভাবেননি, বিশ্বাসবাড়ির ছোট তরফের ঘরবাড়ির এমন জীর্ণ দীন চেহারা হতে পারে। অবশ্য এই ঘরটা বারবাড়ির ঠাকুরদালানের কাছাকাছি কোনও ঘর হবে।

রাজীব তাঁদের এখানেই এনে বসিয়েছে। বসার ব্যবস্থা যৎসামান্য। একটি গোল টেবিল, কয়েকটি সাধারণ চেয়ার।

কিকিরারা তিনজনেই এসেছেন, কিকিরা তারাপদ চন্দন। আর এসেছেন নন্দবাবু। নন্দবাবুকে আনার দায়িত্ব ছিল কিকিরার ওপর। রাজীব জানিয়েছিল, আপনারা আসার সময় নন্দবাবুকেও দয়া করে নিয়ে আসবেন।

ওঁরা চারজন পাশাপাশি বসে, গোল টেবিল ঘিরে। রাজীবও বসল একপাশে।

কিকিরা কিছু বলতে যাচ্ছিলেন তার আগেই রাজীব বলল, "আমি কথা দিয়েছিলাম নন্দবাবুর টাকাটা আমি ফেরত দিয়ে দেব, আপনাদের সামনেই সেটা দিচ্ছি," বলে একটা খাম বার করে নন্দবাবুর দিকে এগিয়ে দিল। "পৌঁছে দেওয়ার

খরচার টাকাও ওর মধ্যে আছে। নন্দবাবুকে ধন্যবাদ, পরশু আমি আলমারিটা ফেরত পেয়েছি।" তারপর কিকিরার দিকে তাকাল। "আপনাকেও ধন্যবাদ রায়বাবু।"

কিকিরা বললেন, "এবার তা হলে তুমি তোমার কথা রাখো। বলেছিলে আলমারি ফেরত পাওয়ার পর তুমি যা বলার বলবে, কোনও কথাই গোপন রাখবে না!"

রাজীব মাথা নাড়ল। বলল, "বলব বলেই আপনাদের একটু কষ্ট করে এ বাড়িতে আসতে বলেছিলাম। আপনারা এসেছেন, সত্যিই আমি কৃতজ্ঞ।"

চন্দন বলল, "আমরা আসতুম। আপনি আপনার কথা বলুন।"

রাজীব সামান্য চুপ করে থেকে বলল, "দিঘায় যখন আপনাদের সঙ্গে আমার আলাপ হয়— তখন কথায় কথায় আমি বলেছিলাম, আমার বাবা ছিলেন ডাক্তার। মনে আছে সে-কথা?"

কিকিরা বললেন, "আছে। পেশা ছিল ডাক্তারি আর নেশা ছিল জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ানো। শিকারের শখ ছিল।"

"শিকারের শখ ছিল একসময়। পরে আর শিকার করতেন না। সেটা বন্ধ হয়ে যায়। সরকারি নিষেধ ছিল। তবে কোথাও কোনও খেপা জন্তু বেরোলে— লোকে এসে তাঁকে ধরত। যেতেনও মাঝে মাঝে। ... একটা কথা আপনাদের সেদিন বলিনি। দরকার মনে করিনি। আমার বাবা ঠিক পুরোপুরি রোগী-দেখা ডাক্তার ছিলেন না। তাঁর মাথায় অন্য একটা চিন্তাও থাকত। জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াবার সময় বাবা লক্ষ করতেন একেবারে জংলি দেহাতি গরিব মানুষরা অসুখবিসুখ হলে গাছগাছালি এটা-ওটা নিয়ে কীভাবে নিজেদের চিকিৎসা করে। তিনি দেখতে পান, অনেক গাছপালা যা আমরা উপেক্ষা করি, কিংবা আমরা যার কথা জানি না— সেগুলো দিয়ে নানা ধরনের ব্যাধি দূর করা যায়।"

"তোমার বাবা কি ওইসব গাছপালা, পাতা নিয়ে নিজে পরীক্ষা করতেন?" কিকিরা বললেন।

"করতেন খানিকটা। বাবার নিজের বাড়িতে ছোট একটা ল্যাবরেটরি ছিল। বাবার বন্ধু কুমুদকাকা ছিলেন ফারমোকোলজির লোক। কেমিস্ট। তাঁকে দিয়ে বাবা দু'-চারটে খুচরো ওযুধও তৈরি করিয়েছিলেন— তার মধ্যে একটা তখন ভালই চলত বাজারে। জন্তু জানোয়ার, বিষাক্ত পোকামাকড়ের কামড়ে বিষিয়ে যাওয়া ঘায়ের ওযুধ। ... দু'পয়সা রোজগারের জন্যে বাবা এসব করতেন না ঠিক। কৌতূহল ছিল। ঝোঁকও বলতে পারেন। ... তা একবার বাবা মধ্যপ্রদেশের এক জঙ্গলে যান। সঙ্গে কুমুদকাকা। কুমুদকাকাও মাঝে মাঝে বাবার সঙ্গী হতেন।"

"মধ্যপ্রদেশের কোথায়?" তারাপদ বলল।

"পাঁচমারির কাছে। জায়গাটার নাম আমার মনে পড়ছে না। জাড়িয়া ফরেস্ট হবে হয়তো। সেখানে এমনি লোকবসতি নেই। আদিবাসী পাঁচ-সাতটা গ্রাম। সভ্য

সমাজের সঙ্গে তাদের কোনও সম্পর্ক নেই। সেখানে তখন এক ধরনের অসুখ দেখা দিয়েছে। অনেকটা ইয়ালো ফিভারের মতন। মারাত্মক ব্যাধি। আমাদের দেশে সচরাচর চোখে পড়ে না। বাবা লক্ষ করে দেখলেন, ডুমুরগাছের মতন একজাতের গাছের ফল জলে ফুটিয়ে সেটা রোগীদের খাওয়ানো হচ্ছে। বেঁচেও যাচ্ছে অনেকে। ফেরার সময় বাবা আর কুমুদকাকা সেই গাছের পাতা, ছাল আর ফল নিয়ে চলে আসেন কলকাতায়।"

"আচ্ছা! এখানে এসে নিজেরা রিসার্চ করতে শুরু করেন?" কিকিরা বললেন।

রাজীব মাথা নাড়ল। "মাস ছয়েক চেষ্টার পর একটা রেজাল্ট পাওয়া গেল। ইয়ালো ফিভার ঠিক নয়, তবে ওই ধরনের অসুখের পক্ষে কাজে লাগতে পারে। বাবা তাঁর নোটবইয়ে রিসার্চের কথাগুলো লিখে রাখেন। যাকে বলে ফারমোকোলজিকাল প্রোফাইল। তাঁর ইচ্ছে ছিল, নানা অসুবিধে ও অর্থাভাবের জন্যে নিজেদের পক্ষে এই গবেষণা নিয়ে আর যখন এগুনো সম্ভব নয়— তখন কোনও বড় ওষুধ কোম্পানিকে সেটা বেচে দেবেন। তারা আরও নিখুঁতভাবে রিসার্চ করে ওষুধটা তৈরি করতে পারবে।"

কিকিরা সন্দেহ করে বললেন, "সেই কাগজপত্র— মানে নোট্স আর পাওয়া যায়নি!"

"পরে পাওয়া গিয়েছে। আমি পেয়েছি," রাজীব বলল। যখন আমি পেয়েছি তখন আমার বয়েস কুড়ির মতন। বাবা মারা গিয়েছেন আমার দশ বছর বয়েসে।

"ওটা কি চুরি গিয়েছিল?"

"না। বাবা লুকিয়ে রেখেছিলেন। আমি হঠাৎ পেয়ে যাই।"

"তোমার বাবা মারা যাওয়ার পর তোমরা তো দাদুর কাছে চলে আসো। তোমাদের নিজের বাড়ি ছেড়ে এ-বাড়িতে আসার পর কাগজগুলো পেলে? দশ বছর পরে। এতদিন এই কাগজগুলো কোথায় ছিল? ও-বাড়ি, না, এ-বাড়িতে?"

"ও-বাড়িতেই ছিল। মায়ের আলমারির একটা লুকনো খোপে। মা জানতেন না। মা যখন বাপের বাড়িতে চলে আসেন তখন ও-বাড়ি থেকে সামান্য কয়েকটা নিজের জিনিস নিয়ে এসেছিলেন, আলমারিটাও।"

তারাপদ বলল, "তা হলে আলমারিটা আপনার মায়ের। দাদু সেটাই বেচে দিয়েছিলেন?"

মাথা নাড়ল রাজীব। "না, না। মায়ের আলমারি থেকে সরিয়ে আমিই দাদুর একটা আলমারিতে রেখে দিয়েছিলাম। দাদু সংসারের খোঁজখবর এখন আর রাখেন না, চোখেও দেখেন কম। অন্ধ হয়ে এসেছেন প্রায়।"

কিকিরা বললেন, "আলমারির কোথায় ওটা ছিল?"

"বাঁদিকের ড্রয়ারের পেছনে। অবশ্য আপনি ড্রয়ার টেনে বার করে নিলেও কিছু দেখতে পেতেন না। ড্রয়ার টেনে বার করে নিলে পেছনে দেখতেন আলমারির কাঠ। কিন্তু বুঝতে পারতেন না পেছন দিকে একটা চোরা খোপ আছে।

ধরা যায় না। সেই খোপের চাবি নীচের দিকে। ছোট্ট চাবি। ওটা আমার কাছে থাকে। কেউ জানে না।"

নন্দবাবু কিকিরার দিকে তাকালেন। যেন বোঝাতে চাইলেন, 'দেখেছেন—আমিও সেই চাবি পাইনি। জানিই না ওরকম কোনও চোরা খোপ আছে।'

কিকিরা বললেন, "কিন্তু ডান আর বাঁ দুটো ড্রয়ার পাশাপাশি রাখলে তো বোঝা যেত, মাপের হেরফের আছে ; বাঁ দিকের ড্রয়ারের মাপ লম্বায় ছোট হত।"

রাজীব হাসল যেন। "না, তাও বোঝা যেত না। ডান দিকের ড্রয়ারের লম্বার মাপ একই রকম ছিল, যদিও তার পেছনে কোনও চোরা খোপ রাখা হয়নি। লোক ঠকাবার কারিকুরি তখনকার মিস্ত্রিদের ভালই জানা ছিল।"

বাইরে হাওয়া উঠেছে। জল পড়ার সেই একই রকম শব্দ। ঘরের আলো কমে আসছে মাঝে-মাঝে। দেয়ালগুলো আরও কালচে দেখাচ্ছিল।

রাজীব জামার পকেট থেকে একটা কী বার করল। রাখল টেবিলে। কিকিরারা অনুমান করলেন ওটা চামড়ার ব্যাগ। তবে চওড়ায় সরু। চশমার খাপের মতন অনেকটা। লম্বায় ইঞ্চি ছয়েক। বেশিও হতে পারে সামান্য।

কেউ কিছু বলল না।

রাজীব নিজেই ব্যাগ খুলে একটা পকেট নোটবই বার করে টেবিলের ওপর রাখল। তফাত থেকেও বোঝা যাচ্ছিল নোটবইটা অনেক পুরনো।

চন্দন বলল, "এটা কি আপনার বাবার সেই পুরনো নোটবই?"

"হ্যাঁ।"

"দেখতে পারি?"

"আপনি ডাক্তার মানুষ। দেখলেই নিশ্চয় আন্দাজ করতে পারবেন। তবে অকারণ দেখা। আমায় বিশ্বাস করতে পারেন।" বলে একটু থেমে চন্দনকেই বলল, "আপনি বোধ হয় জানেন, কাগজেও দু'-চারবার একটা খবর বেরিয়েছে—হালে একধরনের ভাইরাল অসুখ—ইস্ট এশিয়া থেকে এসে এদেশের উত্তর-পূর্ব দিকে ছড়িয়ে পড়ছে। অসুখটা মারাত্মক। তার লক্ষণটাও ইয়ালো ফিভারের মতন।"

চন্দন বলল, "কানে গিয়েছে, তবে আমি নিজে বেশি জানি না।"

"আমারও জানার কথা নয়। বেশি জানি না। তবে কুমুদকাকা আমায় জানিয়েছেন। তিনি এখন গুজরাটে থাকেন। বড় একটা ওষুধ কোম্পানির রিসার্চ ল্যাবরেটরির মাথায় বসে আছেন। অ্যাডভাইসার। তাঁর বয়েস হয়েছে। মানুষটিও একলা। তিনি আমায় চিঠিতে জানিয়েছিলেন, বাবার সেই কাগজপত্রগুলো যদি উদ্ধার করা যায়—তবে এ-সময় কাজে লাগতে পারে।"

"মানে, তুমি সেই কাগজপত্র ওঁদের কোম্পানিকে বেচে দিতে পারো?" কিকিরা বললেন।

রাজীব বলল, "হ্যাঁ। এতে দোষ কোথায়? আমি বাবার নোটবইটা রেখেছি স্মৃতি হিসেবে। আমি তো আর রিসার্চ করব না, আমার ল্যাবরেটরি বা ওষুধ কোম্পানিও নেই। ওটা যদি কুমুদকাকাদের কাজে লাগে, মানুষের উপকার হবে। তাই না?"

"তুমি তা হলে ওটা বেচে দিতে চাও?"

রাজীব মাথা নাড়ল। হ্যাঁ, বেচে দিতে চায়।

"বোধ হয় ভালই টাকা পাবে?"

"কত পাব জানি না। কুমুদকাকাই ব্যবস্থা করবেন।"

তারাপদ হালকাভাবে বলল, "একেই বলে ভাগ্য!"

রাজীব কোনও জবাব দিল না। ব্যাগের মধ্যে আঙুল ডুবিয়ে আরও একটা কী বার করে টেবিলের ওপর রাখল। পাতলা কাপড়ে মোড়া, কাপড়টা খুলে নিল।

কিকিরা দেখছিলেন। কিছু বুঝলেন না। সরু একটা কাঠি যেন। লম্বা। রং বোঝা যায় না। কালচে দেখাচ্ছিল।

"কী ওটা?" তারাপদ বলল।

"হাড়ের টুকরো?"

কিকিরারা অবাক! "কার হাড়? কীসের?"

"বাবাকে একজন দিয়েছিল। বুড়ো এক জিপসি। সার্কাসে খেলা দেখাত। জাগলারি। আগুনের খেলাও দেখাত। মুখে আগুন নিয়ে সাইকেলের কসরত। সে হঠাৎ মারা যায়। বাবা তাকে দেখেছিল। বাঁচাতে পারেনি।"

"হাড় দেওয়ার কারণ?"

"শুনেছি হাড়টা বানরের। নীল বানরের..."

"নীল বানরের?" কিকিরা অবাক!

"তাই বলেছিল। নীল বানর দেখাই যায় না। এদেশে কেউ দেখেছে বলে শুনিনি।"

"কী হবে এই হাড়ে?"

"ভাগ্য! বাবার পরিবারকে চরম দুঃখ দুর্ভাগ্য থেকে বাঁচাবে।"

"বাঁচিয়েছে? এ তো কবচ-মাদুলি পাথর-টাথর পরার মতন ব্যাপার।"

"জানি না। আমার জন্যে আমি ভাবি না। মা আর দাদুর জন্যে ভাবি। দাদু হয়তো আর দু'-চার বছরও নয় ; কিন্তু মা! মা না থাকলে আমার আর কী থাকতে পারে!" রাজীব বড় করে নিশ্বাস ফেলল। কয়েক মুহূর্ত থেমে বলল, "বাবা হঠাৎ চলে যাওয়ার পর আমরা খুবই বিপদে পড়েছিলাম, দাদু না থাকলে কী হত জানি না। সেটাও তো ভাগ্য! এই হাড়ের কোন গুণ আছে না আছে জেনে আমার লাভ নেই ; মায়ের কথা ভেবে ওটা আমি কাছছাড়া করি না। ওটা নাকি জীবনে মাত্র একবার একটি প্রার্থনাই পূর্ণ করতে পারে।"

কিকিরা কিছু বললেন না। যত অলৌকিক অবিশ্বাস্যই শুনতে হোক মায়ের

ওপর ছেলের এই দুর্বলতা স্বাভাবিক। বিশেষ করে যে ছেলে কম বয়েসে বাবাকে হারিয়েছে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর চন্দন বলল, "আমরা এবার উঠতে পারি!"

কিকিরা মাথা নাড়লেন। হ্যাঁ, ওঠা যেতে পারে।

নন্দবাবুই উঠে পড়লেন প্রথমে। মনে হল, তিনি যেন চলে যাওয়ার জন্যে বেশি ব্যস্ত।

বাড়ির বাইরে এসে নন্দবাবু একটা রিকশা নিলেন। তাঁর বাড়ি তেমন দূরে নয়, গলি দিয়ে চলে যাওয়া যায়।

কিকিরারা একটা ট্যাক্সির জন্য বড় রাস্তার দিকে হাঁটছিলেন। সঙ্গে রাজীব।

রাজীব হঠাৎ বলল, "নন্দবাবুর অনেক ক্ষতি হল!"

কিকিরা হাসলেন।

"হাসছেন?"

"আমি জানি। খোঁজ করে দেখেছি। দোকানটায় আগুন লাগলে ওঁর লাভ হত।"

"আমি কিন্তু আগুন লাগাতাম না।"

"তুমি লাগাতে না।... তবে সেদিন দোকানে গিয়ে তুমি ঝগড়াঝাটি করে আসার পর ওঁর মাথায় এই দুর্বুদ্ধি দেখা দেয়। দেওয়ার কারণও আছে। দোকানটা এখন টিমটিম করে চলে। কর্মচারীদের ঠিকমতন মাইনে দিতেও পারেন না। পৈতৃক বাড়ি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ছেলের কোনও উৎসাহ নেই দোকান সম্পর্কে। কী হবে ওই দোকান রেখে! তবে হ্যাঁ, দোকান ছাই হয়ে গেলে নন্দবাবুর নিশ্চয় প্রাণে লাগত। সেটা সহ্য করা কঠিন হত ওঁর পক্ষে। হয়তো ভেবেছিলেন লাখ তিন সাড়ে তিন টাকা যদি হাতে আসে এখন—দুঃখটা সামলে নিতে পারবেন।... মানুষ এইরকমই হয় রাজীব। পাকেচক্রে হতাশায় সে কখন যে অন্যায়ের সঙ্গে রফা করে বসে, কে জানে!... তা বলে তুমি ভেবো না নন্দবাবু মানুষটি সত্যিই অত খারাপ! ভাল কথা, তুমি সব জানতে নাকি?"

রাজীব হেসে বলল, "আমি তো আগেই বলেছি, আমার তরফেও একজনকে লাগিয়ে রেখেছিলাম দোকানে! সুশীল।"

তারাপদ আর চন্দন প্রায় একই সঙ্গে হেসে উঠে বলল, "আপনি মশাই আগুন লাগাতে পারলেন না, অথচ ধোঁয়া ছড়িয়েই খেলাটা শেষ করে দিলেন। কী যে করলেন!"

ততক্ষণে ট্যাক্সি দেখতে পেয়ে গিয়েছিলেন কিকিরা। হাত তুলে থামালেন গাড়িটাকে। ডাকলেন তারাপদদের, "এসো।... চলি রাজীব। তোমার দিঘার হোটেলের নামটা কিন্তু 'সাগরসঙ্গম'-ই দিও।"

রাজীব হাসল। "আপনারা কিন্তু আসবেন।"

ট্যাক্সি চলে গেল।

ভুলের ফাঁদে নবকুমার

ভুলের ফাঁদে নবকুমার

কিকিরা ফোনে কথা বলছিলেন। এই যন্ত্রটি আগে তাঁর বাড়িতে ছিল না। রাখার চেষ্টাও করেননি। ফোনের কথা উঠলে তারাপদদের ঠাট্টা করে বলতেন, "তোমাদের ওই 'টেলি ফোঁ' কানে তুললেই আমার ব্রেন ড্যামেজ হয়ে যায়। ওঃ, কী বিদঘুটে সব শব্দ, হয় পটকা ফাটছে কানের পরদায়, না হয় সোঁ-সোঁ হাওয়া বইছে। এই জ্যান্ত, এই মৃত।...না, বাপু ; এই বেশ আছি। নো ঝামেলা।"

কিকিরা টেলিফোনকে 'টেলি ফোঁ' বলেন। অনেক আগে নাকি 'ফোঁ' বলারই রেওয়াজ ছিল কারও কারও। কেন ছিল তিনি জানেন না। পুরনো বাংলা বইয়েই দেখেছেন কথাটা।

হালে, কিকিরারই এক চেলা, ম্যাজিশিয়ান চেলা, একটা ম্যাজিক বক্সের নকশা করিয়ে নেওয়ার পর, গুরুদক্ষিণা হিসেবে যন্ত্রটি বসাবার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। তার মামা বা কাকার দৌলতে।

কিকিরা যখন ফোনে কথা বলেন, মনে হয় অ্যাক্টিং করছেন। গলার পরদা উঠছে, নামছে, ঢেউ খেলছে, হয় হাসছেন না হয় হায় হায় করছেন—সে এক অপূর্ব শ্রুতিনাট্য।

কিকিরা কথা বলছিলেন ফোনে, আর তারাপদরা নিজেদের জায়গায় বসে কখনও কথা বলছিল, কখনও বা কিকিরার কথা শুনছিল।

এমন সময় এক কমবয়েসি ভদ্রলোক এসে হাজির।

ফোন নামিয়ে রাখলেন কিকিরা।

"আরে লাটু?"

তারাপদরা ভদ্রলোককে দেখছিল। আগে দেখেনি। দেখার মতন অপূর্ব চেহারা অবশ্য নয়, কিন্তু সুদর্শন। লম্বাটে গড়ন, রং বেশ ফরসা। সাধারণ কাটা-কাটা চোখমুখ। পরনে ধুতি, গায়ে ঘি-রঙের সিল্কের হাফশার্ট। চোখে চশমা। কিকিরার চেয়ে বয়েসে ছোট। অনেকটাই।

"কী ব্যাপার লাটু? তুমি হঠাৎ?"

লাটু কিকিরাকে দেখছিল। তারপর তারাপদদের নজর করে নিল।

"এলাম। আপনাকে অনেকদিন দেখতে পাই না, রায়দা! পথ ভুলে গিয়েছেন।"

"না রে ভাই, যাব যাব করি, যাওয়া হয় না। বোসো, দাঁড়িয়ে রইলে যে!"

লাটু বসল। তার ইতস্তত ভাব তখনও যায়নি। তারাপদদের দেখছিল বারবার।

"কেমন আছ?" কিকিরা বললেন।

"চলে যাচ্ছে! বড়বাবুর শরীরটা ভাল যাচ্ছে না। ব্লাড সুগারে কাহিল হয়ে পড়েছে। মেজদা ঠিক আছে।"

"তুমি?"

"দেখতেই পাচ্ছেন!" বলে একবার আড়চোখে তারাপদদের দেখল। সামান্য দ্বিধা নিয়ে বলল, "আপনার সঙ্গে একটা কথা ছিল। প্রাইভেট।"

কিকিরা লাটুকে দেখলেন ভাল করে। "কেমন প্রাইভেট? একেবারে বেশি প্রাইভেট হলে পাশের ঘরে চলো। আর যদি অন্যরকম কিছু হয়—তুমি এদের সামনেই বলতে পারো। ওরা—মানে ওই তারাপদ আর চন্দন আমার রাইট-লেফট, মানে ডান হাত বাঁ হাত।"

লাটু যেন কী ভাবছিল। কিকিরার ডান-বাঁয়ের সঙ্গে তার চাক্ষুষ পরিচয় না থাকলেও এদের কথা সে শুনেছে।

কিকিরার খেয়াল হল, লাটুর সঙ্গে তারাপদদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়নি। ছেলেদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "লাটুকে তোমরা আগে দেখোনি না? লাটুর ভাল নাম, লোকেন। আমরা সবাই ওকে লাটু বলেই ডাকি। লাটু দত্ত। ডাকনামটাই ওর চলে গিয়েছে।" বলে একটু হাসলেন, "লোকেন বললে বাড়ির লোকও ধোঁকা খেয়ে যাবে, বুঝতে পারবে না। লাটুরা হল জুয়েলার্স ; তিনপুরুষের বিজনেস।"

লাটু অন্যমনস্ক। তারাপদদের দেখছে একবার, আবার চোখ ফিরিয়ে কিকিরাকে লক্ষ করছে। খানিকটা বিব্রত ভাব। দ্বিধা।

কিকিরা বুঝতে পারলেন। সহজ হতে পারছে না লাটু। বললেন, "বাইরে থেকে এলে, জল খাবে? গরম পড়তে শুরু করেছে। ঘেমে গিয়েছ যেন। জল খাও আগে, চা খাও।" বলে ইশারায় তারাপদকে একবার ভেতরে যেতে বললেন। বগলাকে জল চায়ের কথা বলে আসতে।

তারাপদ উঠে গেল।

"বড়বাবু দোকানে আসছেন না?" কিকিরা বললেন। ঘরোয়া কথা বলে লাটুর অস্বস্তি কাটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন।

"বিকেলে আসে।"

"ওষুধটষুধ খাচ্ছেন তো! যা জেদি মানুষ।"

"খাচ্ছে। তবে মেজাজ..."

"বুঝেছি। স্বভাব কি পালটায় হে সহজে! ...ভেবো না ; আজকাল বাজারে কত ওষুধ বেরিয়েছে, সুগার কবজা হয়ে যাবে!" বলে চন্দনের দিকে তাকালেন। "কী

বলো ডাক্তার?" বলেই আবার লাটুর দিকে তাকালেন, দেখলেন চন্দনকে, "চাঁদু একজন উঠতি ডাক্তার। ভেরি গুড। বয়েসকালে ধন্বন্তরি হয়ে যাবে।" হাসতে লাগলেন কিকিরা।

তারাপদ ফিরে এল। পেছনে পেছনে বগলা। জল এনেছে।

লাটু জলের গ্লাস তুলে নিল। খেল। সত্যিই তার গলা শুকিয়ে গিয়েছিল। গরম পড়ার মুখেই যেন এবার কলকাতা শুকোতে শুরু করেছে। সবে ফাল্গুনের মাঝামাঝি, এখনই রোদের কী তেজ! এভাবে চললে চৈত্র-বৈশাখে শহরে হলকা উঠবে দিনে-রাতে।

জল খেয়ে পকেট থেকে রুমাল বার করে লাটু মুখ মুছে নিল।

"বলো কী ব্যাপার? ফ্যামিলির কোনও ব্যাপার নয় তো?" কিকিরা বললেন।

"না।...আমার ব্যাপার?"

"তোমার ব্যাপার?"

"মানে, আমার এক বন্ধুর ব্যাপার!"

"কী হয়েছে?"

"তাকে খুনের আসামি করার ফন্দি আঁটা হচ্ছে।"

"খু-নের আসামি?" কিকিরা অবাক! কেমন যেন থতমত খেয়ে গিয়েছেন।

তারাপদরাও অবাক চোখে লাটুকে দেখছিল।

কিকিরা বললেন, "কী বলছ তুমি! খুনের আসামি। তুমি ঠিক বলছ, না, আন্দাজে! ভয় পেয়ে বলছ?"

মাথা নেড়ে লাটু বলল, "ঠিক বলছি।"

"তোমার বন্ধু—খুনের আসামি—", কিকিরা তখনও বিশ্বাস করছিলেন না। "কী করে বন্ধু? নাম কী?"

লাটু বলল, "ওর নাম নবকুমার। নবকুমার চৌধুরী। আমরা ওকে কুমার বলেই ডাকি। ওর একটা ব্যবসা আছে। ছোট কারখানার মতন। সেখানে পুরনো ফ্রিজ সারাই, এয়ারকুলার রিপেয়ারিং, রং করা—এই সব হয়।"

"কারখানা কোথায়?"

"সুরেশ ব্যানার্জি রোডে।"

"তা খুনের আসামি কেন? বয়েস কত তার?"

"প্রায় আমারই বয়েসি। বছর তিনেকের ছোট।...ব্যাপারটা আপনাকে গুছিয়ে না বললে বুঝবেন না!"

"কেমন করে বুঝব! খুলেই বলো।"

তারাপদরাও কৌতূহল বোধ করছিল। লাটুর দিকে তাকিয়ে থাকল।

লাটু বলল, "রায়দা, আপনি বর্ধমান জেলার নুরপুরের নাম শুনেছেন?"

মাথা নাড়লেন কিকিরা। "না। সেটা কোথায়?"

"বর্ধমান থেকে কাটোয়ার দিকে যেতে পড়ে। আমি কোনওদিন যাইনি,

কুমারের মুখে শুনেছি। নুরপুরের নাকি অনেক খ্যাতি। প্রাচীনকাল থেকেই। এখন অবশ্য অত খ্যাতি-প্রতিপত্তি নেই। তবে নুরপুরের রাজবাড়ি, ওরা যাকে বলে 'রাজবাটি' তা টিকে আছে। আগে বলত নুরপুরের রাজা, পরে হল জমিদার, আর এখন জমিদারি সেভাবে না থাকলেও বেনামা জমিজায়গা থেকে শুরু করে, চালকল তেলকল কোল্ড স্টোরেজ নানা জায়গায় ছড়িয়ে আছে। দেদার সম্পত্তি ওদের।"

"মানে নুরপুরের এক্স-জমিদারদের।"

"হ্যাঁ।...কুমার সেই বাড়ির ছেলে। ছোট তরফ—মানে ছোট ভাইয়ের। আইনত পুরো সম্পত্তির অর্ধেক মালিকানা তার। কিন্তু তার ভাগ্য মন্দ। কম বয়েসেই অনাথ। বাবা-মা মারা যান। ওকে পোষ্য নেওয়া হয়। ওর অন্য কোনও নিজের ভাইবোনও ছিল না। ছেলেবেলা থেকে তার জেঠা ওদের ওপর কর্তৃত্ব করেছেন। জেঠা মানে—কুমারকে যিনি পালন করেছেন তাঁর দাদা। মা যতদিন বেঁচে ছিল—তবু সামান্য রয়েসয়ে ছিলেন। মা মারা যাওয়ার পর গ্রাহ্যও করতে চান না।"

"দাঁড়াও, দাঁড়াও—একটু ক্লিয়ার হয়ে নিই। তুমি বলছ, নুরপুরের রাজবাড়ির ছোট ভাই অনাথ একটি ছেলেকে পোষ্য নেন! ...তাহলে বড় ভাই দাঁড়াচ্ছে ছেলেটির একরকম জেঠা।...তা ভাইপোর দোষ?"

লাটু বলল, "দোষ বলতে কী বলব! ভাগ্যের দোষ। কুমারের কথায়, সে পালিত পুত্র। মানে, সে ছেলেবেলাতেই অনাথ হয়ে যায়। তার নিজের বাবা মারা যান বছর দুই বয়েসে। নিজের মাকেও সে হারায় পাঁচ বছরে। একেবারেই অনাথ।"

"ভেরি স্যাড!"

"রজনীকান্ত আবার সম্পর্কে কুমারের মেসোমশাই। তিনিই তাকে পালন করেন। পোষ্য নেন। মাসিমা-মেসোমশাই-ই তার মা-বাবা।"

"রজনীকান্ত তাহলে ছোট ভাই?"

"হ্যাঁ। বড়র নাম কৃষ্ণকান্ত। দু'ভাই কৃষ্ণকান্ত আর রজনীকান্ত। রাজবাড়ি, জমিদারি, স্থাবর সব সম্পত্তির মালিক আইনত দুই ভাইয়ের সমান সমান। কিন্তু ছোট ভাই রজনীকান্ত হঠাৎ মারা যাওয়ার পর, বড় ভাই নিজেই সব অধিকার করে নেওয়ার মতলব আঁটতে শুরু করেন।"

তারাপদ বলল হঠাৎ, "পারিবারিক ঝামেলা। এসব তো ওল্ড কেস। বড় ভাই ছোট ভাইকে পথে বসাবার ধান্দা করতে শুরু করে দেয়!"

লাটু মাথা হেলিয়ে বলল, হ্যাঁ।

কিকিরা বললেন, "কৃষ্ণকান্ত মানুষটি তবে সুবিধের নয় বলছ? সম্পত্তি হাতাবার এইসব কাণ্ডকারখানা পুরনো আমল থেকে চলছে, এখনও চলে। মানুষের লোভ সহজে মেটে না। তার ওপর এখানে দেখছি ছোট ভাই নেই, ভাইয়ের স্ত্রী নেই। রয়েছে তাদের পোষ্যপুত্র। ...তা কৃষ্ণকান্ত থাকেন কোথায়?

বয়েস কত?”

“কুমারের কথায়, তার জেঠার বয়েস পঁয়ষট্টির মতন। থাকেন দেশে। নুরপুরে। নিজেদের ভিটেয়, রাজবাড়িতে।”

“ভাল। তোমার বন্ধু থাকে কলকাতায়, তার জেঠা নুরপুরে। একজন এখানে, অন্যজন দূরে। খুনের আসামি করা হচ্ছে কেমন করে? কে করছে?”

“জেঠা।”

“জেঠা? কীভাবে?”

লাটু আবার রুমাল বার করে মুখ মুছে নিল। ঘরে পাখা চলছিল। সামান্য শব্দ হচ্ছিল।

বগলা চা নিয়ে এল। চায়ের সঙ্গে বাড়িতে ভাজা পকৌড়া।

কোনও কাজে তেমন খুঁত রাখে না বগলা। কাঠের ট্রে থেকে পকৌড়ার প্লেট, চায়ের কাপ তুলে একে একে এগিয়ে দিল সকলকে।

কিকিরা ঘরের বাতি জ্বেলে দিতে বললেন।

বাতি জ্বেলে দিয়ে বগলা চলে গেল।

কিকিরা সহজভাবে লাটুকে বললেন, “নাও, চা খাও। অত ঘাবড়ে যাচ্ছ কেন? ব্যাপারটা শুনি আগে সব। তোমার বন্ধু কি পুলিশের খপ্পরে পড়েছে?”

লাটু মাথা নাড়ল। “না। এখনও পড়েনি।”

“তবে বলছ খুনের আসামি?”

“অ্যাটেম্পট টু মার্ডার কেসে ফাঁসাবার চেষ্টা হচ্ছে।”

“ও! অ্যাটেম্পট টু মার্ডার! সেটাও জব্বর কেস। জামিন পাওয়া বেশ কঠিন শুনেছি।” বলতে বলতে চায়ে চুমুক দিলেন কিকিরা।

চন্দন ধাঁধায় পড়ে বলল, “কেউ খুন হয়নি তো?”

“না।”

যেন নিশ্চিন্ত হয়ে নিশ্বাস ফেলল চন্দন।

কিকিরা লাটুকে বললেন, “একটু গুছিয়ে বলো তো ঘটনাটা। এলোমেলো কথা থেকে কিছু বোঝা যাচ্ছে না। ধরতে পারছি না ব্যাপারটা।”

লাটু কয়েক ঢোক চা খেয়ে নিল। তারপর বলল, “ঘটনাটা দিন আট-দশ আগেকার। কৃষ্ণকান্ত নুরপুর থেকে কলকাতায় এসেছেন। নুরপুর রাজবাড়ির একটা ভাড়া করা আস্তানা আছে কলকাতায়। অনেকদিন ধরেই। ব্যবসাপত্রের কাজকর্মের জন্যে কর্মচারীদের থাকতে হয়। কৃষ্ণকান্তও আসেন। দু'-একজন কাজকর্মের লোক বরাবরই থাকে।”

“বাড়িটা কোথায়?”

“বি. কে. পাল অ্যাভিনিউতে।”

“আচ্ছা! তারপর—? কী ঘটেছিল ব্যাপারটা?”

“কৃষ্ণকান্ত কিছুদিন আগে কলকাতায় এসেছেন। বছরে এক-আধবার তিনি

আসেন। কাজকর্ম থাকে। এবার আসার পর তিনি লোক মারফত খবর পাঠান কুমারকে। দেখা করতে বলেন।”

“কেন?” কিকিরা জিজ্ঞেস করলেন।

চন্দনরা চা-পকৌড়া খেতে খেতে মন দিয়ে লাটুর কথা শুনছিল।

লাটু বলল, “জেঠার সঙ্গে কুমারের যোগাযোগ একেবারে নেই তা নয়। তবে সেটা চিঠিপত্রে। তবে সবই দু' তরফের ঝগড়াঝাটি নিয়ে। মানে সম্পত্তির দাবি পাওনাগণ্ডা নিয়ে।” একটু থামল লাটু। আবার দু' ঢোক চা খেল। বলল, “অনেকদিন ধরে গণ্ডগোলটা চলছে, মেটবার আশা নেই, আইন-আদালত করেও কিছু করা যাবে না দেখে, মানে কুমারের পক্ষে তার জেঠার সঙ্গে যুঝে ওঠা সম্ভব নয় ভেবে শেষ পর্যন্ত কুমার একটা মামুলি মিটমাট চাইছিল।”

“কীরকম মিটমাট?” কিকিরা বললেন।

“কুমার কিছু টাকা চেয়েছিল। নগদ।”

“কত টাকা?”

“প্রথমে লাখ বিশেক টাকা চেয়েছিল। কৃষ্ণকান্ত সটান না করে দিয়েছিলেন।...বিশ লাখ থেকে নেমে নেমে দশে দাঁড়াল। তাতেও কৃষ্ণকান্ত অরাজি। শেষে পাঁচ।”

“পাঁচ লাখ টাকা দাবি ছিল?”

“হ্যাঁ।” লাটু মাথা হেলিয়ে বলল, “কৃষ্ণকান্ত নিমরাজি হন। চিঠিতে জানান, ভেবে দেখছেন।”

“তারপর?”

“তারপর কলকাতা আসার আগে কৃষ্ণকান্ত একটা চিঠি লিখে জানান, তিনি শিগগির বিশেষ কাজে কলকাতা যাচ্ছেন। কলকাতায় এসে তিনি কুমারকে খবর পাঠাবেন। দেখা হলে সামনাসামনি কথা হবে। তবে লাখ দুই-আড়াই টাকা তিনি আপাতত দিতে পারেন। কয়েকটা কাগজপত্রের কাজ শেষ হলে—পরে সে বাকি টাকা পাবে।”

“কী ধরনের কাগজপত্র?”

“জানি না। কুমারও জানে না। সে সুযোগ তার হয়নি।”

“কেন?”

খানিকটা উৎকণ্ঠার গলায় লাটু বলল, “কুমার তার জেঠার কথা মতন নির্দিষ্ট দিনে কৃষ্ণকান্তর সঙ্গে দেখা করতে যায়। ওখানকার লোক চেনে কুমারকে। কৃষ্ণকান্ত বলেও রেখেছিলেন তাঁর কর্মচারীদের। কুমার যাওয়ামাত্র তারা ভেতরের ঘরে তাকে পাঠিয়ে দেয়।”

“মানে কৃষ্ণকান্ত যেখানে ছিলেন?”

“হ্যাঁ।”

“কী হল তারপর?”

"কুমার ঘরে গিয়ে দেখে, জানলার কাছে একটা সেকেলে বিশাল আর্ম চেয়ারে কৃষ্ণকান্ত শুয়ে রয়েছেন। তাঁর সামনে একটা গোল টেবিল। পাথরের টপ। টেবিলের ওপর একটা ব্রিফকেস। পাশেই জলের গ্লাস, পানের ডিবে, জরদার কৌটো।"

"কৃষ্ণকান্ত পান খেতেন?"

"ওই নেশাটা ভালমতনই ছিল তাঁর। কুমার তাই বলে।"

"ভাইপোর সঙ্গে দেখা হল তাহলে?"

"হল। তবে একেবারে অন্যভাবে। কৃষ্ণকান্তর ঘাড় মাথা ঝুলে রয়েছে একপাশে আর্মচেয়ারে। যেন ঘাড় গুঁজে পড়ে আছেন। গলায় একটা গেরুয়া রঙের উড়নি জড়ানো। ফাঁস দেওয়ার মতন প্যাঁচানো। চোখ বন্ধ। হাত ছড়ানো। কোনও সাড়াশব্দ নেই।...কুমার বারকয়েক ডাকল। সাড়া পেল না। হঠাৎ তার ভীষণ ভয় হল। মনে হল, জেঠা মারা গিয়েছেন। গলায় উড়নির ফাঁস লাগিয়ে কেউ তাকে শ্বাস বন্ধ করে মেরে ফেলেছে। সমস্ত ব্যাপারটা এমন অদ্ভুত যে, কুমার ভয় পেয়ে পালিয়ে এল।"

কিকিরা কৌতূহল বোধ করে সোজা হয়ে বসলেন। তারাপদরা হতবাক! লাটুর দিকে তাকিয়ে থাকল।

কিকিরা অবাক গলায় বললেন, "কুমার পালিয়ে এল?"

লাটু মাথা নাড়ল। "ভয়ে।"

"অ্যাটাচিতে কি টাকা ছিল? সেটা—!"

"কী ছিল কে জানে! কুমার অ্যাটাচি ছোঁয়নি। সে পালিয়ে এসেছে। অ্যাটাচি কেসটা নাকি পাওয়া যায়নি।"

"আর কৃষ্ণকান্ত? মারা গিয়েছিলেন গলায় ফাঁস লেগে?"

"না, মারা যাননি। সেটাও বিচিত্র ব্যাপার। তবে কুমার পালিয়ে আসার সময় মাত্র একজন রাজমিস্ত্রিকে দেখেছিল। তাও সে বাইরে নালা মেরামতির কাজ করছিল। দ্বিতীয় কাউকে চোখে পড়েনি।"

কিকিরা প্রথমে লাটু, পরে তারাপদদের দেখলেন। তিনিও কম বিস্মিত হননি। বললেন, "কৃষ্ণকান্ত তাহলে মারা যাননি! মানে গলায় ফাঁস লেগে শ্বাস বন্ধ হয়ে মরেননি।"

"না।"

"তাহলে নট এ কেস অব মার্ডার?"

"সেভাবে খুন বা হত্যা নয়..."

"তবে?"

"অ্যাটেম্পট টু মার্ডার?"

"প্রমাণ কোথায়? কে বলেছে কুমার তার জেঠাকে গলায় ফাঁস লাগিয়ে মারতে গিয়েছিল? থানায় ডায়েরি করেছেন কৃষ্ণকান্ত বা তাঁর তরফের কেউ? পুলিশকে

জানানো হয়েছে?”

মাথা নেড়ে লাটু বলল, “এখন পর্যন্ত নয় বলে জানি।”

“তাহলে?”

“কুমারের কানে গিয়েছে, কৃষ্ণকান্ত এবার তাকে জালে জড়াবেন। সে টাকার লোভে সেদিন তার জেঠাকে খুন করার চেষ্টা করছিল। ভাগ্যক্রমে তিনি বেঁচে গিয়েছেন।”

কিকিরা গম্ভীরভাবে কী যেন ভাবছিলেন। চন্দনরা চাপা গলায় কথা বলছিল নিজেদের মধ্যে।

অনেকক্ষণ পরে কিকিরা লাটুকে বললেন, “তোমার বন্ধু কুমারের সঙ্গে আমি কথা বলতে চাই। সে কোথায়? পালিয়ে বেড়াচ্ছে?”

লাটু বলল, দেখা হওয়ার ব্যবস্থা সে করবে, কাল বা পরশু।

॥ ২ ॥

নবকুমার ছেলেটিকে দেখলে মনে হয় সে ঠিক পুরোপুরি শহুরে ছোকরা নয়। কোথায় যেন খানিকটা মফস্বলি বা গ্রাম্য ভাব রয়েছে। স্বাস্থ্য ভাল, শক্ত গড়ন। হাত পায়ের হাড় বেশ খটখটে। মাথা ভরতি চুল। কোঁকড়ানো। সামান্য দাড়ি গালে। কপাল ছোট। মুখের আদল প্রায় গোল, বড় বড় চোখ, ঘন ভুরু, বসা নাক। দাঁত ঝকঝক করছে। গায়ের রং শ্যামলা। আর বয়েস বেশি হলেও পঁচিশ ছাব্বিশ বড়জোর। তারাপদদের চেয়ে দু'-তিন বছরের ছোটই হবে। লাটুর বন্ধু হলেও বয়েসে ছোট। লাটুকে সে ‘লাটুদা’ বলে ডাকে।

লাটু কিকিরাদের যে বাড়িতে নিয়ে এসেছিল সেটা বেলগাছিয়ার খালের দিকে। আশেপাশে কাঠগোলা, ইট সুরকির আড়ত, পুরনো লোহা-লক্কড়ের গুদোম। মায় একটা কাঠ-চেরাই কল।

মাঠকোঠা ধরনের বাড়ির দোতলায় নবকুমারকে পাওয়া গেল। পেছনে খালের পাড়। মাটি, জংলা গাছগাছালির স্তূপ। খালের গন্ধ আসে হাওয়ায়।

নবকুমার একটা বারমুডা গোছের প্যান্ট আর গেঞ্জি গায়ে বসে ছিল।

লাটুর বোধহয় আগেই বলা ছিল, কিকিরাদের দেখে নবকুমার অবাক হল না। বরং এমনভাবে তাকিয়ে থাকল কিকিরার দিকে যেন তার বিশ্বাস হচ্ছিল না, এরা কিছু করতে পারে তার জন্যে। ক্রিমিন্যাল কেস নিয়ে যারা কোর্টকাছারি মাতিয়ে দেয়—তেমন কোনও পাকা উকিলকে সামনে দেখলে হয়তো নবকুমার সামান্য আশ্বস্ত হত। কিন্তু লাটুদা তাকে বলে গিয়েছিল, ‘আমি ঠিক লোক আনব তুই ভাবিস না।’

কিকিরাও নবকুমারকে ভাল করে দেখছিলেন।

শেষে বললেন, “চলো বসা যাক ভেতরে।”

কাঠের সরু বারান্দা ঘেঁষে শেষপ্রান্তের একটা ঘরে গিয়ে বসল সবাই। ঘরে আসবাব বলতে একটা তক্তপোশ আর মাত্র একটা চেয়ার।

তক্তপোশে বিছানা পাতা ছিল। এলোমেলো হয়ে আছে চাদর বালিশ। ঘরের একপাশে মাটির কুঁজো, গ্লাস।

কিকিরা ঘরের চারপাশ দেখছিলেন। মাঠকোঠা ঘর যেমন হয়, পাকাপোক্ত দেওয়াল নেই, মাথার ওপর টিনের শেড। মামুলি ইলেকট্রিক লাইন। ঘর দেখতে দেখতে হঠাৎ নবকুমারকে বললেন, "তোমার জানাশোনা, বন্ধু গোছের আর কে কে আছে কলকাতায়?"

প্রশ্নটা আচমকা। নবকুমার কেমন থতমত খেয়ে গেল। প্রথমটায় বুঝতে পারল না, কী ধরনের জবাব চাইছেন কিকিরা। পরে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, "আছে; জানাশোনা তো অনেকের সঙ্গে আছে। তবে বন্ধু কম।"

"বিশ্বাসী বন্ধু?"

"বি-শ্বাসী বন্ধু।...কেন! লাটুদাই তো আমার বিশ্বাসী বন্ধু।"

"আর কেউ নেই?"

নবকুমার লাটুর দিকেই তাকাল, যেন সে জানতে চাইছে কী বলবে!

"কেন?"

"পরে বলছি। তুমি লাটু ছাড়া আর কার ওপর ভরসা করতে পারো? বিশ্বাস করো পুরোপুরি?"

"বাঁশরি, বাঁশরিলাল। আমাদের দেশের লোক। আমার বন্ধু। আর ওই পালিত, রাধানাথ পালিত, দোকানের লোক আমার। পালিতদা বলি। বয়েসে বড়। খুব বিশ্বাসী।... পালিতদার কাছে এসেই ওদের লোক শাসিয়ে গিয়েছে।"

কিকিরা চেয়ারে বসলেন। তারাপদরা তক্তপোশের ওপর বসে পড়েছে আগেই, নবকুমার আর লাটু দাঁড়িয়ে।

কিকিরা বললেন, "বাঁশরিলাল কোথায় থাকে?"

"নাগেরবাজার। সরকারি চাকরি। ফুড ডিপার্টমেন্ট।"

"তার সঙ্গে এর মধ্যে তোমার দেখা হয়েছে? সে এই ঘটনার কথা জানে?"

"না," মাথা নাড়ল নবকুমার। "কেমন করে জানবে! আমি তো তারপর থেকেই লুকিয়ে আছি। এমনিতেও বাঁশরির সঙ্গে আমার রোজ দেখা হত না। মাঝে মাঝে হত। সে আসত আমার দোকানে—মানে কারখানায়। কিংবা আগে থেকে বলা থাকলে আমি তার কাছে যেতাম।"

কিকিরা বললেন, "তুমি গোড়া থেকেই কিছু ভুল করে ফেলেছ। প্রথমত, ভয় পেয়ে সেদিন সঙ্গে সঙ্গে পালিয়ে আসা উচিত হয়নি। আমি জানি, ভয়ে মানুষ কাণ্ডজ্ঞান হারায়। তুমি যে খুব ঘাবড়ে গিয়েছিলে, ভয় পেয়েছিলে, বুঝতে পারছি। কিন্তু তোমার উচিত ছিল—যদি ঘরে ঢুকে কৃষ্ণকান্তকে দেখেই মনে হয়ে থাকে তিনি মারা গিয়েছেন—তাহলে ঘরের বাইরে এসে চেঁচামেচি করে লোক জড়ো

করা। বাড়িতে লোক ছিল, তুমি নিজেই বলেছ। কর্মচারীদের দু'-একজনকে ডেকে সঙ্গে নিয়ে আবার ঘরে ঢোকা।"

"কেন?"

কিকিরা তারাপদর দিকে তাকালেন। "তুমিই বলে দাও তো কেন?"

তারাপদ বলল, "ওরা সাক্ষী থাকত।" বলে নবকুমারের দিকে তাকাল। " তুমি চোরের মতন ঘরে ঢোকোনি—" তারাপদ খেয়াল না করেই নবকুমারকে 'তুমি' বলে ডেকে ফেলল। নবকুমার বয়েসে ছোট বলেই বোধহয়। বলল, "ঘরে ঢোকার আগে একজন কর্মচারী তোমায় দেখেছে। কথা বলেছে। এমনকী এ-কথাও বলেছে যে—কৃষ্ণকান্ত ভেতরের ঘরে তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছেন।"

নবকুমার বলল, "বলেছে বইকী!"

"আর তুমি ঘরে ঢুকে দেখলে কৃষ্ণকান্ত মারা গিয়েছেন। মারা গিয়েছেন বুঝলে কেমন করে? শুধু চোখে দেখেই বুঝে নিলে! আর তুমি ঘরে ঢুকলে আর ভদ্রলোককে খুন করলে! অত তাড়াতাড়ি চোখের পলকে কাউকে গলায় কাপড় জড়িয়ে মারা যায়? এটা কি বিশ্বাস করার মতন? পাকা খুনিরাও পারবে বলে মনে হয় না। অ্যাকশান সিনেমায় এসব দেখা যায়, বাস্তবে নয়। তোমার যদি মিলিটারি কমান্ডো ট্রেনিং থাকত—তবু না হয় বলা যেত, তোমার সেই ক্ষমতা কায়দা জানা আছে। তবে তা তোমার জানা নেই।"

লাটু কিকিরার দিকে তাকাল। যেন বুঝতে চাইল, তারাপদ যা বলছে তা কি ঠিক!

কিকিরা আগেই তারাপদদের সঙ্গে ঘটনাটা নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি জানেন তারাপদ যা বলেছে ঠিকই বলেছে।

"ওটাও বলো," কিকিরা তারাপদকে বললেন।

তারাপদ বলল, নবকুমারকেও, "আর ওই যে ব্রিফকেস, সেটা যে তুমি নাওনি, মানে উঠিয়ে নিয়ে পালিয়ে আসোনি, তার প্রমাণও থাকত। অবশ্য তুমি যদি লোক জড়ো করে আবার ঘরে ঢুকতে। যারা তোমার সঙ্গে ঘরে ঢুকত, তারা দেখত—কৃষ্ণকান্তর সামনে টেবিলে ব্রিফকেসটা রাখা রয়েছে।"

লাটু বলল, "ব্রিফকেস ও ছোঁয়নি।... ওর জেঠাকেও নয়।"

"সে তো আমরা বলছি।... ওরা যদি অন্য কথা বলে।"

"কী বলবে?"

"টাকা নিতেই নবকুমার ও বাড়ি গিয়েছিল। তাকে বলা হয়েছিল যেতে। ওরা যদি বলে ঘরে ঢুকে জেঠাকে দমবন্ধ করে মেরে টাকা ভরতি ব্রিফকেস উঠিয়ে নিয়ে ও চলে এসেছে— তাহলে কীভাবে প্রমাণ হবে যে, না সে টাকা নেয়নি। না নেওয়ার সাক্ষী কোথায়?... জেঠা হয়তো বরাতজোরে বেঁচে গিয়েছেন। কিন্তু টাকা!

এবার কিকিরা কথা বললেন। "বুঝলে লাটু, কাজটা বেশ কাঁচা হয়ে গিয়েছে।

কৃষ্ণকান্ত ছক কষে কুমারকে ফাঁসাবার চেষ্টা করেছেন বলে সন্দেহ করা যেতে পারে। কুমার টাকা নিতে ও বাড়ি গিয়েছিল। যাওয়ার কথা ছিল। টাকা নিতে গিয়ে কৃষ্ণকান্তর সঙ্গে তার বচসা হয়, রাগে ক্ষোভে বা মাথা গরম করে সে তার জেঠাকে খুন করতে যায়। তারপর টাকা নিয়ে পালিয়ে আসে।... কৃষ্ণকান্তর যদি এটা সাজানো ছক হয়, তবে আমার সন্দেহ—ব্রিফকেসে না পাওয়াই স্বাভাবিক। নিজেরাই সরিয়েছে।"

নবকুমার দু'হাতে মুখ ঢেকে যেন ফুঁপিয়ে উঠল। মাথা নাড়তে লাগল জোরে জোরে। "আমি টাকা নিইনি। ঝগড়াও করিনি। কার সঙ্গে ঝগড়া করব! জেঠা মারা গিয়েছে ভেবে ভীষণ ভয় পেয়ে আমি পালিয়ে এসেছি।"

কিকিরা কথা বললেন না।

সকলেই চুপচাপ।

নবকুমার নিজেকে সামলে নিল খানিকটা।

লাটু বলল, "রায়দা, এখন কী হবে?"

কিকিরা বললেন, "দেখা যাক কী হয়! তবে ওকে এখানে রেখো না। আমি তো বলব, কুমারের লুকিয়ে থাকাও উচিত হয়নি। সে টাকা নেয়নি, তার জেঠাকেও খুন করার চেষ্টা করেনি। তার উচিত ছিল নিজের আস্তানায় বসে থাকা, দোকানে যাওয়া, আর কোনও ঘুঘু উকিল—যারা ক্রিমিন্যাল কেসের প্র্যাকটিস করে, তার কাছে গিয়ে গোটা ব্যাপারটা খুলে বলা। কাউকে ক্রিমিন্যাল বললেই সে ক্রিমিন্যাল হয় না, অ্যাটেম্পট টু মার্ডার চার্জ আনলেই সেটা সত্যি হয়ে যায়? মামার বাড়ি!" বলে কিকিরা নিজের মাথার ওপরটা দেখালেন ডান হাতে। বললেন, "আমি একদিন মলাঙ্গা লেনের সরু গলি দিয়ে যাচ্ছিলাম মাঝদুপুরে। হঠাৎ একটা দোতলা বাড়ির ছাদের কোণ থেকে একটা ইট এসে পড়ল। একেবারে পায়ের কাছে। মাত্র ফুটখানেক তফাতে। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে মাথা তুলে ওপরে তাকালাম। কাউকে দেখতে পেলাম না। ইটটা আমার মাথায় পড়লে রক্ষে ছিল না। কথা হচ্ছে, আমি যদি এটাকে অ্যাটেম্পট টু মার্ডার বলে কেস ঠুকতাম, আইন কি মেনে নিত?"

লাটু মাথা নাড়ল। "না। তা কেমন করে মানবে! ওটা নিতান্তই অ্যাকসিডেন্ট। কাকতালীয়।"

"পাক্কা কথা বলেছ। আদালত দেখত, ইটটা কেমন করে পড়ল, কে ফেলেছে? নিজের থেকেই আলসের আলগা ইট পড়ে গেছে কি না! যে বাড়ি থেকে ইটটা পড়ল সে বাড়িতে এমন কে আছে যে আমার শত্রু! আমাকে জখম করতে চায়! তার মোটিভ কী!... কিন্তু সেরকম কোনও ব্যাপারই নেই। কাজেই—"

কথাটা আর শেষ করলেন না কিকিরা।

তারাপদ বলল, "আপনার বেলায় না থাক, নবকুমারের বেলায় ছিল।"

"ছিল বলেই তো বলছি, নবকুমার ভুল করেছে পালিয়ে এসে। দু' নম্বর ভুল

হল, সে নিজের দোকান আর বাড়ি ছেড়েই বা পালিয়ে আসবে কেন? তাতে তার ওপর সন্দেহ আরও বেড়ে যায়। এটা উচিত হয়নি।"

লাটু বলল, "ও ছেলেমানুষ, রায়দা! এতটা বোঝেনি।"

"তুমি যে ওকে এখানে এনে লুকিয়ে রেখেছ, তুমি কি ভাবছ ওর জেঠা বুঝতে পারবে না?"

"কেমন করে বুঝবে! এই মাঠকোঠার মালিক আমার চেনা লোক। বিশ্বাসী।"

"হতে পারে। কিন্তু, এটাও নিশ্চয় যে, ওর জেঠা খোঁজখবর রাখে, তুমি নবকুমারের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু। কাজেই বিপদের সময় তুমিই তার প্রধান সহায় হবে। সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান তেমনই বলে।"

চন্দন একেবারে চুপচাপ ছিল। আগের দিনও সে কথা বলেছে কি বলেনি, আজও নীরব। এবার সে কথা বলল, "তা কিকিরা, ভুল শোধরাবার উপায় কী? ও কি নিজের ডেরায় ফিরে যাবে?"

মাথা নাড়লেন কিকিরা। "না। আর ফিরে গিয়ে লাভ নেই। আপাতত নয়। বরং এখানেই থাকুক। তবে চোখ খোলা রেখে!" কথা বলতে বলতে মাথার ওপর তাকালেন। বেশ গরম লাগছিল। ছোট একটা পাখা লোহার রডের সঙ্গে আংটায় ঝোলানো রয়েছে। ছোট পাখা। ইশারায় পাখাটা চালিয়ে দিতে বললেন।

লাটুই পাখাটা চালিয়ে দিল।

কিকিরা নবকুমারকে বললেন, "তোমার জেঠা যে তোমাকে অ্যাটেম্পট টু মার্ডার কেসে ফাঁসাবার চেষ্টা করছেন এ-কথা তুমি জানলে কেমন করে?"

"বললাম যে, পালিতদা বলেছে। আমার দোকানের লোক। জেঠার কর্মচারী আমার দোকানে এসেছিল খোঁজ করতে আমাকে। সে বলে গিয়েছে।"

"খোঁজ করতে, না, ভয় দেখাতে।"

"জানি না।"

"তোমার জেঠা কৃষ্ণকান্তর নিশ্চয় অনেক বুদ্ধি। ধুরন্ধর মানুষ ভদ্রলোক। তা একটা কথা বলো তো বাপু, তোমাকে সম্পত্তি থেকে একেবারে বঞ্চিত করার অজুহাতটা কী ভদ্রলোকের?"

নবকুমার সামান্য চুপ করে থাকল। পরে ক্ষুব্ধ হতাশ গলায় বলল, "জেঠার কথা, আমি তাঁর ছোট ভাইয়ের পালিত পুত্র মাত্র। আমাকে আইনত দত্তক নেওয়া হয়নি। কাজেই আমি চৌধুরী বংশের ছোট তরফের উত্তরাধিকারী হতে পারি না।"

চন্দন অবাক হয়ে বলল, "এমন কোনও আইন আছে নাকি?"

"বর্ধমান কোর্টে আমি মামলা করেছিলাম। কিছু হয়নি।"

কিকিরা বললেন, "এটা তো আমিও জানি না। দত্তক আর পোষ্য বা পালিত পুত্রকন্যাদের মধ্যে তফাতটা কী? তবে আইন বড় অদ্ভুত। কোনটা যে হ্যাঁ হয়ে যায়, কোনটা না, বলা মুশকিল।"

লাটু বলল, "আমি একজনকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বললেন, আইন বড় জটিল। যে কোনও লোক যাকে খুশি পালন করতে পারে। পালিত হলেই সে যে পালকের সম্পত্তির উত্তরাধিকার হবে এমন কোনও কথা নেই। এই ধরনের মামলা অনেক হয়। ব্রিটিশ আমল থেকেই হয়ে আসছে। কোর্ট হাইকোর্টে বছরের পর বছর মামলা চলে।"

কিকিরা আর মামলার কথায় গেলেন না। গিয়ে লাভ নেই। দেওয়ানি আর সম্পত্তির ওয়ারিশন নিয়ে যে এক একটা মামলা বিশ পঁচিশ বছর ধরে পড়ে থাকে আদালতে, তা তিনিও শুনেছেন। আপাতত ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। তবু কয়েকটা কথা জানা দরকার।

কিকিরা বললেন, নবকুমারকেই, "লাটুর মুখে আমরা শুনেছি খানিকটা, তবু তোমার মুখ থেকে শুনতে চাই।"

"বলুন।"

"তোমার বাবা—মানে নিজের বাবার নাম কী? তিনি কোথায় থাকতেন, কী করতেন?"

নবকুমার বলল, "আমার নিজের বাবার নাম ভবনাথ রায়। বাবার মুখও আমার মনে নেই। একেবারে ছেলেবেলায়, আমার দেড় দু'বছর বয়েসে বাবা মারা যান, কেমন করে মনে থাকবে বাবাকে।... বাবা হরিপুর কোলিয়ারিতে কাজ করতেন। কম্পাসবাবু। আমার মায়ের নাম সরমা। মা আমাকে নিয়ে ভীষণ বিপদে পড়ে যান। কী করবেন, কেমন করে মানুষ করবেন ভেবে পেতেন না। মাসি—মানে মায়ের বড় বোন ছাড়া আমাদের অন্য কোনও আত্মীয় ছিল না। মাকে মাসির ওপরই নির্ভর করতে হত। শেষে মা বেচারিও অসুখে পড়লেন। কী অসুখ আমি বলতে পারব না। রক্তবমি হত মাঝে মাঝেই। বাঁচার আশা ছিল না।... তখন মাসি আর মেসোমশাই এসে আমাদের নুরপুরে তাঁদের কাছে নিয়ে যান।"

"তোমার মা নুরপুরেই মারা যান?"

"হ্যাঁ। বাবা মারা যাওয়ার বছর তিনেক পরে।"

"মাসি আর মেসোমশাই তোমাকে পালন করেন?"

"হ্যাঁ। ওঁরাই আমার মা বাবা হয়ে ওঠেন।"

"ওঁদের সন্তান—?"

"ছিল না। আমাকেই ছেলে হিসেবে পালন করেছেন।... আমি ভাল করে জ্ঞান হওয়ার পর ওঁদেরই মা বাবা হিসেবে পেয়েছি। আমরা তো রায় ছিলাম। পরে স্কুলে পড়ার সময় মশাইবাবা আমার পদবির সঙ্গে চৌধুরীও জুড়ে দেন।"

"মশাইবাবা? মানে—"

"মেসোমশাইকে আমি ছোট্টবেলা থেকেই মশাইবাবা বলে ডাকতাম। মাসিকে মা-মাসি।"

"বুঝেছি। তোমার মশাইবাবার নাম যেন কী—?"

"রজনীকান্ত।"

"কৃষ্ণকান্ত আর রজনীকান্ত দুই সহোদর ভাই।"

"হ্যাঁ।"

"কৃষ্ণকান্তর সন্তান?"

"দিদি আর দাদা। দিদির কবেই বিয়ে হয়ে গিয়েছে। জামাইবাবু ব্যবসা করে। দুর্গাপুর আসানসোল। কন্ট্রাক্টারি, দোকান, হোটেল...। দাদা কিছু করে না। ওর তেমন বুদ্ধিশুদ্ধি নেই। বোকা গোছের। চোখ দুটো বড় বড়, টেরা, কথা বলার সময় তোতলায়।"

কিকিরা কী যেন ভাবছিলেন। পকেট থেকে চুরুট বার করে ধরালেন। নবকুমারকেই বললেন, "রজনীকান্ত মানুষটি নিশ্চয় খুব ভাল ছিলেন?"

নবকুমার বলল, "ভাল মানে, মশাইবাবার মতন মানুষ হয় না। তাঁর দয়ামায়ার কথা সকলে জানে। রাজবাড়ির ছোট কর্তা হয়েও একেবারে সাদাসিধে ভাবে থাকতেন। সেরেস্তার কাজকর্ম দেখতেন খানিকটা, বাকি সময়টায় বইটই পড়তেন, বন্ধুদের সঙ্গে তাস খেলতেন। তাস খেলা ছাড়া তাঁর অন্য নেশা ছিল মাছধরা। কত যে ছিপ ছিল মশাইবাবার!"

"উনি কীভাবে মারা যান?"

নবকুমারের মুখ কেমন আরও মলিন বিষণ্ণ হয়ে গেল। বলল, "সে বড় অদ্ভুত ভাবে। আমি তখন বাইরে থাকি। স্কুল বোর্ডিংয়ে। হায়ার ক্লাসে পড়ি। হঠাৎ খবর এল, মশাইবাবা মারা গেছেন। সাপে কামড়েছিল। বিষাক্ত সাপ।"

"সাপ?"

"খবর পেয়ে ছুটলাম।... তখন শ্রাবণ মাস। ভরা বর্ষা। শুনলাম, সেদিন সকাল থেকেই টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছিল। মশাইবাবার ঝোঁক চাপল ওই বৃষ্টির মধ্যে পাশের গ্রামের ঘোষপুকুরে মাছ ধরতে যাবেন। ওই ঝিপঝিপে বর্ষায় মাছধরায় আলাদা আনন্দ।... দুপুরের পর বিকেল যখন গড়িয়ে আসছে, বৃষ্টি নামল তোড়ে। চারদিক ঝাপসা। ঘোলাটে হয়ে এল গাছপালা। মশাইবাবা ফিরেই আসছিলেন, লতাপাতার ঝোপ থেকে কী করে যেন সাপের ছোবল খেলেন।... ওঁকে আর বাঁচানো গেল না।"

তারাপদ আর চন্দন নিশ্বাস ফেলল বড় করে। দুঃখই হচ্ছিল তাদের।

অল্পক্ষণ চুপ করে থাকার পর কিকিরা বললেন, "তুমি লেখাপড়া শেষ করার আগেই—"

"আমি স্কুল শেষ করে বর্ধমানে কলেজে পড়েছি। তারপর এসেছি কলকাতায়। অন্য কোনও জায়গায় পড়ার সুযোগ হল না। টেকনিক্যাল—মানে ওই পলিটেকনিকে পড়েছি। পরে আমার এক গুরু জোটে। তার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে হোটেলে দোকানে ফ্রিজ সারিয়ে বেড়াতাম। হাতে-কলমে শিখেছি। গুরু শেষে

শিলিগুড়ি চলে যায়। আমি একটা দোকান দিই।”

“তোমার মা-মাসি তখন বেঁচে ছিলেন?”

“হ্যাঁ। মা-মাসি আমায় টাকাপয়সা দিয়েছেন। দোকান করার সময় নিজের কিছু গয়না। আমি নিতে চাইনি। মা-মাসি জোর করে দিয়েছেন। বলেছেন, আমি বেঁচে থাকতে এগুলো নিয়ে যা, নয়তো পরে কিছু পাবি না। আমি নিয়েছি। তখনই আমার লাটুদার সঙ্গে পরিচয়। মা-মাসির সোনাদানা যা পেয়েছিলাম লাটুদাই সেসব বিক্রির ব্যবস্থা করে দেয়।

লাটু কিকিরার দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল। কথাটা ঠিকই।

আবার খানিকটা চুপচাপ থাকার পর কিকিরা বললেন, “তোমার জেঠার কোনও ফোটো আছে?”

“এখানে নেই। আমার বাড়িতে আছে।”

“তোমার বাড়ি মানে—সেই...”

“না। আমি যেখানে আছি। সুরি লেনে।”

“সেখান থেকে ফোটো আনা—”

“পারা যাবে না। কে আনবে!” বলে মুখের ঘাম মুছতে মুছতে কী ভেবে যেন নবকুমার বলল, “আমি একটু আধটু ছবি আঁকতে জানি। ছেলেবেলা থেকেই। স্কেচ করতে পারি। জেঠার মুখ আমি কাগজ পেন্সিলে এঁকে দিতে পারি। খুব বেশি অমিল হবে না।”

কিকিরা তারাপদদের দিকে তাকালেন।

তারাপদ বলল, “ভালই তো! তাই দিক।”

কিকিরা বললেন, “বেশ। এঁকেই দাও।... এখন আমরা আর বসব না, অন্য কাজ আছে। তুমি ওটা এঁকে রাখো। কাল লাটু এসে নিয়ে যাবে।”

তারাপদ উঠে দাঁড়াল।

কিকিরা লাটুকে বললেন, “লাটু, এখান থেকে ওকে দু'-একদিনের মধ্যে অন্য কোথাও সরিয়ে দাও। আমার মনে হচ্ছে, এখানে থাকলে ওর ধরা পড়ে যাওয়ার ভয় আছে। এখানে নয়, ওর গ্রামের সেই বন্ধুর বাড়িতেও নয়; অন্য কোথাও থাকুক আপাতত।”

“কোথায় সরাই, রায়দা? ভেবে দেখি—।”

হঠাৎ তারাপদ বলল, “কিকিরা, ও না হয় আমার কাছেই থাকতে পারে ক'দিন!”

কিকিরা ভাবলেন দু' মুহূর্ত। “নট এ ব্যাড আইডিয়া।” বলেই নবকুমারের দিকে তাকালেন। “তুমি সাবধানে থাকবে, এখন বাইরে যাবে না। কেউ এলে দেখাও করবে না। আর শোনো, ভয় পেয়ো না। তোমার জেঠা হুট করে কিছু করতে পারবে না। তোমার যেমন ভুল হয়েছে দু'-একটা ব্যাপারে, তোমার জেঠারও হয়েছে। এত সহজে তোমায় ফাঁসাতে পারবে না।... যাই হোক,

আমরা এখন চলি।... ভাল কথা, বি. কে. পাল অ্যাভিনিউতে যেখানে জেঠা আছে, তার ঠিকানাটা বলো।"

নবকুমার ঠিকানা বলল।

॥ ৩ ॥

মাঝের একটা দিন কিকিরাকে সকাল বিকেল বাড়িতে পাওয়া গেল না।

তারাপদ অফিস থেকে ফোন করেছিল বিকেলে, পায়নি। অবশ্য দুপুরে করলে পেতে পারত। বিকেলে উনি ছিলেন না বাড়িতে।

পরের দিন চন্দন এল বিকেলের পর। বড় গুমোট দিন। আকাশও ঘোলাটে। হয়তো ধুলোর ঝড় উঠতে পারে। এ সময়ে এমন হয়। ঠিক যে কালবৈশাখী তা বলা যাবে না। তবে ঝড় তো নিশ্চয়ই।

চন্দন এসে দেখল, কিকিরা নিজের জায়গাটিতে বসে কী একটা বইয়ের পাতা ওলটাচ্ছেন। পুরনো বই বলে মনে হল, কাপড় দিয়ে বাঁধানো মলাট।

"কী সার? কী পড়ছেন?" চন্দন বলল।

"চাঁদু! বোসো।... কী আর পড়ব—!" বলে বইটা সরিয়ে রাখলেন।

"কাল আমার আসা হল না। অন্য কাজে জড়িয়ে পড়েছিলাম।"

"আমিও ছিলাম না বিকেলে। সন্ধের অনেক পরে ফিরেছি। এলে আমায় পেতে না। বাড়ি ফিরে শুনলাম তারা ফোন করেছিল।"

"আমার সঙ্গে দেখা হয়নি ওর। আজ নিশ্চয় আসবে।... তা নতুন খবর বলুন। কিছু পাওয়া গেল?"

কিকিরা বললেন, "তোমায় একটা জিনিস দেখাই।" বলে পাশের ছোট টেবিল হাতড়ে একটা কাগজ বার করলেন। "এটা দেখো।"

চন্দন উঠে গিয়ে কাগজটা নিল। সাদা কাগজে পেনসিল দিয়ে একটা মুখ আঁকা রয়েছে। দেখল চন্দন। "নবকুমারের জেঠার মুখের স্কেচ?"

"হ্যাঁ। কৃষ্ণকান্ত চৌধুরীর মুখ। কাল পেয়েছি। লাটু দিয়ে গিয়েছে। আমি তখন বাড়ি ছিলাম না। রাত্রে লাটু ফোন করেছিল। বললাম, পেয়েছি। অন্য কথাও হল।"

চন্দন কাগজটা হাতে করে নিজের জায়গায় ফিরে এসে বসল। দেখতে লাগল মুখটা। খুঁটিয়ে।

কিকিরা একবার উঠে ভেতরের ঘরে গেলেন। ফিরে এলেন সামান্য পরে।

"দেখে তো মনে হচ্ছে কড়া ধাতের লোক। ধূর্ত, প্যাঁচোয়া।"

"চোখ দেখে তাই মনে হয়।... নবকুমার যদি বাড়াবাড়ি না করে থাকে তবে আমার মনে হয়, ভদ্রলোককে চতুর, ধূর্ত মনে হলেও পাক্কা ক্রিমিন্যালের মতন দেখায় না। খুনখারাপি করার লোক নয়।"

চন্দন আবার ছবির মুখটা দেখতে লাগল।

কিকিরা হঠাৎ তামাশার গলায় বললেন, "চাঁদু, ধরো আমি ফলস দাড়ি গোঁফ লাগালাম, চোখে কপালে খানিকটা কালিঝুলির মেকআপ নিলাম। মাথায় একটা উইগ চাপালাম। আমায় কেমন দেখাবে?"

চন্দন প্রথমটায় বুঝতে পারেনি। কয়েক মুহূর্ত সময় নিল বুঝতে। তারপর হেসে ফেলল। "কেমন লাগবে!... তা খারাপ লাগবে না। যাত্রাদলের নারদ মনে হতে পারে।"

কিকিরা রেগে যাওয়ার ভান করে বললেন, "হোয়াট! আমাকে যাত্রার নারদ বলছ?... তুমি না দেখেছ যাত্রা, না দেখেছ নারদমুনি। নারদ মাথায় ঝুঁটি বাঁধে, দাড়ি গোঁফ থাকে না।"

চন্দন হো হো করে হেসে উঠল। "আপনাকে কেন বলব, আপনার সাজকে বলছি।"

"তুমি কিস্যু জানো না।... যাকগে, আসল কথা হল, আমার এই চোখ দুটো একেবারে 'ডাল'—মানে ফ্যাকাশে, জন্ডিস রোগীর মতন হলদেটে, একেবারেই ঝকঝক করে না।... বাইবেলে বলেছে, মানুষের চোখই আসল, তাকে চিনিয়ে দেয়।"

"আবার বাইবেল!" চন্দন হাসছিল। "আপনার চোখ 'আই অব এ নিডল'।"

"সংস্কৃতে বলেছে, সজ্জনং পরিচীয়তে নয়নাৎ... মানে চক্ষু হইতে সজ্জন ও শয়তানকে পৃথক রূপে চেনা যায়।"

"দারুণ সাংস্কিট, ব্যাকরণ কৌমুদী হার মেনে যায়।... তা সার সংস্কৃত থাক। আপনি কী বলতে চাইছেন?" চন্দন হাসছিল।

"বুঝতে পারছ না?"

"না।"

"আমি বলছি, কৃষ্ণকান্তর মুখের গড়ন দেখে মনে হয় মানুষটির ব্যক্তিত্ব আছে। জমিদারদের রক্ত তো! দাপুটে মানুষ। তবে ওই চোখ থেকে বোঝা যায় কৃষ্ণকান্ত অত্যন্ত চতুর, হয়তো নিষ্ঠুর। তবে খুনে নয়।"

"সে তো নবকুমারের কথা থেকেই বোঝা গিয়েছে। নতুন আপনি কী বলছেন!"

"নতুন নয়, কিন্তু আমরা যা শুনেছি এ পর্যন্ত—তা একতরফা। নবকুমার যা বলেছে। এই ছবিও তার আঁকা। সাধারণ বুদ্ধি থেকে তুমি জানো, আমরা যাকে পছন্দ করি না, ঘৃণা করি, মনে করি শত্রু, তাকে যত পারি কালি মাখাই, তার দুর্নাম করি। কৃষ্ণকান্ত যে অত্যন্ত দুর্জন মানুষ, সেটা জানছি নবকুমারের মুখ থেকে। তাকে বিশ্বাস করছি। আমিও করছি বারো আনা। তবে আমার মনে হয়—কৃষ্ণকান্ত সত্যিই কেমন তা আমরা এখন পর্যন্ত ঠিকঠাক জানি না।"

"মানে? আপনি—"

"আমি কী বলছি বাদ দাও। অন্য পাঁচজন যদি বলে, নবকুমার টাকা নিয়েছে।

যদি বলে সে সেদিন তার জেঠার ঘরে গিয়ে দেখে কৃষ্ণকান্ত বেহুঁশ অবস্থায় আর্মচেয়ারে পড়ে আছেন, সাড়াশব্দ নেই, আশেপাশেও কাউকে দেখা যাচ্ছে না, টেবিলের ওপর অ্যাটাচি রাখা রয়েছে, নবকুমার সুযোগ বুঝে সেটা উঠিয়ে নিয়ে পালিয়ে এসেছে, তুমি কেমন করে প্রমাণ করবে সে টাকা নেয়নি?"

এমন সময় তারাপদ এসে ঘরে ঢুকল।

চন্দন তারাপদকে দেখল। "আয়—!" বলেই কিকিরার দিকে তাকাল। "আপনি কি বলতে চাইছেন, নবকুমার মিথ্যে কথা বলছে?"

"যদি বলে—?"

"তা কেমন করে হয় কিকিরা! লাটুবাবু ছেলেটিকে ভাল করে চেনে। নবকুমার যদি ওই ধরনের ছেলে হয়, লাটুবাবু নিশ্চয় ওর হয়ে আপনার কাছে আসতেন না।"

তারাপদ এতক্ষণে বসে পড়েছে। বলল, "কী ব্যাপার?"

চন্দন বলল, "কিকিরা কী সব বলছেন—, উনি নবকুমারকে সন্দেহ করছেন।"

"কেন?"

কিকিরা বললেন, "আমি সন্দেহ করেছি বলিনি। বলছি যদির কথা—! আমি প্রথমেই বলেছি নবকুমার দু'-তিনটে মারাত্মক ভুল করেছে। এক, ঘরে ঢুকে যখন তার জেঠাকে ওই অবস্থায় দেখল, তখন সে কেমন করে বুঝল, জেঠা মারা গিয়েছেন, সে তো জেঠার অঙ্গও স্পর্শ করেনি বলছে। সে কতবড় ডাক্তার যে, চোখে দেখেই বুঝে নিল জেঠা মারা গিয়েছেন! এক্ষেত্রে লোকে কী করে? নবকুমারের উচিত ছিল, তার জেঠাকে নাড়াচাড়া করে দেখা। যদি ভয়ে সেটা না পেরে থাকে তবে ঘরের বাইরে এসে লোকজন ডাকা। সে তাও ডাকেনি। পালিয়ে এসেছে। কেন? অ্যাটাচিটার কী হল। কুমার বলছে, আনেনি। ও বাড়ির লোক যদি বলে, নিয়ে পালিয়ে এসেছে কুমার! তাহলে?"

তারাপদ আর চন্দন পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল। ধাঁধা লেগে গিয়েছে যেন!

শেষে তারাপদ বলল, "ভুল তো নবকুমার করেছে। কিন্তু আপনি হঠাৎ অ্যাবাউট টার্ন করছেন কেন?"

"না, করিনি। কোনটা সম্ভব তাই ভাবছি।... চাঁদু ডাক্তার তুমি, ওই আঁকা ছবিটা ভাল করে দেখেছ?"

"হ্যাঁ। কেন?"

"তারাপদকে দেখতে দাও।"

তারাপদ পেন্সিলে আঁকা স্কেচটা নিল। দেখছিল।

কিকিরা চন্দনকে বললেন, "আচ্ছা ডাক্তার, কৃষ্ণকান্তর দাড়ি আছে দেখেছ তো!"

"হ্যাঁ।"

"ওকে চলতি কথায় বলে চাপ-দাড়ি, মানে গালের সঙ্গে যেন চেপে লেগে আছে। ঝুলো দাড়ি নয়, ঝুলে পড়ছে না গলায়।"

"তাতে কী!"

"এবার বলো, একটা লোককে যদি কেউ গলায় ফাঁস লাগিয়ে মারার চেষ্টা করে, তার চোখমুখের চেহারা কেমন হতে পারে? আমি যতদূর বুঝি, আচমকা গলায় ফাঁস লাগলে মানুষ শ্বাসপ্রশ্বাসের জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করে, মরিয়া হয়ে ওঠে, হাত পা ছোড়ে, ফাঁস আলগা করার চেষ্টা করে। যদি নাও পারে, তার চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসে, মুখ হাঁ হয়ে যায়, জিভ বেরিয়ে আসে।... কৃষ্ণকান্তর বেলায় তা হয়েছিল বলে নবকুমার বলেনি। আমি মেনে নিচ্ছি, কৃষ্ণকান্তর মুখে চাপ-দাড়ি ছিল বলে ভাল করে মুখ দেখা যাচ্ছিল না। কিন্তু চোখ? হাত পা? ফাঁস লেগে মরছে তবু ওভাবে নেতিয়ে কেউ পড়ে থাকে?"

চন্দন অস্বীকার করতে পারল না।

"তা ছাড়া টাকা লেনদেনের সঙ্গে একটা শর্ত ছিল। কৃষ্ণকান্ত তখনই টাকা দেবেন যখন নবকুমার কিছু কাগজপত্রে সই করবে! কোথায় সেই কাগজপত্র? কী লেখা ছিল তাতে? নবকুমার জানে না।"

তারাপদ বলল, "বোধহয় তাতে লেখা ছিল রাজবাড়ির কোনও সম্পত্তির ওপর নবকুমার আর কোনওদিন কোনও দাবি-দাওয়া করবে না।"

"আমারও তাই মনে হয়।... তবে সঙ্গে সঙ্গে এটাও মনে করতে হবে, কৃষ্ণকান্ত দয়ার অবতার সেজে ভাইপোর সঙ্গে একটা মিটমাট করতে চাননি। এমন কোনও কারণ ছিল যাতে তিনি আশঙ্কা করতেও ভবিষ্যতে একটা গণ্ডগোল হলেও হতে পারে," কিকিরা বললেন। "লাটুকে আমি কালও রাত্রে জিজ্ঞেস করেছিলাম, নবকুমার কি কখনও তাকে বলেছে রজনীকান্ত কোনও উইলটুইল করেছিলেন কিনা? ...লাটু বলল, সে শোনেনি; নবকুমার তাকে বলেনি।"

বগলা লস্যির মতন শরবত তৈরি করেছিল। দিয়ে গেল তারাপদদের। কিকিরাকেও।

এই সময় শরবত খেতে ভালই লাগার কথা। চন্দন আরামের শব্দ করল।

"কাল আপনি সারাদিন কী করছিলেন?" তারাপদ জিজ্ঞেস করল।

"খোঁজখবরের চেষ্টা করছিলাম। সবই বৃথা। শেষে বি.কে. পাল অ্যাভিনিউতে উঁকি দিলাম। মানে, গেলাম ওখানে।"

"কৃষ্ণকান্তর গদিবাড়িতে?"

"আরে না; হুট করে সে-বাড়িতে যাওয়া যায়!... চেনা লোকটোক খুঁজলাম, পেলাম না। ও-পাড়ার কাউকে চিনি না। শেষে কী করলাম জানো?"

"কী?"

"একটা মামুলি চায়ের দোকানে বসে চা খাচ্ছি—আসলে ভাবছি কী করব, হঠাৎ উলটো দিকের একটা বাড়ির নীচের তলায় ফুটপাথ ঘেঁষে দেখি এক

কবিরাজের নাম আর ছোট সাইনবোর্ড লটকানো।”

“কবিরাজ?” চন্দন অবাক হয়ে বলল।

“হ্যাঁ সার, কবিরাজ।...বৈদ্যরাজ চন্দ্রকান্ত সেনশর্মা, আয়ুর্বেদ ধন্বন্তরি। চায়ের দোকানে জিজ্ঞেস করলাম, কবিরাজমশাই কেমন, মানে হাতযশ। তারা বলল, রোগী পায় না। নিজেই হাঁপানি রোগী।”

তারাপদরা জোরে হেসে উঠল।

কিকিরা বললেন, “আমি দেখলাম, একবার টোকা মেরে দেখি কী হয়! কেননা, কৃষ্ণকান্তর বাড়ির চার পাঁচটা বাড়ির পরই কবিরাজমশাইয়ের বাড়ি বা ডাক্তারখানা বা চেম্বার।”

“চলে গেলেন?”

“একেবারে সটান। তখন বেলা হয়ে যাচ্ছে। ধন্বন্তরির দেখা পাব কি পাব না জানি না। জয় মা দুর্গা বলে সটান চলে গেলাম। দেখাও পেলাম। একটা তক্তপোশের ওপর ময়লা ফরাস। কবিরাজমশাই বসে বসে খবরের কাগজের বাসি খবর পড়ছেন। রোগা খিটখিটে চেহারা, গালে দাড়ির কুচি, চোখে চশমা, পরনে আধময়লা ধুতি, গায়ে ফতুয়া।”

“দারুণ। ধন্বন্তরির এই অবস্থা?”

“খুব বিনয় করে নমস্কার সেরে বললুম, আমার এক পরিচিত ভদ্রলোকের মুখে ওঁর গুণপনার কথা শুনে আসছি। বলে একটা উটকো নাম বললুম। তারপর নিজের নাম বলতে হল। ভবানীপ্রসাদ সাঁই। একটা ঠিকানাও দিলাম। দুটোই ঝাড়া ফলস, যা মুখে এল বলে দিলাম।”

তারাপদ আর চন্দন হো হো করে হেসে উঠল।

“তারপর শোনো—” কিকিরা বললেন, “কবিরাজমশাই আমায় বসতে বললেন। একটা চেয়ার ও একটা টুল সামনে। বসলাম। সেনশর্মা বললেন, ব্যাধি কী?...বললাম, অনিদ্রা, মাথাঘোরা, অগ্নিমান্দ্য, পেট ফাঁপা, অসম্ভব দুর্বলতা, ইত্যাদি ইত্যাদি। এলাপ্যাথি, হোমোপ্যাথি অনেক করেছি। কোনও উপকার হয়নি। শেষে তাঁর শরণাপন্ন হয়েছি।”

চন্দন হাসতে হাসতে বলল, “ফাইলেরিয়া ম্যালেরিয়া বাকি রাখলেন কেন! লাগিয়ে দিলে পারতেন।”

কিকিরা মুচকি হেসে বললেন, “গাছের সব ফল একসঙ্গে পাড়তে নেই। হাতে রাখতে হয়।...তারপর কী হল শোনো—! কবিরাজমশাই নাড়ি টিপে বায়ু পিত্ত কফ আন্দাজ করে নিয়ে মাথায় মাখার তেল, হজমের গুলি, তেঁতুল চটকানো চ্যবনপ্রাশ, কীসের এক আরিস্ট দিলেন। আমার পঁচাশি টাকা খসে গেল।”

“সারের টাকা হাতের ময়লা,” তারাপদ ঠাট্টা করে বলল।

“আরে বাপু, আমার তো অন্য মতলব। কথায় কথায় কবিরাজকে জিজ্ঞেস করলাম, তাঁর প্রতিবেশী কৃষ্ণকান্তবাবুকে চেনেন কিনা? বানিয়ে বানিয়ে দিব্যি

বললাম, আমি ওঁর দেশের লোক। তবে এক গ্রামের নয়। জমিদারবাড়ির দুটো গ্রাম তফাতে আমার দেশ।”

চন্দন বলল, “বাঃ, বানিয়েছেন ভাল।”

“কী বললেন কবিরাজ?”

“বললেন, চেনেন। আলাপ অবশ্য তেমন নেই। তবে কৃষ্ণকান্তের যে ধর্মেকর্মে মতি আছে, শুনেছেন। নিত্য পুজোআর্চা করেন। কালীভক্ত। কলকাতায় এলেই একবার কালীঘাট আর দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে যান দর্শন করতে।”

“কালীভক্ত?”

“দেশের বাড়িতে দু' পুরুষের প্রতিষ্ঠিত কালীমূর্তি আছে, মন্দির আছে। এখানেও বাড়িতে কালী আছেন, ব্রাহ্মণ এসে পুজো করে যান।”

“যাঃ বাব্বা! মা কালীর সন্তান! তা ইয়ে এত কথা...”

“ও বাড়ির এক কর্মচারী, বিপিন সাধু, এখানেই থাকে, মাঝে মাঝে কবিরাজমশাইয়ের কাছে আসে। গল্পগুজব করে, দাবা খেলে, পদ্মমধু দিয়ে গোলমরিচ আর সন্ধব লবণের চূর্ণ খায়।”

“তাতে কী হয়?”

“জানি না।”

“আর কী শুনলেন?”

“কবিরাজ বললেন, মশাই কৃষ্ণকান্তবাবু বেশ মেজাজি মানুষ। এ-পাড়ার দুর্গা কালীপুজোয় তাঁর গদি থেকে পাঁচ সাতশো টাকা চাঁদা বরাদ্দ করা আছে।”

“পাড়ার ছোকরাদের হাতে রেখেছেন আর কি!”

কিকিরা শরবতের গ্লাস নামিয়ে রেখেছিলেন। আয়েসের ভঙ্গিতে মাথা হেলিয়ে একটা চুরুট ধরালেন। বললেন পরে, “তাঁর পান খাওয়ার গল্পও শুনলাম। রাজকীয় ব্যাপার হে। কৃষ্ণকান্তর মুখে বাজারি পান রোচে না। তাঁর পানের রুচি অন্যরকম।”

“কেমন?”

“আফিং দেওয়া জলে পানপাতা ভিজিয়ে রাখতে হবে কমপক্ষে একবেলা। তাতে গোলাপজলের ছিটে থাকবে। খয়ের আসে বেনারস থেকে, কাল্মি খয়ের, গুলতে হয়। গন্ধ মেশানো থাকে। সুপুরি দু'-এক কুচি। জরদা কাশীর। দেড়শো দুশো টাকা ভরি। পানের ডিবে এক বিঘত—মানে ধরো ছ-সাত ইঞ্চি লম্বা। জার্মান সিলভারের ডিবে। জরদার কৌটো রুপোর। দিনে তিরিশ চল্লিশটা পান খান।”

চন্দনরা রীতিমতন অবাক হয়ে গিয়েছিল। একজন মানুষ সম্পর্কে জানার কত কী থাকতে পারে! কৃষ্ণকান্ত কালীভক্ত, পুজোআর্চা করেন, আবার আফিংয়ের জলে ভেজানো পানপাতায় সাজা পান ছাড়া অন্য কিছু মুখে তোলেন না, এ বড় আশ্চর্য জিনিস তো!

কিকিরা খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, "দেখো চাঁদু, নবকুমারকে আমি অবিশ্বাস করতে চাইছি না, কিন্তু তার সেদিনের ব্যবহারটা অবশ্যই অদ্ভুত। আদালতের সামনে দাঁড়ালে তাকে বিস্তর নাজেহাল হতে হবে।...তা সে যাই হোক, আপাতত তাকে কেউ ফাঁসায়নি। পরের কথা জানি না।"

"লাটুবাবু কী বলেন?"

"লাটু এখনও সব কথা জানে না। কাল দেখা হবে। ফোনে কথা কমই হয়েছে। দেখা হলে বলব!"

"আপনি অন্য কিছু ভাবছেন নাকি?" তারাপদ বলল।

"হ্যাঁ। ভাবছি, কৃষ্ণকান্ত আর নবকুমারের মধ্যিখানে অন্য কেউ ছিল কিনা? থার্ড পারসন।"

"থার্ড পারসন? তৃতীয় কেউ?"

কিকিরা কোনও জবাব দিলেন না।

॥ ৪ ॥

সাতসকালে লাটু দত্তর ফোন।

কিকিরা চা জলখাবার খাচ্ছিলেন। হাতে তৈরি একটিমাত্র রুটি, সামান্য সবজি সেদ্ধ, একটা কলা। মগের মতন এক বড় কাপে চা, সকালের চায়ে দুধ থাকে না। সাধারণভাবে এটাই তাঁর জলখাবার। মাঝেসাঝে মুখের রুচি পালটান। তবে মুখে যতই বলুন কিকিরা, আহারের ব্যাপারে বরাবরই সংযমী।

ফোন তুললেন কিকিরা। ভেবেছিলেন, সুশীল কিংবা ছকু হবে। সুশীল ভাল মেকআপম্যান, তার হাতে পড়লে মামুলি ফেরিঅলা যে কেমন করে ছানাপট্টির দুলাল হয়ে যায় কে জানে! সুশীল আবার হাল আমলের কায়দায় মুখোশ তৈরি করতে পারে। সুশীলকে একটা খবর দেওয়া ছিল। হয়তো সে ফোন করেছে। আর ছকু হল চোর-ছ্যাঁচড়দের গুরুর মতন। তার নামযশ হাতযশ যথেষ্ট। ছকু কিকিরার বাধ্য চেলা। তাকেও একটা চিরকুট পাঠিয়েছিলেন কিকিরা। যেটা আজকাল বাগবাজারে আস্তানা গেড়েছে। দোকান দিয়েছে লন্ড্রির। বান্ধব লন্ড্রি। নিজেও খবরটা জানিয়ে রেখেছিল কিকিরাকে।

ফোন তুলে কিকিরা সাড়া দিতেই লাটু দত্তর গলা পেলেন।

লাটুর গলায় উত্তেজনা, উদ্বেগ।

"কী হল? সাতসকালে..."

"রায়দা, সর্বনাশ হয়েছে। কুমার পালিয়ে গিয়েছে।"

"সে কী!" কিকিরা চমকে উঠলেন।

"একটু আগে আমি খবর পেলাম। ওকে যেখানে যার হেফাজতে রেখে এসেছিলাম—সেই প্রফুল্ল হাজরা আমায় ফোন করে জানাল, আজ সকাল থেকে

তাকে দেখা যাচ্ছে না। ঘরের দরজা ভেজানো ছিল। ভেতরে কেউ নেই।”

কিকিরা বললেন, “তুমি কি বাড়ি থেকে ফোন করছ?”

“হ্যাঁ।”

“হাজরা তোমায় কোত্থেকে ফোন করল? ওই মাঠকোঠা বাড়িতে কি ফোন আছে?”

“না। হাজরা তার কাঠগোলা থেকে ফোন করেছে। আমি তাকে বলে রেখেছিলাম কুমারের ওপর নজর রাখতে। সে গোলায় এসে সকাল বিকেল কুমারের সঙ্গে দেখা করে যেত। আজ সকালে এসে মাঠকোঠায় গিয়ে দেখে কুমার নেই। দরজা ভেজানো।...ভেতরে গিয়ে দেখল, কুমার নেই।”

কিকিরা বললেন, “আশেপাশে কোথাও যায়নি তো?”

“কোথায় যাবে! তাকে বারণ করা আছে বাইরে ঘোরাঘুরি করতে। তা ছাড়া এখন বেলাও হয়েছে। আটটা বেজে গেল।”

কিকিরা ভাবছিলেন। তারাপদকে বলা ছিল তার বোর্ডিংয়ে একটা ব্যবস্থা করে কুমারকে নিয়ে গিয়ে রাখতে। তারাপদ ব্যবস্থাও করে ফেলেছিল। আজ কিংবা কাল তাকে নিয়ে যেত। এরই মধ্যে নবকুমার উধাও!

“ওর ঘরে—,” কিকিরা বললেন, “জিনিসপত্র? মানে ওর জামাপ্যান্ট এটা-ওটা—যা ও ব্যবহার করত—সেসব আছে?”

“অত কিছু প্রফুল্ল দেখেনি। শুধু বলল, একটা বড় কিট ব্যাগ ছিল ঘরে, আগে সে দেখেছে। আজ ব্যাগটা দেখতে পেল না।”

কিকিরা কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললেন, “লাটু, আমার মনে হচ্ছে নবকুমার নিজেই পালিয়েছে। তাকে কেউ ধরে নিয়ে গেলে কিট ব্যাগ ঘরেই পড়ে থাকত। তা যখন নেই, ধরে নেওয়া যেতে পারে সে নিজেই পালিয়ে গিয়েছে। ব্যাগে নিশ্চয় ওর জামাপ্যান্ট টুকিটাকি ছিল।”

লাটু বলল, “কোথায় যাবে? কেনই বা হঠাৎ...!”

“হয় ভয় পেয়েছে, না হয় ওখানে থাকতে আর ভরসা হয়নি।”

লাটু চুপ করে থাকল। ফোনের মধ্যেই ওর বিহ্বলতা ধরা পড়ছিল। বলল, “এখন কী করি বলুন তো?”

“কী করবে!...তোমার করার কিছু দেখছি না। দুটো কাজ করতে পারো! ওর সেই দেশগ্রামের বন্ধু—যে নাগেরবাজারে থাকে, সেখানে একবার খোঁজ করতে পারো! আর ওর দোকানে একবার দেখতে পারো—যদি কোনও খোঁজ পাও!”

অল্প সময় চুপ করে থেকে লাটু বলল, “নাগেরবাজারের বাড়ি আমি চিনি না। দোকানে বরং একবার খোঁজ নিতে পারি।”

কিকিরা ভাবছিলেন। বললেন, “শোনো, আজ বিকেলে—মানে ছ'টা নাগাদ তুমি তৈরি থেকো। খালপাড়ের কাঠগোলায় যাব আমরা। খোঁজখবর করে দেখি কী জানা যায়!”

"আমি আপনাকে তুলে নেব?"

"না। তুমি দোকানেই থেকো। আমি যাব। মেজোবাবুর সঙ্গে ওই ফাঁকে দেখাও হয়ে যাবে।"

"রায়দা, প্লিজ..., মেজদাকে কিছু বলবেন না। আমি বাইরের উটকো ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছি শুনলে খেপে যাবে।"

কিকিরা হাসলেন। "আরে না, বলব না।...তোমার গাড়ি রেডি রেখো। দরকার হবে।"

"দোকানের কাছেই থাকবে।"

"ঠিক আছে।" কিকিরা ফোন ছেড়ে দিলেন।

চা খেতে খেতে ঠিক করে নিলেন, তারাপদকে অফিসে ফোন করবেন। আসতে বলবেন তাকে। চন্দনকে পাওয়া যাবে না। নবকুমার সত্যিই সমস্যায় ফেলে দিয়েছে। বারবার সে পালিয়ে যাচ্ছে কেন? গোড়ায় সে না হয় ভয় পেয়ে ভুল করেছে। কিন্তু এবার তার কী হল? কেন পালিয়ে গেল? লাটুকেই বা একটা খবর দিল না কেন? আশ্চর্য!

লাটু দত্তরা বনেদি বংশ। ধনী পরিবার বললে ভুল বলা হয় না। তাদের বাড়ি ওর ঠাকুরদার আমলে। পুরনো ধাঁচের। পরে রদবদল হয়েছে খানিক, প্রয়োজনে, তবু চেহারাটা সাবেকি ধরনের।

লাটুর নিজের একটা গাড়িও আছে। দাদারা আর পরিবারের অন্যরা বড় গাড়িটাই ব্যবহার করেন। লাটুর গাড়ি ছোট, পুরনো মডেলের, তবে তার শখের গাড়ি বলে কলকব্জাগুলো অতিরিক্ত নজর পায়। লাটুবাবু নিজেই গাড়ি চালায়, মামুলি খুঁতও সে রাখে না গাড়ির। তবু ওটা যন্ত্র তো! মাঝেসাঝে লাটুকে যে ভোগাবে তা বলাই বাহুল্য।

আলো না থাকার মতন। সন্ধে হয়ে আসছে প্রায়। কিকিরারা খালধারের মাঠকোঠায় এসে হাজির। তারাপদও এসেছে সঙ্গে।

মাঠকোঠার নীচের তলায় তিন চারজন মিস্ত্রি থাকে। তাদের দু'জন প্রফুল্লর কাঠগোলায় কাঠ চেরাইয়ের কাজ করে। অন্য দুই মিস্ত্রি সামান্য তফাতে কাঠের দোকানে জানলা দরজার ফ্রেম পাল্লা তৈরির কাজ করে। অবশ্য বাইরের মজুরও আসে দোকানে। মিস্ত্রিদের খাওয়াদাওয়া রান্না নীচেই। নিজেরাই করে।

প্রফুল্ল এ সময় কাঠগোলার গদিতে থাকে না। তার অন্য কাজও থাকে বাইরে। বিশেষ করে আজ মাস দুই বুড়ো বাবা আর ডাক্তার বদ্যি নিয়ে বড় ব্যস্ত।

কিকিরারা মিস্ত্রিদেরই ধরলেন।

তারা বলল, গতকাল সকালে এখানে পুলিশের গাড়ি ঘোরাঘুরি করেছে অনেকক্ষণ। থানার বড়বাবু মেজোবাবুরা সর্বত্র ঢুঁ মেরেছেন।

কেন?

কাল মাঝ বা শেষরাত্রে খালধারে একটা 'ডেডবডি' পাওয়া গিয়েছে। জোয়ান বয়েস। গুলি খেয়ে মরেছে। হাতে কাঁধে চপারের ক্ষত।

লোকটা কে, কেউ জানে না। ঠিক এই এলাকারও নয়, নয়তো মুখ চেনা হত। মনে হয় অন্য কোথাও তাকে মেরে এখানে ধড়টা ফেলে গিয়েছে।

কিকিরারা অন্য দু'-একটা জায়গাতে খোঁজ করলেন। একই কথা সকলের।

"লাটু, তোমার বন্ধু প্রফুল্ল তো খবরটা বলেনি তোমায়?" কিকিরা বললেন।

লাটু বলল, "কী জানি! ও যখন ফোন করেছে তখন হয়তো খবরটা চাউর হয়নি।"

"নবকুমার কি পুলিশের গাড়ি আর থানার বাবুদের ঘোরাফেরা দেখে ভয়ে পালাল?"

মাঠকোঠা থেকে শ'খানেক গজের তফাতে একটা চায়ের দোকান। মেঠো দোকান, মাথায় টিনের চালা, রাস্তার গা ঘেঁষে বেঞ্চি। তোলা উনুন জ্বলে, জল ফোটে হাঁড়িতে। মাটির খুরি কিংবা ছোট ছোট কাচের গ্লাসে চা। কাচের বয়ামে দিশি বিস্কুট। চাঅলা বিহারি।

অন্যদের চেয়ে তার দেওয়া খবরটাই বিস্তারিত। সে বলল, সকালে সবেই যখন উনুন ধরিয়েছে চাঅলা, মাঠকোঠার বাবু তার দোকানে চা খেতে এসেছিল। ক'দিনই আসছে। এমন সময় হঠাৎ একটা পুলিশ জিপ খালপাড়ের রাস্তায় ঢুকে পড়ে। তখন অন্য কোনও দোকান খোলেনি এধারের। আটটা ন'টার আগে খোলেও না। টায়ার সারাইয়ের দোকানটাও নয়।...পুলিশের জিপ একবার চর দিয়ে চলে গেল। কখনও কখনও পুলিশের জিপ আসে এপাশে। নতুন কিছু নয়। কিন্তু এবারের ব্যাপারটা অন্যরকম, তখন কেউ বোঝেনি, জানতও না! বেলা বাড়ার পর দেখা গেল পুলিশের বড় গাড়ি, পুলিশ একদল। তারপরই শোনা গেল লাশ পড়ে থাকার কথা।

লাটু বলল, "তুমি বাবুকে যেতে দেখছ?"

দোকানি বলল, "জরুর। বাবু থোড়া বাদ ইধার সে কাঁহা..."

"বাবুর সঙ্গে ছিল কিছু?"

"ব্যাগ...।"

কিকিরা লাটুকে বললেন, "চলো। বুঝতে পেরেছি। পুলিশের জিপ দেখেই ও ভয়ে পালিয়েছে। এখানে কী ঘটেছে সে জানে না।"

গাড়ির কাছে ফিরে এসে লাটু বলল, "এখন কী করা যায় রায়দা?"

"কী করবে আর! ওয়েট করো। আমার মনে হয়, নবকুমার যেখানেই যাক— তোমায় একটা খবর দেবে। আজই হোক বা কাল..."

লাটু আকাশের দিকে তাকাল। সন্ধে হয়ে গিয়েছে। তারা ফুটেছে আকাশে। খালের দিক থেকে হাওয়া আসছিল। ঝোপঝাড় আর পাঁক ময়লার গন্ধ-মেশানো হাওয়া।

“এখন তাহলে ফিরতে হয়!” তারাপদ বলল।

কিকিরা তারাপদর দিকে তাকালেন না। লাটুকে বললেন, “চলো তো একবার বি. কে. পাল ঘুরে আসি।”

“বি. কে. পাল অ্যাভিনিউ? মানে—”

“কৃষ্ণকান্তর বাড়ির দিকটায় চলো একবার। আমি পাড়াটা দেখে গিয়েছি। চলো।”

ওরা গাড়িতে উঠল।

তারাপদ বলল, “আপনি কৃষ্ণকান্তর বাড়ি যাবেন নাকি?” হালকাভাবেই বলল। সে জানে কৃষ্ণকান্তর বাড়ি যাওয়ার কথাই ওঠে না এখন।

কিকিরা বললেন, “যাব। যেতেই হবে। তবে আজ নয়। দু’-তিন দিন পরে। আজ ও-পাড়ায় একটু ঘুরব। তোমরা গাড়িতে থাকবে। একটু আড়ালে গাড়ি রেখো। নজর করবে কৃষ্ণকান্তর বাড়িতে কেউ যাচ্ছে, না, বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসছে?”

“তাতে লাভ?”

“লাভ-লোকসান পরে দেখা যাবে।”

গাড়ি চলতে শুরু করেছিল।

লাটু বলল, “রায়দা, আমি ধোঁকা খেয়ে যাচ্ছি। এর পর কী হবে কে জানে!”

কিকিরা বললেন, “আমার মাথাতেও আসছে না, নবকুমার বার বার কেন পালিয়ে যাচ্ছে? ছেলেটার এত ভয় কেন?”

“কী জানি! তবে খুনখারাপির ব্যাপার, ওর বয়েস কম, বোধহয় ঘাবড়ে যাচ্ছে।”

“হতে পারে। তবে অকারণ ভয় ছোকরার ভাল করছে না। এভাবে চললে ও নিজেই না একটা কাণ্ড বাঁধিয়ে বসে।” বলে সামান্য চুপচাপ থাকলেন কিকিরা। পরে বললেন, “লাটু, তুমি কি জানো, ওকে যিনি পালন করেছিলেন বা পোষ্য নিয়েছিলেন, সেই ভদ্রলোক রজনীকান্ত কোনও উইলটুইল করে রেখে গিয়েছিলেন কিনা?”

মাথা নাড়ল লাটু। গাড়িটা দাঁড়িয়ে গিয়েছে। ট্রাফিক পুলিশ অন্য পথের গাড়ি পার করাচ্ছিল।

ট্রাফিক পুলিশের হাত নামল। লাটু এগিয়ে গেল সোজা পথেই।

কিকিরা নিজের মনেই যেন বললেন, “এদিকে আমার ঘোরাফেরা কম। ভাল করে রাস্তাঘাটও চিনি না। দু’-একজন আলাপী লোক থাকলে সুবিধে হত।”

“কেন। ধন্বন্তরি কবিরাজ মশাইয়ের সঙ্গে আপনার আলাপ...”

“আরও একটু জমাতে পারলে ভাল হত। দেখি—।”

কৃষ্ণকান্তর বাড়ির উলটো দিকের ফুটপাথে গাড়ি দাঁড় করাল লাটু। কিকিরাই

চিনিয়ে দিলেন বাড়ি। "তোমরা বোসো, আমি আসছি"—গাড়ি থেকে নেমে গেলেন তিনি। "বাড়ির দিকে নজর রেখো।"

গাড়িটা ভাল জায়গাতেই দাঁড়িয়েছে। একফালি তেকোনা ছোট পার্ক। বাচ্চারা খেলা করে বোধহয়, পার্কে দোলনা, স্লিপ, ছোট সিঁড়ি। ধুলোয় ভরা মাঠ। ফুটপাথের কোল ঘেঁষে একটা আধ শুকনো কৃষ্ণচূড়া। শীতে পাতা ঝরে যাওয়ার পর সবে নতুন পাতা আসছে ডালে।

তারাপদরা সিগারেট ধরাল।

লাটু বলল, "কী হবে বলুন তো! কুমার আমায় এমন একটা অবস্থায় ফেলবে, ভাবিনি। একেবারে গাধা।"

তারাপদ হেসে বলল, "আমার মনে হয়, বয়েস কম বলে শুধু নয়, ও বোধহয় খানিকটা বেশি অস্থির।"

"আমি অনেকবার বলেছি, তুই তোর জেঠার সঙ্গে ঝগড়াঝাটি ছেড়ে দে। তোর হাতে কী আছে যা নিয়ে ফাইট করবি! কোর্টে একবার হেরেছিস। আর কেন! তার চেয়ে নিজের দোকান নিয়ে থাক। তোর তো দিব্যি চলে যাচ্ছে। ...আমার কথা শুনবে না। জেদ। জেঠা তাকে ফাঁকি দিচ্ছে।"

"দেখুন লাটুবাবু, আইন আমি জানি না। কিকিরাও তেমন জানেন না। তবে উনি খোঁজখবর করে যা শুনেছেন তাতে মনে হয়, আইনসঙ্গত ভাবে দত্তক না নিলে আজকাল তার কোনও দাবি থাকে না। সম্পত্তির কথা বলছি। আগে অনেক সময় সামাজিক আচরণ করে কাউকে দত্তক নিলে আদালত তবু সেটা বিবেচনা করত। এখন করতে চায় না। ...তার ওপর কোন পক্ষ কীভাবে মামলা লড়ছে, কার কত জোর, জজসাহেবের মরজি—"

"মুশকিল তো সেখানেই," লাটু বলল, "ছেলেবেলার কথা কুমারের মনে নেই। তার মা, মানে রজনীকান্তর স্ত্রী, যাকে কুমার মা-মাসি বলত, তিনিও বেঁচে নেই যে, পুরনো ব্যাপারটা জানা যাবে। তবে এখানেও একটা ফাঁক আছে। কুমার পুরোপুরি পালিত ছেলে হলে তার মা-মাসি তো বলেই দিতেন, তুমি আমাদের সম্পত্তির কিছুই পাবে না। তোমার কোনও অধিকার নেই।"

"বলেননি বোধহয়?"

"শুনিনি। কুমার বলেনি।"

ওরা নিজেদের মধ্যে কথা বলছিল। নজরও রাখছিল কৃষ্ণকান্তর বাড়ির দিকে। দু'-একজন ঢুকে যাচ্ছে বাড়িতে, কেউ বা বেরিয়ে আসছে। হঠাৎ একটা ট্যাক্সি এসে থামল। ভাড়া মিটিয়ে কে একজন ঢুকে গেল ভেতরে। ছোকরা বয়েস, পরনে প্যান্ট শার্ট, হাতে ব্যাগ। গটগটিয়ে ঢুকে গেল ছোকরা। আধঘণ্টার মতন হবে, কিকিরা ঘোরাফেরা সেরে ফিরে এলেন।

"চলো।"

"গিয়েছিলেন কোথায়?"

"বাড়িটার পেছনের দিকে। একটা সরু গলি আছে। পাঁচমেশালি গলি। গলির শেষে ছোট বাড়ি। বাড়িটার পেছন দিকের কম্পাউন্ড ওয়ালের পাঁচিল বেশি উঁচু নয়। গাছপালা রয়েছে দু'-একটা। পাঁচিল-লাগোয়া একপাশে একটা টিনের চালা। গলির ওপর ঝুঁকে পড়েছে।"

"গলির লোকজন?"

"বাড়ি রয়েছে রামশ্যামের, মুদিখানার ছোট দোকান, তামাক পাতার আড়ত, কামারের দোকান..."

"কথাবার্তা বললেন কারও সঙ্গে?"

" না। শুধু দেখে এলাম।"

"তাহলে?"

"এখন কিছু বলতে পারছি না।" বলে হঠাৎ হাত বাড়িয়ে সিগারেট চাইলেন তারাপদর কাছে। "ছকু বেটা যে কী করছে কে জানে!"

"ছকু কে?" লাটু বলল।

"ছকু একজন পাক্কা আর্টিস্ট। নর্থ ক্যালকাটার পিক পকেট অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট!" কিকিরা গম্ভীরভাবে বললেন।

লাটু অবাক হয়ে বলল, "পকেটমার।"

"আগে মারত। তা বলে ছিঁচকে ছিল না। ওর বাজারে নাম ছিল ছা। মারলে ওভার বাউন্ডারি। ছকু এখন গুরু। ভেরি গিফটেড পারসন। হাত সাফাইয়ের কতরকম কায়দা বার করেছে।"

"বাঃ! শেষ পর্যন্ত পকেটমার!" তারাপদ বলল, "কলকাতা শহরের আর কত দাগি আসামিকে আপনি চেনেন, সার!"

"তা ওরকম চেনাচিনি আমাকে রাখতে হয়, তারাবাবু। ওরা আমার গুমটি। দরকারে কাজে লাগে। ...তবে ছকু বেশি জেলেটেলে যায়নি। জেলটা ওর পছন্দ নয়। তাই হাতে-কলমে নিজে কিছু করে না, এখন তো ট্রেনিংয়ের লাইনে আছে। ট্রেনার। বা অ্যাডভাইসার।"

লাটু হেসে ফেলল। ভাবল, রায়দা তামাশা করছেন।

তারাপদ বলল, "ছকু আপনার কোন কাজে আসবে, সার?"

"দেখি কী কাজে আসে! ...ছকুর আর একটা কোয়ালিফিকেশন কী জানো?"

"কী?"

"চালাক বেড়ালের মতন সে সব জায়গায় ঢুকে পড়তে পারে। তাকে আটকানো মুশকিল।"

" ও! আপনি তাহলে ছকুকে কৃষ্ণকান্তর বাড়িতে ঢুকিয়ে দিতে চান?"

"পারলে ভাল।" বলে কিকিরা লাটুর দিকে মুখ বাড়ালেন। "শোনো লাটু, আমার ধারণা নবকুমার তোমাকে নিশ্চয় কোনও খবর দেবে। দিলে, তুমি তাকে বলবে, ও যেন পালিয়ে গিয়ে বসে না থাকে। তাতে লাভ হবে না, উলটে ক্ষতি

হবে। ওকে ফিরে আসতে বলবে। আরও বলবে, কাঠগোলার মাঠকোঠার বাড়িতে থাকতে না চায় না থাকুক। তারাপদর বোর্ডিংয়ে থাকবে। ব্যবস্থা হয়েছে। ভয়ের কারণ নেই।”

“বলব। আগে খবর পাই।”

“পাবে। ...একটা ব্যাপার কী জানো? কৃষ্ণকান্তর সামনাসামনি আমাদের হতেই হবে। ভদ্রলোকের তরফ থেকেও চালে বড় ভুল হয়েছে। না হলে এতদিন থানা পুলিশ ডায়েরি না করে বসে থাকতেন না।”

॥ ৫ ॥

পরের দিন সকালে আবার ফোন এল। লাটুর ফোন।

“রায়দা, কাল বাড়ি ফিরে এসে কুমারের ফোন পেলাম। ও বার দুয়েক চেষ্টা করেছিল সন্ধেবেলায়। আমায় পায়নি। আমি তো তখন আপনাদের সঙ্গে...।”

“কোথায় আছে ও?”

“রামরাজাতলায়। এক চেনা লোকের বাড়ি।”

“পালিয়ে গিয়েছিল কেন?”

“আপনি যা ভাবছিলেন ঠিক তাই। সকালে পুলিশের জিপ দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছিল।”

“তুমি ব্যাপারটা পরিষ্কার করে দিয়েছ তো?”

“হ্যাঁ। ...বলেছি, তুই আজই চলে আয়। তোকে মাঠকোঠায় থাকতে হবে না। তারাপদবাবুর সঙ্গে বোর্ডিংয়ে থাকবি। ব্যবস্থা হয়েছে। চলে আসবি আজ। ভয়ের কিছু নেই। ...আপনার ফোন নাম্বারও দিয়ে দিয়েছি। দরকারে ফোন করবে।”

“বেশ করেছ। এখনকার মতন ছাড়ছি। পরে তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করব।” কিকিরা ফোন রেখে দিলেন।

আজ কেমন একটা চাপা গুমোট সকাল থেকেই। রোদ দেখলে মনে হয় লাল লাল চোখ করে সব দেখছে। অনবরত গা মুখ ঘামে ভিজে যাচ্ছিল।

কিকিরা আর পারলেন না। স্নানটা সেরে নিলেন।

আরাম লাগছিল। বেলা প্রায় দশটা।

এমন সময় ছকু এসে হাজির।

“আরে ছকুবাবু যে, এসো, এসো। তুমি একেবারে ডুমুরের ফুল হয়ে উঠলে যে!” তামাশা করে বললেন কিকিরা।

ছকু পিঠ নুইয়ে অতি বিনয়ের সঙ্গে দু'হাত বাড়িয়ে পা ছুঁয়ে প্রণাম করল কিকিরাকে। “আজ্ঞে, খবর পেতে দেরি হল।”

“বোসো।”

ছকু চেয়ারে সোফায় বসবে না। কিকিরার সামনে সে উঁচু আসনে বসে না।

অনেক বলেছেন কিকিরা, ছকু মাথা নাড়ে, কান ধরে, "আরে ছি ছি, তাই কি হয়, গুরুজির সামনে চেয়ারে বসা!"

ছকুকে দেখতে রোগা। গায়ের রং তামাটে ফরসা। নিরীহ মুখ। চোখ দুটি সামান্য ধূসর। একটু টেরা। মুখে দু'-চারটি বসন্তের দাগ। মাথার চুল ছোট ছোট। বাঁ পাশে টেরি কাটে। ওর পরনে পাজামা। গায়ে হাফহাতা শার্ট।

ছকুর পুরো নাম ছবিলাল। ওটা কেউ জানে না। দেওঘর থেকে বাপের সঙ্গে চলে এসেছিল কলকাতায়। মা ছিল না। অনেক ঘাটের জল খেয়েছে। নিজে তো বিশ বাইশ বছর পর্যন্ত বাস কন্ডাক্টরের কাজ করেছিল। তারপর মালিক আর ড্রাইভারদের সঙ্গে টাকাপয়সার ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে গোলমাল, ঝগড়া। খেপে গিয়ে সে পকেটমারের দলে ভিড়ে গেল। তবে পেশাটা তার ইজ্জতে লাগছিল। ফলে নিজে আর লাইনে থাকল না সরাসরি, অন্যদের হাত সাফাই, চালাকি এইসব শেখাতে লাগল। এখন তার বয়েস অন্তত চল্লিশ। লন্ড্রির দোকান দিয়েছে একটা বাগবাজারের দিকে। মন্দ চলে না। সেইসঙ্গে পকেটমারদের মাস্টারি করে। মাস্টারি মানে নিজেদের গল্প শোনায়।

ছকু অত্যন্ত চালাক। বুদ্ধি প্রখর। ওর হাতসাফাইয়ের আশ্চর্য কায়দাকানুন দেখে কিকিরা ওকে দু'-চারজন জুনিয়ার ম্যাজিশিয়ান ছেলের (যারা বারো আনা অ্যামেচার) তাদের দলে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। অ্যাসিস্ট করত। ছকু শেষ পর্যন্ত আর তাদের সঙ্গে থাকেনি। ছকুর কোনও বদ নেশা নেই। তবে পান বিড়ি খায়।

কিকিরার সামনে মাটিতে বসে পড়ল ছকু।

কিকিরা বললেন, "তোমাকে নিয়ে আর পারলাম না। না হয় ভেতর থেকে একটা টুল বা মোড়া নিয়ে এসে বোসো।"

"এই ঠিক আছে।"

"তাহলে আর কী বলব! ...যাক, কেমন আছ?"

"আছি! আমার দুখ নেই, গুরুজি। বালবাচ্চা ভাল আছে।" ছকু কিকিরাকে গুরুজি বলে। খুব দুঃখের দিনে গুরুজি একবার তাকে প্রাণে বাঁচিয়েছিলেন।

কিকিরা এবার কাজের কথা পাড়লেন।

খুঁটিনাটি সব কথা বলার দরকার ছিল না, সংক্ষেপে যা জানানোর ছিল—জানিয়ে কিকিরা বললেন, কৃষ্ণকান্তর কলকাতার আস্তানা বি. কে. পাল অ্যাভিনিউয়ের অত নম্বর বাড়ি। সেই বাড়িতে ঢুকতে হবে।

ছকু বলল, "এ আর এমন কী শক্ত কাজ গুরুজি! সদরের কোলাপসিবল গেট, দরজার তালা, গ্রিল, কী ভাঙতে হবে বলুন! ভেঙে দিচ্ছি।"

ছকুর হাতযশ জানা আছে কিকিরার। বললেন, "না; তালা ভেঙে ঢোকার দরকার নেই। তাতে লাভ হবে না। সরাসরি ঢুকতে চাই।"

মাথা চুলকে ছকু বলল, "সিধে যাবেন! কীভাবে!"

"তুমি বলো?"

খানিকক্ষণ ভাবল ছকু। বলল, "গুরুজি, আমি বাড়িটা আগে নজর করে নিই। যদি বলেন, টাইমে হল্লা লাগিয়ে দেব। আপনি ঢুকে যাবেন।"

কিকিরা হাসলেন। "না, হল্লা লাগিয়ে কাজ হাসিল হবে না!"

"তো ক্যায়সা হবে?"

কিকিরা বললেন, "আমি একটা মতলব ভাবছি। তুমি আমার সঙ্গে থাকবে। কৃষ্ণকান্তবাবুর সঙ্গে আমি যখন কথা বলব, তুমি সরে গিয়ে ভেতরে ঢুকে যাবে। দেখবে কোথায় কোন ঘর, কে কে আছে, বাড়ির পেছন দিক দিয়ে কীভাবে ঢোকা যায়। ও-বাড়িতে দু'-তিনজন কর্মচারী আছে বাবুর। তাদের তুমি সামলাবে। দরকার হলে তোমার হাতসাফাই দেখাবে।"

"ওসব ঠিক আছে; মাগর আপনি যাবেন কেমন করে?"

"মহারাজ হয়ে। শ্যামদাস মহারাজ।"

ছকু অবাক! "সাধুজি মহারাজ হয়ে?"

কিকিরা হাসলেন। "কৃষ্ণকান্ত ধর্মকর্ম করেন। কালীভক্ত। সাধুসন্তকে তাড়িয়ে দেবেন না মনে হয়।"

ছকুর বিশ্বাস হচ্ছিল না। পছন্দও করছিল না ব্যাপারটা।

কিকিরা তাকে বোঝাতে লাগলেন তাঁর মতলবটা।

অনেক ভেবে কিকিরা ঠিক করেছেন, বেশি ঝঞ্ঝাট ঝামেলায় না গিয়ে সহজভাবে এই কাজটা করা যেতে পারে। তিনি সাজবেন নকল মহারাজ, সঙ্গে থাকবে চেলা ছকু। ছকুকে জটা দাড়ি গোঁফ কিছুই লাগাতে হবে না। যেমন আছে তেমন থাকলেই চলবে, শুধু একটা গেরুয়া জামা গায়ে চাপালেই যথেষ্ট। কিকিরাকে অবশ্য সামান্য ভোল পালটাতে হবে। মাথায় জটার দরকার নেই, তবে বাবরি ধাঁচের পরচুলা পরতে হবে। সাধুসন্ন্যাসীর কানঢাকা টুপির বদলে— তাঁকে গেরুয়া পাগড়িও বাঁধতে হবে না। মাথার নকল চুল সামলাবার জন্যে একটা গেরুয়া পট্টি টুপিই যথেষ্ট। গালে মুখে সামান্য দাড়ি গোঁফ লাগানো দরকার। চোখে চশমা। গোল চশমা হলেই ভাল। পরনে বাসন্তী-গেরুয়া আলখাল্লা। কাছাকোঁচাহীন বস্ত্র। জব্বর এক রুদ্রাক্ষের মালা ঝোলাবেন গলায়।

মহারাজ যাবেন কালীভক্ত কৃষ্ণকান্তর সঙ্গে দেখা করতে।

কেন? সহজ কারণ। কিছু আর্থিক সাহায্য ভিক্ষা করতে। মাতৃমন্দিরের জন্যে।

কদমকানন মাতৃমন্দিরটির পরিবেশ চমৎকার। নির্জন। কোথাও উপদ্রব নেই। ভক্তজন যায়-আসে। তবে আর্থিক অনটন থাকায় অনেক কাজকর্ম করা যাচ্ছে না। আশ্রমের আর মন্দিরের সাধুজিরা তাই মাঝে মাঝে অর্থসংগ্রহে বেরিয়ে পড়েন।

ছকু বলল, "গুরুজি, চাঁদার রসিদ বই হাতে হরেক রকম বাবাজিদের বাড়ি বাড়ি ঘুরতে দেখেছি। এটা কি সেইরকম?"

কিকিরা বললেন, "চাঁদার রসিদ বই কে নিচ্ছে হে! ওসব মঠঅলাদের মানায়। আমি যাব ভদ্রলোককে দেখতে আর বাজাতে। দেখি না কী বলেন?"

"তা মন্দির আখড়ার জায়গাটা কোথায় গুরুজি?"

কিকিরা মুচকি হাসলেন, বললেন, "তুমি বুঝবে না। ক্যানিং লাইনে। ...আরে, ওই মন্দির কি আজকের? কোনকালের পুরনো। ভাঙা পাথরের ঢিবি হয়ে পড়ে ছিল জায়গাটা। পরে কে যেন দেখল, পাথরের আড়ালে এক-দু' হাতের ভাঙাচোরা কালীমূর্তি পড়ে আছে। তখন আবার—"

ছকু বুদ্ধিমান। হেসে বলল, "ক্যানিং নয়, বনগাঁ লাইনে করে দিন। লাইনের নামে বাবু যেতে চাইবেন না।"

জোরে হেসে উঠলেন কিকিরা। বাহবা জানালেন ছকুকে।

বগলা চা দিয়ে গেল।

চা খেতে খেতে কিকিরা ছকুকে সব বুঝিয়ে দিলেন। অর্থাৎ তিনি কৃষ্ণকান্তকে নিয়ে ব্যস্ত থাকবেন যখন, কথার বহর ছোটাবেন, ভদ্রলোককে দু'-চারটে ভেলকিবাজি দেখাতেও পারেন,—তখন ছকুর কাজ হবে ঘরের বাইরে চলে যাওয়া। তার নজর থাকবে ভেতর মহলে। দোতলায় সে উঠতে পারবে না, কিন্তু নীচের তলার ঘরদোর জানলা, আসা-যাওয়ার পথ, কে কোথায় ঘোরাফেরা করছে ভাল করে লক্ষ করা। পারলে এক-আধজনের সঙ্গে গল্প জমানো।

ছকু বলল, "বুঝে গেলাম। কব্ যাবেন?"

কিকিরা বললেন, "পরশু। দেরি করলে কৃষ্ণকান্তবাবু যদি দেশে ফিরে যান—ধরতে পারব না। তবে মনে হয় না যাবেন।"

ছকু উঠে পড়ল।

কিকিরা বললেন, "তুমি কাল আমাকে একটা ফোন করে জেনে নিয়ো। ...ভাল কথা, আমরা কিন্তু সকাল দুপুরে যাব না। শেষ বিকেলে যাব। সন্ধে হব-হব সময়ে। বেশি আলো ভাল নয়, ছকু। ধরা পড়তে রাজি নই।"

ছকু চলে গেল।

কাজটা সহজ হবে কিনা তিনি জানেন না। কৃষ্ণকান্তকে ধোঁকা দেওয়া কঠিন। ঠিকমতন চাল না চাললে ধরা পড়ে যেতে পারেন। আর ধরা পড়লে বিসদৃশ ব্যাপার হবে। তখন হয় পালাতে হবে, না হয়—!

চন্দন বলছিল, "সার, আপনি বড় বেশি রিস্ক নিচ্ছেন। আমার মনে হয় ব্যাপারটা অন্যভাবে সেটেল হলে ভাল হত। কলকাতায় আজকাল প্রাইভেট এজেন্সি, বুরো হয়েছে। তারা প্রফেশনাল। ইনভেস্টিগেশন করাই কাজ তাদের। নবকুমার ওদের সাহায্য নিলে পারত।"

কিকিরা বলেছেন, "তুমি পাগল। যে-ছেলে ভয়ে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে সে যাবে ওইসব জায়গায়! বরং দেখাই যাক আমরা কী করতে পারি। না পারলে হাত গুটিয়ে নেব। তখন অন্য ভাবনা ভাবা যাবে। নট নাউ।"

কৃষ্ণকান্ত তখনও আসেননি।

কিকিরা কাঠের চেয়ারে বসে ঘরটি দেখছিলেন। ছকু একপাশে দাঁড়িয়ে আছে। বসেনি।

নীচের তলায় ভেতর দিকের এই ঘরটি কৃষ্ণকান্তর বসার ঘর। মাঝারি মাপের ঘরের চেয়ে সামান্য বড়। দুটি দরজা, বাইরে থেকে আসার একটি, আর অন্যটি ভেতর দিকে যাওয়ার। প্রথমটি উত্তর দিকে। দ্বিতীয়টি ঘরের বাঁদিকে, পুবে। জানলা তিনটি। দক্ষিণের দিকে দুটি, পেছনে—পুব দিকে একটি। আসবাবপত্র বেশি নেই। জানলা ঘেঁষে পুরনো আমলের এক বিরাট আর্মচেয়ার, সামনে পাথর বসানো গোল টেবিল। ঘরের অন্য পাশে তিন-চারটি কাঠের চেয়ার। এক কোণে দেরাজ একটিমাত্র। দেওয়ালে তিন-চারটি বাঁধানো ছবি। কালীর পট, দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুরবাড়ির রঙিন ফোটো, হাতে আঁকা কোনও পাহাড়ি এলাকার পথ আর অদ্ভুত এক অবধূত সন্ন্যাসীর ছবি—তেলরঙে আঁকার মতন দেখায়। উত্তরের দেওয়ালে বড় দেওয়াল ঘড়ি।

সন্ধে হয়ে আসছিল। ঘরে একটা বাতি জ্বলছে। টিউব লাইট নয়, শেড পরানো দেওয়াল-বাতি।

কিকিরা নিজেকে সামান্য গুছিয়ে নিলেন যেন। শ্যামাদাস মহারাজের ছদ্মবেশটি মন্দ হয়নি। বাড়াবাড়ি সাজসজ্জা নেই। মাথার বাবরিচুলও বড় নয়, তবে খানিকটা এলোমেলো। টুপিটা প্রায় গোল। মাথার সঙ্গে চমৎকার এঁটে গিয়েছে। মুখের দাড়ি গোঁফও ছিমছাম, অল্প। চোখের চশমাটি নিকেল ফ্রেমের। গায়ের আলখাল্লা কটকটে গেরুয়া রঙের নয়, বাসন্তী-গেরুয়া। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা।

ছকুর বেশবাস সাধারণ। তবে সে ধুতি পরেছে, গায়ে গেরুয়া খদ্দরের পাঞ্জাবি। মাথায় কিছু নেই।

কৃষ্ণকান্তর পায়ের শব্দ।

ভদ্রলোক ঘরে ঢুকতেই কিকিরা উঠে দাঁড়ালেন।

"কী ব্যাপার? আপনারা?"

কিকিরা অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে নমস্কার জানালেন কৃষ্ণকান্তকে। ছকুও নমস্কার করল।

নিজের পরিচয় দিলেন কিকিরা। শ্যামাদাস মহারাজ। আসলে তিনি সেবক। লোকে বলে মহারাজ। বলে ছকুকে দেখালেন, "আমার সঙ্গী। আশ্রমের দেখাশোনা করে অন্য দু'-একজনের সঙ্গে।"

"কীসের আশ্রম?" কৃষ্ণকান্ত নিজের জায়গায় বসতে বসতে বললেন।

মাতৃমন্দিরের বর্ণনা দিতে দিতে কৃষ্ণকান্তকে দেখে নিচ্ছিলেন কিকিরা। ভদ্রলোক বৃদ্ধ নন, তবে প্রৌঢ়। স্বাস্থ্য মোটামুটি স্বাভাবিক। বয়েসের তুলনায়

সক্ষম বলে মনে হয়। চোখ দুটি তীক্ষ্ণ। গলার স্বর ভারী, গম্ভীর। জমিদারি দাপট রয়েছে যেন।

কৃষ্ণকান্ত পাথরের টেবিলের ওপর পানের বড় ডিবে আর জরদার কৌটো রেখে কিকিরার কথা শুনছিলেন। কতটা খেয়াল করছিলেন বলা মুশকিল। পান মুখে দিলেন। পরে জরদা।

হঠাৎ যেন খেয়াল হল তাঁর। কিকিরাকে হাতের ইশারায় বসতে বললেন।

বসলেন কিকিরা। মাতৃমন্দিরের বিবরণ শোনাচ্ছেন নম্র গলায়। অতীত, বর্তমান ; আশ্রমের কথাও।

কৃষ্ণকান্ত বললেন, "তা আমার কাছে কেন?"

কিকিরা বললেন, "ভিক্ষার আশায়। অনেকের কাছেই যাই। কেউ সাহায্য করেন ; কেউ বা করেন না। আমাদের অন্য কী উপায় আছে বলুন! যাঁরা সহৃদয় হয়ে সাহায্য করেন তাঁদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। যাঁরা বিমুখ করেন, বুঝি তাঁরা এইসব সাধারণ সৎ কাজে দানধ্যান করতে চান না। সংসারে সবরকমেরই মানুষ আছে, কেউ দয়াদাক্ষিণ্য করেন, কেউ করেন না।"

কৃষ্ণকান্ত বললেন, "আপনারা কেমন করে বুঝলেন আমি দ্বিতীয় দলের মানুষ নই?"

কৃষ্ণকান্ত আরও একটু জরদা মুখে দিলেন।

কিকিরা বিনীত হাসি হেসে বললেন, "ভিক্ষাপাত্র যে বাড়ায় সে কি আগে থেকে অনুমান করতে পারে কে ভিক্ষা দেবে, কে দেবে না। ...আপনি তো ভক্ত মানুষ।"

"ভক্ত! কে বলল মহারাজ, আমি ভক্ত! আর ভক্ত হলেই কি দান করতে হয়! আপনি আমাকে চিনলেন কেমন করে, আপনাকে তো আমি চিনি না।"

কিকিরা এমন মুখভঙ্গি করলেন, সলজ্জভাবে যে, মনে হল, তিনি বলতে চাইছেন—এ আপনি কী কথা বললেন, মশাই। মুখে বললেন, "আজ্ঞে, সাধক রামদাস বলেছেন, আরে তুই তো ভেরান্ডা গাছ, তোর কাছে কোন বোকা আশ্রয় নিতে আসবে, লোকে দু'দণ্ড ছায়ায় জিরোবার জন্যে বট, অশ্বত্থ, নিমগাছের তলায় গিয়ে বসে।... আমি সেইরকম নগণ্য ভেরান্ডা ; আর আপনি বট, অশ্বত্থ। আপনাকে চিনতে পারব না।"

কৃষ্ণকান্ত হাসলেন। "বা, কথাবার্তা তো ভালই বলতে শিখেছেন। তবে আমি বট, অশ্বত্থ নই।"

"আপনি কে আমি জানি।" কিকিরা বললেন, "আপনি নুরপুরের বিখ্যাত জমিদার বাড়ির কর্তা। আগে আপনাকে আমি দেখিনি। নামধাম অনেক শুনেছি। ছেলেবেলায় আপনাদের দেশবাড়ি জমিদারির পাঁচ-সাত ক্রোশ দূরে আমার মামার বাড়ি ছিল। তখনই নুরপুরের কত গল্প শুনেছি।"

"ও! আপনি বর্ধমান জেলার লোক?"

"বাঁকুড়া জেলার।...পুরনো কথা আমাদের বলতে নেই। যৌবনে কেমন করে কী কারণে ঘরছাড়া হই, কী খোঁজে বেরিয়েছিলাম তাও জানি না। আজ্ঞে—সেই যে বলে, ঘুরি পথে পথে হইয়া সাধুর শিষ্য—তাই। নানা জায়গায় ঘুরে আমার আসল গুরু লাভ হয়। স্বামী মহেশ্বরানন্দ। তাঁর কাছে ছিলাম অনেকদিন। গুরুজি দেহ রাখার আগে আমায় আদেশ করেছিলেন, নিজের দেশে ফিরে যেতে। দেশে অবশ্য ফেরা হয়নি, তবে তিনি আমায় কদমকাননে টেনে আনেন।"

"কদমকানন?"

"আজ্ঞে, জায়গাটার নাম বড়জালি। তারই একপাশে একটি জঙ্গল ছিল। কদমগাছ হয়তো ছিল অনেক। সেই থেকে কদমকানন। সেখানে প্রাচীন একটি কালীমূর্তি পাওয়া যায়। ভাঙা মন্দির। মূর্তিরও একটি হাত ভাঙা। মায়ের পায়ের তলায় শিব নেই। কিংবদন্তি বলে, এখানে সতীমায়ের বাঁ পায়ের একটি আঙুলের নখকণা ছিটকে এসে পড়েছিল। ...তা সে যাই হোক, ওখানে কেউ একজন কালীমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। প্রাচীন মূর্তি। ওটি প্রায় চাপা পড়ে গিয়েছিল। আমরা চেষ্টাচরিত্র করে মন্দিরটি গড়ে তুলেছি। আশ্রম আছে। পুজোপাঠ ছাড়াও সেবাধর্মের উদ্দেশ্য নিয়ে কাজও কিছু হয়।"

কৃষ্ণকান্ত বললেন, "সবই বুঝলাম। কিন্তু এতকাল পরে হঠাৎ আমায় মনে পড়ল কেন? কার কাছে খবর পেলেন আমি এখন কলকাতায় রয়েছি? ঠিকানা জোগাড় করলেন কেমন ভাবে?"

কিকিরা কোলের ওপর রাখা গেরুয়া রঙের কাঁধ-ঝোলা তুলে নিয়ে কী যেন খুঁজলেন ভেতরে। বইয়ের মাপের একটি ডায়েরি বই বার করে পাতা ওলটাতে ওলটাতে বললেন, "এটি আমার নামধাম এটা-ওটা লিখে রাখার খাতা। যাঁদের কাছে যাই তাঁদের নাম-ঠিকানা আছে। আবার কেউ যদি নতুন কারও কথা বললেন, তাঁর নামধামও টুকে রাখি। আমাদের কাজই হল ছোট-বড় সকলের কাছে যাওয়া। যে যেমন পারেন সাহায্য করেন।...এই যে আপনার নাম-ঠিকানা। এটি পেয়েছি হরিবাবুর কাছে। আপনাদের দেশের লোক।"

কৃষ্ণকান্ত বুঝলেন না, হরিবাবু কোনজন! তবে নামটা এতই প্রচলিত যে, দেশগ্রামে হরিবাবু দু'-একজন থাকতেই পারে।

কৃষ্ণকান্তর দ্বিধা দেখে কিকিরা তাড়াতাড়ি বললেন, "একটা কথা কী জানেন! ঠাকুর বলতেন, রামকৃষ্ণদেব, ওরে বনের মধ্যে ফুল ফুটলেও ভ্রমর তা খুঁজে নেয়। সে যে গন্ধ পায় বাতাসে।... আপনি কাকে জানলেন না জানলেন কিছুই যায়-আসে না। লোকে যে আপনাদের জানে চৌধুরীমশাই।"

কৃষ্ণকান্ত চুপ।

ঘড়ির কাঁটার দিকে আড়চোখে চেয়ে নিলেন কিকিরা। ছকুকে বললেন, "তুমি ঘরের বাইরে গিয়ে অপেক্ষা করো। আমরা দুটো কথা সেরে নিই।"

ছকু চলে গেল। সে জানে তাকে কী করতে হবে। বাড়ির বাইরেও কিকিরা

লোক রেখেছেন। তারাপদ, চন্দন, লাটু দত্ত। বলা তো যায় না কোথাকার জল কোথায় গড়াবে! ঝঞ্ঝাট ঝামেলা হলে বাঁচতে হবে নিজেদের।

কৃষ্ণকান্ত বললেন, "আমি ভেবে দেখব।" গলার স্বরে ক্লান্তি।

কিকিরা সঙ্গে সঙ্গে বললেন, "অবশ্যই ভাববেন। আমি শুধু আপনার কাছে সাহায্য চাইতে এসেছিলাম। আরজি জানিয়ে যাচ্ছি। আজই আপনাকে কিছু দিতে হবে না। পরে আসব।"

"তাই আসুন। আমি সপ্তাহখানেক আছি এখানে।"

ডায়েরি খাতাটা ঝোলার মধ্যে ঢুকিয়ে কিকিরা মুখ নামিয়ে কী যেন হাতড়ালেন। তারপর একটা কাগজের ঠোঙা বার করে বললেন, "মায়ের পায়ে দেওয়া ফুল আর সামান্য প্রসাদী আপনাকে দিয়ে যাই।"

চেয়ার থেকে উঠে কয়েক পা এগিয়ে কৃষ্ণকান্তর দিকে যাবেন, হঠাৎ তাঁর নজরে পড়ল, ভদ্রলোক আর্মচেয়ারে ঘাড় হেলিয়ে দিয়েছেন। মাথামুখ বুকের কাছে ঝুঁকে পড়েছে।

কিকিরা অবাক!

কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করে এগিয়ে গিয়ে সামনে দাঁড়ালেন তিনি কৃষ্ণকান্তর। ভদ্রলোকের চোখের পাতা বোজা। ঠোঁট ঈষৎ ফাঁক হয়ে রয়েছে। মনে হল, ওঁর কোনও হুঁশ নেই। অচৈতন্য।

বিস্মিত বিমূঢ় কিকিরা কী করবেন বুঝতে না পেরে তাড়াতাড়ি কাগজের ঠোঙাটা টেবিলের ওপর রেখে কৃষ্ণকান্তর নাকের কাছে ডান হাতের একটি আঙুল ধরে রাখলেন। নিশ্বাস-প্রশ্বাস আছে, তবে দুর্বল বলে মনে হল। বুক ওঠানামা করছে এত ধীরে যে, সতর্ক হয়ে নজর করতে হয়।

কিকিরা স্বাভাবিক বোধবুদ্ধির বশে তাড়াতাড়ি কৃষ্ণকান্তের গলায় জড়ানো উড়নি বা পাতলা চাদরটা আলগা করে খুলে দিলেন। শ্বাসকষ্ট কমা উচিত। আর তখনই তাঁর নজরে পড়ল, কৃষ্ণকান্তর গলার মাঝামাঝি—সামান্য বাঁদিক ঘেঁষে একটি টিউমার। গলগণ্ডর মতন দেখায়। বিসদৃশ অবশ্যই। তবে কি এইজন্যেই কৃষ্ণকান্ত গলার কাছটা চাপা দিয়ে রাখেন?

একবার মনে হল কিকিরা চিৎকার করে কাউকে ডাকেন! জানলার দিকে তাকালেন। বাড়ির ভেতর দিকে জানলা। মেঝে থেকে সামান্যই উঁচু, আড়াই কি পৌনে তিন ফুট। জানলায় গরাদ নেই। ওপাশে বোধ হয় প্যাসেজ। সহজেই টপকে যাওয়া যায়।

কৃষ্ণকান্তকে সামান্য নাড়া দিলেন কিকিরা। "কৃষ্ণকান্তবাবু! শুনছেন! কৃষ্ণকান্তবাবু!"

জলের জন্যে তাকালেন চারপাশ। জল নেই। পানের ডিবে খুললেন। ভিজে ন্যাকড়া চাপা দেওয়া ছিল। সেটা তুলে নিয়ে কৃষ্ণকান্তর কপালে, চোখে বোলাতে লাগলেন।

সামান্য পরে নড়ে উঠলেন কৃষ্ণকান্ত। মনে হল, ঘুমের ঘোর কাটিয়ে জেগে উঠছেন। আলস্য, আবেশ, দুর্বলতা—সব যেন কেমন মেশানো রয়েছে দৃষ্টিতে। শ্বাস নিলেন। শূন্য চোখে তাকালেন। "কে?"

"আমি শ্যামাদাস।"

"শ্যামা-দাস! ও!"

"আপনার কী হয়েছিল? হঠাৎ...?"

কৃষ্ণকান্ত উড়নি দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে বললেন, "কিছু না। এরকম আমার হয়। আগে কম হত। এখন প্রায়ই হয়। কাজ করতে করতে, কথা বলতে বলতে হঠাৎ কখন ঘুমিয়ে পড়ি। নিজেই বুঝতে পারি না।"

"ডাক্তার দেখাচ্ছেন না?"

"দেখাই। এবারও দেখাচ্ছি।... যাক, আপনি এখন আসুন। আমার ভাল লাগছে না।"

কিকিরা নমস্কার জানিয়ে চলে আসার আগে টেবিলে রাখা কাগজের ঠোঙাটা দেখালেন। "মায়ের প্রসাদী ফুল রেখে গেলাম। আসি।"

বাইরে এসে রিকশা ডাকল ছকু। কথাই ছিল কৃষ্ণকান্তর বাড়ি থেকে বেরিয়ে রিকশায় উঠবেন কিকিরা। সঙ্গে ছকু থাকবে। বেশ খানিকটা এগিয়ে এসে রিকশা ছেড়ে দেবেন ওঁরা।

লাটু গাড়ি নিয়ে পিছু পিছু আসবে। গাড়িতে তারাপদ আর চন্দনও আছে।

শেষে রিকশা ছেড়ে কিকিরা গাড়িতে উঠবেন। ছকু চলে যাবে নিজের জায়গায়।

রিকশায় বসে কিকিরা বললেন, "ছকু, আমি এমন দেখিনি। সমস্ত গোলমাল হয়ে যাচ্ছে আমার।"

ছকু বলল, "কী হল গুরুজি?"

"পরে বলব। তুমি কাল সন্ধের পর একবার বাড়িতে এসো।...তোমার নিজের কাজ কতটা হল।"

ছকু জানাল, "আমার কাজ হয়েছে থোড়া বহুত। আপনি ভাববেন না।"

॥ ৭ ॥

তারাপদই সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল নবকুমারকে।

নবকুমার এখন কয়েকদিন তারাপদর বোর্ডিংয়েই রয়েছে। তারই হেফাজতে। আবার যেন ও পালিয়ে না যায় তার জন্যে তারাপদ বোর্ডিংয়ের ম্যানেজারবাবুকে বলে রেখেছে ছোকরার ওপর নজর রাখতে। বলেছে, একটু খেয়াল রাখবেন তো চারুবাবু ; ছেলেটার মাথায় ছিট আছে, খেয়ালি, যখন-তখন বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে

যায়। দু'-চারদিন থাকুক এখন, ওর গার্জেন এলে হাতে তুলে দেব।

কিকিরার ঘরে চন্দন বসে ছিল। কথা বলছিল।

তারাপদরা আসতেই কিকিরা বসতে বললেন তাদের। দেখলেন নবকুমারকে। একই রকম। উদ্বিগ্ন, শঙ্কিত মুখ। খানিকটা হতাশ।

কিকিরা দু'-চারটে মামুলি কথা বলে নবকুমারকে সহজ করার চেষ্টা করলেন। হাসি তামাশাও করলেন। শেষে বললেন, "তোমার জেঠামশাইয়ের সঙ্গে আলাপ করে এসেছি, শুনেছ তো?"

শুনেছে নবকুমার। তারাপদই বলেছে।

"এবার তোমায় ক'টা কথা জিজ্ঞেস করি। ঠিক ঠিক উত্তর দেবে। লুকোবে না কোনও কথা।"

"বলুন?"

"কৃষ্ণকান্তবাবু, মানে তোমার জ্যাঠামশাইয়ের যে একটা অদ্ভুত রোগ আছে, উনি যখন-তখন হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়েন, তুমি জানো?"

নবকুমার তাকিয়ে থাকল সামান্য সময়। পরে বলল, "শুনেছি। আগে শুনতাম মৃগী। কখনও-সখনও হত। আমি নিজে দেখিনি।"

"দ্যাখোনি?"

"না।...আজ পাঁচ-ছ' বছরের মধ্যে আমি মাত্র তিন-চারবার নুরপুরের বাড়িতে গিয়েছি। তাও হয়তো দু'-একদিনের জন্যে। ওখানে কেউ আমায় আদর আপ্যায়ন করে না। মা-মাসি থাকলে নিশ্চয় করত। অন্য যারা আছে তারা দুটো খেতে দেয়, ঘরের দরজা জানলাগুলো খুলে দেয়, এই পর্যন্ত। এক-আধটা কথা যা বলে তা নেহাতই দয়া করে।"

"ও বাড়িতে তোমায় পছন্দ করে এমন কেউ নেই?"

"না, এখন নেই। জলধরদা ছিল। মারা গিয়েছে।"

"তুমি তা হলে ঠিকমতন জানো না, কৃষ্ণকান্তবাবুর অসুখটা কেমন? কতদিনের?"

"না। শুনেছি এই মাত্র। তাও কেউ বলতে পারত না কেমন অসুখ। মা-মাসির মুখেও শুনেছি। বলত, মৃগী রোগীর মতন অনেকটা। আবার কেউ বলত, এপিলেপসি ধরনের।"

"তুমি নিজে কোনওদিন দ্যাখোনি?"

"না। তা ছাড়া তখন হয়তো বাড়াবাড়ি ছিল না।"

"এখন কি বাড়াবাড়ি হয়েছে?"

"আমি কেমন করে জানব! আপনি যেদিন গিয়েছিলেন আপনার চোখের সামনে হয়েছে—এ-কথা তো আমি তারাপদবাবুর মুখে শুনলাম।"

কিকিরা মাথা নাড়লেন, "হ্যাঁ। আমার সামনেই হয়েছে। উনি এখানে এসেছেন, আছেন—তার একটা বড় কারণ শুনলাম ডাক্তার দেখানো।"

“তা আমি জানি না। রোগটা কী? মৃগী—!”

চন্দনের দিকে তাকালেন কিকিরা। চন্দন বলল, “না মৃগী নয়, এপিলেপসি নয়। এর নাম আমি জানি না। সিনিয়ারদের জিজ্ঞেস করেছি। বইপত্র ঘেঁটে বলবেন বলছেন। তবে রোগটা কমন বা নর্মাল নয়। ভেরি রেয়ার। লাখে একটা পাওয়া যায় কিনা তাও সন্দেহ।... আর আশ্চর্যের কথা, এরা নিজেরাও বুঝতে পারে না, কখন আচমকা ঘুমিয়ে পড়বে। ব্যাপারটা নিজের ইচ্ছে অনিচ্ছেয় হয় না।”

“অদ্ভুত!”

“মানুষের শরীরের স্বাভাবিক একটা গঠন আছে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গেরও মিল আছে। তবু কখনও কখনও অস্বাভাবিক পার্থক্য থেকে যায়। কেন যায় বলা মুশকিল। প্রকৃতির খামখেয়ালিপনা। কিন্তু দেখা গিয়েছে, এই ধরনের অ্যাবনর্মালিটি যাদের থাকে—তাদের বেশিরভাগ ক্ষেত্রে গণ্ডগোলটা জন্মকাল থেকেই থেকে যায়। প্রথম বয়েসে, মাঝবয়েসে বা প্রায় প্রৌঢ় বয়েসে—কখন ধরা পড়বে তাও বলা যায় না।”

তারাপদ বলল, “আরে সেই যে বিখ্যাত গল্প...। একটা লোকের হার্ট বাঁদিকে না থেকে ডানদিকে ছিল...।”

“গল্প নয়, এরকম হয়, হতেই পারে। তবে রেয়ার। আবার সৃষ্টির এমনই মহিমা যে—যদি কারও হার্ট ডানদিকে থাকে—তবে এমনও দেখা গিয়েছে, তার ক্ষেত্রে অন্য অঙ্গ বা প্রত্যঙ্গগুলো—যা বাঁদিকে থাকার কথা, সব ডানদিকে জায়গা করে নিয়েছে।...এসব অবশ্য কদাচিৎ দেখা যায়। সৃষ্টি রহস্য! এর কোনও ব্যাখ্যা নেই।”

“আমাদের অফিসে ডেসপ্যাচ সেকশনের কড়িদার বাঁ হাতে ছ'টা আঙুল,” তারাপদ বলল, “এটাও তো স্বাভাবিক নয়।”

কিকিরা বললেন, “যাক গে, আসল কথা হল কৃষ্ণকান্তর একটা অস্বাভাবিক রোগ আছে। আমার পরের প্রশ্ন—” বলে নবকুমারের দিকে তাকালেন, “তুমি একেবারেই খেয়াল করে দ্যাখোনি কৃষ্ণকান্ত সত্যিই বেঁচে আছেন কিনা! তুমি তাঁকে হাত দিয়ে ছুঁয়েও দেখোনি।”

“না।”

“ওঁর গলায় যে গলগণ্ড কিংবা টিউমারের মতন ফোলা মাংসপিণ্ড আছে, তুমি নিশ্চয় জানতে।”

“দেখেছি।”

“লোকের চোখ এড়াতে কৃষ্ণকান্ত গলায় একটা চাদর চাপিয়ে রাখতেন, তুমি জানো না?”

“বাইরের লোকের সামনে বেরুতে হলে গলা চাপা দিতেন, অন্য সময় নয়। বাড়ির মধ্যে দেখিনি।”

"তুমি বলেছিলে, সেদিন তুমি দেখেছ, কৃষ্ণকান্তর গলায় বাসন্তী-গেরুয়া রঙের চাদর ছিল।"

"হ্যাঁ। জেঠামশাই রঙিন চাদরও পছন্দ করেন।"

"আমি তো দেখলুম, ওঁর গলায় সাদা উড়নি। উড়নির পাড়ে অবশ্য রং ছিল বাসন্তী ধরনের।"

নবকুমার কিছু বলল না।

"সেদিন তুমি ঘরে ঢুকে তোমার জেঠামশাইয়ের সামনে টেবিলের ওপর একটা অ্যাটাচি কেস দেখেছিলে তো?"

"হ্যাঁ দেখেছি।"

"তুমি ওটা ছুঁয়েও দেখোনি?"

"না।"

"ঠিক বলছ?"

নবকুমার বিরক্ত হল। "আমি বার বার বলেছি, অ্যাটাচি কেসটায় হাত দিইনি আমি।"

"কী রঙের অ্যাটাচি? মনে আছে?"

"অ্যাশ কালার, ছাই রঙের।"

কিকিরা অল্প সময় চুপ করে থাকলেন। ভাবলেন কী যেন, শেষে বললেন, "তবু ওরা রটিয়ে বেড়াচ্ছে, তুমি নাকি তোমার জেঠামশাইয়ের গলায় ফাঁস লাগিয়ে তাঁকে মারবার চেষ্টা করেছ, টাকা ভরতি অ্যাটাচিকেসটা নিয়ে পালিয়ে এসেছ!"

"আমি তাই শুনেছি। ওদের লোক এসে আমার দোকানে বলে গিয়েছে।"

"ওরা বেশি চালাক। তবে চালাকিটা ধোপে টিকবে না জানে। আর সেজন্যে থানাপুলিশ করেনি।... যাক গে, আমি ভেবে দেখলাম, ওটা এমন অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে যে, আড়ালে আড়ালে লড়ে লাভ হবে না। মুখোমুখি হওয়া দরকার। সামনাসামনি না দাঁড়ালে সত্যি কথাটা জানা যাবে না। কাজেই স্ট্রেট ফাইট।"

তারাপদ বলল, "আপনি ফাইট করবেন?"

কিকিরা মাথা নাড়লেন, হেসে যাত্রার ভঙ্গি করে বললেন, "সম্মুখ সমর বিনা গতি নাহি আর। কৃষ্ণকান্ত পর্বটা শেষ করে ফেলতে হবে। না করলে ভদ্রলোককে আর কলকাতায় পাব না। দেশে ফিরে যাবেন উনি।"

তারাপদ হালকাভাবে বলল, "সার, অপারেশন কৃষ্ণকান্তটা কবে হচ্ছে?

"যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। দেরি করলে ভদ্রলোককে কলকাতায় পাচ্ছ কোথায়? উনি তো বললেন, হপ্তাখানেক থাকবেন আর।"

"এই সপ্তাহে তবে লাগিয়ে দিন।...তা আমাদের করণীয় কী?"

"তোমরা থাকবে। তবে বাড়ির বাইরে গেরিলা কায়দায় পজিশন নেবে। ভুলে যেও না ওটা কৃষ্ণকান্তর পাড়া। তাঁর নিজের কর্মচারী ছাড়াও ওঁর হাতে লোক আছে। পাড়ার ছেলে। গণ্ডগোল বাঁধলে তোমাদেরও ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।"

"শুধু হাতে?" তারাপদ ঠাট্টা করে বলল। "নো বোমা, নো পাইপগান, নো হ্যান্ডমেড পিস্তল? ভীষণ রিস্কি হবে, সার?"

কিকিরা গম্ভীরভাবে বললেন, "মুরগিহাটা থেকে কিছু পটকা কিনে নিয়ে যেও। চিনেবাজারেও পেতে পারো।"

তারাপদরা হেসে উঠল। "মুরগিহাটায় পটকা—! সে তো চিকেন কোয়ালিটি হবে!"

চন্দন উঠে পড়ল। তার অন্য একটা কাজ আছে। "আমি চলি।"

"তুই যাবি?" তারাপদ হাতঘড়ি দেখল। "আটটা বাজতে চলল। আমরাও তাহলে যাই। চল, একসঙ্গেই যাব।"... বলে কিকিরার দিকে তাকাল। "আমরা আসি সার। পরে খবর নেব...!"

"এসো।"

চন্দনরা চলে গেল।

কিকিরা একই ভাবে বসে থাকলেন।

সামান্য পরেই ছকু এল।

"এসো। আমি তোমার কথাই ভাবছিলাম।"

ছকু বলল, "দোকানের কাজকর্ম মিটিয়ে এলাম। চেনা একটা স্কুটার ভ্যান আসছিল। বললাম, একটু নামিয়ে দিয়ে যা ভাই।"

"বোসো।"

ছকু বসল। একেবারে কিকিরার পায়ের কাছে। কিকিরা অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করেন এভাবে ছকু মাটিতে বসলে। কিন্তু সে কিছুতেই শোনে না, কী করা যাবে।

"খবর বলো?" কিকিরা বললেন।

ছকু আগের দিনের বিবরণ দিতে শুরু করল। বলল, কৃষ্ণকান্ত যে-বাড়িটায় থাকেন, সেটা বেশ পুরনো। ভাড়া-নেওয়া বাড়ি। নীচের তলায় সদর ঘেঁষে একপাশে দফতর, ব্যবসাদারদের গদির মতন। সেখানে জনাদুই বসে। কী করে কে জানে! অন্যপাশে মুনশির কামরা। মুনশিবাবু মানে ম্যানেজারবাবু। ভেতরে একটা হলঘর। পেছন দিয়ে দোতলার সিঁড়ি উঠে গিয়েছে। কৃষ্ণকান্তর বসার ঘর হলঘরের শেষদিকটায়, সিঁড়ির গায়ে গায়ে। গোটা দুই সরু প্যাসেজ এপাশে ওপাশে। বাড়ির পেছনদিকে একফালি জমি। একটা ছোট নিমগাছ, জলের রিজারভার, পাঁচিল।

কর্মচারীদের দু'জন আছে ওই বাড়িতে। রিজারভারের কাছে সাধারণ একটা ঘরে তাদের আস্তানা। ঠাকুর চাকর থাকে নীচে, উত্তর দিকে। উঠোন রয়েছে সামনে।

দোতলায় ছকু যায়নি।

একতলায় ঘুরঘুর করার সময় মুনশিজির সঙ্গে তার আলাপ হয়ে যায়। কথায়

কথায় জানতে পারল, মুনশিবাবু বললেন—তাঁর মালিক কৃষ্ণকান্তর শরীর ভাল যাচ্ছে না। কলকাতায় এসেছেন—ডাক্তার দেখাতে। কাজেকর্মে যখনই আসেন এখানে, একবার ডাক্তার দেখিয়ে যান। এবারে অবশ্য মূল উদ্দেশ্য ডাক্তার দেখানো। বড় ডাক্তার। দু'-তিনজনকে দেখানো হয়ে গিয়েছে। পরীক্ষাও হয়েছে নানারকম।

ছকু নিজের থেকে জানতে চায়নি, মুনশিবাবু নিজেই বললেন, "কর্তামশাইয়ের ডাক্তারবদ্যি দেখানোর ভারটা এবার নিয়েছেন বাসুদেববাবু। তাঁর ব্যবস্থা মতনই আসা-যাওয়া করতে হচ্ছে কর্তাকে।

"বাসুদেববাবু? সে আবার কে?" কিকিরা জিজ্ঞেস করলেন।

"কৃষ্ণকান্তবাবুর জামাইয়ের ভাই।"

"কোথায় থাকে?"

"এখানেই, কলকাতায়।"

"কী করে?"

"তা জানি না।"

কিকিরা কৌতূহল বোধ করলেন। "ওই বাড়িতেই থাকে?"

"মুনশিবাবু থাকার কথা বললেন না তো!"

নিজের মাথায় দুটো টোকা মারলেন কিকিরা। "ইস, তুমি একটু আগে এলে জানা যেত হয়তো। নবকুমাররা ছিল।...আচ্ছা, দাঁড়াও দেখি।"

সামান্য ঝুঁকে টেলিফোন তুলে নিলেন কিকিরা। লাটু দত্তকে ফোন করলেন বাড়িতে।

পাওয়া গেল লাটুকে ; সবেই বাড়ি ফিরেছে।

"লাটু?"

"রায়দা! বলুন।"

"বাসুদেব বলে কারুর নাম শুনেছ নবকুমারের মুখে?"

"বা-সু-দেব!...বাসুদেব! কই না, মনে পড়ছে না।"

"কৃষ্ণকান্তবাবুর জামাইয়ের ছোট ভাই। কলকাতায় থাকে। চৌধুরীমশাইয়ের ডাক্তারবদ্যি দেখানোর দায়িত্ব এবার তার ঘাড়ে বর্তেছে।"

লাটু কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, "না, রায়দা, আমি জানি না। কুমারকে জিজ্ঞেস করতে হবে। তবে সে কি জানবে? জেঠার বাড়ির সঙ্গে তার যা সম্পর্ক!"

"আরে, খানিকটা আগেই তো ওরা আমার কাছে ছিল। ওরাও চলে গেল, ছকু এল। ছকুর মুখে শুনলাম এইমাত্র।"

"কাল খোঁজ করব?"

"আমি করে নেব।... শোনো, পরশু একবার এসো। আমি আর সময় নষ্ট করতে চাই না। হাত গুটিয়ে বসে থাকলে চৌধুরীবাবুকে আর পাব না। উনি দেশে ফিরে যাবেন।"

"আপনি কি ভেবেছেন কিছু?"

"হ্যাঁ। পরশু এসো, বলব। এবারে সম্মুখ সমর। কৃষ্ণ ভার্সেস কিকিরা। ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসব..." কিকিরা হেসে ফেললেন।

॥ ৮ ॥

অফিস যাওয়ার তোড়জোড় করছিল তারাপদ। পৌনে ন'টা বেজে গেল। দাড়ি কামানো শেষ করেছে সবে, স্নানে যাবে, হঠাৎ দেখল কিকিরা তার ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন।

"এ কী! আপনি?"

ঘরে ঢুকলেন কিকিরা। "তুমি কি মাথায় ফুলেল তেল মাখো?"

"ফুলেল তেল?"

"এত গন্ধ ছুটছে...!"

"না সার," তারাপদ হাসল, "আমার মাথার চুল চাপড়া ঘাসের মতন, সিমপিল কোকোনাট মাখি। হ্রাস বৃদ্ধি একই রকম।"

"মোবিল অয়েল চেষ্টা করে দেখতে পারো।"

তারাপদ হেসে উঠল। কিকিরাও।

"আপনি হঠাৎ আমার কাছে, এখন?"

"তোমার কাছে নয়, নবকুমারের কাছে। কোথায় সে? একবার ডাকো।"

তারাপদ অবাক হয়ে বলল, "কী ব্যাপার! কাল সন্ধেবেলায় আপনার বাড়ি থেকে ঘুরে এলাম; আর আজ সকালেই—? সামথিং হ্যাপেন্ড?"

"ওকে ডাকো। কোথায় ও?"

"এই তো কাছেই এগারো নম্বর ঘরে। ডেকে আনছি।"

এগারো নম্বর ঘরটা ফাঁকা আছে ক'দিন। চুনিবাবু মালদায় গিয়েছেন অফিসের কাজে। দিন পনেরোর আগে ফিরবেন না। নতুন বোর্ডার নেওয়ার কথা ওঠে না। তারাপদর কথায় নবকুমারকে থাকতে দিয়েছেন ম্যানেজারবাবু।

কিকিরা বসলেন। বিছানার ওপরেই।

তারাপদ গেল আর ফিরে এল। সঙ্গে নবকুমার।

কিকিরা একবার দেখলেন নবকুমারকে। তারপর ভণিতা না করে সরাসরি জিজ্ঞেস করলেন, "বাসুদেবকে চেনো?"

নবকুমার কেমন ঘাবড়ে গেল। "বাসুদেব—?"

"চেনো না?"

"চিনি। জামাইবাবুর ছোট ভাই।...কেন?"

"বাসুদেব কলকাতায় থাকে? কী করে?"

স্নানে যাওয়ার তাড়া ভুলে তারাপদও দাঁড়িয়ে থাকল।

নবকুমার বলল, "বাসুদাকে আমি চিনি। কুটুম মানুষ। তবে তার সঙ্গে আমার এমনিতে কোনও যোগাযোগ নেই। ন'মাসে ছ'মাসে ট্রামে বাসে পথেঘাটে হঠাৎ দেখা হয়ে যায়। এমনি কথা হয় দু'-চারটে।... আমি তো জানি বাসুদা বেলেঘাটা না ওদিকে কোথাও থাকে।"

"কী করে?"

"ওষুধ কোম্পানিতে কাজ করত শুনেছি। আর তো কিছু জানি না।"

কিকিরা তারাপদর দিকে তাকালেন। "তুমি চান করতে যাও। পারলে এক কাপ চায়ের কথা বলে যেও। আমি নবকুমারের সঙ্গে দুটো কথা বলে নিই।"

"তা বলুন। তবে ওই বাসুদেবকে কোথায় পেলেন আপনি?"

"ছকু।...তোমরা চলে আসার পর ছকু এসেছিল। তার কাছে শুনলাম। কৃষ্ণকান্তবাবুর দেখাশোনার দায়িত্ব এখন তার হাতে। মানে, চৌধুরীমশাইকে সে বড় বড় ডাক্তারবদ্যির কাছে নিয়ে যাচ্ছে।"

"ও! কনট্যাক্ট ম্যান...!" তারাপদ আর দাঁড়াল না। স্নানে চলে গেল।

কিকিরা নবকুমারকে বসতে বললেন।

বসল নবকুমার।

"বাসুদেবের বয়েস কত?" কিকিরা জিজ্ঞেস করলেন।

"ক-ত! আমার চেয়ে বড়। ত্রিশ-বত্রিশ বছর হবে।"

"কেমন মানুষ? দাদার সঙ্গে সম্পর্ক কেমন?"

নবকুমার বিপদে পড়ে গেল যেন। সে নিজেই কত দিন-বছর হল নুরপুরে যায় না। দিদিরা অন্য জায়গায় থাকে, তবু বাড়িতে গেলে হয়তো দিদির কথা শুনতে পেত। দিদির সঙ্গেও দেখা নেই। ওদের সংসারের খোঁজখবরও রাখে না। তবে দুই ভাইয়ের মধ্যে মাখামাখি বেশি নেই, সেটা জানে।

কিকিরা অপেক্ষা করছেন দেখে নবকুমার আরও অস্বস্তি বোধ করছিল। বলল, "আমি ঠিক জানি না। তবে বাসুদা শুনেছি বেশিদিন কোথাও কাজ করতে পারে না। ঘন ঘন কোম্পানি পালটায়।"

"ফ্যামিলি নিয়ে থাকে?"

"না। বিয়ে-থা করেছে বলে জানি না।"

"তোমার সঙ্গে শেষ কবে দেখা হয়েছে?"

নবকুমার মনে করার চেষ্টা করল। দু'-চার মাসের মধ্যে তো নয়ই। প্রায় আচমকা মনে পড়ল, আরে—এই তো সেদিন—শীতের শেষাশেষি ম্যাডান স্ট্রিটের একটা ইলেকট্রিকের দোকানের সামনে দেখা। ফুটপাথে দাঁড়িয়ে কাকে খুঁজছিল। নবকুমারকে দেখতে পেয়ে ডাকল। দু'-একটা কথার পরই বলল, 'তোর কাছে শ' দুই তিন টাকা আছে? দে তো! একজনের আসার কথা, আসছে না এখনও, দেরি হয়ে যাচ্ছে আমার। দু' দিন পরে ফেরত দিয়ে আসব তোকে!'

নবকুমারের কাছে তখন বাড়তি টাকা শ'খানেক ছিল। বলল, "দু'-তিনশো টাকা

নেই।”

বাসুদা কেমন বিরক্তির মুখ করল। “পকেটে দু’-তিনশো টাকাও থাকে না? ফাঁকা! তোর দোকান চলে কেমন করে! রাবিশ।”

নবকুমারের গায়ে লাগেনি কথাটা। বাসুদাকে সে যতটা দেখেছে তাতে জানে, চালিয়াতি করার, অন্যকে উপেক্ষা করার, ছোট করার অভ্যেস তার আছে। বোধহয় মিথ্যেবাদীও।

“মনে পড়ছে না?” কিকিরা বললেন।

নবকুমার ঘটনাটা সংক্ষেপে বলল। অবশ্য এমনভাবে বলল, যেন, বাসুদেবের কথায় সে বিশেষ কিছু মনে করেনি।

“তোমার দোকান, বাড়ি ও চেনে?” কিকিরা জিজ্ঞেস করলেন।

“দোকানটা দেখেছে।”

বোর্ডিংয়ের একটা ছেলে এসে চা দিয়ে গেল কিকিরাকে।

চায়ে চুমুক দিয়ে কিকিরা বললেন, “বাসুদেবকে এর মধ্যে তুমি আর দেখোনি?”

“না।”

“আচ্ছা—এত লোক থাকতে তোমার জেঠামশাই এবার হঠাৎ বাসুদেব—মানে জামাইয়ের ভাইয়ের ওপর ভরসা করলেন কেন?”

“আমি জানি না। বাসুদার ওপর ভরসা করেছিলেন তাও বা জানব কেমন করে। আপনি বলছেন বলে শুনছি।”

কিকিরা মাথা নাড়লেন।

তারাপদ ফিরে এল। স্নান শেষ। মাথা মুছছে তখনও।

“চা খেয়েছেন? তা এত বেলায় আরও কোথাও যাবেন নাকি?”

“না।”

“কেসটা ভাল বুঝলাম না।”

“বোঝার মতন হয়নি এখনও। সময়ে বুঝবে। আমি চলি। তুমি আজ আমায় সন্ধেবেলায় বাড়িতে পাবে না। কাল পাবে।” কিকিরা উঠে পড়লেন।

“চাঁদুকে কিছু বলার আছে?”

“না। কাল তোমরা দেখা কোরো।”

“অপারেশন কৃষ্ণটা কবে হবে সার?”

“পরশু বা তরশু।”

“পাঁজিতে ভাল দিন আছে?” তারাপদ ঠাট্টার গলায় বলল।

“দেখে নিও। আমি চলি।”

কিকিরা চলে গেলেন।

নবকুমার বোকার মতন বসে থাকল। দেওয়ালে টাঙানো আয়নায় মুখ মাথা দেখতে দেখতে চুল আঁচড়াচ্ছিল তারাপদ।

“তারাপদদা?”

“বলো?”

“বাসুদার কথা উনি তুললেন কেন আমি বুঝতে পারছি না।”

তারাপদ বলল, “তোমায় বুঝতে হবে না। কিকিরা বরাবরই মিস্টিরিয়াস। অপেক্ষা করো, বুঝতে পারবে।”

কবিরাজমশাইকে পাওয়া গেল।

কাছাকাছি কোথাও ঘুরতে গিয়েছিলেন। বিকেলের পর খানিকটা হাঁটাচলা না করলে এই বয়েসে শরীর টেকে না।

বাড়ির সামনে আসতেই কিকিরাকে দেখতে পেলেন।

আজ বাতাস রয়েছে বিকেল থেকেই। এলোমেলো। মাঝে মাঝে ধুলো উড়ছে। ঝড় উঠবে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। উঠলেও কালবৈশাখীর আশা নেই, দু'-একবার দমকা ঘূর্ণি উঠেই থেমে যাবে হয়তো।

“আপনি?” কবিরাজ চিনতে পারলেন কিকিরাকে। “সাঁইবাবু না?”

কিকিরা হাসলেন। “বালাই বড় দায়।”

“কেন, কী হল?”

“আমার সেই বুক জ্বালার ওষুধটা আরও দিনতিনেকের মতন ছিল, কিন্তু নিজের দোষে হাত থেকে পড়ে একেবারে ময়লার মধ্যে। এদিকে আজ কষ্টটা বড় বেড়েছে।... এদিকেই একটা কাজে এসেছিলাম, ভাবলাম যদি একবার আপনার দেখা পাই—!”

“কেমন জ্বালা? গলার কাছে, না অন্ত্রে?” চন্দ্রকান্ত কবিরাজ বললেন।

“পেটে।”

“আসুন, দেখি।”

কবিরাজমশাইয়ের বাড়ির সদর বন্ধ ছিল। কড়া নাড়ার পর একটি ছোট মেয়ে এসে খুলে দিল।

নিজের ঘরটিতে ঢুকে আলো জ্বাললেন কবিরাজ।

“বসুন।”

কিকিরা বসলেন। “কোথাও গিয়েছিলেন?”

“না, বিকেলে একটু পায়চারি করার অভ্যেস। আর মশাই পথে বেরুলে চেনাশোনা লোক, পাড়াপড়শির সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। দুটো গল্পগাছা..।” বলতে বলতে ঘরের পেছন দিকে রাখা পুরনো আলমারির পাল্লা খুললেন।

আলমারির গোটাদুয়েক কাচ ফাটা। ভাঙা কাচে কাগজের তাপ্পি। ভেতরে পাঁচ-সাতটা ওষুধের শিশি বোতল। কাচের বয়াম।

কবিরাজমশাই ওষুধ খুঁজতে খুঁজতে বললেন, “আমাদের অসুবিধে কী তা জানেন! এ তো এলাপ্যাথি হোমিওটোমিও নয়, চাইলেই দু'-এক শিশি বার করে দেব! বড়িও নয়। কারখানার জিনিস নয়, মশাই। আমাদের হল গাছগাছড়া

খুঁজেপেতে নিজের হাতে তৈরি। সময় লাগে। দেখি কী পাই—।”

কিকিরা বসে থাকলেন। লাটুকে তুলে নিয়ে এসেছেন দোকান থেকে। তাঁর উদ্দেশ্য ওষুধ নয়।

“আপনার তেলটা আমার বড় উপকারে লেগেছে।”

“সুনিদ্রা হচ্ছে!”

“ভালই হচ্ছে।”

“আর ওই ক্ষুধাবৃদ্ধির চূর্ণটা?”

“বোধহয় ধাতে লেগেছে...।”

কবিরাজমশাই হাতড়া-হাতড়ি করে পেলেন কিছু।

বসলেন।

“আপাতত এটা দিচ্ছি। জ্বালার উপশম হবে। দুটি করে বটিকা দিনে তিনবার, সামান্য দুধ দিয়ে খাবেন। চামচ পরিমাণ। মধু দিয়ে খাবেন না। দুধের বদলে জল হতে পারে।...ভাল কথা, অম্ল কিছু খাবেন না। দধিও নয়।”

ওষুধের বড়ি নিয়ে কিকিরা পঞ্চাশ টাকার একটি নোট সামনে এগিয়ে দিলেন।

কবিরাজমশাই টাকাটা নিয়ে নিলেন।

“আপনার কথা আমি অন্য দু'-একজনকে বলেছি। তারাও হয়তো আসবে।”

কবিরাজ বললেন, “কথায় বলে গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না। আমরা তো এখন বাতিল। দু'-একটা অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ খসড়া করে রাখলেই কি চলে মশাই? চলে না। অথচ দেখুন বাজারে হঠাৎ ভেষজ ভেষজ রব উঠেছে কেমন। কত কোম্পানি। লাখ লাখ টাকা ঢালছে। কোটির হিসেবে ব্যবসা। আমরা আর কী করতে পারলাম।”

কিকিরা কথা পালটালেন। “একটা কথা মনে পড়ল।”

“কী?”

“তেমন জরুরি ব্যাপার নয়।...আচ্ছা, আপনার প্রতিবেশী কৃষ্ণকান্তবাবুর এক আত্মীয়কে আমি চিনতাম। সেদিন আপনার কাছ থেকে ফেরার সময় তাকে দেখলাম ওই বাড়ির সামনে। আমায় চিনতে পারল না।”

“কে বলুন তো?”

“নামটা মনে হচ্ছে বাসুদেব।”

“বাসুদেব। বাসুদেব পাঁজা!”

“চেনেন?”

“মুখে চিনি। তবে আমার সঙ্গীটি, ওই যে বিপিন সাধু, যে দাবা খেলতে আসে চৌধুরীমশাইয়ের বাড়ি থেকে, কর্মচারী ওই বাড়ির, তার মুখে ওর কথা শুনেছি। ওকে আপনি চিনলেন কেমন করে! শুনেছি, ছোকরার স্বভাব মন্দ, ধাপ্পাবাজ, বড় বড় কথা বলে। দু' নম্বর তিন নম্বরি কারবার...। ও বাড়ির লোকই নিন্দে করে ছোকরার।”

"মানে, লেজ গজিয়েছে এখানে থাকতে থাকতে, তাই আমাদের আর চিনতে পারল না।"

"দুর্জন না চিনলেই ভাল।"

"ও কি ওই বাড়িতেই থাকে!"

"না। ওবাড়িতে থাকে না। বেলেঘাটায় থাকে।" বলে একটু ভেবে একটা পাড়ার নাম বললেন। "তবে এবাড়িতেও আড্ডা গাড়ে মাঝে মাঝে।"

কিকিরা আর বসলেন না। তাঁর যা জানার ছিল জানা হয়ে গিয়েছে। হয়তো এতটা জানতে পারবেন, আশা করেননি।

"আজ আমি চলি কবিরাজমশাই, আবার আসব।"

চলে এলেন কিকিরা।

লাটুর কাছে এসে শুনলেন, একটা ছোকরা এইমাত্র ট্যাক্সি করে এসে কৃষ্ণকান্তবাবুদের বাড়ি ঢুকল। আগের দিনও দেখেছে একে।

॥ ৯ ॥

কৃষ্ণকান্ত দরজার দিকে ঘাড় ঘোরালেন। পায়ের শব্দ পেয়েছিলেন তিনি।

"ও, আপনি?"

কিকিরা নমস্কার করলেন। আগের দিনের মতনই সন্ন্যাসীর বেশ। মাথায় গেরুয়া টুপি। চোখে চশমা। গলায় ছোট চাদর, রুদ্রাক্ষের মালা।

"আপনাদের যে তর সইছে না, মশাই।" কৃষ্ণকান্ত শ্লেষের গলায় হয়তো নয়, কিন্তু বিরক্তির সঙ্গে বললেন। বসতেও ইশারা করলেন না।

কিকিরা বিনীতভাবে বললেন, "আপনি কয়েকদিন পরই আসতে বলেছিলেন। কলকাতায় থাকবেন না, দেশে ফিরে যাবেন জানিয়েছিলেন।"

"ঠিক আছে।...আমি মুনশিবাবুকে বলে যাব। পরে এসে শ' পাঁচেক টাকা নিয়ে যাবেন। পাকা রসিদ দেবেন।"

"পাঁ-চ শো!"

"কেন! কম হল!" কৃষ্ণকান্ত এবার বিদ্রূপ করেই বললেন, "চাইছেন ভিক্ষে, তাও আবার মন উঠছে না।"

কিকিরা হাসির মুখ করলেন। "আজ্ঞে, মানুষের স্বভাবই এই রকম। যা পায় তাতে মন ওঠে না। আদ্যিকালের কথাই ধরুন। মহাভারত তো পড়েছেন। দুর্যোধনের কি কম ছিল? কুরুবংশ..."

কৃষ্ণকান্ত ধমকের গলায় চুপ করিয়ে দিলেন কিকিরাকে। "জ্ঞান দিতে এসেছেন আমাকে? কোথাকার সাধু, এসেছেন ভিক্ষে চাইতে, বড় বড় কথা বলছেন—?"

"বড় কথা কেন হবে চৌধুরীমশাই, মানুষের স্বভাবের কথা। এই সংসারে—

সেই বেশি চায় আছে যার ভূরি ভূরি—! আপনি নিজেও কি তার বাইরে?"

কৃষ্ণকান্ত থমকে গেলেন। দেখলেন কিকিরাকে। "মানে?"

কিকিরা হাসি হাসি মুখেই বললেন, "মানেটা আপনি যথেষ্ট বোঝেন। নুরপুরের রাজত্ব একাই আপনি ভোগ করে যাচ্ছেন কেন? কোন অধিকারে? রজনীকান্তবাবুর?..."

কৃষ্ণকান্ত চমকে উঠলেন। সোজা হয়ে বসলেন আর্মচেয়ারে। তীক্ষ্ণ চোখে দেখলেন কিকিরাকে। "আপনি কে?"

"আমি কে জানার আগে আপনি নিজেই বলুন আপনার অধিকার কতটা সঙ্গত?" বলতে বলতে কিকিরা হঠাৎ শূন্যে হাত বাড়িয়ে একটা ছোট্ট ঘণ্টি বার করলেন। ঠাকুরপুজোর সময় বাড়িতে যেমন ঘণ্টি বাজায়। ঘণ্টিটা বাজালেন। অদ্ভুত শোনাল টুংটুং শব্দটা।

কৃষ্ণকান্ত চমকে উঠলেন। অত্যন্ত অপ্রসন্ন ও উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন। তবু কী মনে করে হাত নেড়ে কাছে ডাকলেন কিকিরাকে। সন্দেহের গলায় বললেন, "আপনি সেই চোর নচ্ছার ছেলেটার টাকা-খাওয়া লোক নাকি!...ঘণ্টি বাজিয়ে আমায় ভয় দেখাচ্ছেন!"

"যা ভাবেন।"

"তাহলে শুনুন, আমার ছোট ভাই রজনীকান্ত—একটা ছেলেকে নিজের কাছে রেখে লালন করেছিল মাত্র। গোরু-ভেড়া বামুন চাকর—যাকে ইচ্ছে পালন করা যায়। অনাথ অবোধকে এভাবে অনেকেই পালন করে। তাকে আইনত দত্তক নেয়নি। অন্তত সে রকম কোনও প্রমাণ নেই। আপনার মক্কেল কোর্ট কাছারি করেছিল। হেরে গিয়েছে। আপনি কি বলতে চান একটা রাস্তার ছেলেকে আমি চৌধুরীবংশের অন্দরমহলে ঢুকিয়ে নেব, তাকে উত্তরাধিকার দেব, মেনে নেব? না। আমি বেঁচে থাকতে তা হবে না।"

কিকিরা বললেন, "তাহলে আপনি তাকে কয়েক লাখ টাকা দিতে চেয়েছিলেন কেন? দয়া করে?"

"হ্যাঁ। দয়া করে।...বছরের পর বছর সে আমায় চিঠি লিখে লিখে উত্যক্ত করত। তার চিঠির বয়ান ছিল ইতরের মতন। আমার স্ত্রী, জামাই, মেয়ে, সকলেই সেটা জানে।...আপনি নিজেই জানেন আমি অসুস্থ। বয়েস হয়েছে। এই অসুখ সারার নয়। কবে কী হয়ে যায় ভেবে আমি ওকে কিছু টাকা দিয়ে ব্যাপারটা মিটিয়ে নিতে চেয়েছিলাম—যাতে ভবিষ্যতে আর না গণ্ডগোল করে।"

"মানে, আপনি ওকে টাকা দিয়ে বরাবরের মতন মিটমাটের একটা চুক্তি সই করে নিতে চেয়েছিলেন।"

"হ্যাঁ।"

"প্রথম কিস্তির টাকাটা তো ও পায়নি।"

"পেয়েছে। টাকা নিয়ে ও পালিয়েছে।"

"কেমন করে আপনি জানলেন? ও যখন এই ঘরে আসে—আপনি আর্মচেয়ারে শুয়ে, মাথা ঘাড় হেলিয়ে মরা মানুষের মতন অঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছেন। আপনার গলায় চাদর জড়ানো। ও ভয় পেয়ে বোকার মতন পালিয়ে যায়।"

কৃষ্ণকান্ত প্রায় চিৎকার করে উঠলেন। "মিথ্যে কথা। আমাকে ওই অবস্থায় দেখে টাকা নিয়েই ও পালিয়েছে..." বলে গলা তুলে ডাকলেন, "কে আছে রে বাইরে, মুনশিকে ডেকে দে।"

কিকিরা ইতস্তত করলেন। মুনশি কি দেখেছে নবকুমারকে। কিন্তু তা কেমন করে হবে!

হঠাৎ কী মনে করে কিকিরা বললেন, "চৌধুরীমশাই, একটা কথা আপনাকে বলি। আজ এই বাড়ির বাইরে আমাদের লোকজন আছে। নজর রাখছে। নবকুমারও আছে। যদি বলেন তাকেও ডাকাতে পারি।"

কৃষ্ণকান্ত খেপাটে গলায় বললেন, "চুপ করুন। আমাকে ভয় দেখাবেন না। চোরের হয়ে আমায় শাসাতে এসেছেন!" বলতে বলতে গলা কর্কশ হয়ে এল। অভ্যাসবশে পানের ডিবে খুলে একটা পান নিলেন। পানের ওপরে ভিজে কাপড়ের টুকরো। জরদার কৌটো সামনেই।

মুনশি এল।

বছর পঞ্চাশ বয়েস। দোহারা গড়ন। পরনে ধুতি আর বড় ফতুয়া। চোখের চশমা হাতে।

কাছে এসে মুনশি আড়ষ্ট গলায় বলল, "বাবু!"

"মুনশি! সেদিন, ওই ছোঁড়াটাকে টাকা দেব বলে আগেরদিন আমার দোতলার ঘরে, তুমি আমার চোখের সামনে গুনে আড়াই লাখ নগদ টাকা অ্যাটাচিতে রাখলে না?"

"হ্যাঁ, বাবু। রেখেছি।"

"টাকার অ্যাটাচিটা চেস্টে রাখা হল। পরের দিন বিকেলে আমি যখন এ ঘরে এলাম, চেস্ট খুলে টাকার ব্যাগটা তুমি আমার হাতে দিলে।"

"দিয়েছি বাবু।"

"শুনুন মশাই—" "কিকিরাকে বললেন কৃষ্ণকান্ত, "আপনি নিজের হাতে ওই টাকা এনে এখানে রেখেছি। এই টেবিলে। আমাদের কুলদেবতা চণ্ডীর নামে শপথ!...আর কিছু বলতে চান?"

কিকিরা কথাটা অস্বীকার করলেন না। নবকুমার টেবিলের ওপর রাখা অ্যাটাচি দেখেছে। "টাকাটা—ওই অ্যাটাচি গেল কোথায়?"

"কোথায় গেল! আপনার মক্কেল জানে না? চুরি করেছে।"

"তাহলে তো আপনার থানা-পুলিশ করা উচিত ছিল। কেন করেননি?...না করে লোক পাঠিয়ে নবকুমারকে ভয় দেখিয়েছেন! অ্যাটেম্পট টু মার্ডার, আর

চুরি।”

কৃষ্ণকান্ত মুখ মুছে নিলেন চাদরে। পাখাটা জোরেই চলছিল। ঘরের আলো অতটা উজ্জ্বল নয়। কৃষ্ণকান্তর যেন দম ফুরিয়ে আসছিল। গলা ভেঙে আসছে। বললেন, “পারতাম। কেন করিনি জানেন?”

“কেন?”

“কুমারকে ঘরে ঢুকতে বা বেরিয়ে যেতে আমি দেখিনি। আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম অঘোরে। যেমন হয় আমার হঠাৎ হঠাৎ...। প্রমাণ ছিল না যে!...তা ছাড়া দ্বিতীয় কারণ, আপনি বুঝতে পারবেন না ঠিক। চৌধুরীবংশে, কোর্ট কাছারি, মামলা মোকদ্দমা অনেক হয়েছে। তাতে আমাদের লজ্জা নেই। ওটা আভিজাত্যের লক্ষণ। তা বলে ঘরের কেচ্ছার জন্যে থানা-পুলিশ আমরা করি না।”

কিকিরা অবাক হয়ে গেলেন। অদ্ভুত তো!

“কিন্তু টাকা সে নেয়নি,” কিকিরা বললেন। বলে দরজার কাছে গিয়ে ডাকলেন—“ছকু।” আসলে ঘণ্টি বাজার সঙ্গে সঙ্গে ছকু তৈরি ছিল।

কোথায় কোন আড়ালে লুকিয়ে ছিল ছকু চোরের মতন, হাজির হয়ে গেল।

কিকিরা বললেন, “নবকুমারকে ডাকো। ওদেরও আসতে বলতে পারো।”

কৃষ্ণকান্ত মুনশিকে জল আনাতে বললেন। তাঁর গলা শুকিয়ে গিয়েছে। শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল। মুনশি চলে গেল।

কিকিরা বললেন, “টাকাটা আর কে নিতে পারে বলে আপনি সন্দেহ করেন?”

“জানি না।”

“আপনার কর্মচারীদের কেউ?”

“না।”

“বাসুদেব?”

“বাসু-দেব! সে তখন কোথায়?”

“এ বাড়িতে ছিল না?”

“না।”

“আপনি তার ওপর ভরসা করে এখানে ডাক্তার দেখাতে এসেছিলেন কেন?”

“আমি যখনই কলকাতায় আসি, কাউকে না কাউকে দেখাই। লাভ কিছুই হয় না। এবারে ও নিজেই...”

মুনশি জল নিয়ে এল।

কৃষ্ণকান্ত জল খেলেন। স্বস্তি পেলেন যেন।

এমন সময় ছকু ঘরে এল, সঙ্গে নবকুমার।

কৃষ্ণকান্ত দেখলেন নবকুমারকে। “তুমি এইসব দলটল জোগাড় করেছ! আমায় অপদস্থ করতে চাও?”

“আমি টাকা নিইনি।” নবকুমার বলল।

কৃষ্ণকান্ত হঠাৎ উত্তেজনায় উঠে দাঁড়ালেন। তারপর সকলকে চমকে দিয়ে প্রাণপণে এক চড় মারলেন নবকুমারের গালে। "স্কাউন্ড্রেল। লায়ার। চোর।" কাঁপতে কাঁপতে আবার তিনি বসে পড়লেন আর্মচেয়ারে। হাঁফাচ্ছিলেন। ঘামছেন দরদর করে।

হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন কিকিরা। অন্যরাও বিমূঢ়। নবকুমার মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে।

মুনশি হঠাৎ বলল, "বাবু, বাসুবাবুকে ডাকব?"

"কোথায় সে?"

"ওপরে। সামান্য আগে এসেছেন।"

"ডাকো।"

মুনশি বাসুদেবকে ডাকতে গেল।

কিকিরা কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন কৃষ্ণকান্তকে। বললেন না। ভদ্রলোকের মানসিক উত্তেজনা তাঁকে যেন ক্ষিপ্ত করেছে।

স্তব্ধ ঘরে যে যার মতন দাঁড়িয়ে। কৃষ্ণকান্ত চোখের পাতা বুজে ফেলেছেন। ঘুমিয়ে পড়লেন নাকি?

না।

বাসুদেব ঘরে এল। সঙ্গে মুনশি। এমনভাবে এল বাসুদেব যেন সে জানতে এসেছে, ঘরে এরা কারা, বেপরোয়া রূঢ় গলায় বলল, "কে? আপনারা কারা? এখানে কেন?"

কৃষ্ণকান্ত চোখ খুললেন।

কিকিরা যে কখন আলখাল্লার পকেট থেকে একটা ভয়ংকর বস্তু বার করেছেন, কেউ দেখতে পায়নি। এগিয়ে গিয়ে ছকুর হাতে গুঁজে দিলেন, নজরে পড়ল না কারুর।

বাসুদেব হাত তুলে ঘরের দরজা দেখাল। "বেরিয়ে যান। ভদ্রলোকের বাড়িতে ঢুকে গুণ্ডামি?"

ওর কথা শেষ হওয়ার আগেই ছকু অদ্ভুত কায়দায় বাসুদেবের গলা চেপে ধরল। একটা হাত তার গলায় পেঁচিয়ে আছে, অন্য হাতে সরু পাতলা অস্ত্র। সাইকেলের চাকার স্পোকের মতন সরু। কিন্তু অতি তীক্ষ্ণ, ধারালো।

বাসুদের নড়তে পারল না। অস্ত্রের সূক্ষ্ম মুখটা তার গলায় লাগছে। সামান্য নড়লেই গেঁথে যাবে।

কিকিরা দু' পা এগিয়ে গেলেন। "টাকাটা কোথায়?"

"টাকা!"

"আড়াই লাখ টাকা! কোথায় টাকা?"

"আমি কী জানি! কী যা-তা বলছেন?"

"ছকু—!"

ছকু হাতের অস্ত্রটা প্রায় গলায় চামড়ার সঙ্গে ছুঁইয়ে ঈষৎ চাপ দিল।

"আমি জানি না।"

কিকিরা বললেন, "আমাদের সঙ্গে পুলিশ আছে। স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চ। ডাকব?" বাসুদেবকে ভয় দেখাবার জন্যে ধাপ্পা দিলেন কিকিরা। ঠাট্টার গলায় বললেন, "উর্দিপরা নয়, প্লেন ড্রেস! ডাকব?"

ছকু এবার হাতের অস্ত্রটা বাসুদেবের থুতনির তলায় এমনভাবে চেপে ধরল যে, সামান্য নড়াচড়া করলেই গলায় বিঁধে যাবে ধারালো মুখটা।

কিকিরা মনে মনে ঠিক করে নিয়েছেন, চন্দনকেই পুলিশের অফিসার বলে চালাবেন। প্লেন ড্রেস অফিসার তো! মানিয়ে যাবে। চন্দনের চেহারা ভাল, ডাক্তারি করতে করতে দিব্যি গাম্ভীর্যও রপ্ত করে ফেলেছে।

ছকু যেন সাঁড়াশির মতন আঁকড়ে ধরেছে গলাটা। বাসুদেবের নিশ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল।

বাসুদেব কোনওরকমে বলল, "বলছি। আমার গলা ছেড়ে দিন। জিভ বেরিয়ে আসছে।" ঘামে ভয়ে তার মুখ অস্বাভাবিক দেখাচ্ছিল। চোখ লালচে হয়ে উঠেছে।

কিকিরার ইশারায় গলার কাছ থেকে হাত সামান্য সরিয়ে নিল ছকু।

বাসুদেব শ্বাস নিল। তারপর বাইরের দিকে হাত দেখাল। "বাইরে জলের রিজার্ভারের মধ্যে মোটা পলিথিন শিট জড়িয়ে অ্যাটাচিটা ফেলে রেখেছি।"

"নিয়ে যাওনি?"

"না। পারিনি। এখন ওই টাকা নিয়ে গোলমাল চলছে এ-বাড়িতে। পরে নিয়ে যেতাম।" বলে কৃষ্ণকান্তকে দেখাল। "উনি এখান থেকে চলে যাওয়ার পর।"

"টাকা তুমি নিয়েছ?

"হ্যাঁ।"

"কিন্তু তুমি তো শুনলাম এ-বাড়িতে ছিলে না তখন?"

মুনশি হঠাৎ বলল, নিজের থেকেই, "কর্তাবাবু জানেন না। বাসুবাবু আগের দিন ছিলেন। রাত পর্যন্ত। পরের দিনও দুপুরে এসেছিলেন লুকিয়ে। আমি জানি।"

"বাসুদেববাবু কেমন করে জানবে টাকা দেওয়ার কথা? কে বলেছে যে, কুমারকে টাকা দেওয়া হবে?"

মুনশি বলল, "আজ্ঞে, এসব কথা বাসুবাবুর না জানার কথা নয়। কর্তামশাই নিজেই বলেছেন। তবে টাকা দেওয়ার কথাই। কবে কখন তা কি বলেছেন!"

কৃষ্ণকান্ত এতক্ষণ কোনও কথা বলেননি। কাণ্ডকারখানা দেখছিলেন কিকিরাদের। কথা শুনছিলেন। এবার বিরক্তির গলায় বললেন, "হ্যাঁ, বলেছি। বলব না কেন? দোষটা কোথায়! টাকাপয়সা জড়ো করা হচ্ছে নগদ, ও জানতে পারবে। এ-কথাও বলেছি, আমি বুড়ো হয়ে গিয়েছি। অসুখটাও এখন পাকাপাকি জড়িয়ে ধরেছে। ডাক্তারদের ওপর আর ভরসা করা যাচ্ছে না। কবে কী হয় কে

জানে! তা আমি চাই না, আমাদের বাড়ির এই ঝামেলা টিকে থাকুক। আমি মারা যাওয়ার পর কুমার আমার স্ত্রীকে জ্বালিয়ে মারবে! তার চেয়ে ওকে কিছু দিয়ে-থুয়ে বরাবরের মতন ঝঞ্ঝাটটা চুকিয়ে দেওয়া ভাল।"

কিকিরা বললেন, "তাহলে তো সবই জানিয়ে দিয়েছিলেন আপনি।"

"না", মাথা নাড়লেন কৃষ্ণকান্ত। "কত টাকা দেব এখন তা হয়তো বলেছি কথায় কথায়। তবে কোনদিন কখন—, তা বলিনি। টাকার ব্যবস্থা করে যেদিন মুনশি আর আমি গোনাগুনি করছিলাম, সেদিন বাসুদেবকে দেখিনি। আমাদের কাজকর্ম হচ্ছিল ঘরের দরজা বন্ধ করে রাত্তিরবেলায়। ও তখন কোথায়?"

মুনশি ঘাড় নাড়ল। আবার বলল, "কর্তামশাই জানেন না। আগে যা বলেছি আমি—সেটাই ঠিক। বাসুবাবু সেদিন এ বাড়িতে অনেকটা রাত পর্যন্ত ছিলেন। হয়তো আঁচ করতে পেরেছিলেন আমরা কী নিয়ে ব্যস্ত থাকব।"

"কিন্তু সে ছিল কোথায়, মুনশি?" কৃষ্ণকান্ত বললেন।

"এ বাড়িতে লুকিয়ে থাকার জায়গার অভাব কোথায় কর্তাবাবু!" মুনশি বলল। "আমিও তো আগে ওঁকে দেখিনি। পরে দেখলাম। দোতলায় ঠাকুরঘরের পাশে কোঠাটায় ছিলেন। পরে চলে গেলেন।"

"আমি তো জানি না।" কৃষ্ণকান্ত বললেন।

কিকিরা সামান্য হেসে বললেন, "আপনার চোখ কতটা আর দেখতে পারে। বাসুদেব অনেক চালাক। বাহাদুরিও আছে। ও সবই নজরে রেখেছিল।...কী বলো বাসুদেব?"

কেমন হতাশ ভেঙে পড়া গলায় বাসুদেব বলল, "আমি কিন্তু একটা কথা জানতাম না। ভাবতেও পারিনি।"

"কী কথা?"

"টাকা নিতে এসে কুমার দেখবে, উনি—মানে চৌধুরীমশাই ঘুমিয়ে পড়েছেন। আর ও চলে যাবে। ভয়ে কুমার পালিয়ে গেল—আমি দেখেছি। ওই জানলার ওপাশে আমি সব দেখছিলাম লুকিয়ে।"

"ও!"

"অ্যাটাচি সরাবার সুযোগটা হঠাৎ এসে গেল আমার।"

"না এলে কী করতে?"

"না এলেই বরং ভাল হত। ও যদি টাকার অ্যাটাচি নিয়ে বাড়ির বাইরে চলে যেত—বেশিদূর যেতে পারত না। আমার লোক ছিল বাইরে, মোটরবাইক নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। টাকা ছিনতাই হয়ে যেত।"

সামান্য চুপ করে থেকে কিকিরা বললেন, "তোমার এত টাকার দরকার হবে কেন? তুমি কি চোর, ডাকাত, গুণ্ডা?"

বাসুদেব মাথা নিচু করে বলল, "যা ভাবেন আপনারা! তবে একটা কথা বলি—দুটো কোম্পানি যেখানে আমি কাজ করেছি আগে, কোথাও মাসআষ্টেক, কোথাও

বছরখানেক—আমার নামে কোর্টে মামলা করেছে। হিসেবের গোলমাল, টাকা চুরি, ফোরজারি। আমায় তাড়িয়ে দিয়েছে ওরা। প্রায় আশি-পঁচাশি হাজার টাকা দিতে পারলে নিস্তার পাব। টাকার আমার দরকার ছিল।”

কৃষ্ণকান্ত সোজা হয়ে বসতে যাচ্ছিলেন, পারলেন না। হঠাৎ পেছনদিকে পিঠ হেলিয়ে শুয়ে পড়লেন। চোখের পাতা বুজে গেল। হাত এলিয়ে পড়ল দু' পাশে।

তারাপদরা সবাই ততক্ষণে ঘরের মধ্যে এসে পড়েছে।

কয়েক মুহূর্ত সব কেমন নিঃশব্দ। থমথম করে উঠল ঘরের আবহাওয়া। তারপরই হঠাৎ নবকুমার ছুটে গিয়ে কৃষ্ণকান্তর মুখের সামনে ঝুঁকে পড়ল। “জেঠামশাই?”

কৃষ্ণকান্ত সাড়া দিলেন না। তাঁর চোখের পাতা কেমন বিষণ্ণ, মলিন, সামান্য আর্দ্র দেখাচ্ছিল।

গ্রন্থ-পরিচয়

কৃষ্ণধাম কথা।
আনন্দমেলা ৩১ ডিসেম্বর ১৯৯৭ সংখ্যায় প্রকাশিত।

ঝিলের ধারে একদিন। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।
প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ১৯৯৮। পৃ. ১০০।
মূল্য ৪০.০০।
উৎসর্গ: অনুষ্টুপকে।
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ: সুব্রত চৌধুরী।

সোনালি সাপের ছোবল। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।
প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ১৯৯৯। পৃ. ১২২।
মূল্য ৪৫.০০।
উৎসর্গ: বিবি-কে।
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ: নির্মলেন্দু মণ্ডল।

হায়দার লেনের তেরো নম্বর বাড়ির কফিন বাক্স।
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।
প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ২০০০। পৃ. ১১৬।
মূল্য ৫০.০০।
উৎসর্গ: রুদ্র ও রুদ্রাণী-কে।
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ: সুব্রত চৌধুরী।

নীল বানরের হাড়। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।
প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ২০০১। পৃ. ৯৬।
মূল্য ৫০.০০।
উৎসর্গ: নোটন ও ছুটকু-কে দাদাই।
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ: সুব্রত চৌধুরী।

ভুলের ফাঁদে নবকুমার।
আনন্দমেলা পূজাবার্ষিকী ১৪০৮-এ প্রকাশিত।